প্রকাশক :
অরুণ পুরকায়স্থ
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা
আষাঢ় ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

সূচিপত্র

মুখবন্ধের বদলে

অনুনাটক

ওরাও একদিন ছিল

চরিত্র ঃ কয়েকজন অভিনেতা

[পর্দা খুললে দেখা যাবে— মঞ্চের দু'দিকে স্ট্যাণ্ডসহ দু'টি মাউথপিসের পেছনে একজন লাল জামা গায়ে ও অন্যজন নীল জামা গায়ে দাঁড়িয়ে হাত ছুড়ে ছুড়ে চেঁচিয়ে উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছে। দু'জনের বক্তৃতাই একসঙ্গে শুরু হবে ও একসঙ্গে থেমে যাবে। দু'জনের ভাষণেরই প্রথম ও শেষ অর্থবহ শব্দ ছাড়া মাঝখানে শুধু অর্থহীন চিৎকৃত ধ্বনিসমষ্টি থাকবে।
যাঁরা 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা চ্যাপলিন-অভিনীত হিটলার চরিত্রটির বক্তৃতার অংশটি স্মরণ করলে আমাদের বক্তব্যটি সহজে বুঝতে পারবেন। যাঁরা দেখেননি, তাঁরা একটু ভাবলেই বিষয়টি বুঝে নেবেন]

নীল জামা ঃ বন্ধুগণ....(অর্থহীন অনর্গল ধ্বনিগুচ্ছ) বন্দেমাতরম্ জয়হিন্দ।

লাল জামা ঃ কমরেডস্.... (অর্থহীন উত্তেজক ধ্বনির প্রবাহ) লাল সেলাম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

[অটোস্টপের মতো একসঙ্গে থেমে গেলে তিনজন অভিনেতা আসে]

তিনজন সমস্বরে ঃ সব শালা সমান, সব নেতাই চোর-জোচ্চর, সব পার্টিই ধাপ্পাবাজ। রাজনীতি মানেই ধান্দাবাজী।

[রঙচঙে ঢোলা জামা প'রে সূত্রধার আসে]

সূত্রধার ঃ রাজা আসে যায়, নীল জামা গায়, লাল জামা গায়, পোশাকের ঢং বদলায়। মুখোশের রং বদলায়, তবু দিন বদলায় না। এমন কিছুই যেন বলেছিলেন এক কবি। তিনি নেই, তবু কথাটা ফ'লে গেছে। তাই এইসবই শোনা যায় সর্বত্র।

তিনজন সমস্বরে ঃ শুধু মুখেই বড় বড় বুলি, আর কাজে শুধু নিজেদের আখের গোছায় এরা।

সূত্রধার ঃ হ্যাঁ, এরা সবাই ধান্দাবাজ, ধাপ্পাবাজ, চোর-গুণ্ডার দল। কিন্তু একদিন তো ওরাও ছিল।

তিনজন ঃ ওরা? ওরা কারা?

সূত্রধার ঃ এখনই ভুলে গেছো ওদের? বেশ, তাহলে মনে করিয়ে দিই। এই মঞ্চেই না হয় ফিরে আসুক আগুনঝরা সেইসব ভুলে যাওয়া দিনগুলো—

[নীল ও লাল জামা পরা অভিনেতারা জামা খুলে ফেলে অন্যদের সঙ্গে মিশে যায় এবং অভিনেতারা মিছিলের মতো স্লোগান দিতে দিতে মঞ্চপরিক্রমা শুরু করে]

সবাই ঃ ইনকিলাব জিন্দাবাদ! এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। সাতের দশক মুক্তির দশক, মুক্তির দশক জিন্দাবাদ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম। দিকে দিকে কৃষকের গেরিলা যুদ্ধ চলছে চলবে।

[ওরা পেছনে চ'লে যায়]

সূত্রধার ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। সাতের দশক। সেই ১৯১০-এর একদিন মাঝরাতে একটা বড়সড় কালো ভ্যান দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল আমাডাঙার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে। নির্দিষ্ট জায়গায় ভ্যানটা হঠাৎ থামে। (নেপথ্যে গাড়ি থামার আবহ)

[পুলিশ অফিসারের পোশাক প'রে নিয়ে এক অভিনেতা এক বয়স্ক যুবকের কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে সামনে এগিয়ে আসে]

পু. অ. ঃ কী নাম?

যুবক ঃ কানাই ভট্টাচার্য।

পু. অ. ঃ কী করিস?

যুবক ঃ ভদ্রভাবে কথা না বললে একটা প্রশ্নেরও জবাব দেবো না।

পু. অ. ঃ সব ক'টাই জাত সাপের বাচ্চা, লেজে পা পড়লেই ফোঁস। এখনও ফোঁস যায়নি দেখছি, এত টর্চারের পরেও। তা দেখছি, মহাশয়ের কাজকর্ম করা হয় কিছু? না-কি শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকে শুধুই মাও সে তুং জিন্দাবাদ করা হয়।

যুবক ঃ আমি টেক্সম্যাকোতে কাজ করি, স্কিল্‌ড ওয়ার্কার।

পু. অ. ঃ দেখে তো মনে হচ্ছে— বিয়েশাদী করেছেন—

যুবক ঃ আমার দু'টি ছেলে আর একটি মেয়ে আছে।

পু. অ. ঃ তিন ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েও নকশালী হাঙ্গামায় জড়িয়েছেন? পাগল না-কি? শুনুন, শুনুন, আপনাকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করুন, এইসব বিপ্লবটিপ্লবের ঝামেলায় থাকবেন না।

যুবক ঃ উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। তবে সারাদিন ধ'রে থানা লক্‌আপে বীভৎস অত্যাচার করার পর একটা অজানা অচেনা মাঠে নিয়ে এসে মাঝরাতে উপদেশ দেওয়াটা জঘন্য রসিকতা ব'লেই মনে হয়।

পু. অ. ঃ না, না, সত্যি বলছি— রসিকতা করছি না। সত্যিই ছেড়ে দেবো, শুধু যদি—

যুবক ঃ শুধু যদি?

পু. অ. ঃ শুধু যদি আপনাদের পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ড ঠেক্‌গুলো চিনিয়ে দেন, কয়েকজন লীডারকে যদি ধরিয়ে দেন—

যুবক ঃ তার মানে বেইমানী? বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! থুঃ!

পু. অ. ঃ শালা থুতু দিয়েছে। আর রেহাই নেই বাঞ্চতের। গুলি কর্‌।

যুবক ঃ (চিৎকার) বিপ্লবীদের মেরে বিপ্লবকে ধ্বংস করা যায় না—

[পেছন থেকে অন্যেরা ঃ যায় না, যাবে না]

যুবক ঃ (চিৎকার) নকশালবাড়ি লাল সেলাম।

[পেছন থেকে অন্যেরা ঃ লাল সেলাম, লাল সেলাম]

পু. অ. ঃ (চিৎকার) ফায়ার, ফায়ার, এগেন অ্যাণ্ড এগেন!

[যুবক গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থির]

সূত্রধার ঃ না, না, এসব ঘটনার কথা আজ আর আমাদের মনেও পড়ে না। আমরা একেবারেই ভুলে গেছি— জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করা

এইসব আত্মত্যাগী বীর মানুষদের, যারা ছিল আমাদেরই ঘরের সন্তান।

[ফ্রিজ ভেঙে যায়]

জানি, জানি, বলতে হবে না; ওরা অনেক ভুল করেছিল, সমস্ত মানুষকে একজোট করার আগেই আবেগতাড়িত হয়ে এক অসম যুদ্ধে নেমে পড়েছিল, আর তাই ওরা হেরে গিয়েছিল। কিন্তু যতই ভুল করুক, একটা জায়গায় ওদের কোনো ভুল ছিল না। শোষণহীন বৈষম্যহীন এক মুক্ত মানবিক সমসমাজের যে স্বপ্ন ওরা দেখেছিল, তা'তে কোনো ভুল ছিল না। আর ঐ স্বপ্নকে সফল করার জন্যে ওরা নিজেদের জীবনকে বাজী রেখেছিল। ওরা ধান্দাবাজ ছিল না, চোর-জোচ্চর-দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল না, প্রমোটার শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীদের দালাল ছিল না। ওদের ঝাণ্ডার রং তাই মেকী ছিল না, বরং সেই পতাকা ওদেরই শিরা ছেঁড়া বুকের রক্তে লাল থেকে গাঢ় লাল হয়ে উঠেছিল—জানি, জানি, ওদের স্বার্থবোধহীন বীরত্ব নিয়ে আজ নাটক করাও হাস্যকর ছেলেমানুষী। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে একবার বলুন তো অতীতের সেই সর্বস্বত্যাগী বীর ছেলেরা যদি সব ভুলভ্রান্তি অতিক্রম ক'রে আবার ফিরে আসে এই হতভাগ্য শৃঙ্খলিত দেশে, তবে কেমন হয়? আমরা অন্তত ওদের আবার আসার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি।

অন্যেরা ঃ ওদের আবার আসার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছি, ওরা আবার আসবে।

বিরতিহীন পূর্ণাঙ্গ নাটক

শববাহকেরা

চরিত্র ঃ নন্দিনী, অধ্যাপক, বিশু, ফাগুলাল, রঞ্জন, কিশোর, গোকুল, গজ্জু, কঙ্কু।

।। সূত্রপাত ।।

[এই অংশের প্রতিটি সংলাপ 'রক্তকরবী' থেকে চয়ন করা হয়েছে, অবশ্য সংলাপের বিন্যাসক্রম মানা হয়নি। নেপথ্য আবহে দ্রুতলয়ে উত্তেজক রণবাদ্য এবং ঝড়ের ক্রুর হুঙ্কার সংমিশ্রিত হয়। নাটক শুরু হচ্ছে সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে, তাই এই অংশের পাত্র-পাত্রীদের চলনে-বলনে-অভিনয়ে অস্বাভাবিক দ্রুততা থাকবে। আলোর রং হবে স্বপ্নময় রঙিন]

নন্দিনী ঃ রাজা, এইবার সময় হলো।

নেপথ্যাশ্রিত রাজা ঃ কীসের সময়?

নন্দিনী ঃ আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা ঃ আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী ঃ তারপর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা ঃ তাহলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে, আজ আমাকে তোমার সাথী করো নন্দিনী।

নন্দিনী ঃ কোথায় যাবো?

রাজা ঃ আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছো না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক— তাতেই আমার মুক্তি!

[নেপথ্যে গান ঃ "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে"—এই গানের আবহের মধ্যেই নিম্নলিখিত চরিত্রগুলির ছুটোছুটি ব্যস্ততা হঠাৎ প্রকট হয়ে উঠবে]

ফাগুলাল ঃ (ছুটে প্রবেশ করে) সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ প'ড়ে আছে।

নন্দিনী ঃ নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না।

[প্রস্থান]

ফাগুলাল ঃ কোথায় ছুটেছো অধ্যাপক? [অধ্যাপক ঢোকে]

অধ্যাপক ঃ কে যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

[অধ্যাপকের প্রস্থান। বিশু ঢোকে]

বিশু ঃ ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়?

ফাগুলাল ঃ তুমি কী ক'রে এলে?

বিশু ঃ আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়?

ফাগু ঃ সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু ঃ কোথায়?

ফাগু ঃ শেষ মুক্তিতে। বিশু, দেখতে পাচ্ছো ওখানে কে শুয়ে আছে?

বিশু ঃ ও যে রঞ্জন!

ফাগু ঃ ধুলায় দেখছো ঐ রক্তের রেখা?

বিশু ঃ বুঝেছি, ওই তাদের পরম মিলনের রক্তরাখী। এবার আমার সময় এলো একলা মহাযাত্রার!

নন্দিনীর কণ্ঠ ঃ মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না।

ফাগু ঃ নন্দিনীর জয়।

বিশু ঃ নন্দিনীর জয়।

নন্দিনীর কণ্ঠ ঃ জয়, রঞ্জনের জয়।

বিশু ঃ আয় রে ভাই এবার লড়াইয়ে চল্।

॥ সত্তর দশক ॥

[মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকারে ভ'রে যায়। "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে" গানের ফাঁকে ফাঁকে নন্দিনীর ঘোষিত প্রত্যয় উচ্চারিত হ'তে থাকে বার বার "মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না।" হঠাৎ পর পর গুলির শব্দ। নেপথ্য আবহ স্তব্ধ হয়ে যায়। গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চারজন যুবকের দেহ মঞ্চে ছিট্‌কে পড়ে। মঞ্চে এবার সাদা আলো। যুবকেরা উঠে প'ড়ে উদ্দাম গতিতে ছুটতে থাকে। অডিটোরিয়াম থেকে হঠাৎ রঞ্জন চিৎকার ক'রে ওঠে—]

রঞ্জন : —বারাসাত! (একটি যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে প'ড়ে যায়) —কখনোই শ্রেণীসংগ্রাম ভুলো না। বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে! —বরাহনগর! (২য় যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে প'ড়ে যায়।) যেখানেই নিপীড়ন, সেখানেই প্রতিরোধ! দৃঢ় থাকো, কোনো ত্যাগকেই ভয় কোরো না এবং যুদ্ধে জেতার জন্য সমস্ত বাধা অতিক্রম করো। —শ্রীকাকুলাম! (৩য় যুবক গুলিবিদ্ধ হয়।) সংশোধনবাদ নয়, মার্ক্সবাদ অনুশীলন করো। লড়াই করো, ব্যর্থ হ'লে আবার লড়ো, আবার ব্যর্থ হ'লে আবার লড়ো, যতক্ষণ না জয়লাভ করতে পারো। এই হচ্ছে জনগণের যুক্তি। —'সারা ভারতবর্ষ! (৪র্থ যুবক গুলিবিদ্ধ হয়) জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই বিশ্বইতিহাসের চালিকা শক্তি। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলেরাই কাগুজে বাঘ। তাই জয় আমাদের হবেই। (নিজে গুলিবিদ্ধ হয়ে স্টেজের সামনে প'ড়ে যায়। চারজন যুবক উঠে পড়ে।)

যুবকেরা : আনন্দবাজার, আনন্দবাজার। —১৯৭১-এর সতেরোই জুন। হাওড়া স্টেশনের সংলগ্ন বাস টার্মিনাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আত্মগোপনকারী এক উগ্রপন্থী যুবক নিহত। স্পেশাল ব্রাঞ্চের সন্দেহ— অপারেশন সিক্সটি নাইন গ্রুপের নেতৃস্থানীয় এই যুবকটিই আসলে, বহু অনুসন্ধানেও যাকে ধরা যায়নি— সেই দুর্ধষ সন্ত্রাসবাদী রঞ্জন!

॥ পর্বান্তর ॥

[নেপথ্যে যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে। যুবকেরা স্টেজ থেকে নেমে এসে রঞ্জনের দেহটিকে তুলে নেয়। বার বার সমস্বরে "আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগো রে সকল দেশ—" বলতে বলতে অডিটোরিয়ামের মধ্যে দিয়ে চ'লে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই "বল হরি হরিবোল" হরিধ্বনি দিতে দিতে অডিটোরিয়ামের পেছন থেকে নন্দিনী, অধ্যাপক, বিশু, ও ফাগুলাল সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা কফিন কাঁধে ক'রে ধীর-মন্থর গতিতে স্টেজের ওপর উঠে আসে। নেপথ্যে প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের গর্জন। মঞ্চে নীলাভ আলো। আলোকিত স্টেজে একটা পোড়ো ভাঙা বাড়ির ইঙ্গিতময় সেট]

অধ্যাপক : এসো, এখানেই একটু বসা যাক।

বিশু : হ্যাঁ, হাতে-পায়ে খিল ধরতে শুরু করেছে।

ফাগু : কম দূর না-কি! বাব্‌বাঃ! ক্লান্তিতে সারা শরীর ছিঁড়ে পড়ছে।

অধ্যাপক : এটাকে ঐ পেছন দিকটায় রেখে দিই। [স্টেজের পেছনে একটা

ভাঙা বেদীতে ওরা কফিনটাকে রাখে। ওরা তিনজন সামনে এগিয়ে আসে। নন্দিনী মৃতদেহটার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে।]
—বসো এখানে। একটু আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে বসো সবাই। যতক্ষণ না বৃষ্টি থামে, এখানেই থাকতে হবে।

ফাগুলাল ঃ ঝড়ের হুঙ্কার শুনছো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লোপাট ক'রে দেবে যেন। আজ আর বৃষ্টি থেমেছে!

বিশু ঃ না থামলেই ভালো। বৃষ্টি থামলেই তো আবার সেই অন্ধকার পিছল পথে অন্তহীন চলা! আর পারি না যে!

অধ্যাপক ঃ পারতে যে হবেই। না পেরে যে উপায় নেই। পথে যখন নেমেছি, তখন দুরন্ত ঘোড়ার মতো বোধের সমস্ত সীমান্ত পেরিয়ে ছুটে যেতেই হবে।

বিশু ঃ কোথায় যাবো?

অধ্যাপক ঃ আপাতত জানি, এই পরিচিত পৃথিবীর সীমারেখায় রুগ্ন-মজা কোনো নদীর আদিগন্ত বালুচরের রুক্ষ কাঠিন্যে ঘেরা এক নির্জন মহাশ্মশানে— যেখানে দিনরাত স্মৃতির চিতায় বুকের আগুন নেচে নেচে গেয়ে যায় জীবনের পরম অচরিতার্থতার ট্র্যাজিক সঙ্গীত— যেখানে চিতার আগুন আকাশের বৈশাখী মেঘের ললাটে পরায় রক্তচন্দনের নির্মম তিলক—

ফাগুলাল ঃ এই ঝড়বৃষ্টি— চারিদিকে অন্ধকার— এখনও তোমার কাব্য আসছে অধ্যাপক?

অধ্যাপক ঃ কিংবা সেই মহানৈঃশব্দ্যের বিষণ্ণ উপকূলে সারি সারি দেবদারু গাছের আড়ালে ঘেরা পিতৃপুরুষের কৃতঘ্ন বাসনার করুণ কবরখানায়, রাতের শিশির আঁধারের শুকনো পাতা থেকে সলজ্জ বেদনায় ঝ'রে পড়ে টুপটাপ.... টুপটাপ.... টুপটাপ— অবিরাম, ঝরা শিউলিফুলের রাশি বিছিয়ে রেখেছে হায় পরমবেদনায় মানুষের সীমাবদ্ধ নিয়তির নির্দিষ্ট বৃত্তগুলি—

ফাগুলাল ঃ অধ্যাপক, রক্ষে করো— ঝড়ের শব্দে প্রাণ কাঁপছে ভয়ে, এই ভাঙা পোড়ো বাড়িতে ব'সেও বিন্দুমাত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই। যে-কোনো সময়েই ইটকাঠ আর কড়িবরগাগুলো দুম ক'রে খ'সে পড়তে পারে। আর সঙ্গে সঙ্গেই—

বিশু ঃ ভবলীলা সাঙ্গ এবং নির্ভেজাল স্বর্গপ্রাপ্তি!

ফাগু ঃ যা বলেছো বিশু, এই ঝড়বৃষ্টির রাতে সবেধন নীলমণি এই আশ্রয়টিও যখন নিরাপদ নয়—

অধ্যাপক ঃ নিরাপদ আশ্রয়! নিরাপত্তা! হুঁঃ!

বিশু ঃ আরে— নন্দিনী যে ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—

ফাগু ঃ নন্দিনী, এখানে এসো— জমিয়ে গল্প করা যাক। আরে, এসো না— কী হলো? শুনতে পাচ্ছো না না-কি? নন্দিনী—

বিশু ঃ এই পাগলী, দারুণ ঝড়ের রাতে কতদিন পরে আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেছি— দেশবিদেশে যাত্রা করা জাহাজগুলো আবার ভিড়েছে সেই পুরোনো বন্দরে। এদিকে আয়। —সাড়া দেয় না কেন!

অধ্যাপক ঃ (কঠিন স্বরে) নন্দিনী!

নন্দিনী ঃ (ওখান থেকেই মৃদুস্বরে) কী?

অধ্যাপক ঃ এখানে এসো!

নন্দিনী ঃ না!

অধ্যাপক ঃ কেন?

নন্দিনী ঃ আমাকে বিরক্ত কোরো না।

ফাগু ঃ তা ব'লে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? একটা কফিনের পাশে? তোমার কি ঘেন্নাপিত্তিও নেই?

বিশু ঃ অমন কথা বলিস না ফাগুলাল, এতদিন তো ঐ কফিনই আমরা কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।

ফাগু ঃ সে নেহাতই দায়ে প'ড়ে।

অধ্যাপক ঃ দায়? কে আমাদের মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল, ঐ মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে— দিন নেই রাত নেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের জলাভূমিতে হেঁটে বেড়ানোর জন্যে?

বিশু ঃ অধ্যাপক!

অধ্যাপক ঃ কে বলেছিল— ঐ কাঠের কফিন ছুঁয়ে ছুঁয়ে পেরিয়ে চলো পৃথিবীর দুরারোহ পর্বতমালা, সভ্যতার জীর্ণ ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে শুধু ঐ সাদা কাপড়ে ঢাকা স্বপ্নের প্রেতটিকে বুকের পাঁজরের গোপন গহ্বরে লুকিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে চলো অস্তিত্বের ভয়াল অরণ্যের লুপ্ত পথরেখা খুঁজে খুঁজে? কীসের জন্যে আমরা, কীসের দায়ে, কার উস্কানিতে আজ নষ্ট মৃতপ্রান্তরে হেঁটে চলেছি ঝড়বাদলের উদ্দাম নিশীথে?

ফাগু ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার ঘাট হয়েছে। আমার মোটেই ভোলা উচিত হয়নি— ভারত সরকারের রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে তুমি কানাডায় পাড়ি দিয়েছো বহুদিন, সুতরাং ফলাও ক'রে পাণ্ডিত্য জাহির করার একচেটে অধিকার তোমার আছে।

অধ্যাপক ঃ মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে।

ফাগু : একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে মাথাটি তো সাফ নয়। কারখানার মজুর ছিলাম। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পাণ্ডাও। [নেপথ্যে— ইনকিলাব জিন্দাবাদ! হামারা মাঙ দেনে হোগা, দেনে হোগা।] আজ সেই সুবাদে না হয় শিকে ছিঁড়ে লেবার অফিসারের পোস্টটি বাগিয়ে নিয়েছি। তবু মজুরের হেডটি যাবে কোথায়? ঠিকঠাক বুঝতেটুঝতে আজও টাইম লাগে!

বিশু : চন্দ্রা কেমন আছে রে ফাগুলাল—

ফাগুলাল : ভালোই তো থাকা উচিত। যা যা চেয়েছিল, (জাগলারের ভঙ্গিতে) টাকা, পয়সা, গোছানো ঘর, গয়নার কাঁড়ি, প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা— সবই পেয়েছে। কিন্তু আর নয়— বিশুভাই, অধ্যাপকের দর্শনতত্ত্বের চোটে মাথাটি ঘুরছে, একটু গানটান শোনাও দেখি—

বিশু : ভুলে গেছি রে ভাই, কিচ্ছু মনে নেই।

ফাগুলাল : বাজে বোকো না। প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে বোম্বেতে যে হিউজ মার্কেটটি করেছো, তা কি আমাদের একেবারেই অজানা? গানটা শুরু করো—

বিশু : হ্যাঁ কোত্থেকে যে কোথায় এসেছি— কোন্ আঘাটায়— যেখানে পৌঁছাবো ব'লে ঘর ছেড়েছিলাম— আর পথ ভুলে মিথ্যে আশার পেছনে ঘুরে ঘুরে যেখানে এলাম, তার মধ্যে যোজন যোজন ফারাক!

ফাগু : তোমার গায়েও হাওয়া লেগেছে দেখছি, শুরু করবে কি-না—

বিশু : ১৯১১-এর ১৭ই জুন থেকে আজ.... [অভিনয়ের দিনটির তারিখ উচ্চারিত হবে]— কত দীর্ঘ পথ একটি মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছি উদ্‌ভ্রান্তের মতো—

অধ্যাপক : সব পথই ভুল হয়ে যায়— মুছে যায় সব দিক্‌চক্রবাল, কেন তবু ছুটে চলা— সার্থকতা, প্রেম, প্রয়োজন, প্রতিষ্ঠা—

বিশু : (হঠাৎ গান ধরে) শেষ কোথায়, শেষ কোথায়—

ফাগু : নন্দিনী— এদিকে এসো! অনেকদিন বাদে বিশু গাইছে—

অধ্যাপক : থাক্! ওকে ডেকো না!

বিশু : (গান চলে) —কী আছে শেষে, পথের....

ফাগু : (চিৎকার ক'রে) থামো! এ গান কেন গাইছিস? অনেকদিন তো সব ভুলে গেছি—(গান চলতে থাকে। কফিনের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ নন্দিনী পাগলের মতো ব'লে ওঠে—)

নন্দিনী : বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়!

ফাগু : (পরম বিস্ময়ে) কী বলছে ও!

নন্দিনী : বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক....

অধ্যাপক : এই পাগলী, কী বলছিস? নন্দিনী— (চেঁচিয়ে) নন্দিনী!

ফাগু : পাগল না-কি!

বিশু : ওরে— এসব কথা কেন বলছিস এখানে?

নন্দিনী : সেই যাত্রার বাহন আমি— (ওরা সবাই ছুটে যায়)

অধ্যাপক : এখনও ভোলোনি সব?

বিশু : ভুলে যা, ওরে ভুলে যা। ভুললেই বেঁচে যাবি, না ভুললেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ধ্ব'সে যাবে পৃথিবীর সমস্ত প্রাসাদ!

নন্দিনী : (অভিভূতের মতো একই কথা ব'লে চলে—) বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়।

ফাগু : কোন্ সর্বনেশে দানব আজ তোকে ভর করেছে নন্দিনী!

নন্দিনী : তোমার জয়যাত্রা আজ হ'তে শুরু হয়েছে।....

বিশু : হয়নি পাগলী, কিচ্ছু হয়নি, সব ভুলে যা।

নন্দিনী : তোমার জয়যাত্রা আজ হ'তে শুরু হয়েছে।

অধ্যাপক : (সজোরে ঝাঁকিয়ে) থামো! একদম থেমে যাও। সামনে অতল খাদ!

নন্দিনী : সেই যাত্রার বাহন আমি। ....সেই যাত্রার বাহন আমি। ....সেই যাত্রার বাহন আমি! (উন্মাদের মতো হেসে উঠে কান্নায় ভেঙে পড়ে)

সবাই : নন্দিনী! (সবাই নিথর নীরব)

নেপথ্যে গান : পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
পিছিয়ে পড়েছি আমি
যাবো যে কী ক'রে?
এসেছে নিবিড় নিশি
পথরেখা গেছে মিশি
সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।

॥ কে হায় হৃদয় খুঁড়ে— ॥

[গান শেষ হ'লে চরিত্রগুলি ছটফট ক'রে ওঠে]

অধ্যাপক : না! একদম ঠিক নয়! মিথ্যে! ভয়ঙ্কর মিথ্যে!

ফাগু : নন্দিনী! ওসব বাজে চিন্তা ছাড়ো!

বিশু : রঞ্জন ম'রে গেছে রে পাগলী, ম'রে গেছে সব স্বপ্নসাধ!

অধ্যাপক ঃ স্বপ্নগুলোই মিথ্যে ছিল, বীভৎস আত্মপ্রতারণা। ওসব হয় না। সব বুঝে গেছি আজ। আমরা ভুল করেছিলাম নন্দিনী, ভুল লক্ষ্যে ভুল তীর ছুড়েছিলাম।

নন্দিনী ঃ না!

অধ্যাপক ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। রক্তের উদ্দাম জোয়ারে ভেসে আমরা ভেবেছিলাম— যক্ষপুরী বুঝি ভাঙা যায়, গভীর আঁধারের বুক চিরে বুঝি ছিনিয়ে আনা যায় মানুষের চিরায়ত বাসনার নীলকান্ত মণি, স্বর্ণতৃষ্ণায় উন্মাদ এক দল কৃতঘ্ন বর্বরের নিপীড়নের পাহাড়গুলিকে শুধু বুঝি ক্রোধের ডিনামাইটেই ধ্বংস করা যায়।

ফাগুলাল ঃ যায় না। কিছু করা যায় না।

অধ্যাপক ঃ ভুল, ভুল ভেবেছিলাম। মিথ্যে আশার পিছনে ছুটে মরেছিলাম, যাকে ভেবেছিলাম ছায়ঘন সুনিবিড় মরুদ্যান, হায় রে— সে যে তরুণ বয়সের দৃষ্টিবিভ্রম!

নন্দিনী ঃ না! রঞ্জন বেঁচে উঠবে! ও কখনও মরতে পারে না!

অধ্যাপক ঃ নন্দিনী!

বিশু ঃ পাগলী— ঐ দ্যাখ্ রঞ্জনের মৃতদেহ, করুণ কাঠের আবরণে ঢাকা!

ফাগু ঃ আমরা সেই মৃতদেহ কাঁধে ক'রেই তো ১৯১১-এর ১৭ই জুন থেকে আজ পর্যন্ত হেঁটে চলেছি শ্মশানের দিকে— কিংবা কবরখানায়—

অধ্যাপক ঃ রঞ্জন বেঁচে নেই নন্দিনী, ও মারা গেছে, ওকে গুলি ক'রে মেরেছে—

নন্দিনী ঃ না! দুই হাতে দুই দাঁড় ধ'রে সে আমাকে তুফানের নদী পার ক'রে দেয়, বুনো ঘোড়াব কেশর ধ'রে আমাকে বনের ভেতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়—

ফাগু ঃ না! সতেরোই জুন একাত্তর সাল! মেরে ফেলেছে রঞ্জনকে হাওড়া স্টেশনের কাছে গুলি ক'রে!

[নেপথ্যে— বুলেট! বুলেট! বুলেট!]

নন্দিনী ঃ না! লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা ক'রে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে—

বিশু ঃ (আর্তনাদ) না!

নন্দিনী ঃ প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ ক'রে সে হারজিতের খেলা খ্যালে।

অধ্যাপক ঃ না! খেলতো! রঞ্জন নেই। সে মারা গেছে।

বিশু ঃ হারজিতের শেষ খেলায় সে শেষবারের মতো হেরে গেছে রে পাগলী!

অধ্যাপক ঃ একাত্তর সাল! —একাত্তর সাল রঙিন কাচের ঝলমলে জানলায় ছুড়ে মেরেছে নির্মম বাস্তব। দুঃখবিলাসের জোয়ারে ভেসে যতখানি গিয়েছিলাম, স্বপ্নভঙ্গের ফিরতি টানের ভাঁটা ঠিক ততখানিই উল্টো মুখে এসে নিজের নিজের বিন্দুতে পৌঁছে গেছি!

নন্দিনী ঃ না!

অধ্যাপক ঃ হ্যাঁ, এই হয় নন্দিনী, এটাই নিয়ম, যক্ষপুরী ভাঙে না, সর্দার আর মোড়লদের মূঢ় প্রতাপের রাজছত্রে লাগে না ধ্বংসের হাওয়া, এটাই নিষ্করুণ নিয়তি!

বিশু ঃ রঞ্জন— শুধু রঞ্জনটাই— দ্যাখো, ঝোড়ো হাওয়ায় আগুনের ফুলকির নিভন্ত ছাই হয়ে উড়ে গেল কোথায়— কোন্ নিরুদ্দেশ শূণ্যতায়!

অধ্যাপক ঃ হ্যাঁ, কষ্টটা শুধু সেখানেই। আমরা তো আবার ফিরে এলাম, সমস্ত ভুলভ্রান্তির কাঁটা ঝোপ মাড়িয়ে আমাদের নিজেদের ছেড়ে যাওয়া ঘরে; আবার তো সব গুছিয়ে নিয়েছি ঠিকঠাক পরিপাটি ক'রে। শুধু রঞ্জনটাই ফিরলো না। সেইটাই তো যন্ত্রণা! হৃদয়ের গভীরে রক্তপাত!

ফাগু ঃ গোকুলও ফেরেনি— গজ্জু, কিশোর, কঙ্কু, উপমন্যু, অনুপ— আরও, আরও অনেকে!

অধ্যাপক ঃ ওদের জন্যেও দুঃখ হয়! —আমরা যে মানুষ! ঐসব ছেলের দল কী উদগ্র আগ্রহে যুদ্ধে নেমেছিলো, কী অসীম ত্যাগ তাদের— সে তো আমি জানি!

নন্দিনী ঃ বাঃ, বাঃ, চমৎকার!

অধ্যাপক ঃ কিন্তু সে যে হবার নয় নন্দিনী! হাজার হাজার বছর ধ'রে যা আমাদের অস্তিত্বের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে অনড় অটল বিধাতার মতো, তাকে কি ভাঙা যায়? স্বর্গ কি দখল হয় অনায়াসে, একনিমেষে? [বিদ্যুৎচমকের মতো কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা ঘ'টে যায়]

ফাগু ঃ সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বড়লোকের পিঠের চামড়ায় গরিবের জুতো তৈরি হবে।

বিশু ঃ হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু! প্রতিটি আক্রমণের বদলা নিন!

নন্দিনী ঃ সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন!

অধ্যাপক ঃ জয় আমাদের হবেই, কারণ—

ফাগুলাল ঃ ধর্মঘট বানচাল ক'রে লেবার অফিসার হয়ে যাওয়া— মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও।

বিশু ঃ গণসঙ্গীত গাইতে গাইতে বোম্বেতে পপ্ সঙের প্লেব্যাক করা— মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও।

নন্দিনী ঃ কালকের গেরিলা যোদ্ধা, আজকের সোসাইটি গার্ল— মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও।

অধ্যাপক ঃ পরিশেষে মুচলেকা এবং বিদেশ যাত্রা— মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও। [আবার সব পূর্ববৎ]

নন্দিনী ঃ আমি কী ক'রে ভুলবো? কী ক'রে ভুলবো তাদের?

অধ্যাপক ঃ ভুলে যেতেই হবে। মানুষের ভয়ানক কষ্টগুলো ভুলে গিয়েই তো বেঁচে থাকতে হয়!— কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে, পথের কষ্ট পথ চলতে চলতেই ভুলতে হয় নন্দিনী!

নন্দিনী ঃ আমি যে পারি না ভুলতে, কিছুতেই না। ওদের তো আমিই ডেকে এনেছিলাম এই ভাঙনের পথে, এই সর্বনাশের উদ্ধারহীন চোরাবালিতে। কী ক'রে ভুলবো সেইসব আগুনের মতো উদ্দাম ছেলেদের— সেই যে কিশোর ব'লে উঠেছিল ভয়ভাঙার উত্তপ্ত প্রহরে— [আলোক পরিবর্তন। কিশোর ঢোকে]

কিশোর ঃ কীসের দুঃখ! একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেবো নন্দিনী। এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি।

নন্দিনী ঃ তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেবো বল্ তো কিশোর?

কিশোর ঃ এই সত্যটি কর্ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী ঃ আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস!

কিশোর ঃ না, আমি সামলে চলবো না, চলবো না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবো। [প্রস্থান]

নন্দিনী ঃ হায় রে! সেই কিশোরকে ওরা আলিপুর জেলের মধ্যে গুলি ক'রে খুন করেছে।

নেপথ্যে কোরাস ঃ বুলেট! বুলেট! বুলেট!

নেপথ্যে রাজার কণ্ঠ ঃ সে যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্দ্ধা ক'রে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিলো। বুদ্বুদের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী : আলিপুর জেলের পাঁচিল পেরিয়ে তার ভয়হীন কণ্ঠস্বর আমার বিলাসী শয্যা যে বারবার এলোমেলো ক'রে দেয়!

বিশু : ভোলা যায় না, তবু ভুলতে হয়!

ফাগু : লড়াইয়ে তো আমিও নেমেছিলাম। আমিও তো বলেছিলাম 'মরি তবু ফিরবো না'— কিন্তু ফিরে তো এলাম!

অধ্যাপক : এই হয়! এটাই ভালো! এতেই মঙ্গল।

ফাগু : ছিলাম মজুর। হাড় ভাঙা খাটুনির পর গা-গতরের ব্যথা ভুলতে বঞ্চিত মনের জ্বালা কমাতে মদের গেলাসে চুমুক দিতাম। তারপর একদিন সেই নেশার শূন্য গেলাসের ফাঁকিটাকে ভেঙে দিয়ে সর্দারদের কড়া হুকুমের চাবুকটাকে টেনে ছিঁড়ে আমিও তো গিয়েছিলাম লড়াই করতে—

অধ্যাপক : তাই তো সবাই যায়; যায়, আবার ফিরে আসে!

ফাগু : আর আজ ঐ সর্দারদেরই পা চাটছি! ওরাও অকৃতজ্ঞ নয়, আমাকে বানিয়েছে লেবার অফিসার, অভাবটভাব ঘুচে গেছে, পেয়েছি স্বস্তি!

অধ্যাপক : ভালোই তো! শেষপর্যন্ত আমরা তো ভুল বুঝতে পেরেছি, মিথ্যে কতকগুলো স্বপ্নের খোঁজে অনির্দেশ সমুদ্র পাড়ি দেবার মূর্খতা থেকে তো বেঁচেছি।

বিশু : গোকুলকে মনে পড়ে নন্দিনী?

নন্দিনী : গোকুল? সেই গোকুল? যে আমাকে—

বিশু : প্রথমে বিশ্বাস করেনি। আমায় কতবার বলেছে—

[আলোক পরিবর্তন। গোকুল ঢোকে]

গোকুল : দ্যাখো বিশু, তোমার ঐ নন্দিনীকে কিন্তু ভালো ঠেকছে না!

বিশু : কেন, কী করেছে?

গোকুল : কিছুই করে না, তাই তো খট্‌কা লাগে। আমরা বিশ্বাস করি সাদামাটা গোছের চেহারা— বেশ ওজনে ভারী!

বিশু : যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের পরেও অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়— এইটাই সর্বনেশে।

গোকুল : বিশু ভাই, ওই মেয়েকে দেখে তোমার মনও ভুলেছে, সেই জন্যে দেখতে পাচ্ছো না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি হবে না ব'লে রাখলুম। (প্রস্থানোদ্যত)

নন্দিনী : হ্যাঁ, হ্যাঁ— অবিশ্বাসের ভয়ঙ্কর তাড়নায় সে তো আমাকেও বলেছিলো দুর্বিষহ ক্ষোভে—

গোকুল ঃ (ফিরে আসে) একবার মুখ ফেরাও তো দেখি। —তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে?

নন্দিনী ঃ আমাকে যা দেখছো তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী!

গোকুল ঃ একটা কী মন্তর তোমার আছে! ফাঁদে ফেলেছো সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে, তারা মরবে। ভয়ঙ্করী ওরে ভয়ঙ্করী!

নন্দিনী ঃ আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে কেন?

গোকুল ঃ দেখে মনে হচ্ছে— তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই— নির্বোধদের বুঝিয়ে বলি গে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান!' [দ্রুত প্রস্থান]

নন্দিনী ঃ ও তো নিজেই সেই সাবধানবাণীকে একদিন অগ্রাহ্য ক'রে আমারই রাঙা আলোর মশাল হাতের মুঠিতে সজোরে চেপে এগিয়ে গেল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে—

ফাগু ঃ এই আমিই তো ওকে টেনে আনলাম যুদ্ধের উন্মত্ত দামামার কলরোলে। লড়াইয়ের সময়েও গোকুল যখন অন্ধ সংশয়ে ব'লে উঠেছিলো— [গোকুলের পুনঃপ্রবেশ]

গোকুল ঃ সবার আগে ঐ ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে। (সবাই আটকায়)

ফাগু ঃ গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। —চলো আমার সঙ্গে!

অধ্যাপক ঃ (চিৎকার করে) থামো! [গোকুল চ'লে যায়]

ফাগু ঃ গোকুল আমার সঙ্গেই লড়াইয়ে গেল। বীরের মতো মাথা উঁচু ক'রে ছিনিয়ে নিলো শক্ত হাতে শহীদের মৃত্যুর গৌরব!

অধ্যাপক ঃ (আরও জোরে) চুপ! একেবারে চুপ!

ফাগু ঃ জগদ্দলের থানা লক্‌আপে পিটিয়ে পিটিয়ে গোকুলকে ওরা মেরেছে। একগুঁয়ে মজুরের বাচ্চার মুখে ওরা মাখাতে পারেনি বেইমানীর ঘৃণ্য কলঙ্ক !

অধ্যাপক ঃ ফাগুলাল!

ফাগু ঃ এবং আমি লেবার অফিসার! মজুর ছাঁটাইয়ের প্ল্যান করি।

অধ্যাপক ঃ স্টপ ইট! যত ভুলে যেতে চাই, যত বিস্মরণের আঁধারে ঢেকে দিতে চাই ব্যর্থ অতীতের লুপ্ত ভগ্নশেষ, তত তোমরা বার বার কোন্ নির্বোধ আত্মপ্রবঞ্চনায় স্বনির্ধারিত সুস্থ জীবনের রাজপথ থেকে পাড়ি দিতে চাও অন্তহীন অরণ্যের অকারণ রহস্যময় লতাজালজটিল গহনে! কেন-কীসের লোভে? কোন্ সস্তা চাটুবাক্যের ষড়যন্ত্রী উৎসাহে, কোন্ নির্বীর্য খেয়ালে?

বিশু : অধ্যাপক—

অধ্যাপক : কেন মিছিমিছি রক্তাক্ত করো এই হৃদয়? যা অতীত, তাকে ভুলে যেতে দাও।

ফাগু : ঠিক বলেছো অধ্যাপক, বিষন্ন বেদনার গানে কেন ভরিয়ে রাখবো আমাদের সাফল্যের আকাশ?

নন্দিনী : নিশ্চয়ই না, চামড়ার তলায় দগদগে পচা গলা কুৎসিৎ ক্ষত-চিহ্নগুলো ঢেকে রাখবো আমরা উগ্র প্রসাধনের প্রলেপে!

অধ্যাপক : নন্দিনী!

নন্দিনী : আমরা ফুরিয়ে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি, তবু দম-দেওয়া পুতুলের মতো কথায় বার্তায় চালচলনে সাফল্যের রঙমশাল জ্বালাবো—

বিশু : কী বলছো?

নন্দিনী : তবু দুনিয়ার সব রঙমশাল একদিন নিভে যায়, তখন আলোহীন অন্ধকারে প'ড়ে থাকে ক্লেদাক্ত পোড়া ছাই—

অধ্যাপক : চুপ করো— চুপ করো বলছি!

নন্দিনী : তুমি ভণ্ড— প্রতারক— বিট্রেয়ার— হিপোক্রিট—

অধ্যাপক : কী? (সজোরে চড় মারে নন্দিনীকে)

বিশু : অধ্যাপক!

ফাগু : তুমি গায়ে হাত দিলে নন্দিনীর!

নন্দিনী : নীচ— ইতর— ছোটলোক!

অধ্যাপক : (চিৎকার ক'রে) চুপ করো! (সবাই নিথর, নিস্তব্ধ)

নেপথ্যে গান : পুরানো সেই দিনের কথা, সে কি ভোলা যায়....

॥ এ কার মৃতদেহ ॥

[গানের প্রথম কলিটি শেষ হ'তে না হ'তেই অধ্যাপক চিৎকার ক'রে ওঠে]

অধ্যাপক : যা করেছি আমরা, ঠিক করেছি। ওরা নির্বোধ, ওরা মূর্খ। তাই চুরমার হয়ে গেছে। আমরা বেঁচে গেছি মৃত্যুর প্রলয়ঙ্কর হাতছানি থেকে। শুধু দুঃখ এই— আরও আগে কেন ঘুম ভাঙেনি, আরও আগে কেন বুঝিনি—

নন্দিনী : (তীব্র ব্যঙ্গে) শুধু এই! আর কিছু নয়?

অধ্যাপক : এই শুধু। আর কিছুই নয়।

নন্দিনী : যারা মারা গেল—

অধ্যাপক : তাদের জন্যে দুঃখ হয়!

নন্দিনী : ব্যাস্! এইটুকু!

অধ্যাপক : হ্যাঁ— তাই! ঐটুকুই!

নন্দিনী : ঐ রঞ্জনের জন্যেও? শুধুই দুঃখ?

অধ্যাপক : হয়তো আরেকটু বেশি। দুঃখের যে স্তরকে বলে কষ্ট, তাই। কিংবা আরও একটু এগিয়ে যাকে বলি যন্ত্রণা— তাই। এর বেশি কিছু নয়।

নন্দিনী : চমৎকার! বাহবা! (হাততালি দেয়)

অধ্যাপক : বিদ্রূপের কি কোনো প্রয়োজন আছে নন্দিনী? আজ তুমিও যা, আমিও তাই। হে প্রলয় পথে আমার দীপশিখা—

নন্দিনী : তোমার দীপশিখা?

অধ্যাপক : কোন এক নির্মম ঝড়ের ফুঁয়েতে নিভে গিয়ে সোসাইটি গার্লের কদর্য চেহারায় দেখা দিয়েছো, দিল্লিতে আজ পেশাদার সমাজ-সেবিকার পদে বৃত হয়ে সরকারী সব অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হে বিদ্রোহিনী মূর্তিমতী প্রাণের উচ্ছলগতি সঞ্চারিনী, শুধু নিভৃত গোপনে রঞ্জনের জয়ধ্বনি করলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যায়, তাই না?

নন্দিনী : থামো!

অধ্যাপক : সহ্য করতে পারলে না তো! —শুধু পুষ্পিত কতকগুলো মিথ্যাচার দিয়ে সত্যের নিরাবরণ চেহারাটাকে ঢেকে রেখে সভ্য ভদ্র ক'রে পোষাকী অলঙ্কারে সাজিয়ে না তুলতে পারলে তোমাদের বড় কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু কী করবো বলো— সত্য সবসময়েই উলঙ্গ করুণাহীন!

নন্দিনী : বাজে বোকো না!

অধ্যাপক : বাজে বকার অভ্যেসটি যে তোমাদেরই একচেটে! কোদালকে আমরা কোদালই বলতে জানি, পরিপাটি ক'রে খনিত্র বলিনে। তাই সোজাসুজি বলতে ভালোবাসি, রঞ্জনরা উন্মত্ত আবেগের ভ্রান্ত জোয়ারে ভেসে গেল ব'লেই—

নন্দিনী : জানি, জানি, রঞ্জনের প্রতি তোমার অন্ধ ঈর্ষা চিরদিনই ছিলো সুপ্ত হয়ে—

অধ্যাপক : অস্বীকার করিনে। তবে এখন আর নেই। একটা মৃত মানুষের দুর্ভাগ্যকে কখনও কি জীবন্ত সৌভাগ্য ঈর্ষা করতে পারে? এখন ওর জন্যে হৃদয়ভরা করুণা!

নন্দিনী : শুধু করুণাই যদি হয়, তবে কীসের তাগিদে ওরই মৃতদেহ কাঁধে তুলে পাহাড় পর্বত সমুদ্র জনপদ পেরিয়ে ছুটে চলেছো অনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে?

অধ্যাপক ঃ এতক্ষণ সেটাই ভাবছিলাম নন্দিনী, এখন তার উত্তর খুঁজে পেয়েছি।

বিশু ঃ অধ্যাপক?

অধ্যাপক ঃ সবকিছু পেয়েও প্রতিষ্ঠা আর সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর ছুঁয়েও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন হ'তে পারিনি, ঈর্ষাকাতর প্রেতের মতো রঞ্জনরা রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে!

নন্দিনী ঃ এ কী জঘন্য কথা!

অধ্যাপক ঃ ওর মৃতদেহ তাই পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে হবে, কিংবা এমন গভীর মাটির তলায় করতে হবে সমাধিস্থ, যেখান থেকে ও আর কোনোদিন উঠে আসতে পারবে না।

নন্দিনী ঃ কী বলছো তুমি!

ফাগু ঃ ঠিক বলেছো অধ্যাপক, মাঝে মাঝে তাড়া ক'রে ফেরে কে যেন ঘুমের মধ্যে আজও— (বিশু মঞ্চের আবছা অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে থাকে—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি....') তরল আগুন বুকের বোতলে পুরে যত ভুলতে চাই, ততই কারা যেন ফুসফুস দুটো টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, পাঁজরগুলো খুলে নেয় একে একে, আমি বাঁচতে চাই অধ্যাপক— রঞ্জনকে পুড়িয়ে ফেলেও যদি একটু নিরেট পাথরের মতো ঘুম পাই— সেও ভালো।

বিশু ঃ (গান থামিয়ে) ঠিক, ঠিক। সব ঠিক। ওরে পাগলী, এমন ক'রে ভাবিসনে। যে ভাবায় ফল নেই, উপায় নেই, নেই উদ্ধারের পথ, কী হবে সে ভাবনার জাল বুনে? আজ তুই অনাথ আশ্রমের ফিতে কেটে সরকারী খরচে সমাজসেবা করিস, কাগজে কাগজে বাণী দিস। কী হবে রঞ্জনের কথা ভেবে? রঞ্জনের রক্তাক্ত মুখ মনের ক্যানভাসে আঁকা থাকলেই কি তোর এই জীবনটা মিথ্যে হয়ে যায়, মুছে যায় আজকের চড়া মেক্‌আপের চড়া রঙগুলো?

অধ্যাপক ঃ সবচেয়ে বড় যুক্তি হলো ওরা যদি পথভ্রষ্ট না হতো তবে তো ওরাই জিততো, ওরা যদি সত্যিই জিততো, তবে কি ওদের পাশ থেকে স'রে আসতাম? ওরাই তো প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেল, এ কারাপ্রাচীর ভাঙা যায় না, অত জীবন দিলেও না!

সবাই ঃ তাহলে কারা ঠিক? ওরা, না আমরা? (ক্ষণিক নীরবতা)

ফাগু ঃ হুর্‌রে! অধ্যাপক, বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার, চলো!

বিশু ঃ হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পৌঁছুতে হবে।

নন্দিনী ঃ কোথায়?

ফাগু : যেখানে যাবো ব'লে বেরিয়েছিলাম, শ্মশানে, কিংবা কবরখানায়—
নন্দিনী : তাহলে এই-ই ঠিক?
ফাগু : কথা বাড়িয়ো না নন্দিনী। এতদিন বাদে আমরা গন্তব্যস্থলের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছি। চলো, কফিনে কাঁধ দিতে হবে—
অধ্যাপক : আমরা জিতে গেছি নন্দিনী— মনে ভরসা রাখো।
ফাগু : হুর্‌রে! হিপ্‌ হিপ্‌ হুর্‌রে! (নেচে ওঠে যেন)
অধ্যাপক : এক পরাজিত মৃত সৈনিকের দেহ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছি আমরা— বিজয়ী মানুষেরা!
ফাগু : ভিক্‌ট্রি ইজ আওয়ার্স! জয় আমাদের হবেই! হুর্‌রে!
অধ্যাপক : যদিও সে আমাদের প্রিয়জন, আমাদের পরম আপন, যার জন্যে আমাদের অনন্ত ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা— (সবাই কফিনের দিকে এগোয়)
বিশু : (চিৎকার ক'রে) অধ্যাপক! কফিনের কাপড়টা স'রে গেছে—
অধ্যাপক : বোধহয় ঝড়ে। ভয় পেয়ো না। ও আজ নিতান্তই মৃত।
ফাগু : অধ্যাপক, ডালাটা খোলা।
বিশু : মুখ দেখা যাচ্ছে!
নন্দিনী : (ভয়াবহ আর্তনাদ) আ-আ-আ! ও কে ওখানে শুয়ে?
ফাগু : রঞ্জন নয়! এ কার মৃতদেহ অধ্যাপক?
অধ্যাপক : (উন্মাদের মতো) আমার, নিতান্তই আমার। এতদিনে চিনতে পেরেছি। ও আমি ছাড়া আর কেউ নয়।
বিশু : মিথ্যে কথা! তুমি নও। এ মৃতদেহ আমি চিনি, অনেকদিন ধ'রেই চিনি। ঐ কফিনটা যেন আয়না, ওখানে আমারই মুখ ফুটে উঠেছে।
অধ্যাপক : নিশ্চিতভাবে আমার, অবধারিতভাবেই আমার!
ফাগু : না! ওখানে আমি শুয়ে আছি— এই দেখছো না— আমারই মতন মুখ, ওরে ফাগুলাল— ওই কাঠের কফিনে তুই কতকাল—
বিশু : বাজে কথা। এ মৃতদেহ আমার! এ মুখ আমি চিনি, আয়নায় দেখেছি কতবার—
অধ্যাপক : আমি, শুধু আমি, এ ছাড়া আর কারুর মুখ নয়!
নন্দিনী : (হাহাকার) হায়, হায় রে মূঢ়া নারী, তোর সকল কামনা-বাসনা-স্বপ্ন-সাধ ঘুমায় ঐখানে— এ যে তোর একান্ত গোপন মৃতদেহ—
ফাগু : অধ্যাপক, এ যে আমারই—
বিশু : না, আমার—
অধ্যাপক : আমার, আমার, আমার! (প্রচণ্ড গোলমাল— ধস্তাধস্তি)

নন্দিনী ঃ হায়, আমরা কার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে চলেছি কোন্ শূন্য পরিণামের দিকে?

সবাই ঃ আমাদের নিজেদের, আমাদের সবাইয়ের, আমাদের প্রত্যেকের! (সবাই নিষ্পন্দ। হঠাৎ বিশু গান ধরে—)

বিশু ঃ তোমায় গান শোনাবো, তাই তো আমায়
জাগিয়ে রাখো—
ওগো ঘুমভাঙানিয়া!
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো
ওগো দুখজাগানিয়া....

॥ আয়নায় মুখগুলি ॥

নন্দিনী ঃ পাগল ভাই, একদিন না-কি এই আমিই তোমার দুখজাগানিয়া ছিলাম? আজও কি সেই ঈশানী পাড়ার নন্দিনীকে তুমি ঘুমভাঙানিয়া ব'লে গান শোনাও—যে তোমায় না-কি জাগিয়ে রাখে গভীর অন্ধকারে—

বিশু ঃ হ্যাঁ! আজও!

নন্দিনী ঃ মিথ্যে, দারুণ মিথ্যে পাগল ভাই। সে নন্দিনী আর নেই। আমি প'চে গেছি, ম'রে গেছি, ঐ দ্যাখো আমার মৃতদেহ!

বিশু ঃ আমিও যে আর বেঁচে নেই নন্দিনী! তাই তো আজও এক মরা মানুষ তার নষ্ট মৃত স্বপ্নের উদ্দেশে এ গান গাইতে পারে।

নন্দিনী ঃ না পাগল ভাই, আজ এ গানের লক্ষ্য পাল্টে গেছে। এ গান শুধু তারই উদ্দেশে গাওয়া চলে, যার মৃতদেহ ভেবে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের শব বহন ক'রে নিয়ে চলেছি।

বিশু ঃ (গুনগুনিয়ে গায়) আজি ঝড়ের রাতে, তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার—

ফাগু ঃ (ক্লান্ত স্বরে) বিশু— এ গান আর গাসনি তুই—

বিশু ঃ গাই না তো!

ফাগু ঃ কী?

বিশু ঃ ভুলেই তো গেছি সব, সমস্ত গান। একদিন আকাশছোঁয়া বনানীর শ্যামলতার নিভৃত কুঞ্জে ব'সে গেয়েছিলাম উলঙ্গ সূর্যের দিকে মাথা তু'লে আমার আত্মনিবেদনের গান, তারপর রণক্ষেত্রের অস্ত্রঝঙ্কারেও বেঁধেছিলাম আমার মৃত্যুঞ্জয়ী বাসনার সুর— আর আজ দ্যাখো সোনার শেকল পরেছি পায়ে, সমৃদ্ধির খাঁচায় প্রতিষ্ঠার

দাঁড়ে ব'সে যে গান গাই প্রভুদের নির্দেশে, তাতে না থাকে সুর, না থাকে জীবনের সংলাপ—

ফাগু : তবু তো শুনি— তোর রেকর্ডের প্রচুর বিক্রি, বোম্বেতে প্রচুর টাকা কামাস, হিন্দি ফিল্মে তোর সব-ক'টা গান হিট করে।

বিশু : হ্যাঁ, সেই আনন্দেই তো হোটেলে হোটেলে নিশীথ ফেরিতে পণ্য সাজাই, সেই খুশিই তো এল.এস.ডি.-র মৌতাতে জ'মে ওঠে কী করুণ বীভৎসভাবে, হুইস্কি আর বিয়ারের বোতলের ঠনঠন শব্দে প্রাণে জাগে কদর্য মাধুর্যের ফ্যাশিস্ত উল্লাস!

ফাগু : বিশু!

বিশু : একদিন জীবনের উত্তপ্ত মিছিলে আসন্ন যুদ্ধের খবর জানিয়ে গান ধরতাম, কুলহীন জনসমুদ্রে আসতো নতুন জোয়ার। সেজন্যে ওরা আমাকে জেলেও পুরেছিলো, চাবুক মেরে মেরে সারা শরীরে এঁকে দিয়েছিলো অবমানিত মনুষ্যত্বের কলঙ্করেখা—
[আলো পরিবর্তন]

নন্দিনী : আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে? এ কীসের চিহ্ন তোমার গায়ে!

বিশু : চাবুক মেরেছে, যে চাবুক দিয়ে ওরা কুকুরকে মারে! যে রশিতে এই চাবুক তৈরি, সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরি!

নন্দিনী : পাগল ভাই— আর বোলো না সে সব কথা!
[আলো পূর্ববৎ হয়]

বিশু : আর আজকে তো আমি সেই চাবুকেরই জয়গান গাই! চাবুক খেয়ে যে নির্যাতিত মানুষ গ'র্জে উঠতে চায় তাদের আমি ঘুমপাড়ানী গান শুনিয়ে চাবুকের রাজত্ব টিকিয়ে রাখি।

অধ্যাপক : বেশ ছিলাম— বেশ ছিলাম আমি ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে। নীরস বুদ্ধিবৃত্তির নিরর্থক জাল বুনে, পাণ্ডিত্যের ভয়ানক অহমিকার নিরাপদ দুর্গে— তুমি— তুমি, নন্দিনী আমাকে সেখান থেকে টেনে বার ক'রে নামিয়ে আনলে খোয়া ওঠা রাস্তায়— লড়াইয়ের মিছিলে—

নন্দিনী : আমি? আমি টেনে এনেছি তোমায়?

অধ্যাপক : হ্যাঁ, তুমি! তুমিই পথে নামিয়েছো আমায়, অথচ কোথাও পৌঁছুতে দিলে না, কেড়ে নিলে নিরুদ্বিগ্ন অস্তিত্বের সাজানো ঘর— অথচ হায় উন্মাদ ঝড়ের দিকনির্দেশও করলে না, দিলে না ভেসে যেতে বিদ্রোহের বিক্ষুব্ধ জোয়ারে—

নন্দিনী ঃ বাঃ! বাঃ!

অধ্যাপক ঃ কী যে করি আমি? নন্দিনী, তুমি আমার সমস্ত জীবন নষ্ট ক'রে দিলে! আমার সমস্ত আশা, আমার সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে—

নন্দিনী ঃ কেন? এত অনুতাপ কীসের? না হয় মিথ্যে পাগলামীতে ভুলে সামান্য ক'টা দিন নষ্ট করলে, এখন তো আবার ফিরে গেছো নিজের জায়গায়, বরং তার চেয়েও অনেক— অনেক উঁচুতে!

অধ্যাপক ঃ নন্দিনী!

নন্দিনী ঃ ছিলে তো সামান্য একটা কলেজের প্রফেসার। আর আজ সরকারী কৃপাধন্য মহান বুদ্ধিজীবী! সরকারী খরচে কানাডায় গেছো বস্তুবিদ্যার উন্নতি বুঝতে—

অধ্যাপক ঃ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো তুমি!

নন্দিনী ঃ আমি না-কি তোমার ক্ষতি করেছি, হায়রে! ঐ লড়াইয়ের দৌলতেই আজ গুছিয়ে নিয়েছো ভালোমতন। আগে কে পাত্তা দিতো তোমায়, কে চিনতো?

অধ্যাপক ঃ খবরদার বলছি—

নন্দিনী ঃ থামো! আমাকে চোখ রাঙিয়ো না। লড়াইয়ে নেমেছিলে ব'লেই তো ওরা তোমায় বিপজ্জনক মনে ক'রে চড়া দাম হেঁকেছিলো তোমার পাণ্ডিত্যের, ঠিক সুযোগমতো বিকিয়ে দিলে নিজেকে। আমি ক্ষতি করেছি তোমার? আমি? ফুঃ!

অধ্যাপক ঃ (চিৎকার ক'রে) চুপ করো! বাজে বোকো না! —কতটুকু জানো তুমি আমার? পাশাপাশি এক ছাদের নিচে থেকেও কতটুকু চিনেছো আমায়?

বিশু ঃ অধ্যাপক!

অধ্যাপক ঃ রাত্তিরে গাদা গাদা পিল না খেলে যার চোখে ঘুম নামে না কখনও, কী ক'রে বুঝবে— তার বুকের ভেতরটায় কোন্ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে চূর্ণবিচূর্ণ হয় সব বসন্তবিলাস, কীসের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে তার সুখময় সাজানো বাগান? কী বোঝো তুমি আমায়, কতটুকু? কোন্ বঞ্চনার ক্ষোভে বিষিয়ে ওঠে সমস্ত জীবন— কোনোদিন জেনেছো তা, চেষ্টা করেছো জানতে?

নন্দিনী ঃ তবু না-কি আমরা ভালোবেসে ঘর করছি!

অধ্যাপক ঃ না কখনও না। কখনও ভালোবাসোনি আমায়!

ফাগু ঃ অধ্যাপক! কী হচ্ছে!

অধ্যাপক : মনে মনে ঐ রঞ্জনকেই তুমি- হ্যাঁ, এখনও, আজও এই মুহূর্তেও—

নন্দিনী : ভালোবাসতাম!

অধ্যাপক : না। এখনও বাসো! এখনও ঐ মৃত মানুষটার জন্যে তোমার সমস্ত হৃদয় গভীর শূণ্যতায় গুমরে ওঠে, সে কি আমি জানি না? আমি কি এতই অন্ধ; নির্বোধ?

বিশু : অধ্যাপক, থামো!

নন্দিনী : হ্যাঁ, ওরই জন্যে সমস্ত অস্তিত্বটাই শূণ্য হয়ে যায়, হাহাকার করে, ওর জন্যেই তো!

অধ্যাপক : এই— এই তো বলেছিলাম!

নন্দিনী : কিন্তু ভালোবাসতে পারি না আর ওকে। সে অধিকার হারিয়েছি।

অধ্যাপক : বটে! তবে কি সেই অনধিকারের ভালোবাসাই আমাকে দিয়েছো?

নন্দিনী : না। ভালোবাসতেই ভুলে গেছি আজ।

অধ্যাপক : তাই, তাই তো! তাই তো জানি আমি। তবে কেন, কেন সেদিন যুদ্ধের শেষে ঘরে পালাবার দিনে আমার হাতে হাত রেখেছিলে; কেন বলেছিলে— এসো ঘর বাঁধি? কেন কতকগুলো সাজানো মিথ্যায় এমনভাবে প্রবঞ্চনা করলে? তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম আমি?

বিশু : তোমরা চুপ করো!

নন্দিনী : জানি না। বোধহয় পালাবার সময় তোমারই মতন একজন পলাতক সঙ্গী দরকার ছিলো, তাই; বোধহয় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে তোমারই মতন একটা নির্ভরযোগ্য সিঁড়ির প্রয়োজন ছিলো, তা-ই।

অধ্যাপক : সব শেষ! সব নষ্ট হয়ে গেল।

নন্দিনী : তোমারও বোধহয় আমারই মতন একজনকে দরকার ছিলো, কারণ সুন্দরী স্ত্রীকে না দেখালে আবার সরকারী কৃপা মেলে না কি-না!

বিশু : থামো তোমরা থামো! তোমাদের দু'টি পায়ে পড়ি। জীবনের সব ফাঁকিকে এমনভাবে একসঙ্গে টেনে বের ক'রে উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়ো না তোমরা, দোহাই তোমাদের। এসো আমরা অন্য কথা বলি।

ফাগু : আমাদের তো সব গেছে, দাঁত— নখ সব কিছু, ছোবল মারার ক্ষমতাও নেই, সব কিছু হারিয়ে আজ তো ওদেরই পায়ের তলায়—

বিশু ঃ যেমন গজ্জু পালোয়ান!

ফাগু ঃ গজ্জু? যে লড়ায়েরও আগে একা রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই গজ্জু?

বিশু ঃ হ্যাঁ— মারের চোটে যার মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে গিয়োছিলো—

নন্দিনী ঃ মনে পড়েছে আমার—

অধ্যাপক ঃ আমারও!

বিশু ঃ প্রচণ্ড নির্যাতনেও যার ক্রোধ ছিলো সীমাহীন—

[আলোক পরিবর্তন। গজ্জুর দেহ আছড়ে পড়ে]

গজ্জু ঃ দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক ঃ কেন হে?

গজ্জু ঃ কেবল ঐ সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি হে কল্যাণময় হরি— আঃ যদি একবার— সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি—

ফাগু ঃ কিন্তু সেই গজ্জুও শেষপর্যন্ত মোড়লের ঘরে যাবার জন্যে সর্দারের হুকুম শুনে ব'লে উঠলো—

গজ্জু ঃ যে আদেশ!

নন্দিনী ঃ পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে, সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই—

গজ্জু ঃ না, না, থাক্! সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী ঃ আমি সর্দারের রাগকে ভয় করিনে।

গজ্জু ঃ আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

[চ'লে যায়। আলো পূর্ব্ববৎ]

অধ্যাপক ঃ আমরা সবাই একেকটা গজ্জু পালোয়ান! —প্রচণ্ড হুঙ্কারে আস্ফালন ক'রেও আবার মাথা হেঁট ক'রে সব মেনে নিয়েছি।

ফাগু ঃ কে জানে, লড়াইয়ের সময় গজ্জু হয়তো আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো, এবার আর একা নয়, সবাইয়ের সঙ্গে এক হয়ে, ক্রোধে ফেটে পড়েছিলো, হয়তো ওকেও হাজরা সাঁপুইয়ের সঙ্গে সোনারপুরের মাঠে ওরা খুন ক'রে ফেলে দিয়ে গেছে!

বিশু ঃ তাহলে হয়তো ও জিতে গেল, বার বার হেরে গিয়েও শেষ অবধি জিতে গেল। আমরা যেমন বার বার জিতে যাচ্ছি ভাবতে ভাবতে আসলে চরম পরাজয়ের কাঁটার মুকুট প'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলাম।

নন্দিনী ঃ আঃ! আমি কী করেছি! কতজনকে টেনে এনেছি এই মরণ ফাঁদে—

অধ্যাপক ঃ নন্দিনী, একদিন না আমি তোমায় বলেছিলাম— মনে আছে? সারা রাজপথে ঘন টকটকে লাল রঙের ঢেউ তুলে তুলে মিছিল ক'রে যখন তুমি যেতে— বলেছিলাম— "সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা, জানিনে রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছো।"

নন্দিনী ঃ ধ্বংসের লিখন, সর্বনাশের লিখন। —হায় রে, প্রতিদিন যখন কারখানা ফেরত জীর্ণশীর্ণ ক্লান্ত ছেলেগুলোকে দেখতাম, আর ভাবতাম— এ কী বীভৎস অত্যাচার চলেছে চারিদিকে, মনে হতো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই সব— স্বেচ্ছাচারের অন্যায় স্পর্দ্ধার মিনারগুলো, যখন দেখতাম— অনুপ আর উপমন্যুর রুগ্ন উপবাসী মুখ, শক্লুর বিধ্বস্ত শরীর, ভাবতাম— হায় কেন এই নির্মম কারাগারগুলো ক্রোধের বিস্ফোরণে চুরমার হয়ে যায় না—

অধ্যাপক ঃ আমারই সামনে একদিন টালমাটাল পায়ে হেঁটে যাওয়া কঙ্কুকে দেখে তুমি আর্তনাদ ক'রে ব'লে উঠেছিলে—

[আলোক পরিবর্তন। টলতে টলতে কঙ্কু ঢোকে]

নন্দিনী ঃ ও কী, কঙ্কু যে! আহা ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড় লাজুক ছিলো, যে ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারই কাছে ঢালু পাড়ির প'রে ব'সে থাকতো, ভান করতো যেন তীর বানাবার জন্যে শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টুমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠতো, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলো না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। [কঙ্কু চ'লে যায়। আলো পূর্ব্ববৎ]

অধ্যাপক ঃ সুতরাং তুমি দেশোদ্ধারে নামলে।

নন্দিনী ঃ ব্যাঙ্গ করছো?

অধ্যাপক ঃ তাই কি পারি আমি— ওগো পতিতপাবনী যক্ষপুরের আচম্কা আলো— মূর্খ পতঙ্গের মতো কতজন যে তোমার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরেছে—

নন্দিনী ঃ কী বলছো?

অধ্যাপক ঃ যারা মরেছে, তারা বেঁচেছে। আর আমি? মরতেও পারলাম না, শুধু ইহকাল-পরকাল বিসর্জন দিয়ে, বেগম সাহেবা, তোমার সমাজসেবার খাসমহলে খোজা হয়ে দিন কাটাই—

নন্দিনী ঃ ও! তাই!

অধ্যাপক ঃ আমার সবকিছু নষ্ট ক'রে দিয়ে— হায়! কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, এক সুপ্রসিদ্ধা অভিজাতা সমাজসেবিকার স্বামী নামক খিদ্‌মতগার হয়ে— যিনি পোষাক পাল্টানোর মতন রোজ পুরুষ পাল্টান—

নন্দিনী ঃ থামো!

অধ্যাপক ঃ সেদিন তো তোমার কঙ্কু কোনো কথা না ব'লে চ'লে গিয়ে ছিলো তারপর শুনেছি তাকেও না-কি কারা যেন পয়েন্ট থার্টি ফাইভ রিভলবারের গুলিতে ছিন্নভিন্ন ক'রে বারাসতের মাঠে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো—

নেপথ্যে ঃ বুলেট! বুলেট! বুলেট!

অধ্যাপক ঃ সেই কঙ্কু যদি আজ এসে দাঁড়ায়, যদি জবাব চায়—

[কঙ্কু পুনঃ প্রবেশ]

কঙ্কু ঃ নন্দিনী, আমরা ছিলাম রাজার এঁটো, সর্দারদের জালে বন্দী বিজ্ঞানের যন্ত্রশালায় কাঁচামালের ছিবড়ে, সেখানে একদিন প্রাণ সঞ্চার করেছিলে তুমি, আমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলাম, দু' চোখ ভ'রে তাকিয়েছিলাম আকাশের সোনালী বর্ণচ্ছটার দিকে, জয় করতে চেয়েছিলাম অপহৃত সৌন্দর্যকে, সংঘর্ষের রক্তাক্ত প্রান্তরে যেদিন শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ালাম, মৃত্যুকে ধরলাম বলিষ্ঠ পাঞ্জায়— তখন তুমি কোথায় গেলে নন্দিনী?

নেপথ্যে কোরাস ঃ তখন তুমি কোথায় গেলে নন্দিনী? [কঙ্কুর প্রস্থান]

নন্দিনী ঃ কোথাও না— কোথাও না, বিলুপ্ত হয়ে গেলাম, শেষ হয়ে গেলাম কঙ্কু!

॥ আমরা কেমন ক'রে বেঁচে আছি.... ॥

অধ্যাপক ঃ কে বলেছে নন্দা? মোটেই শেষ হওনি তুমি! এখন এই মুহূর্তে তুমি দিল্লিতে সংসদ সদস্যদের মজলিশে দাবি জানাচ্ছো পুরীর উপকূলে এক বিশ্রাম ভবন খোলার জন্যে, কিংবা কোলকাতায় নতুন একটা আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠার জন্যে।

নন্দিনী ঃ আর তুমি? তুমি ধোয়া-তুলসীপাতা, না? সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তুমি ঘোষণা করোনি হিংসা আমাদের আদর্শ নয়, আমাদের আদর্শ শান্তি আর অহিংসা? সরকারী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আর বৈদেশিক নীতির স্তুতি গেয়ে মোটা মোটা বই ছাপাচ্ছো না?

পকেটে পুরছো না ঝকঝকে তকতকে সরকারী মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা কাগুজে মুদ্রা?

ফাগু : আর আমি? আকণ্ঠ মদ গিলে প'ড়ে থাকি ভাটিখানায়, তবুও আসে না ঘুম, চোখের তারায় নাচে আগুনের ফুলকির মতো সেই দূরের ছায়া-ছায়া মূর্তিগুলো, যাদের ছুঁতে চাই, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাই, যাদেরকে কাছে পেতে পারলে বোধহয় আমি আজ নতুন ক'রে বেঁচে উঠতে পারি— হয় না, কিছুতেই না, সময়গুলো সব পিছলে যায়, হাতের তাস আর হাতে থাকে না।

বিশু : আমি একা, ভয়ানকভাবে একা, গোপন পাপের মতো একা, একা-একাই নিজের ক্রুশ আমাকে নিজেকে বহন করতে হয়, এই দ্যাখো— আমার শরীর বেয়ে রক্ত ঝরছে, তবু রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে কেউ আর এলো না।

অধ্যাপক : আমি, ঘৃণা করি তোমাদের সবাইকে। কেউ বোঝো না, কেউ কোনোদিন বুঝলো না আমায়। ঘৃণ্য আত্ম-অবমাননার গলিত কলঙ্ক নিয়ে আমাকে আজ নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়, তবু তোমরা নিজের হৃৎপিণ্ড নিজের হাতে ছিঁড়ে শ্মশানে ফেলতে এসেও কেমন উদাসীন নির্বেদে আত্মতুষ্ট, আত্মতৃপ্ত। ঘৃণা করি তোমাদের। সমস্ত পৃথিবীর জন্যে আমার বুক ভর্তি শুধু জমাট অতলস্পর্শী বিস্ফোরক ঘৃণা!

নন্দিনী : আমারও ঘৃণা আছে। তিক্ত বিদ্বেষ আছে, আছে বুক ভর্তি ধিক্কারের ক্লিন্ন গ্লানি। না, তোমাদের জন্যে নয়, আমার, শুধু আমার জন্যে, শুধু আমার প্রতি!

ফাগু : চন্দ্রাও আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে না, অথচ ওর জন্যে, ওরই তাগিদে আমাকে লড়াই থেকে পালিয়ে বেইমানীর পোষাক প'রে উন্নতি খুঁজে বেড়াতে হয়েছে, ওরই জন্যে, ওরই চাহিদা মেটানোর জন্যে! অথচ চন্দ্রাই আজ আমাকে মনে করে একটা ঘৃণ্য জীব, যে না-কি বিকিয়েছে তার আদর্শ, স্বর্ণশৃঙ্খলে বেঁধেছে তার বিবেক— হায় রে, এইটুকুই মানুষের শেষ পাওনা!

বিশু : কিশোরকে খালি মনে পড়ছে এখন! আমার ওপর সরকারী নির্যাতন দেখে ঐ ছেলেটা বিপুল আবেগে ব'লে উঠেছিল—
[আলোক পরিবর্তন। কিশোর ঢোকে]

কিশোর : বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু ঃ এ যে তোর পাগলের মতো কথা!

কিশোর ঃ শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়েস অল্প, আমি খুশি হয়ে সইতে পারবো।

নন্দিনী ঃ আহা, না, কিশোর— ওকথা বলিসনে।

কিশোর ঃ নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা আমাকে যে অপমান করবে এই শাস্তি তার থেকে আমায় বাঁচাবে।

বিশু ঃ না কিশোর, এখন ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে. যেমন ক'রে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর ঃ নন্দিনী, তাহলে বিদায় নিলুম।

[কিশোর চ'লে যায়। আলো পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে]

বিশু ঃ সেই ডালকুত্তা গোয়েন্দার দল ওকে ধরলো শেষপর্যন্ত, তার আগে সে রঞ্জনের কাছে পৌঁছেছিলো, নন্দিনীর দেওয়া রক্তকরবীর মঞ্জরী তার হাতে তুলে দিয়েছিলো।

নন্দিনী ঃ কিশোর! আমার কাছ থেকে কী-ই-বা পেলে! —তবু এমন ক'রে—

বিশু ঃ সেই কিশোরকে যখন ওরা আলিপুর জেলের ভেতর গুলি ক'রে মারলো, আমি তখন বোম্বেতে পপ সঙ্ কম্পোজ করছি—

ফাগু ঃ আমি তখন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্ল্যান আঁটছি—

বিশু ঃ ভীষণ ইচ্ছে হলো— কিশোরকে নিয়ে একটা গান বাঁধি, আমার সত্যিকারের শেষ গান, যে গান শুনে সারা দুনিয়া ভয়ে থরথর ক'রে কেঁপে উঠবে, সমস্ত মানুষ অন্ধকারের হিম শীতলতার বিরুদ্ধে শেষবারের মতো রুখে দাঁড়িয়ে বজ্রমুঠিতে ছিনিয়ে নেবে তার বেদখল হয়ে যাওয়া স্বপ্নের নন্দন কানন, যে গান আবার আমার এই ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করবে নতুন রক্তমাংসে গড়া সেই হারিয়ে যাওয়া পুরোনো মানুষটাকে—

ফাগু ঃ বিশু!

বিশু ঃ হায়! গলায় বাঁধা দাসত্বের সোনালী বক্‌লস— কণ্ঠ দিলো রুদ্ধ ক'রে, বীণার তার গেল ছিঁড়ে, গুনগুনিয়ে ওঠা বুকের ভেতরকার কান্নার জলে ধোয়া শুদ্ধ পবিত্র সে সঙ্গীত রঙিন গেলাসের তরল পানীয়ের বুদ্‌বুদে গেল মিলিয়ে—

অধ্যাপক ঃ আমরা কেমন ক'রে বেঁচে আছি, একবার তুই দেখে যা রঞ্জন! আজ তোরই মৃতদেহ নিয়ে কিংবা আমাদের নিজেদের— আমরা কোথায় চলেছি, কোন্ নেতির মহানৈঃশব্দে ঢাকা বিজন শূন্যতায়!

॥ এক আমির ভেতরে আরেকটা আমি ॥

নন্দিনী ঃ সেই যে রঞ্জন, আমাদের প্রিয় অধিনায়ক, যাকে কিছুতেই বাঁধা যায় না। কখন যে গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে আসে, সর্দার আর মোড়লদের শৃঙ্খলে যে পড়ে না ধরা কোনোদিন—

বিশু ঃ সবার সতর্ক পাহারা এড়িয়ে বজ্রগড় থেকে কুবেরগড়ে, দন্ত্য'ন' পাড়া থেকে মূর্ধণ্য'ণ' পাড়ায়—

ফাগু ঃ অন্ধ্র থেকে পাঞ্জাব— নাগাভূমি থেকে কাশ্মীর—

অধ্যাপক ঃ গোপীবল্লভপুর থেকে শ্রীকাকুলাম—

নন্দিনী ঃ যে শুধু প্রাণের প্রদীপ হাতে ঘুরে বেড়ায় পথহীন অরণ্যের বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—

অধ্যাপক ঃ হায়, আমরা তারই পুরোনো সাথীরা তাকেই বয়ে নিয়ে চলেছি বিস্মৃতির চিতায় তুলে ছাই ক'রে দিতে কিংবা কবর দিতে আমাদের নিশ্চিন্ত প্রাচুর্যের ভূমিতে, যেখান থেকে ও আর কোনোদিন আমাদের ঘুম ভাঙাতে আসবে না।

সবাই ঃ ঐ রঞ্জন একদিন আমাদের নতুন জীবনের মন্ত্রে দিয়েছিলো দীক্ষা, বঞ্চনার অন্ধকূপে ঐ রঞ্জন একদিন জ্বেলেছিলো চেতনার প্রদীপ্ত মশাল!

বিশু ঃ ঐ রঞ্জনের হৃদয়বনবাসিনী নন্দিনী আজ অধ্যাপকের ঘরে গিয়ে শুধু লালসার সাজানো শয্যায় করে নিশিযাপন—

নন্দিনী ঃ রঞ্জনের মন্ত্রশিষ্য ঐ ফাগুলাল— রঞ্জনের হত্যাকারীদের করে পদলেহন।

অধ্যাপক ঃ আর ঐ বিশু— রঞ্জনের শেখানো গান বিকিয়ে দিয়েছে প্রভুদের আলোকিত দোকানে।

ফাগু ঃ আর ঐ অধ্যাপক— রঞ্জনের রক্তে কলম ডুবিয়ে লেখে সর্দারদের জয়ধ্বনি।

বিশু ঃ অধ্যাপক, যখন আমরা এই ঘন আঁধারের রাতে আমাদের স্বপ্নের এই পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়িতে এক বিস্মৃত মানুষের মৃতদেহ নিয়ে ব'সে আছি ওপারের খেয়াতরীর আশায়—

অধ্যাপক : তখন এই মুহূর্তেই লেবার অফিসার ফাগুলাল, নিশ্চিন্ত কোলকাতার কোনো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হোটেলের বিলাসবহুল স্যুইটে ব'সে মালিক আর মন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে—

ফাগু : (মদ্যপানের ভঙ্গি ক'রে) চিয়ার্স! বুঝলেন স্যর, গ্রাইণ্ডিং সেকশনের ওয়ার্কার্সদের মধ্যে কয়েকটা নকশাল ঢুকে পড়েছে, ওরাই স্ট্রাইকের প্ররোচনা দিচ্ছে, ওদের দু'-একটা পাণ্ডাকে যদি খতম ক'রে দেওয়া যায়, আর বাকিগুলোকে চার্জশীট ধরিয়ে দেওয়া যায়— তাহলে— হাঃ হাঃ—

নন্দিনী : ঠিক এই মুহূর্তেই বিশু হয়তো বোম্বেতে কোনো চিত্রাভিনেত্রীকে—

বিশু : (ঈষৎ মত্ত) আমি, আমি বলছি ডার্লিং, বিশ্বাস করো, এবার তোমার লিপে যে গানটা দেবো না— সেটা সুপারহিট করবেই, ঐ যে সেই সিচ্যুয়েশনটা— যখন তুমি আস্তে আস্তে সব ড্রেসগুলো খুলে ফেলছো, ওহ্ সুপার— প্লিজ, সুইট হার্ট—

ফাগু : নন্দিনী হয়তো এখন দিল্লিতে এক অনাথ আশ্রমের ফিতে কেটে উদ্বোধন করছে—

নন্দিনী : (ফিতে-কাটার ভঙ্গীতে) ধন্যবাদ, ভদ্রমহোদয়গণ— আজ এই দেশের জনসাধারণের অতিপ্রিয় সরকারের এই যে জনকল্যাণকর প্রচেষ্টা, এই যে জনসাধারণের সুবিধের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম— বন্ধুগণ— কিছু কিছু ঈর্ষাকাতর লোক বিদেশী অর্থেপুষ্ট হয়ে ব'লে বেড়াচ্ছে— এই সরকারও না-কি ইন্দিরা সরকারের পথে চলেছে, বেলচিতে হরিজন মেরেছে, রাজোয়ারা-কানপুরে শ্রমিক হত্যা করেছে ইত্যাদি— বন্ধুগণ— এইসব দেশদ্রোহীদের প্রচারে মোটেই কান দেবেন না— আজ ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, শান্তিপূর্ণ পথে সমাজ-পরিবর্তনের যে সুযোগ এসেছে, তাকে এরা বানচাল করতে চায়, এদের চিনে রাখুন, এদের মুখোশ খুলে দিন। —এক গ্লাস জল! [হাততালি ক্যামেরার ফ্লাস]

বিশু : এই অধ্যাপক ঠিক এই সময়েই কানাডায় বন্ধুবান্ধবীদের ঘরোয়া বৈঠকে—

অধ্যাপক : ওঃ! ক্যালকাটা! হরিবল! দিনরাত অশান্তি চিৎকার— অথচ আমাদের নতুন সরকার ভেরী ভেরী পপুলার গভর্ণমেন্ট, পিপলস ওয়েলফেয়ারের জন্য দিনরাত খাটছে! কিন্তু কতকগুলো ইয়াং ফেলো আর-একটা ডিস্টার্বেন্স ক্রিয়েট করতে চায়— খালি খুন জখম। গত সপ্তাহে না-কি ভোজপুরে তিনজন ল্যাণ্ডলর্ডকে কেটে

ফেলেছে— যতসব এ্যান্টিসোস্যাল হুলিগ্যানস— আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের লেফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট কেন যে এদের এখনও টলারেট করছে বুঝছি না— এইসব উড়নচণ্ডী ছোকরাদের একজনকে আমি চিনতাম, নামটা মনে পড়েছে না,— ও হ্যাঁ হ্যাঁ, রঞ্জন— রঞ্জন, ভেরী ডেঞ্জারাস ম্যান, পুরোদস্তুর ক্রিমিন্যাল পার্সোন্যালিটি— পুলিশ গুলি ক'রে মারায় সত্যি বলতে কী, লোকেরা ইয়ে হয়েছে— হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে—

নন্দিনী : তবুও এই মানুষগুলোর ভেতরে বোধহয় আরও একটা ক'রে মানুষ আছে—

বিশু : এই আমির ভেতরে আরেকটা আমি—

ফাগু : রাতে যারা ঘুমোয় না, একা হ'লেই যারা ছটফট ক'রে মরে—

অধ্যাপক : এই দু'হাজার.... (অভিনয়ের দিনের সাল তারিখ বসবে) রাতেও যারা উনিশশ একাত্তরের সতেরোই জুনে পুলিশের গুলিতে নিহত এক যুবকের মৃতদেহ কাঁধে ক'রে সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায় একটু আশ্রয়ের খোঁজে—

নন্দিনী : যে বিজ্ঞানকে রাজা সাজিয়ে সর্দাররা বন্দী ক'রে রেখেছিলো তাদের স্বার্থের জালের আড়ালে, ভেবেছিলাম একদিন সেই বন্দী-রাজাকে মুক্ত করবো, স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই রাজা আসবে নেমে জনতার মাঝখানে—

ফাগু : হায় রে নন্দিনী, সেই বিজ্ঞানের, সেই সাজানো রাজার আধুনিকতম মারণাস্ত্রে খুন হয়েছে রঞ্জন— থ্রি নট থ্রি রাইফেলের বুলেট তার পাঁজর ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছে—

নেপথ্যে : বুলেট! বুলেট! বুলেট!

নন্দিনী : তবু রঞ্জন বেঁচে আছে। মৃত্যুর মধ্যেও তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি! রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনও মরতে পারে না।

।। এই মৃতদেহ আমাদের যুদ্ধের নিশান।।

ফাগু : অধ্যাপক— আমরা তাহলে কী করবো?

[ওদের অজান্তে চার যুবক ঢোকে]

অধ্যাপক : আমরা হেরে গেছি, সুনিশ্চিতভাবে হেরে গেছি আমরা— যারা বেঁচে আছি এইভাবে সংশয় আর সন্দেহের কাঁটাতারে ঘিরে

আমাদের বিবেক, তারা আজ প্রতিষ্ঠা আর প্রতিপত্তির আকাশে পাড়ি দিয়েও ছিন্নভিন্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

নন্দিনী : জিতে গেল ওরা, যারা যুদ্ধের আগুনে নিজেদের পুড়িয়ে দিয়েছে।

বিশু : এই মৃতদেহ নিয়ে আমরা তবে কী করবো এখানে—

অধ্যাপক : চলো, ওকে জীবন্ত ক'রে তুলি, ঐ মৃতের শরীরে আনি বিশ্বস্ত প্রাণের জোয়ার— (ওরা কফিনের দিকে এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়! চার যুবক মৃতদেহ ঘিরে আছে।)

বিশু : (চিৎকার ক'রে) অধ্যাপক! এরা কারা?

নন্দিনী : রঞ্জন— আমার রঞ্জনকে কারা ঘিরে রেখেছে!

অধ্যাপক : তোমরা কারা? এখানে এসেছো কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে?

ওরা চারজন : এই মৃতদেহ নিয়ে যেতে।

ফাগু : কেন? কীসের জন্যে?

ওরা চারজন : এই মৃতদেহ আমাদের যুদ্ধের নিশান!

অধ্যাপক : তোমরা কারা? তোমাদের চিনতে পারছি না কেন?

চারজন : চিনতে চাও না ব'লে! আমরাই তো কিশোর, গোকুল, গজ্জু, আর কঙ্কুর দল; আমারই তো 'মুক্তধারা'র 'রক্তকরবী'র শিবতরাইয়ের প্রজারা; আমরাই তো 'অচলায়তন'-এর দর্ভক, শোনপাংশু, পঞ্চকের দল; আমরাই তো 'কালের যাত্রা'র সেই শূদ্রেরা।

নন্দিনী : চিনেছি! তুই কিশোর!

কিশোর : 'রক্তকরবী'তে আমি কিশোর, 'অচলায়তনে'-এ আমি পঞ্চক, 'মুক্তধারা'য় আমি সুমন—

চারজন : আর একাত্তর সালে বারাসত থেকে বেলেঘাটায়, আর আলিপুর থেকে বহরমপুরে নিহত সেই নিষ্পাপ পবিত্র তরুণ আমরা!

ফাগু : স'রে যাও তোমরা! এ মৃতদেহ আমাদের দাও!

গোকুল : না! এ মৃতদেহ আমাদের। আমাদেরই আছে শুধু অধিকার এই মহান শহীদের দেহ বহন করার।

বিশু : কেন? একদিন তো আমরাও ছিলাম রঞ্জনের সঙ্গে, ও আমাদের বন্ধু, আমাদের স্বজন—

কিশোর : তোমরা আজ রণক্ষেত্র থেকে পলাতক গৃহসুখসন্ধানীর দল। রঞ্জন তাই তোমাদের নয়, আমাদের অধিনায়ক। আমরা যারা ফিরিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, আমরা যারা হারাইনি বিশ্বাস!

অধ্যাপক : মিথ্যে কথা! তোমরাতো ম'রে গেছো— এই দ্যাখো আমরা বেঁচে

আছি। ভুলই করি আর যা-ই করি বেঁচে তো আছি, তাই এই মৃতদেহ আমরাই বহন করবো— এটা আমাদেরই অধিকার, আমাদেরই দায়।

কিশোর : (হেসে ওঠে) দায়! কীসের দায়? দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকদের আবার দায় কীসের?

বিশু : না। আমরা কোনো কথা শুনবো না। এ মৃতদেহ ছুঁতে না পারলে, এতে প্রাণ আনতে না পারলে আমাদের মুক্তি নেই।

গোকুল : আমরা দেবো না।

ফাগু : অধ্যাপক, চলো কেড়ে নিই। এই শবদেহ আমাদের চাই! (ওরা এগুতে যায়। পারে না।)

বিশু : এ কী! আমরা এগুতে পারছি না কেন?

ফাগু : পা আমাদের পাথরের মতো ভারী হয়ে গেছে—

নন্দিনী : মাটির সঙ্গে আটকে গেছে!

অধ্যাপক : কোন্ যাদুমন্ত্রে আমাদের এ অবস্থা করলে?

গজ্জু : কোনো যাদুমন্ত্র নয়, তোমাদের গোপন পাপ তোমাদের এগুতে দেবে না।

গোকুল : তোমাদের কৃতঘ্নতা ঐ মৃতদেহের কাছে পৌঁছবার রাস্তায় দেওয়াল তুলেছে।

নন্দিনী : দোহাই তোমাদের— বিশ্বাস করো, আমরা আবার ফিরে যেতে চাই।

কিশোর : ফিরতে চাইলেই ফেরা যায় না নন্দিনী, তার জন্যে দীর্ঘ প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

গোকুল : ফিরলেও তোমরা আর ঐ মৃতদেহ বহন করতে পারবে না। সে অধিকার তোমরা হারিয়েছো অনেকদিন।

কঙ্কু : সত্যিই যদি চাও, তবে এসো, আমাদের অনুগমন করো, নগ্নপদে, নতমস্তকে!

গোকুল : তবে সামনের সারিতে আর নয়।

গজ্জু : নেতৃত্বে কখনও নয়। বিশ্বাসঘাতক পলাতকদের চিনেছি আমরা!

অধ্যাপক : আর একটিবার সুযোগ দাও আমাদের, আর একবার!

কিশোর : নন্দিনী, ওদের গোঁসাই যখন বলেছিলো— ধর্মের আফিং খাইয়ে ভাঙো ওদের মেরুদণ্ড, আর ফৌজ দিয়ে ভাঙো ওদের প্রতিরোধ তখন তুমি বলেছো— আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু! মৃত্যু কখনও জীবনের অস্ত্র হয় না নন্দিনী!

কঙ্কু ঃ তাই তোমরা হেরে গেছো!

বিশোর ঃ ফৌজের সঙ্গে লড়তে গেলে ফৌজ দিয়ে লড়তে হয়, শুধু আত্মত্যাগ দিয়ে নয়, অকারণ আত্মদানের খেলা বেশিদিন টেঁকে না। নির্মম হ'তে হয় নন্দিনী, কৌশলী হ'তে হয়।

গজ্জু ঃ জয়লাভ করতে হ'লে অনেক আঁকাবাঁকা পথ পেরুতে হয়। সহজ রাস্তায় সোজা হিসেবে যুদ্ধ চলে না।

ফাগু ঃ মৃতদেহটা আমাদের দাও— দয়া করো!

কিশোর ঃ না! নন্দিনী— সর্দারের বর্শার ডগায় তোমার কুন্দফুলের মালা দোলে কোন্ মূঢ় প্রত্যাশায়? তুমি কি ভেবেছিলে— যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ সাদারঙের ফুলের মালাকে তোমার রক্তে রাঙিয়ে তুললেই তা কি সর্দারের বর্শার ডগায় রক্তকরবী হয়ে উঠে আমাদের মুক্তি এনে দিতো?

নন্দিনী ঃ বল্ তোরা, যত ইচ্ছে বল্! সব মেনে নেবো মাথা নিচু ক'রে।

কিশোর ঃ নির্মোহ হ'তে হয় নন্দিনী! সর্দার আর মোড়লদের সততা আর মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়।

গোকুল ঃ তাই-ই তোমরা নিজেদের দোষে যুদ্ধে হেরে গিয়ে এক তীর থেকে অন্য তীরে পালিয়েছো, এক শিবির থেকে বিপরীত শিবিরে!

অধ্যাপক ঃ দোহাই তোমাদের— মৃতদেহটা আমাদের দাও, আমাদের বেঁচে উঠতে দাও!

কিশোর ঃ না, বহন করতে দেবো না। ইচ্ছে হয় তো আমাদের পেছনে পেছনে এসো!

গোকুল ঃ আয় রে ভাই— এবার লড়াইয়ে চল্।

চারজনে ঃ লড়াইয়ে চল্! লড়াইয়ে চল্! (ওরা স্লোগান দিতে দিতে মৃত দেহ নিয়ে অডিটোরিয়ামের মধ্যে দিয়ে চ'লে যেতে থাকে। মঞ্চে এরা যন্ত্রণায় ছটফট করে)

নন্দিনী ঃ দেখতে দেখতে সিঁদুরের মেঘে আজকের গোধূলি— রাঙা হয়ে উঠলো। ওই কি আমাদের মিলনের রঙ! আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে! রঞ্জন! রঞ্জন!

ফাগু ঃ এই শুনছো— আমরা যাবো, আমাদের নিয়ে যাও।

বিশু ঃ অধ্যাপক— এগুতে পারছি না কেন? পা আটকে গেছে।

অধ্যাপক ঃ ফাগুলাল— এ কোথায় আমরা বন্দী হয়ে আছি!

ফাগু ঃ বুঝলেন স্যার— গ্রাইণ্ডিং সেক্সনের ওয়ার্কার্সদের মধ্যে কয়েকটা নকশাল ঢুকে পড়েছে— ওদের শায়েস্তা করতে না পারলে—

অধ্যাপক ঃ এই— এই যে কিশোর— আমি যাবো, আমায় নিয়ে যা।

নন্দিনী ঃ রঞ্জন, আমাকে পথ দেখাও।

ফাগু ঃ শুনছো ভাই— বড় অন্ধকার, আলো— আলো চাই!

বিশু ঃ ঐ যে সেই সিচ্যুয়েশনটা— যখন তুমি কাপড় ছাড়বে, তখন এমন একটা এফেক্ট মিউজিক দেবো—

অধ্যাপক ঃ নন্দিনী— আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

বিশু ঃ অধ্যাপক! ওদের থামতে বলো— আমরা যাবো!

ফাগু ঃ পা দুটো সেঁটে গেছে! ওরে ভাই এগুতে দে আমাদের—

নন্দিনী ঃ জনসাধারণের অতিপ্রিয় এই সরকারের এই যে জনকল্যাণকর—

বিশু ঃ ফাগুলাল— তুই একটা বেইমান শয়তান—

অধ্যাপক ঃ রঞ্জন একটা ক্রিমিন্যাল পার্সোন্যালিটি— পুলিশে মেরেছে; বেশ হয়েছে—

নন্দিনী ঃ তোমাকে আমি— তোমাকে ছুঁতে গা ঘিনঘিন ক'রে ওঠে—

অধ্যাপক ঃ ইউ ডার্টি বিচ! —আমার সব নষ্ট করেছো—

ফাগু ঃ বিশু— তোকে আমি খুন ক'রে ফেলবো—

অধ্যাপক ঃ বেরিয়ে যা— বেরিয়ে যা ফাগুলাল— গেট আউট আই সে—

বিশু ঃ অধ্যাপক— তুমি একটা ভণ্ড, হিপোক্রিট—

ফাগু ঃ নন্দিনী— তুই একটা বেশ্যারও অধম!

নন্দিনী ঃ আদর্শ হারিয়ে গেলে মানুষ জানোয়ার হয়ে যায়— জানোয়ার— থুঃ! (সবাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে স্থির)

নেপথ্যে ঃ রঞ্জন আসবে ব'লে অপেক্ষা করেছিলুম, রঞ্জন তো এলো, ওর আবার আসার জন্য প্রস্তুত হবো, ও আবার আসবে....

।। যবনিকা।।

দালাল

চরিত্রাবলী ঃ ভিয়েতনামের বুড়ি, ১ম আমেরিকান সৈনিক, ২য় আমেরিকান সৈনিক, শান্তিপ্রিয়, মস্তান, হরিনাথ, সুপ্রিয়, মা, পুলিশ অফিসার, ন্‌গুয়েন বিন মুক্তিযোদ্ধাগণ, রমা।

[দর্শকদের মাঝখান দিয়ে রক্তাক্ত এক ভিয়েৎনামী বুড়িকে হিঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে দুই আমেরিকান সৈনিক]

১ম সৈনিক ঃ বল্ মাগী, শিগগির বল্ তোর ছেলে কোথায়?

বুড়ি ঃ জানি না, জানি না। বলছি তো তোমাদের!

২য় সৈনিক ঃ মিথ্যে কথা বলবি তো বেয়নেট দিয়ে পেট ফাঁসিয়ে ছেলেকে বার ক'রে আনবো।

বুড়ি ঃ আনো, তাই আনো বাছারা, নতুন নতুন জন্ম নিক আমার ছেলেরা।

১ম সৈনিক ঃ বলবি না? দ্যাখ্— (চাবুক ও বেয়নেটের আঘাত)

২য় সৈনিক ঃ ব'লে দে বুড়ি! তোর ছেলে কমিউনিস্ট গেরিলা। দেশের দুশমন! (আবছা অন্ধকার মঞ্চে বুড়িকে টেনে তোলে)

বুড়ি ঃ কোন্ দেশের দুশমন? ভিয়েৎনামের? না, আমেরিকার?

১ম সৈনিক ঃ ছেঁদো কথা রাখ্। এমন হারামী বুড়ি বাপের জন্মে দেখিনি!

২য় সৈনিক ঃ আমরা খবর পেয়েছি তোর গেরিলা ছেলে ন্‌গুয়েন বিন কাল রাতে তোর কাছে এসেছিল। বল্ সে বাঞ্চোৎ এখন কোথায়?

১ম সৈনিক ঃ শালার সাহস বলিহারী! এমন কাঁটাতারে ঘেরা মার্কিন সেনাবাহিনীর পাহারাধীন স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেটেও শুয়োরের বাচ্চারা ঢুকেছে!

২য় সৈনিক ঃ শুয়োর নয়, ইঁদুর। ইঁদুরের বাচ্চারা। ভেতরে ভেতরে মাটি কেটে হঠাৎ ফুঁড়ে ওঠে।

১ম সৈনিক ঃ কী রে বুড়ি.... বললি না তো! আমাদের আর কিছু করার নেই।

২য় সৈনিক ঃ তবে তৈরি হ', মরার জন্যে। কত্তাদের হুকুম— গেরিলাদের সঙ্গে সামান্য সংযোগও যার ধরা পড়বে, তার হবে—

১ম সৈনিক ঃ মৃত্যু! এখনও বল্ বুড়ি— তোর ছেলে কোথায়?

বুড়ি ঃ জানি না। জানি না। জানি না।

[সৈনিক দু'জন রাইফেল উঁচিয়ে ক্রমশ এগোয়। বুড়ি চিৎকার ক'রে ওঠে—

—আমায় তোমরা মারছো কেন? কী অন্যায় করেছি আমরা?

সৈনিকরা ক্রমশ এগোয়। সন্ত্রাসে বুড়ি পেছোয়। পেছুতে পেছুতে শেষ ধাপে পৌঁছে বিকট আর্তনাদ ক'রে ওঠে বুড়ি। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ এবং বুড়ির মৃত্যু—ভয়ার্ত মুখের ক্লোজ-আপ। এক মিনিট পরএকদমআলোনিভে যায়। তারপর আবার জ্ব'লে ওঠে। এক যুবক দাঁড়িয়ে একা মঞ্চে।]

যুবক ঃ আজ্ঞে না মহাশয়, এটা ভিয়েৎনাম নয়। এটা কোলকাতা। অর্থাৎ ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলার রাজধানী। সায়গন-হ্যানয়-মেকং এখান থেকে অনেক অনেক দূরে। তবে ঐ যে ওদিকে রাস্তার ও ফুটপাথ দেখুন— প্রদর্শনী হচ্ছে— ভিয়েৎনাম প্রদর্শনী। আমি একটু ঘুরে দেখে এলাম এখনই। এখান থেকেও দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই ঐ যে বিরাট বড় ক'রে আঁকা সন্ত্রস্ত রক্তাক্ত এক ভিয়েৎনামী বৃদ্ধা মহিলার মুখ— আর নিচে লেখা নির্যাতিতা ভিয়েৎনামী মা! দেখতে পাচ্ছেন? ঐ ছবিটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু। না, না, স্যার এবং মহিলাগণ— দোহাই আপনাদের.... মানে ইয়ে আমি মোটেই রাজনীতি করি না। আমি কেরাণী স্যার, আমি দুশো তিরিশ টাকার কেরাণী। আজকাল রাজনীতি করলে রাস্তায় লাশ প'ড়ে থাকে নয়তো জেলে নিয়ে ভ'রে দেয়। আমার পরের ভাইটাও যেমন রয়েছে। আমি তাই মোটেই রাজনীতি করি না। পুলিশে একবার ধরলেই চাকরি নট্। আর তাহলে আমার বুড়ো মা-বাপ, আর চারটে ছোটো ছোটো ভাইবোন, ছাঁটাই হওয়া দাদা আর বৌদি আর তাদের একটা কোলের বাচ্চা কোথায় যাবে বলুন? আর আমি রাজনীতি করলে এম.এল.এ. হয়ে মন্ত্রী হ'তে পারবোই— এ গ্যারাণ্টি মানে— নামের জন্যে নয়— রাজনৈতিক চাকরির গ্যারাণ্টি, কে আর দিচ্ছে দাদা? তাই রাজনীতি ক'রে হবেটা কী? মানে আমি রাজনীতি করি না, কিন্তু তবু এই যে এখানে এস্প্ল্যানেডে বাসগুমটিতে দাঁড়িয়ে আছি রমার জন্যে, এই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ঐ ছবিটা কেমন যেন মাথার মধ্যে,

মানে ঠিক বোঝাতে পারছি না.... ঐ ছবির বৃদ্ধা মহিলাকে তো আমি চিনি না, দেখিনি কোনোদিন, উনি তো বাঙালিও নন, সেই ভূগোলে পড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কী যেন ভিয়েৎনামে— তবু বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে— মুখের ঐ ভয়ের রেখাগুলোকে আমি চিনি, দেখেছি। কবে যেন— মাইরি বলছি স্যার, আমি রাজনীতি করি না।

[স্লোগানের আওয়াজ]

ঐ যে দেখুন স্যার এবং ম্যাডামরা, আমাদের ইউনিয়নের মিছিলে যাচ্ছে— আমি তাতে নেই। পালিয়ে এসে অপেক্ষা করছি রমার জন্যে। আমরা এখন মেট্রোতে ঢুকবো, আর ঐ মিছিল যাচ্ছে রাইটার্সের দিকে, বুঝতেই পারেন— পথ আমাদের আলাদা। কিন্তু ঐ ছবিটা কেন যে এত— বিশ্বাস করুন দাদারা.... আমি একদম শান্তিপ্রিয়। আমার নামটাও তাই। কোনোদিন ঝগড়াঝাঁটি করা, গলা উঁচু ক'রে কথা বলা— মানে কোনো প্রতিবাদট্রতিবাদ করা, এসব আমার ধাতে নেই। এ জন্যে আপনারা আমায়—

[এক মস্তানের প্রবেশ]

মস্তান ঃ এই যে দাদা— ক'টা বাজে?

শান্তিপ্রিয় ঃ (ঘড়ি দেখে) দুটো দশ।

মস্তান ঃ (একটা রিভলবার সামনে ধ'রে) ঘড়িটা খুলে দিন।

শান্তি ঃ এ্যাঁ? ঘড়ি?

মস্তান ঃ হ্যাঁ। ঘড়ি! দিন, দিন, দেরি করবেন না।

শান্তি ঃ ঘড়ি— মানে এই বাজারে.... ইয়ে ঘড়িটা—

মস্তান ঃ তাড়াতাড়ি দিন। নয়তো দেখছেন তো মালটা? একদানা ঢুকিয়ে দেবো পাঁজরার ভেতর।

শান্তি ঃ দানা?

মস্তান ঃ বুলেট, বুলেট, কথাও বোঝো না, কোথাকার গাড়ল। দিন, দেরি হচ্ছে যে!

শান্তি ঃ (ঘড়ি খুলে) নিন।

মস্তান ঃ থ্যাংক ইউ। এটাও আপনি রাখুন— (রিভলবারটা দেয়)

শান্তি ঃ (বজ্রাহত) এটা? এটা যে—

মস্তান ঃ ছ'আনার পিস্তল। শোধবোধ হয়ে গেল। চলি দাদা।

[প্রস্থান]

শান্তি ঃ দেখলেন তো! এই তো হচ্ছে ব্যাপার। মাঝের থেকে ঘড়িটা গেল। আঠেরো মাস টিফিন না খেয়ে খেয়ে ঘড়িটা কিনেছিলাম। যাক গে! ঝামেলা করার মশাই আমার দরকার নেই। যা গেছে তা তো আর ফিরবে না। (হাতের দিকে

চেয়ে) এটা আর কেন রাখি? কে জানে মশায়, যা দিনকাল— হয়তো এই সুদ্ধু অ্যারেস্ট ক'রে বেআইনি পিস্তল রাখা, পাঁচটা মার্ডার আর তিনটে রেপ কেসের চার্জে ঝুলিয়ে দিলো। (পিস্তলটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে) সব সময় সেফ সাইডে থাকা ভালো, বুঝলেন! আমার পরের ভাইটাকে যখন মাঝ রাত্তিরে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ, তখন কলের পাইপগুলো পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল, পরে আনন্দ বাজারে দেখি— আমাদের বাড়িতে না-কি পাইপগানের কারখানা ছিল! দেখুন দিকি, কী থেকে কী হয়! ঐ জন্যে আমি পকেটে রুমাল রাখি না, কে জানে ধ'রে নিয়ে গিয়ে বলবে— ঐ রুমালে বেঁধে বোমার মশলা নিয়ে যাই! আমার কী দরকার ওসব হুজ্জোতির মধ্যে গিয়ে? তাই মিছিলেটিছিলে না গিয়ে রমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। রমা অনেকদিন আমার পাশে ব'সে সিনেমা দ্যাখেনি। আজকে একটু— কিন্তু এই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ব্যথা হয়ে আসছে। আর ঐ দেখুন ছবিটা— ঠিক আমার মুখোমুখি, ঐ রক্তমাখা ভয়ার্ত বৃদ্ধা, ঐ ভিয়েৎনাম, এই যে এত লোক আমার চারপাশ দিয়ে যাতায়াত করছে ওদের কারুর চোখে পড়ছে না, শুধু আমারই.... আর ঐ মুখ— মানে খালি মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি কোথায় যেন.... মাঝে মাঝে হয় না আপনাদের— কোনো অপরিচিত লোককে দেখেও মনে হয়.... আসলে ঐ ছবিটা— এই যে হরিদা—

[হরিনাথের প্রবেশ। প্রৌঢ়, বিষণ্ণ]

কোত্থেকে ফিরছেন? বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি!

হরি ঃ কে? ও, শান্তি! এখানে কী ব্যাপার?

শান্তি ঃ এই একটু এখানে— মানে এক ফ্রেণ্ডের আসার কথা।

হরি ঃ তোমার ভাইয়ের খবর কিছু পেলে?

শান্তি ঃ কে? রজত? ও তো এখন ইয়ে— জেলে।

হরি ঃ জানি। (নীরবতা) খবর কিছু পাওনি?

শান্তি ঃ খবর? অ্যাঁ? হ্যাঁ, পেয়েছি— খবর পেয়েছি। ভালো আছে। ভালো।

হরি ঃ ভালো আছে? ভালো কেউ থাকে আজকাল? (থেমে) তা ভালো থাকলেই ভালো!

শান্তি ঃ আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

হরি ঃ কে? আমি? কোথাও না।
শান্তি ঃ কোথাও না?
হরি ঃ কোথায় যাওয়া যায় বলো দিকি? (শান্তি নীরব) যাওয়ার কোনো জায়গা আছে এ পোড়া দেশে? এক শ্মশান ছাড়া?
শান্তি ঃ আপনার অফিস?
হরি ঃ আসছে মাসে সরিয়ে নিচ্ছে ব্যাঙ্গালোরে।
শান্তি ঃ স্টাফেরা?
হরি ঃ এক মাসের নোটিশ দিয়েছে।
শান্তি ঃ ও! আচ্ছা, ঠিক আছে হরিদা! (হরি চ'লে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়)
হরি ঃ পাঁচটা টাকা হবে তোমার কাছে? দিন দশেক বাদেই দেবো।
শান্তি ঃ টাকা? না, না। আমার কাছে এখানে টাকা কোথায়!
হরি ঃ ও! আচ্ছা চলি ভাই কিছু মনে কোরো না যেন। মানে র‍্যাশনের টাকায় শর্ট পড়েছে। ক'টা ধার শোধ দিতে হলো কি-না! আর টাকা! আসছে মাসে যে কী হবে— কিছু মনে কোরো না যেন ভাই—
শান্তি ঃ কিসের?
হরি ঃ এই ইয়ে ধার চাইলাম কি-না? অসীম তো তোমার ছোটো ভাইয়ের বন্ধু ছিল—
শান্তি ঃ অসীম! ওদের ব্যাপারটার আর কিছু হলো হরিদা?
হরি ঃ (উদাসীন) কী হবে?
শান্তি ঃ মানে ইয়ে আর কি! তদন্ত মানে কেসটেস—
হরি ঃ (ম্লান হেসে) গরিবের ঘোড়া রোগ। বাগমারীতে গুলি ক'রে মারার পর পুলিশ গাড়িতে ক'রে ঝাঁঝরা শরীরটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল— এই তো যথেষ্ট! (চ'লে যেতে গিয়ে) তোমার ভাই রজতের সঙ্গে অসীমের একটা ছবি তোলা ছিল না?
শান্তি ঃ কী জানি! হবে বোধ হয়।
হরি ঃ খুঁজো তো ভাই! আমাদের বাড়িতে একটাও নেই কি-না। ওর মা মাঝে মাঝেই.... কী আর করা যাবে বলো। সবই— যাকগে, চলি ভাই। (আবার ঘুরে) রজত কোন্ জেলে যেন?
শান্তি ঃ দমদম। কেন?
হরি ঃ না। তবে ঠিক আছে। আজ কাগজেই দেখলাম কি-না—
শান্তি ঃ না, না, সে তো বহরমপুর জেলে। গুলি চলেছে তো?
হরি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ— ক'জন মরেছে?

শান্তি : কাগজে বলছে ষোলো জন। আসলে কত কে জানে—

হরি : মরা—কেবল মরা। কেউ বেঁচে থাকবে না। (থেমে) কেউ বেঁচে আছে কি এখনও? কিছু মনে কোরো না যেন— ধার চাইলাম ব'লে। [প্রস্থান]

শান্তি : বাঁচলাম! মনটা আরেকটু হ'লেই ভিজে গিয়েছিল বৈকি! পাঁচটা টাকাই সম্বল। হরিদাকে দিলে রমার কী হতো? জানেন, ক'দ্দিন আমরা সিনেমা দেখা দূরে থাক্, একসঙ্গে ইডেনে গিয়ে ফুচ্‌কা পর্যন্ত খাইনি! কী করবো, দুশো তিরিশে কত দিকে তাকাবো? দাদা তো ছাঁটাই হয়ে আমার ঘাড়েই চেপেছে— বৌদি আর বাচ্চাটা সমেত। বুড়োবুড়ি কী করতে যে এখনও টিকে আছে— আরও চারটে অপোগণ্ড ভাই বোন। রজতটা জেলে গিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে। গ্র্যাজুয়েট বেকার ভাইয়ের ভাতটা তো বেঁচেছে। ঐযে হরিদা— ওর ছেলে— আমার তো মনে হয়— ম'রে গিয়ে বাপকে রেহাই দিয়েছে। একজনের ভাত তো কমেছে। আমি কী করবো বলুন! তিরিশ ছুঁই ছুঁই করছি। রমাটাও অবুঝ। আমাকে সব দিক থেকে চাপ দিলে আমি কী করতে পারি— কী হে দেখতে পাও না? ধাক্কা দিলে যে? দেখছো দাঁড়িয়ে আছি! না না ভাই— ঠিক আছে যাও। যত ঘেমো গন্ধওলা মজুরের দল! কিন্তু এখনও তো রমা এলো না! পৌনে তিনটেয় শো! মেট্রোয় লাইন পড়েছে কত বড় দেখেছো? শালা! এডাল্টস্ পিকচার কি-না! আজ বহুদিন বাদে রমাকে পাশে পেলে— কী করবো মশাই আমারও তো যৌবন আছে না-কি? সে কি সব শুধু এই চৌরঙ্গীর মেমেদের? স্যরি ম্যাডাম। ভেরি স্যরি। হাওয়ায় সেন্টের কী গন্ধই ছেড়েছে— শালা দুনিয়াটা ওদেরই! এভাবে হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগে না— আবার দ্যাখো ঐ ছবিটা অতবড় ক'রে আঁকবার কী দরকার ছিল বাপ— খালি খালি কী যেন একটা-কী যেন হারিয়ে যাচ্ছে—কিছুতেই মনে পড়ছে না, মানে ঐ মহিলা, ঐ বৃদ্ধা— ঐ রক্ত গড়ানো মুখ— ঐ ভয়— মানে— মানে ঠিক বোঝাতে পারছি না—

[সুপ্রিয়র প্রবেশ]

সুপ্রিয় : আরে শান্তি, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

শান্তি : তুই! সুপ্রিয়! কোত্থেকে!

সুপ্রিয় : পাড়া থেকে। টালিগঞ্জে যাবো। এক ভদ্রলোকের পায়ে তেল দিতে।

শান্তি : আশা পেলি কিছু?

সুপ্রিয় : দুর দুর! কারখানাটা লকআউট হয়ে যা অবস্থা চলছে না সংসারের!

শান্তি : সবারই তাই।

সুপ্রিয় : তুই তো তবু ভালো আছিস, কেন যে শালা মরতে বিয়ে করলাম!

শান্তি : তোর বিয়ে ক'রে যা অবস্থা, আমার বিয়ে না ক'রে তাই।

সুপ্রিয় : তা ঠিকই! তোর দাদার কিছু হলো?

শান্তি : নাঃ। হবে ব'লেও মনে হয় না।

সুপ্রিয় : যা দিনকাল পড়েছে— জিনিসের দাম শুনলে মাথা গরম হয়ে যায়। তা এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?

শান্তি : আকাশ দেখছি।

সুপ্রিয় : তা দ্যাখ্। মনে এখনও রং আছে দেখছি। থাকবে না থাকবে না। সব চ'টে যাবে। আসবে কেউ?

শান্তি : রমা।

সুপ্রিয় : তুই জানিস না ওদের পাড়া পুলিশে ঘিরেছে?

শান্তি : (উদ্বেগে) তাই না-কি? কখন? রমা কি সেইজন্যে—

সুপ্রিয় : সাড়ে বারোটা নাগাদ।

শান্তি : (স্বস্তিতে) ও তো দশটায় অফিসে এসেছে। ঝামেলায় পড়েনি।

সুপ্রিয় : তিনটে ছেলেকে ধ'রে গুলি করেছে সবার সামনে।

শান্তি : (হাই তুলে) ও তো রোজ চলছেই! নতুন কী!

সুপ্রিয় : তা বটে! সয়ে গেছে আজকাল। সিনেমা দেখবি!

শান্তি : ইচ্ছে তো তাই।

সুপ্রিয় : দ্যাখ্ দ্যাখ্। বেড়ে আছিস মাইরি! (প্রস্থানোদ্যত)

শান্তি : সুপ্রিয়, এই সুপ্রিয় শোন্—

সুপ্রিয় : কী? ডাকছিস কেন!

শান্তি : ঐ ছবিটা দ্যাখ্—

সুপ্রিয় : কোন্টা?

শান্তি : ঐ যে ভিয়েৎনামের নির্যাতিতা মা!

সুপ্রিয় : ও হ্যাঁ— ওরা লড়ছে বটে— বাহাদুর জাত!

শান্তি : না, মানে আসলে তা নয়— ইয়ে ব্যাপারটা হলো— ঐ ছবিটা দ্যাখ্ না—

সুপ্রিয় ঃ ও আর দেখার কী আছে! ছবিটা ভালোই এঁকেছে।

শান্তি ঃ না না, তা নয়— আমি বলতে চাইছি—

সুপ্রিয় ঃ তোর তাহলে উন্নতি হয়েছে—

শান্তি ঃ মানে?

সুপ্রিয় ঃ এ্যাদ্দিন তো ভেড়ুয়াই ব'নে ছিলি— আজ তাহলে রাজনীতি টানছে তোকে। সবাইকে একদিন না একদিন টানবে। কেউ আর পেছিয়ে—

শান্তি ঃ ঠিক তা নয়, দ্যাখ্ না ভালো ক'রে— মুখটা যেন চেনা চেনা— কেমন যেন—

সুপ্রিয় ঃ (কিছুক্ষণ ওকে দেখে) পাগল হয়েছিস? কোথায় ভিয়েৎনাম আর কোথায়—

শান্তি ঃ দ্যাখ্ না ভালো ক'রে দ্যাখ্— চেনা চেনা—

সুপ্রিয় ঃ (হেসে) দেখার কী আছে? চেনা চেনা তো লাগবেই। আমার মা তোর মা— সবার মা'রই তো এক অবস্থা। চলি। [*প্রস্থান*]

শান্তি ঃ আমার মা! আমার মা! মা! তাহলে সেদিন— সেদিন মা'র মুখ— মা'র মুখ একেবারে ঐ ছবির মতো। রজত— রজতকে ধ'রে নিয়ে যাবার পরদিন রাত্রে— আবার আবার এলো ওরা— আমার মা— মা— তখন—

[লাইট নিভে গেল। আবার আবছা আলো। এক পুলিশ অফিসার ও মা দাঁড়িয়ে]

পু. অ. ঃ বলুন, এখনও বলুন, রজতের রিভলবারটা কোথায়?

মা ঃ বলেছি তো জানি না। কতবার বলবো?

পু. অ. ঃ আমরা খবর পেয়েছি রিভলবারটা এ বাড়িতেই আছে।

মা ঃ সারা বাড়ি তো আপনারা তছনছ করেছেন! তবুও তো পাননি।

পু. অ. ঃ পাইনি। কিন্তু এখানেই তো আছে জানি। ব'লে দিন জায়গাটা।

মা ঃ কেন? খোকার জিনিস, খোকাই তো বলবে কোথায় রেখেছে।

পু. অ. ঃ সাপের বাচ্চা তো সাপই হয়। মেরে মেরে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে দিয়েছি। তবু বাঞ্চোতের মুখে রা নেই।

মা ঃ তাহলে আর আমি কী করবো বলুন!

পু. অ. ঃ আপনি জায়গাটা ব'লে দেবেন। শুধু এইটুকু কাজ।

মা ঃ আমি জানি না।

পু. অ. ঃ আমাকে উত্তেজিত করবেন না। রেগে গেলে আমি যা তা ক'রে বসবো। ব'লে দিন।

মা ঃ কতবার বলবো— আমি জানি না, জানি না, জানি না।

পু. অ. ঃ (চিৎকার ক'রে) বল্ খান্‌কি মাগী! (লাথি মারে)

[মা চিৎকার ক'রে প'ড়ে যেতে গিয়ে স্টিল হয়ে যান। পুলিশ অফিসার ক্ষিপ্ত আক্রোশে পায়ে পায়ে এগোয়। মা'র সন্ত্রস্ত রক্তাক্ত মুখের ক্লোজ-আপ। পুরো মঞ্চ অন্ধকার। আবার আলো জ্ব'লে ওঠে। শান্তিপ্রিয় একা মঞ্চে]

শান্তি ঃ আমি— আমি তখন পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছি। আমি তো রাজনীতি করি না— সাতে নেই পাঁচে নেই— দুশো তিরিশ টাকার ছাপোষা কেরাণী, কত বিরাট সংসার আমার ঘাড়ে। আমার কি— আমার কি তখন অধীর হওয়া সাজে! আপনারাই বলুন! আমায় যদি জেলে যেতে হয়, আমার লাশ যদি প'ড়ে থাকে বারাসত, কোন্নগর, কিংবা জলপাইগুড়িতে, আমার বুকের ভেতরে হাতুড়ি পিটে যাচ্ছে কে যেন অবিরাম, আর ওদিকে অচৈতন্য মা, জানলা দিয়ে আমি তো সব দেখেছি— রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা ঘর, সারা দেশ, মা'র মুখ অবিকল ঐ ছবির মতন, ঐ রক্তাক্ত সন্ত্রস্ত ভিয়েৎনামী বৃদ্ধা, ভিয়েৎনামের নির্যাতিতা মা, আর আর আমার মা আমি আমি.... ভীষণ ভয়, ভীষণ ভয়.... আমি তো রাজনীতি করি না, আমি বেঁচে থাকতে চাই— তাই আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে— আর আমি নিশ্চুপ নির্বাক। ঐ ভিয়েৎনামী বৃদ্ধাও যখন.... যখন মৃত্যুর দোলনায়.... তখনও কি— তখনও কি আমার মতন....

[লাইট নিভে যায়। আবছা আলো। কয়েকজন ভিয়েৎনামী মুক্তিযোদ্ধা প্ল্যান করছে]

১ম মুক্তিযোদ্ধা ঃ তিনমাইল জুড়ে যদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আমাদের ফোর্সটাকে রাখা যায়, তাহলে আমেরিকান মিলিটারি কনভয় যদি এই রুটে আসে— তবে সহজেই তাকে এ্যামবুশ করা যাবে।

নগুয়েন বিন ঃ কিন্তু তারপরই বেস ক্যাম্পে রিট্রিট করতে হবে। কারণ এত বড় মিলিটারি কনভয়কে শেষ করার পর ব্যাপক তল্লাসি শুরু হবে।

২য় মুক্তিযোদ্ধা ঃ তল্লাসি! মার্কিন অভিধানে তল্লাশির অর্থ— হত্যা লুণ্ঠন আর ধর্ষণ।

১ম মুক্তিযোদ্ধা ঃ শোধ, প্রতিশোধ নেবো প্রতি পদে পদে।

ন্‌গুয়েন বিন ঃ কাল মা'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। ওখানেও এক অবস্থা। প্রতিদিন যাকে-তাকে টর্চার ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে ভিয়েতকং সন্দেহে। আর অত্যাচার? বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকে বেয়নেট দিয়ে গেঁথে দিচ্ছে— যুবতী মেয়েদের গোপন অঙ্গে পুরে দিচ্ছে টকটকে লাল লোহার গরম শিক। বুড়োদের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে—

২য় মুক্তিযোদ্ধা ঃ মারবো, আমরাও মারবো। এক এক ক'রে মারবো। কোনো মোহ নয়, ক্ষমা নয়, করুণা নয়, আমাদেরও পাল্টা নৃশংস হ'তে হবে।

১ম মুক্তিযোদ্ধা ঃ পারবে না, হাজার চেষ্টা ক'রেও নৃশংসতায় ওদের হারাতে পারবে না।

ন্‌গুয়েন বিন ঃ ঠিক বলেছো কমরেড। আমরা লড়ছি মানবতার জন্যে, সভ্যতার জন্যে। চেষ্টা করলেও ওদের মতো জানোয়ার হ'তে পারবো না।

নেপথ্যে ঃ কমরেড বিন, কমরেড ন্‌গুয়েন বিন!

[তৃতীয় মুক্তিযোদ্ধার প্রবেশ]

৩য় মুক্তিযোদ্ধা ঃ আপনার মাকে ওরা খুন করেছে কমরেড।

ন্‌গুয়েন বিন ঃ (স্তম্ভিত) কাকে? আমার মাকে?

৩য় মুক্তিযোদ্ধা ঃ হ্যাঁ কমরেড। আপনি কাল ফিরে আসার পর আজকে ওরা আপনার মাকে এ্যারেস্ট ক'রে টর্চার ক্যাম্পে নিয়ে আসে। অসমসাহসিনী বীর জননী আপনার— প্রবল ঘৃণায় সহ্য করেছেন কুত্তাদের হাজার অত্যাচার। তারপর তাঁকে গুলি ক'রে মেরে কুপিয়ে কুপিয়ে মৃত শরীরকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে, গাছে টাঙিয়ে রেখেছে অন্যান্যদের শিক্ষার জন্যে।

ন্‌গুয়েন বিন ঃ মা! আমার মা!

২য় মুক্তিযোদ্ধা ঃ ক্ষমা নয়, করুণা নয়, দয়া নয়। মারো, মারো শুয়োরের বাচ্চা বিদেশী রক্তচোষা শকুনদের। খতম করো ওদের পদলেহী বেইমান কুকুরদের।

৩য় মুক্তিযোদ্ধা ঃ জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের আঞ্চলিক কমিটি এই সংবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে— আজ রাত্রেই স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট আক্রমণ করা হবে। প্রতিশোধ নেওয়া হবে কমরেড বিনের বীরমাতার হত্যার।

১ম মুক্তিযোদ্ধা ঃ শোক নয়, কান্না নয়, কমরেড বিন! বুকের ভেতর প্রতিহিংসার বাজাও উন্মত্ত দামামা। শ্রেণীক্রোধে শানিয়ে নাও হাতিয়ার। (ন্‌গুয়েন বিন মাথার ওপরে রাইফেল তুলে ধ'রে চিৎকার ক'রে ওঠে)

ন্‌গুয়েন বিন ঃ শুনে রাখো দুনিয়ার মানুষ, যতদিন এই দেশের মাটিতে একটাও মার্কিন সৈন্য থাকবে, ততদিন আমাদের হাতের রাইফেল বিশ্রাম নেবে না। যতদিন— যতদিন একজনও ভিয়েৎনামী বেঁচে থাকবে, ততদিন মুক্তির যুদ্ধ, স্বাধীনতার সংগ্রাম, আজাদীর লড়াই চলতেই থাকবে।

[অন্ধকার। আবার আলো জ্বলবে। শান্তিপ্রিয় মঞ্চে একা]

শান্তি ঃ এই দেখুন মশাইরা— আরেকটা ছবিও টাঙানো রয়েছে ঐ সন্ত্রস্ত বৃদ্ধার পাশেই। এতক্ষণ এটা আমরা দেখিনি। ঐ যে দেখুন, রাইফেল হাতে তুলে ঐ বলিষ্ঠ যুবক! কী আশ্চর্য ব্যাপার, সব আজেবাজে বকছি! আমি শান্তিপ্রিয় মুখুজ্জে— দুশো তিরিশ টাকার কনিষ্ঠ কেরাণী— ঘাড়ে আমার ন'জন প্রাণী— ঠিকমতো প্রেম করার সাহসও যার নেই— রমার নিত্যিদিনের অভিযোগ যাকে শুনতে হয় আমি না-কি ভীরু কাপুরুষ, আমি সেই শান্তিপ্রিয় মুখুজ্জে, বাড়ির সামনে রক্তের ছাপ দেখেও নিশ্চিন্তে রাত্রিতে ঘুমোই— মশাই, প্রেমিকার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে এই এস্‌প্ল্যানেডে বাসগুমটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এ কী ঘোড়া-রোগে ধরলো! বিশ্বাস করুন মশাইরা, আমি কস্মিনকালেও রাজনীতি করিনি। আমি শুধু— বুঝলেন স্যার, কোনোক্রমে খেয়ে-প'রে পৃথিবীর লাস্ট বেঞ্চে ব'সে সবার অলক্ষ্যে উপেক্ষিত জীবন কাটাতে চেয়েছি— আর চেয়েছি একটা গৃহস্থ প্রেম। বিশ্বাস করুন, ভদ্রমহোদয়গণ— ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার কোনো ইচ্ছা আমার কোনোকালে ছিল না।

[নেপথ্যে ভিয়েৎনাম সংক্রান্ত মিছিলের স্লোগান দ্রুতলয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে শোনা যায়]

এই— এই দেখুন মশাই— আবার মিছিল যাচ্ছে! আজ্ঞে না মশাই, আমি মিছিলে যাবো না। আমি কোনোদিন কোনো মিছিলে যাই না, আমার অফিসের মিছিলেও না। এই মিছিল আবার বাস-ট্রাম বন্ধ ক'রে দেবে না-কি! আরে রমাই তো এলো না! আড়াইটে বেজে গেছে— পৌনে তিনটে বাজতে চললো। শালা ক'দ্দিন বাদে সিনেমা দেখবো ভাবছিলাম,

তাও হলো না। রমাও নিশ্চয়ই আটকে পড়বে। আহা, মেয়েটা ক'দ্দিন ধ'রে ঝুলে রয়েছে আমার জন্যে! ওকে আজ একটা সিনেমাও দেখাতে পারবো না? ধ্যুৎতেরি! মিছিলের নিকুচি করেছে। এই মিছিলেই যদি শিকে ছিঁড়তো তবে আমার রজত কি জেলে পচে, অসীম কি খুন হয়, আমার মা'র কপাল কেটে রক্ত বেরোয়— এই— এই রমা— এই যে এদিকে। উঃ, ওদের চিৎকারের চোটে শুনতেও পাচ্ছে না। এই— এই রমা— প্রায় দুটো থেকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমার জন্যে। রমা, ওদিকের রাস্তাটা ক্রশ ক'রে এসো, এই তো এদিকে আমি— এখনও গেলে মেট্রোতে টিকিট পাবো অন্তত ইভনিং শোয়েরও। এই যে মশাই সরুন না! এদিকে এদিকে রমা—

[রমার প্রবেশ]

রমা ঃ কতক্ষণ?

শান্তি ঃ এই তো এলাম। মাত্র তিরিশ মিনিট।

রমা ঃ রাগ করেছো!

শান্তি ঃ মোটেই না। রাগ করা আমার স্বভাবই নয়।

রমা ঃ (হেসে) তুমি একটু রাগো না গো, রাগলে তোমায় ভারী সুন্দর দেখায়।

শান্তি ঃ আজ তো শনিবার! আজ তো আর বড়বাবুর চোখে ধুলো দিয়ে অফিস পালাতে হয়নি। দেরি করলে কেন?

রমা ঃ বিজন এসেছিল। ওর সঙ্গে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম।

শান্তি ঃ কে বিজন? রজতের বন্ধু!

রমা ঃ হ্যাঁ।

শান্তি ঃ ওদের সঙ্গে তুমি এখনও মেশো! এখনও সেই পলিটিক্সের ছাইভস্ম তোমার মাথায় ঢুকে আছে?

রমা ঃ এই যে বললে তুমি রাগো না।

শন্তি ঃ ঠাট্টা নয়—। তোমাকে না বারবার বলেছি— আজকে রাজনীতিটিতি খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ওসবের মধ্যে আমাদের মতো লোকের মাথা গলিয়ে কী লাভ? তাও আবার রজতের রাজনীতি। ফর নাথিং শুধু ব্লাডশেড।

রমা ঃ বাব্‌বা, দেখা হ'তে না হ'তেই বকতে শুরু ক'রে দিয়েছো।

শান্তি ঃ বকলুম কখন? শুধু সাবধান ক'রে দিচ্ছি মাত্র।

রমা ঃ আমি জানি। আর আমি তো ওদের সঙ্গে এ্যাক্‌টিভলি কিছুই

করছি না। দিদি দিদি ব'লে আসে, দু'একটা কাজটাজ ক'রে দিই মাত্র।

শান্তি ঃ হ্যাঁ! এর বেশি একদম মাখামাখি করবে না।

রমা ঃ আজকে আমাদের পাড়ার তিনটে ছেলেকে মেরে ফেলেছে, জানো?

শান্তি ঃ জানি। তুমি শুনলে কী ক'রে? তুমি তো আগেই বেরিয়ে এসেছো—

রমা ঃ বিজন বললো।

শান্তি ঃ ও! (নীরবতা) সিনেমায় যাবে তো চলো।

রমা ঃ না। সিনেমায় নয়। আজকে তোমার সঙ্গে কোথাও ব'সে গল্প করবো। বাব্‌বা প্রায় তিন সপ্তাহ দেখাই পাইনি একদম।

শান্তি ঃ চলো, তবে ইডেনের দিকে যাওয়া যাক।

রমা ঃ চলো। (হঠাৎ ভীত চোখে) এই— তুমি স'রে দাঁড়াও তো! শিগ্‌গির!

শান্তি ঃ (বিস্মিত) কেন! স'রে দাঁড়াবো কেন!

রমা ঃ আঃ, যা বলছি করো না! নয়তো বিপদে পড়বে।

[দু'জন কনস্টেবল সহ পুলিশ অফিসারের প্রবেশ]

পু. অ. ঃ এই যে রমা দেবী অনেকক্ষণ পেছনে পেছনে ঘুরে তবে— আহা হা— নড়বেন না। একদম নয়, আমার রিভলবার থেকে গুলি ছুটে যেতে পারে।

রমা ঃ কী বলছেন আপনি?

পু. অ. ঃ বিজনবাবু যে রিভলভারটা আপনাকে পাচার করার জন্য দিয়ে সট্‌কে পড়েছেন, সেটা কোথায়? ঐ ভ্যানিটি ব্যাগে?

রমা ঃ জানি না! ইতর! অভদ্র!

পু. অ. ঃ আহা হা মুখ খারাপ করবেন না মা লক্ষ্মী! পুলিশের কাজ ক'রে ক'রে জিভটা আমাদের গঙ্গা জলে ধোয়া, পালটা খিস্তি আমরাও মারতে পারি।

রমা ঃ ছেড়ে দিন আমায়। যেতে দিন।

পু. অ. ঃ দেবো বৈকি মা, ছেড়ে দেবো। একেবারে পাঠান সেপাই ছেড়ে দেবো তোমার ওপর মা। আগে থানায় চলো। এই মশাইরা, ভিড় হটান তো, কী দেখছেন! মেয়ে ডাকু, মেয়ে ডাকাত। যান ভাগুন।

রমা ঃ যেতে দিন আমায়!

পু. অ. ঃ সে-ই হাত লাগাতে বাধ্য করলেন? ধর্‌ চেপে।

(কনস্টেবল দু'জন চেপে ধরে, রমা আর্তনাদ ক'রে ওঠে) —টেনে নিয়ে চল্ মাগীকে। (যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে শান্তিপ্রিয়কে দেখিয়ে) এই লোকটা কি আপনার সঙ্গেই ছিল রমা দেবী?

রমা : না।

পু. অ. : হুঁ। আপনার নাম কী মশাই?

শান্তি : আ-আমার নাম! আমার নাম হলো গিয়ে বি-বিকাশ মজুমদার।

পু. অ. : অ! নিয়ে চল্ মেয়েটাকে। আপনি কেটে পড়ুন মশাই।

শান্তি : অ্যাঁ! হ্যাঁ যাই, চ'লে যাই— যত গিয়ে ইয়ে সব— মানে উট্‌কো যত ঝামেলা—

পু. অ. : রিভলভারটা কি রজতের— রমা দেবী?

[কনস্টেবল দু'জন হিঁচড়ে টানতে থাকে রমাকে। রমার বুক ফাটা আর্ত চিৎকার। আলো নিভে যায়। আবছা অন্ধকার। রমা ভয়ে পেছুতে থাকে। পুলিশ অফিসার টলতে টানতে এগোয় ওর দিকে—] এখনও বল রমা— বিজন, প্রকাশ, অশোক কোথায়? বল, কিচ্ছু করবো না। নয়তো তোমার ঐ ন্যাকাপনা সতীত্বের গুমোর দু'হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো। বল্ শালী— (চুলের মুঠি ধরে)

রমা : আপনার মা বোন নেই!

পু. অ. : চুপ কর্ শালী! জ্ঞান দিসনে। এখনও বল্। বলবি না? বলবি না তুই?

রমা : জানি না। বলেছি তো জানি না।

পু. অ. : দ্যাখ্ তবে!

[রমার অস্পষ্ট চিৎকার ও তার সন্ত্রস্ত রক্তাক্ত মুখের ক্লোজ-আপ। আলো নিভেই জ্ব'লে উঠলো। মঞ্চে একা শান্তিপ্রিয়]

শান্তি : দেখুন— একবার দেখুন না, ঐ বড় ক'রে আঁকা ভিয়েৎনামের ধর্ষিতা রমণীর ছবি নয়, আমার মা'র ছবি নয়, রমার ছবি নয়, নয় ঐ বলিষ্ঠ যুবকের রাইফেল হাতে প্রতিরোধের ছবি, দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ ভদ্রমহিলাগণ— আমাকে দেখুন, আমার হাতে রাইফেল নেই— বিশ্বাস করুন আমার পা কাঁপছে। হ্যাঁ স্যার, ভয় দেখালে আমি ভয় পাই। সত্যি বলছি আমি রাজনীতি করি না, ছাপোষা মানুষ, আপনি আমার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিন, আমি কাউকে বলবো না।

আমায়— আমায় শুধু টিকে থাকতে দিন মশাইরা। বিশ্বাস করুন আমার হাতে রাইফেল নেই— বিশ্বাস করুন ঐ ভিয়েৎনামের ছবি দুটো আমার ওপর কিছুই effect করেনি। আপনারা আমার প্রেম থেঁতলে রক্ত বার ক'রে দিয়েছেন— আমি মুখ ঢেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি হে মহামানবেরা। আপনারা বিশ্বাস করুন— আমি রাইফেল হাতে ভিয়েৎনাম হয়ে যাইনি। আমায় শুধু বেঁচে থাকতে দিন। ও কী! আপনারা এগিয়ে আসছেন কেন? আমায় ঘিরে ফেলছেন কেন হে মহাপুরুষরা? আমি রাজনীতি করি না স্যার। আমি দুশো তিরিশ টাকার কেরাণী, আমার ভাই জেলে গেলেও মুখ ফুটে বলিনি কিছু— মা'র রক্ত দেখে শুধু ভয় পেয়েছি, আর রমার ধর্ষিত শরীরের নিচে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে দিয়েছি— তবু মুখে চাবিটি এঁটেছি। তাও আপনারা এমন নিষ্করুণ কেন? বিশ্বাস করুন স্যার, আমি ভোট দিই প্রতি বছর! আপনারা আমায় ঘিরে ফেলবেন না এমন ক'রে। আমার ভয় করছে।

[ক্রমশ আবছা অন্ধকার]

আমি কোনোদিন বলিনি স্যার— আমি এই অবস্থায় অসুখী। আর এগুবেন না মহারাজাধিরাজরা। আমি সব মুখ বুজে মেনে নিতে জানি! দোহাই আপনাদের। বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন মহাশয়েরা, ইন্দোনেশিয়ার ভয় দেখালে আমি সত্যিই চমকে উঠি। আপনাদের পায়ে পড়ি, হে সম্রাজ্ঞী, ঈশ্বরী, সুদর্শনি ক্লিওপেট্রা— এবারের মতো রক্ষা করুন আমায়। একটিবারের মতো, একটি বার শুধু বিশ্বাস করুন, আমি ভিয়েৎনাম নই ভিয়েতংনাম নই- — আমি ভারতবর্ষ— ভারতবর্ষ।

[শান্তিপ্রিয়র সন্ত্রস্ত ক্লোজ-আপ]

—ঃ পর্দা ঃ—

নিবেদন ঃ এই নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিষড়ার 'সংলাপ' 'বিশ্বাস করুন, আমি রাজনীতি করিনা' নামে গণনাতীত অভিনয় করে। নির্দেশনা ও মুখ্য চরিত্রের অভিনয়ে ছিলেন অকাল প্রয়াত ভূদেব চক্রবর্তী। নাটকটি তাই ভূদেবের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম।— অ. রা।

ট্রিলজি—১

একাঙ্ক

লাসবিপণি

চরিত্র ঃ ঘোষক, পতিতুণ্ড (অভিনেতা), গাইড, শিব মুখুজ্জে, দারোগা, জনৈক, আরেকজন, অন্য আরেকজন, রমজান, হারাণ, শ্রমিক, নেতাবাবু, ছেলে (সুমিত), মাস্টারমশাই, বাবা, হকার

[নাটক শুরু হবার আগে নেপথ্য আবহে হিন্দি ফিল্মের কোনো বহুল প্রচারিত গানের মাঝে মাঝে মাইকের কর্কশ ঘড়ঘড়ানি সহ অদ্ভুত ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠস্বর শোনা যাবে— "হ্যালো মাইক টেস্টিং হ্যালো— বিশাল মৃতদেহ প্রদর্শনী— উদ্যোক্তা— লাসবিপণি— আসুন, দেখুন, পরখ করুন, ক্রেতাদের সুবর্ণ সুযোগ, লট-লট-লট, বিশেষ রিবেট, আমাদের প্রদর্শনী এখনই শুরু হচ্ছে— আসুন, দেখুন, মাল চিনে নিন, খাঁটি আগমার্কা মাল, সেন্টপারসেন্ট গ্যারান্টি-প্রদত্ত খাঁটি মৃতদেহ প্রদর্শনী— উদ্যোক্তা— লাসবিপণি— উদ্যোক্তা— ভারত সরকারের জাতীয়কৃত লাসবিপণি, হেড-অফিস— লালবাজার, গুদাম— বড়বাজার—, আসুন দেখুন— ইন্দুমাসীর আয়োজনে আন্তর্জাতিক মৃতদেহ প্রদর্শনী।" পর্দা খুললো। মঞ্চের এককোণে মাউথপিস নিয়ে ঘোষক]

ঘোষক ঃ এবার প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। তার আগে আমাদের এই বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পর্কে বলবেন পরম শ্রদ্ধেয়, পরমহংস শ্রীপাতিরাম পতিতুণ্ড, যিনি অসীম ত্যাগ স্বীকার ক'রে এই লাসবিপণি নামক দেশ-বিদেশে বিখ্যাত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে তুলেছেন— জাতীয়করণ করার আগে যিনি ছিলেন লাসবিপণির মালিক, এবং এই সমাজতান্ত্রিক দেশের নতুন আইনে জাতীয়কৃত এই লাসবিপণির ম্যানেজিং ডিরেক্টর— শ্রীপাতিরাম পতিতুণ্ড।

[বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে শ্রীপাতিরামের প্রবেশ, সঙ্গে গাইড। পাতিরাম মেদবহুল, ফর্সা। অল্প পরিশ্রমেই বেশ ঘেমে ওঠেন। গাইডের বুদ্ধিজীবী সুলভ বেশভূষা।]

পতিতুণ্ড ঃ (মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে) আমার নাম শ্রীশ্রীপাতিরাম পতিতুণ্ড। আমি গণতন্ত্র নামক বস্তুটার ছিঁড়েছি মুণ্ডু! আগে আমি ছিলাম লাসবিপণির মালিক। এখন নতুন সমাজতান্ত্রিক আইনে লাস জাতীয়কৃত হবার পর আমি এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিক্‌টেটার— (হঠাৎ বলা থামিয়ে) মাইক ঠিক আছে?

গাইড ঃ হ্যাঁ স্যার।

পতিতুণ্ড ঃ তুমি তো হ্যাঁ ব'লেই খালাস। বক্তৃতার মাঝখানে কেলো হবে না তো?

গাইড ঃ আজ্ঞে?

পতিতুণ্ড ঃ লোডশেডিং, লোডশেডিং। গতবারের কথা মনে আছে? সেই যে আমি একটা সরকারী ডেয়ারীর উদ্বোধন করতে গিয়ে বলতে শুরু করেছিলাম— আমাদের দেশের এই দুর্দিনে আমাদের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই একেকটি গরুর বাচ্চা—

ঘোষক ঃ (চেঁচিয়ে) লোডশেডিং।

পতিতুণ্ড ঃ হ্যাঁ। কারেন্ট ফেল। সুতরাং বক্তৃতাও এখানে বন্ধ।

গাইড ঃ সুতরাং পরদিন খবরের কাগজে বেরুলো— শ্রীপাতিরাম পতিতুণ্ড বলেছেন আমাদের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই একেকটি গরুর বাচ্চা!

পতিতুণ্ড ঃ উঃ। ঐ রিপোর্ট বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে কী ঝামেলাতেই না পড়তে হলো— সবাই খ'চে ফায়ার, এই জেলে পোরে তো সেই জেলে পোরে, মানহানির মামলা শুরু হয় হয়, রাজধানীতে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক, পার্লামেন্টে সোরগোল, প্রধানমন্ত্রীর জোর তলব, ইত্যাদি ইত্যাদি— আমি শালা কাউকেও বোঝাতে পারি না যে ঐ সময়ে কারেন্টটি ফেল না হ'লে— মানে আমি যা বলতে চেয়েছিলাম— জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ দেশের এই দুর্দিনে প্রত্যেকেই একেকটি গরুর বাচ্চা পুষলে— অর্থাৎ কি-না ঘরে ঘরে ডেয়ারী চালু করলে—

গাইড ঃ দুধের বন্যায় সমাজতন্ত্রের মড়া ভেসে ভেসে আসবে।

পতিতুণ্ড ঃ ঠিক তাই। তা নয়, শালা ঐ সময়েই কারেন্টটি ফেল হয়ে গিয়ে কী গ্যাঁড়াকলেই না পড়া গেল—

ঘোষক ঃ এবার আর তা হবে না স্যার। জেনারেটার এনে রেখেছি।

কারেন্ট ফেল, জেনারেটার ফিট!

পতিতুণ্ড ঃ তাহলে আমিও এবার পাবলিককে টিট করি?

ঘোষক ঃ হ্যাঁ স্যার। সবাই অপেক্ষা করছেন। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আজকের এই প্রদর্শনীতে লোকজন এসেছেন।

পতিতুণ্ড ঃ তাহলে বেশ একটা জব্বর— মানে জোরালো ইকিপচ, দেওয়া দরকার— কী বলো?

গাইড ঃ হ্যাঁ স্যার, সামনেই ইলেকশন—

পতিতুণ্ড ঃ ইলেকসন? এখন আবার ইলেকশন কোথায় হে?

গাইড ঃ ভাববেন না স্যার, গতবার টিকিট পাননি ব'লে বড় দুঃখ পেয়েছেন, এবার ঐ জন্যেই আবার গণেশ উল্টোবে শিগ্‌গির— আফটার অল, সবাইকে চান্স দেওয়া চাই তো— না হ'লে সমাজতন্ত্রই টিকবে না—

পতিতুণ্ড ঃ গাইড— তুমি আমার মনের কথাটা একেবারে ফাঁস ক'রে দিয়েছো হে! ইস, গতবার কী চান্সটাই মিস করেছি— সব শালা গুছিয়ে নিলে মাইরি। আমি তো ভাবছিলাম— বামপন্থী হয়ে যাবো নিদেনপক্ষে বিক্ষুব্ধ। যাকগে, এবার তাহলে আরম্ভ করি—

ঘোষক ঃ করুন।

পতিতুণ্ড ঃ বিদেশী এসেছে বলছিলে না?

গাইড ঃ হ্যাঁ স্যার। অনেক সাহেব-মেম।

পতিতুণ্ড ঃ অ্যাঁ মেম? মেমও আছে মাইরি— সত্যি বলছো? মানে আসল মেম? শ্বেতাঙ্গিনী!

গাইড ঃ হ্যাঁ স্যার! একেবারে স্কার্ট-ফ্রক পরা—

পতিতুণ্ড ঃ আহা! শ্বেতাঙ্গিনী যদি অর্ধাঙ্গিনী হয় রে!

গাইড ঃ (জনান্তিকে) একটু ধৈর্য ধরবেন মহাশয়রা, আমার স্যারের আবার একটু ম-এর দোষ আছে!

পতিতুণ্ড ঃ মেমেরা এসেছেন যখন— তখন ইংরাজিতেই বলি, কী বলো?

গাইড ঃ বলুন। (হঠাৎ) না না স্যার— ও কাজটি করবেন না।

পতিতুণ্ড ঃ আঃ! বেশ ফোলো এসেছে, বাধা দিও না। ডিয়ার ফ্রেণ্ডস্ অ্যাণ্ড মেমস্—

গাইড ঃ মেমস্ নয় স্যার— ম্যাডামস্।

পতিতুণ্ড ঃ একই হলো। হিয়ার ইজ এ— হিয়ার ইজ এ— হিয়ার এ কম্পিটিশন—

গাইড : কম্পিটিশন নয় স্যার, এক্সিবিশন!

পতিতুণ্ড : কম্পিটিশন অফ মৃতদেহস্—

গাইড : স্যার বাংলায় বলুন—

পতিতুণ্ড : আঃ! কেন ঝামেলা পাকাচ্ছো শালা— বলছি না এমোশন এসেছে— ইয়ে মানে হলো কী— আওয়ার গভর্ণমেন্ট ইজ এ বিজনেসম্যান— মানে ব্যবসা করছে— মৃতদেহস্ ব্যবসা— ডু ইউ ফলো ডিয়ার মেমস্—

গাইড : ম্যাডামস্।

পতিতুণ্ড : একই হলো। নাও এ ভেরি ইয়ে হয়েছে— সো ইট ইজ আওয়ার ডিউটি যে আপনাদের—

ঘোষক : দোহাই স্যার বাংলায় বলুন—

পতিতুণ্ড : বাংলায় বলবো কেন? আমি কি ইংরাজি জানি না? ইস্কুলে কত— বি এল এ ব্ল্যা, সি এল এ ক্ল্যা পড়েছি জানো? আসলে ডিয়ার মেমস্, গণ্ডগোল ইজ দ্যাট যে ইফ ইয়ে ইজ হ্যাপেন, তবে ইয়ে হয়— কী হয়?

গাইড : স্যার অনুবাদের ব্যবস্থা আছে—

পতিতুণ্ড : ইট ইজ নেভার এ ম্যান ইজ মৃতস্— মানে হলো—

ঘোষক : স্যার।

পতিতুণ্ড : সব গুলিয়ে দিলি শালা! —বেশ একটা ইয়ে এসেছিল—

গাইড : স্যার— আপনি বাংলাতেই বলুন, ইংরাজিতে ট্রানস্লেশন ক'রে দেবে—

পতিতুণ্ড : কেন? তোমাদের কষ্ট কম হতো—

গাইড : স্যার— আপনার বাংলা থেকে তবু কষ্টেসৃষ্টে ইংরাজিতে ট্রানস্লেশন চলতে পারে, কিন্তু আপনার ইংরাজি থেকে ট্রানস্লেশন করতে হ'লে—

পতিতুণ্ড : কেন? আমি কি ইংরাজি জানি না?

গাইড : (ভয়ে) না স্যার, মানে খুব স্টিফ ইংরিজি তো, শক্ত ইংরিজি কি-না—

ঘোষক : একেবারে শেক্সপীয়ারের ঠাকুর্দার আমলের কি-না—

পতিতুণ্ড : শক্ত মানে সলিড ইংলিশ? ঠিক আছে তোমাদের জন্য তাহলে সহজ ক'রে লিকুইড ইংলিশই ছাড়ছি। আসলে পড়াশোনা করোনি তো, আজকাল তো ইস্কুল-কলেজে মাস্টারগুলো শেখায়ই না— সব শালা মাইনে বাড়ানোর

জন্য আন্দোলন করে। ঐ জন্যেই সলিড লিকুইড কোনো ইংলিশই বোঝো না।

ঘোষক : বাংলাতেই শুরু করুন স্যার!

পতিতুণ্ড : (গলা খাঁকারি দিয়ে) বন্ধুগণ— দীর্ঘদিন ধ'রে আমাদের দেশ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা শোষিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের মেহনতী মানুষের রক্ত চুষে চুষে খেয়েছে— ওয়াজ কিস্‌ড এ্যাণ্ড কিস্‌ড্ দা ব্লাড—

গাইড : স্যার—

পতিতুণ্ড : আঃ আবার কী হলো! এখন তো বাংলাতেই ইস্পিচ দিচ্ছি।

গাইড : সর্বনাশ করেছেন স্যার! সাম্রাজ্যবাদ বলতে শুরু করেছেন স্যার— একেবারে কমিউনিস্ট বাঞ্চোৎদের ময়দানী বক্তৃতা হয়ে যাচ্ছে স্যার।

পতিতুণ্ড : তুমি একটি আস্তো গেঁড়ে! জানো না হাওয়া পাল্টেছে? আজকাল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদেরও ভাষণ দিতে হয়— হুঙ্কার ছাড়তে হয়—

গাইড : বুঝেছি স্যার! আগের অভ্যেস তো! মানে আগে যেমন আমরা ঐ লালমুখোদের বলতাম— ভুলে গেছে বাপের নাম, ওরা বলে ভিয়েৎনাম!

পতিতুণ্ড : আর আজকে আমরাই বলি— আমার নাম, মামার নাম ভিয়েৎনাম, ভিয়েৎনাম। —অভ্যেস পাল্টাও, অভ্যেস পাল্টাও। এখন লয়া যুগ, বুঝলে— গাড়লচন্দ্র, এখন ক'ষে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ আর সমাজবাদ আমাদেরও মুখস্থ রাখতে হবে! —হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম—

ঘোষক : ঐ যে স্যার সাম্রাজ্যবাদ—

পতিতুণ্ড : হ্যাঁ বন্ধুগণ— তাই সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশকে আক্রমণ করার জন্যে, রুশ আর চীনা সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা আমাদের পবিত্র সীমান্তে বারবার হানা দিচ্ছে—

গাইড : ইস্টপ, ইস্টপ!

পতিতুণ্ড : আবার কী হলো?

গাইড : অভ্যেস পাল্টান, অভ্যেস পাল্টান! রুশ দেশ আমাদের বন্ধু—

পতিতুণ্ড : ও! রুশ আমাদের হালে বন্ধু হয়েছে— না? ভুলেই গিয়েছিলাম— রুশ নয়, চীন! হ্যাঁ বন্ধুগণ উত্তর সীমান্তে চীন এবং পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানী দস্যুরা ওঁৎ পেতে আছে—

গাইড : ইস্টপ, ইস্টপ! আবার একই গোল বাঁধাচ্ছেন!

পতিতুণ্ড : (স্ত্রীসুলভ অভিমানে) না ভাই বারবার বাধা দিলে বলবোই না—

গাইড : পূর্ব সীমান্তে এখন পাকিস্তান নয়, বাংলাদেশ! দস্যু নয়, বন্ধু! বড় বেফাঁস বলেছেন!

পতিতুণ্ড : ভুল হয়ে গেছে। গাইড, এতদিন ধ'রে শালা ডিকশনারী দেখে কাঁচা কাঁচা খিস্তিগুলো শিখেছিলাম— রুশ-চীন-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কিস্তি কিস্তিতে ছাড়বো ব'লে—

গাইড : এখন সেগুলো আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করুন—-

পতিতুণ্ড : এই রে! তাই হয় না-কি! এ্যাদ্দিন যাকে বাপ বললাম—

গাইড : এখন বাবা বদল হয়েছেন। বলুন সি.আই.— এ.!

পতিতুণ্ড : অ্যাঁ?

গাইড : নতুন যুগে সমাজবাদের পরতে হবে নতুন বেশ, কায়দাগুলো বদলে ফ্যালো, পাল্টে ফ্যালো অব্‌ভেস।
লোকে কেন পায় না খেতে, আগে বলতে— চীন!
এসব শুনে স্যামু চাচা ছাড়তো অনেক ঋণ!
মেঘগুলো সব ডাকছে কেন, কেন এমন খরা?
জবাব ছিল সহজ অতি, চীনই অমনতরা!
এসব ব'লে স্যামুচাচার চাটতে গিয়ে পা—
দিন বদলের দিনগুলোতে ওসব ভুলে যা!

পতিতুণ্ড : তবে এখন?

ঘোষক ও গাইড: এখন— রুশের সঙ্গে চুক্তি, দুই শেয়ালের যুক্তি
উঠবে যেথায় বিরোধিতার ঝাণ্ডা।
সমাজবাদের মুখোশ এঁটে, সাম্যবাদের বাটনা বেঁটে
লাগাও জোরে প্রগতিশীল ডাণ্ডা।।

পতিতুণ্ড : (সুর ক'রে) বলদ কেন বাচ্চা বিয়োয়, বোবা বনে গাইয়ে, জেনে রেখো এর পেছনে কাজ করে সি.আই.এ.। —
না হে অতটা চটালে চলবে না! কে জানে আবার কোনোদিন কোনো অশুভ সন্ধ্যায় রুশবাবু ছেড়ে আবার পুরোনো খদ্দেরকে ঘরে ঢুকতে দিতে হবে। জানিস সই আমার না বড় জ্বালা, রোজ রাতে বাবু বদল হয়, যেমন পাল্টায় স্লোগান। —আজ আমেরিকা বন্ধু, রুশ শত্রু, কাল রুশ বন্ধু, চীন শত্রু, পরশু—

ঘোষক : চীন বন্ধু, রুশ শত্রু!

পতিতুণ্ড : না হে! চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব কী ক'রে হয়? ব্যাটারা হেভি

খচ্‌রা, কিছুতেই শালাদের চিঁড়ে ভেজে না—

গাইড : তবে চীনের বিরুদ্ধেই বলুন স্যার! আমেরিকার বিরুদ্ধে বলতে হবে না, আফটার অল এ্যাদ্দিন যাকে বাপ বলেছি—

পতিতুণ্ড : তাকে এখন শালা বলতে বুকে ব্যথা লাগে গাইড। হ্যাঁ— কী যেন বলছিলাম— চীনা সাম্রাজ্যবাদ হাজার হাজার বছর ধ'রে এই দেশকে শোষণ করেছে—

গাইড : এ কী বলছেন— চীন আবার কবে আমাদের শোষণ করলো?

পতিতুণ্ড : চীন এখনও ক'রে উঠতে পারেনি বুঝি? অ! তবে অন্য অনেকে করেছে— আমাদের দেশ থেকে কাঁচামাল লুট ক'রে নিয়ে গিয়ে বিদেশে জিনিস তৈরি ক'রে সেই মাল চড়া দামে আমাদেরই বাজারে বিক্রি করতো আমেরিকা— (হঠাৎ মুখ চেপে) না না, আমেরিকা আবার এসব কবে করলো— অন্য, অন্য সব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো। এখনও যে করে না, তা নয়। তবে সম্প্রতি আমাদের মহান বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অর্থনৈতিক ফাঁস ছিঁড়ে আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং স্বাবলম্বী স্বয়ম্ভর জাতীয় অর্থনীতি গ'ড়ে তুলছে। তারই প্রমাণ— রপ্তানী বাণিজ্যে আমাদের আয় গত একাত্তর থেকে তিয়াত্তরে প্রায় সাড়ে সতেরো গুণ বেড়েছে! হাঃ হাঃ! (অনুমোদনের আশায় গাইড ও ঘোষকের দিকে তাকায়। তারা তখন গল্প করছে) সানাইয়ের পোঁ— মিলছে না কেন?

গাইড ও ঘোষকঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

পতিতুণ্ড : কেমন বললুম!

গাইড : টপ! এবার ইলেকশনে সিওর একটা ইয়ে মারাবেন!

পতিতুণ্ড : টপ! এবার ইলেকশনে সিওর একটা ইয়ে মারাচ্ছি। (বক্তৃতার ভঙ্গিতে) মাননীয় অতিথিবৃন্দ, আপনারা জানেন— সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের দেশ যে লাভবান হয়েছে, তার একমাত্র কারণ মৃতদেহ— চালান ব্যবসা। হ্যাঁ বন্ধুগণ বিপুল পরিণামে—

গাইড : পরিমাণে—

পতিতুণ্ড : হ্যাঁ, বিপুল পরিণামে—

গাইড : ওটা পরিণাম নয় স্যার, পরিমাণ—

পতিতুণ্ড : তোমার পরিমাণ বড় খারাপ হে! হ্যাঁ বিপুল পরিণামে

দেশবিদেশে মৃতদেহ চালান দিয়ে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কারণ বর্তমান সুসভ্য জগতে মানুষের মৃতদেহ অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস!

ঘোষক : জ্যান্ত মানুষের থেকেও।

পতিতুণ্ড : ডাক্তারী ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে যেমন মৃতদেহের গায়ে ছুরি চালিয়ে জ্যান্ত শরীরে ছুরি চালানো প্র্যাক্‌টিস করতে হয় কিংবা কঙ্কাল দেখে জেনে নিতে হয় মানুষের শরীরে হাড়ের সংখ্যা কত, তেমনি মানুষের হাড় গুঁড়ো ক'রে অত্যান্ত সুফলা উর্বরা সার তৈরি হয়।

গাইড : এমন সার আমেরিকার মাটিতে ছড়ালে পি.এল. '৪৮০-র হাজার হাজার মণ গম উৎপন্ন হয়।

পতিতুণ্ড : অন্ধ লোকের দৃষ্টি ফেরাতে কিংবা হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল এমন লোককে সুস্থ করতে মৃতদেহের চোখ উপড়ে লাগানো বা ফুসফুস ছিঁড়েটিড়ে টুকটাক জুড়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রায়ই ঘটছে। আসলে জনতা, মৃতদেহ এমন একটা জিনিস, যার কিছুই যায় না ফেলা, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবই লাগে কাজে। —আর কী হয় যেন?

গাইড : আর কী হয় যেন?

পতিতুণ্ড : কী আতা! আমাকেই জিগ্যেস করছে! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে— সম্প্রতি আমেরিকান ছিপিদের জন্যে—

ঘোষক : ছিপি নয় স্যার, হিপি!

পতিতুণ্ড : ঐ ছিপিই হলো। অত যাদের বোতলের ওপর ঝোঁক—তারা ছিপিই। হ্যাঁ— আমেরিকান ছিপিদের জন্যে মরা মানুষের চামড়া দিয়ে হ্যারিসঙ্কীর্তনের খোলও তৈরি হচ্ছে এদেশে—

গাইড : কারণ আমাদের চামড়া অতীব পুরু, সহজে ফাঁসে না!

পতিতুণ্ড : সুতরাং দিনকে-দিন সারা দুনিয়া জুড়ে মৃতদেহের চাহিদা বাড়ছে। এযাবৎ মৃতদেহের আন্তর্জাতিক বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ভিয়েৎনাম নামে একটি দেশ থেকে সে হাজার হাজার মৃতদেহ কাঁচামাল হিসেবে এনে পেন্টাগনের কারখানায় ট্যান্‌ড ক'রে আন্তর্জাতিক মার্কেটে টুকটাক ছাড়তো। তবে এই সেদিন ভিয়েৎনামে হেরে যাবার ফলে তার ব্যবসায় কিছুটা ভাঁটা পড়েছে। আর আন্তর্জাতিক বাজারের এই শূন্যতার সুযোগ নিয়েছি আমরা, সুযোগসন্ধানীরা। রুশের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি

সম্পাদিত হবার পর মহান রুশবন্ধুদের উৎসাহে বেশি বেশি পরিণামে বিপুল বিপুল পরিণামে মৃতদেহ উৎপাদন ক'রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মৃতদেহের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্যের ওপর বলিষ্ঠ আঘাত হেনেছি।

ঘোষক ঃ (হাততালি দিয়ে) ফাস্টো কেলাস!

পতিতুণ্ড ঃ কেমন একোনোমেক্সের থিওরি দিলুম, বলো তো?

গাইড ঃ মাসিমার সেক্রেটারি লিখে দিয়েছে বুঝি?

পতিতুণ্ড ঃ চাপো চাপো, কেউ না জানে। —হ্যাঁ, মাসিমার সেক্রেটারি লিখে দিয়েছে। কাউকে বোলো না কেমন—(বক্তৃতা দিতে যায়)— কী যেন বলছিলাম, বন্ধুগণ—

গাইড ঃ (ঘোষককে তারস্বরে) তোমাকে আগেই বলেছিলাম মাসিমার সেক্রেটারি লিখে দিয়েছে—

পতিতুণ্ড ঃ কী বিভীষণ!— ও হ্যাঁ, বন্ধুগণ— মৃতদেহের বাজারে আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান মুনাফা দেখে ঈর্ষাকাতর অনেকে প্রচার করতে শুরু করেছে— আমরা না-কি জোচ্চুরি ক'রে এই ব্যবসায় লাভ করছি, আমরা না-কি মৃতদেহে ভেজাল দিচ্ছি অর্থাৎ আমরা যেসব মৃতদেহ চালান দিচ্ছি তা না-কি আদপেই মৃতদেহ নয়! এটা কেমন ইয়ার্কি বলুন দিকি! হ্যাঁ, আমরা একথা অস্বীকার করি না, আমাদের বাণিজ্য-জগতে ভেজাল একটি লাভজনক ব্যবসায়। আমরা চালে ভেজাল দিই, তেলে ভেজাল দিই, ওষুধে ভেজাল দিই, কাপড়ে ভেজাল দিই, সিমেন্টে ভেজাল দিই, শিক্ষায় ভেজাল দিই, ইতিহাসে ভেজাল দিই, চরিত্রে ভেজাল দিই, শাসনে ভেজাল দিই—

ঘোষক ঃ কিন্তু শোষণে নয়!

পতিতুণ্ড ঃ ঠিক তাই। আর মৃতদেহে নয়! কী ক'রে দেবো? আমাদের দেশ আধ্যাত্মিকতার দেশ, আমাদের ধর্মগুরুরা আত্মার অবিনশ্বরত্বের কথা বলেছেন, বলেছেন— তোমরা ইহলোকে ঝাড় খাও— তবে পরলোকে উর্বশী, রম্ভা, মেনকাদের নিয়ে হেভি মজা মারাবে। আমাদের জাতির পিতা বলেছেন— "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে—"

গাইড ঃ স্যার, ওটা জাতির পিতা বলেননি—

পতিতুণ্ড ঃ তোমার পিতা বলেছেন তো! —হ্যাঁ তাই বন্ধুগণ, মৃতদেহ আমাদের কাছে অতীব পবিত্র জিনিস, বন্ধুগণ দয়া ক'রে

বিশ্বাস করুন— ধর্মপ্রাণ এই দেশবাসী নিজেদের আত্মাতেও ভেজাল দিতে পারে, কিন্তু মৃতদেহের বিশুদ্ধতা রক্ষা তার পবিত্র কর্তব্য—

গাইড : দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার— শুরু করুন—

পতিতুণ্ড : (গাইডকে দেখিয়ে) ইনি একজন একাধারে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক। অর্থাৎ এক কথায় ইনি একজন মনীষী।

গাইড : (বিগলিত হয়ে) হেঁ হেঁ! কী যে বলেন, আমি লজ্জা পাই—

পতিতুণ্ড : না, না, লজ্জার কী আছে! আপনি একজন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী, একজন মেরুদণ্ডহীন— বাঞ্চোৎ।

গাইড : আপনি আমায় অপমান করছেন স্যার?

পতিতুণ্ড : না, না, আপনাকে আমি অপমান করবো কেন? আপনাকে আমি বিশেষণে বিভূষিত ক'রে মেরুদণ্ডহীন— ঐটা বলেছি।

গাইড : স্যার— আবার!

পতিতুণ্ড : ইনি আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করার জন্যে নানাবিধ তথ্য সহযোগে প্রমাণ করবেন— আমাদের রপ্তানী করা মৃতদেহগুলি সেন্ট. পারসেন্ট খাঁটি আগমার্কা, এক নম্বর, একটুও ভেজাল মিশ্রিত নয়। ইনি আরও দেখাবেন— খাঁটি দেশীয় মতে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে প্রায় বিনা খরচে অহিংস নীতি অবলম্বন ক'রে কী ক'রে এদেশে মৃতদেহ তৈরি করা হয়, যেখানে আমেরিকাকেও কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ ক'রে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের দ্বারা এই কাজটি করতে হচ্ছে— সেখানে আমরা কত কম ইনভেস্টমেন্টে লাস বানাই তবেই বুঝবেন, এত সস্তা মাল কী ক'রে আমরা বাজারে ছাড়ি। বন্ধুগণ মাল সস্তা হ'লেই তো মেকি হয় না। নাও স্টার্ট।

গাইড : লাস নাম্বার ওয়ান। নাইণ্টিন সেভেণ্টি থ্রি। লাস নাম্বার ওয়ান। (সাধারণ আলো নিভে যায়। শুধু গাইডের মুখে স্পটের আলো। মঞ্চের আরেকটি কোণ ক্রমশ আলোকিত হয়— একটা রুগ্ন কঙ্কালসার লোক সেখানে দাঁড়ায়) দেখুন— চেয়ে দেখুন, একটি মৃতদেহ, একটি ডেডবডি, একটি লাস, হাজির আপনাদের সামনে, একদম টাটকা লাস, মাত্র গত পনেরোই আগস্ট, মহানগরীর রাজপথে পড়েছিল। এটি যে একটি সত্যিকারের লাস, কোনো সিনথেটিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী নয়, তারও প্রমাণ দিচ্ছি।

ওহে লাস— তুমি তোমার লাস হবার গল্প শোনাও। ধরুন, এর নাম রমজান মিঞা— এক গেঁয়ো চাষি। এবার দেখুন— কী ক'রে জ্যান্ত মানুষ লাস হয়! (আলো জ্ব'লে উঠলো। পতিতুণ্ড, ঘোষক, ও গাইড মোটামুটি দর্শকদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। দরিদ্র চাষি রমজান মিঞার গলার গামছা ধ'রে টানতে টানতে নারকেল বেড়িয়ার জোতদার শিব মুখুজ্জের প্রবেশ। সঙ্গে থানার দারোগা)

শিব ঃ ওসব ছেঁদো কথা আমার কাছে চলবে না বাপু, স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি— সব ধান যদি আমার গোলায় ভালোয় ভালোয় না তুলিস— তোকে মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো! শালা!

রমজান ঃ এটা কী ক'রে বলেন গো আপনি, না খেয়ে যে মরতি হবে সবাইকে!

শিব ঃ (ভেংচে) না খেয়ে মরতি হবে! দানছত্তর খুলে বসেছি আমি, না? আমায় বকাসনে রমজান, এমনিতেই আমার প্রেসারটা বেড়েছে।

দারোগা ঃ তা প্রেসারের আর দোষ কী বলুন— দুধ-ঘি-মাছ-মাংস যেভাবে সাঁটাচ্ছেন—

শিব ঃ থাক্, থাক্। ওসব ব'লে আর এখানে উস্কানি দেবেন না। ব্যাস!

দারোগা ঃ উস্কানি?

শিব ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ! উস্কানি। এমনিতেই গাঁসুদ্ধু হাভাতের দল দিনরাত 'চাল দাও, চাল দাও' ব'লে বাড়ির সামনে হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে আর আমি ব'লে দিচ্ছি— চাল এক দানাও নেই। এখন যদি আমার রান্নাঘরের হাঁড়ির খবর সবাইকে বলতে শুরু করেন—

দারোগা ঃ লোকে খেপে যাবে, তাই না?

শিব ঃ ঠিক তাই। আবার আগের মতো ঝামেলা শুরু হবে। ঘুম ছিল না মশাই একদম— রোজই শুনি জোতদার খুন, জমিদার খুন, মহাজন খুন, দালাল খুন— শুধু খুন আর খুন!

দারোগা ঃ সে ভয় আর নেই। সব পিটিয়ে ঠাণ্ডা করেছি!

শিব ঃ সেটাই তো রক্ষে। তোমাদের ভরসাতেই তো বেঁচে আছি— জামাতাবাবাজীবন! (চুমু খায়)— এই শালা, চ' শিগ্‌গির— ধান তুলে দিবি সব।

রমজান ঃ পারবো না বাবু! ম'রে যাবো একদম!

শিব ঃ ইঃ! শালার ইয়ে দ্যাখো না! পারবি না মানে? এটা আমার ন্যায্য দাবি!

রমজান ঃ তিন ভাগের দু'ভাগ তো আপনারে দেছিই— তবু যদি বলেন সব দিতি—

শিব ঃ আমায় কেতাত্থ করছো যেন! তুই তো দারুণ হারামী রে! পুরো ধানটা কি চাইচি এমনি এমনি— গত সনের ধারটা কে শুধবে? তোর মাগ?

রমজান ঃ সেই তো মুস্কিল হলো! গত সনে যখন গতরে বেশি খেটে আপনার ধারডা শোধ দিতি গেলাম, আপনি বললেন— আরও ছ'সালের ধার বাকি রয়েছে। ঐ জন্যেই তো গতবারে আবার কর্জ করতি হলো!

শিব ঃ তা তো হলোই। সেই ধারটা এখন শোধ দে, বাপ আমার!

রমজান ঃ তখন বলি নাই— আমার তো খেয়ালই ছেলো না— ছ'সালের ধার বাড়াইলেন কেমনে?

শিব ঃ কী? তুই আমাকে মিথ্যেবাদী বলিস? (চড় মারে)

দারোগা ঃ পিস! এ্যাবসোলিউট পিস! শান্তি বজায় রাখুন! শান্তি বজায় রেখে বিরোধ মিটিয়ে নিন।

শিব ঃ থামুন! আপনাকে আর পাকামি করতে হবে না! দ্যাখ্ রমজান— বকাসনে আমায়, প্রেসারটা বাড়লে টের পাবি মজা! ধান দিবি কি-না শুয়োরের বাচ্চা!

রমজান ঃ বললাম তো বাবু— সব দিলি এবার আর খেতি পাবো না। সত্যি বলছি— আর বছরে সব একসঙ্গে শোধ দেবো— দেখবেন, বিশ্বাস করেন—

শিব ঃ হুঁ! শালা মোচ্‌লার কথায় আবার বিশ্বাস, ওদের রক্তের ভেতরে বেইমানীর বিষ—

দারোগা ঃ ছি ছি! এ কী বলছেন— এটা সেক্যুলার কাণ্ট্রি— বড় পিক্যুলার দেশ— মানে ধর্মনিউট্রাল দেশ— অন্য ধর্মকে আঘাত—

শিব ঃ এত বাজে বকেন কেন? পাছায় কামড়ায়, না? আরে আমি হলাম গিয়ে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর এই মোচ্‌লা ব্যাটা? আগে ছিল ডোম-হাঁড়ি-মুচি-বাগ্‌দী-চাঁড়াল—ওদের ছায়া মাড়ালেও পাপ! সেক্যুলার! শা-লা!

রমজান : বাবু— সবই যদি আপনাকে দেই— সম্বৎসর চলবে কেমনে?

শিব : আহা-হা! তার জন্যে এত ভাবনা কীসের? আমি রয়েছি কী জন্যে?

রমজান : আপনি?

শিব : হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে ধার নিবি! ওরে তোদের কষ্টে যে আমার—

রমজান : তার মানে বসত ভিটেটিও বন্ধক রাখতি হবে? সব চাষের জমিই তো আপনার গভ্ভে গেছে— নিজের জমিতে নিজে ভাগ চায করতেছি— আরও বেশি জড়ায়ে পড়তি হবে? পারবো না বাবু—

শিব : কী? কী বললি?

রমজান : দু'ভাগের বেশি ছাড়তি পারবো না।

শিব : আর গত সনের কর্জ?

রমজান : সেই ছ'সালের কর্জ আমি মানি না বাবু—

শিব : তোর এত বড় সাহস!

রমজান : সব ধান আমি দেবো না। যা পারেন করেন। কাছারীতে যান, মামলা করেন— তবু ধান আমি ছাড়বো না। ঘরের ছোটো ছোটো ছাওয়ালগুলোর মুখের দিকি তাকায়ে বলতেছি বাবু— এ ধান আমার!

দারোগা : এই শালা তুমি তলে তলে উত্তেজনা ছড়াচ্ছো, ওদের সঙ্গে সাঁট আছে বুঝি, শালা চীনের চর, মুসলমানের বাচ্চা—

শিব : তুই কি ভেবেছিস— শিব মুখুজ্জে ম'রে গেছে— না? এটা তিয়াত্তর সাল, তোর সত্তরের দশক উল্টোয়ে গেছে রে। চাকা আবার আমাদের হাতে, ধান দিবি কি-না শুয়োরের বাচ্চা—

রমজান : না।

শিব : বটে! (প্রচণ্ড মার শুরু হয় রমজানের ওপর। হকারের প্রেক্ষাগৃহ পরিক্রমা)

হকার : টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম! নারকেলবেড়িয়া গ্রামে এক পাকিস্তানী গুপ্তচর গ্রেপ্তার! দেশপ্রেমিক ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক প্রহার ও পরে পুলিশের হাতে সমর্পণ!

দারোগা : আর মারবেন না, ম'রে যেতে পারে। এবার আমায় দিন (দারোগা ও শিব মুখুজ্জে রমজানকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। রমজান একটু বাদেই আবার ঢোকে)

রমজান ঃ আমারে ফাটকে পোর্‌লো। আটমাস বাদে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন— (হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে) ঘর আমার গোরস্থান, দু'-দুটো ছাওয়াল না খেতি পেয়ে মরেছে, বিবিটা যে কোথায় চলি গেল, ভিটেমাটি পর্যন্ত ঐ বাবুর দখলে। গেরামে কেউ কাজ দিলো না। হাঁটতি হাঁটতি শহরে আলাম। (সারা স্টেজ ঘুরে বেড়ায়) বাবু— একডা কাজ দেবে, যে কোনো একডা কাজ, দাও না বাবু—কেউ দিলো না। কোথাও কাজ নাই। অথচ আগুন জ্বলছে প্যাটে, দপ্পে দপ্পে মারে— তখন (ভিখিরির মতো) একটা পয়সা দেবে বাবু— দু'দিন কিছু খাইনি— ও বাবা একডা পয়সা, বড় খিদে গো, ওমা— মা একটু ফ্যান (কণ্ঠস্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়, ধুঁকতে ধুঁকতে প'ড়ে যায়। গাইড সামনে এগিয়ে আসে)

গাইড ঃ এইভাবে, ঠিক এইভাবে কেমন নিখরচায় একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ হাত-পা-ছড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখুন! বন্ধুগণ, যাঁরা আমাদের মৃতদেহ-ব্যবসার সমৃদ্ধিতে হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছেন— তাঁরাও দেখুন— এই লাস মোটেই কৃত্রিম নয়— আমরা এতই সৎ ব্যবসায়ী যে, বিজনেস সিক্রেটও ব'লে দিচ্ছি— কেউ যদি পারেন, এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে, আমাদের আপত্তি নেই। কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করুন, তাকে শহরে এনে ভিখিরি বানান, দেখবেন কেল্লা ফতে, ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ঢোল!

পতিতুণ্ড ঃ এর কথায় বিশ্বাস করুন জনতা, ইনি বিশেষ মিথ্যে কথা বলেন না। ইনি একজন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী, একজন মেরুদণ্ডহীন বা— (গাইড তাকাতে কথা ঘুরিয়ে নেয়) বাঃ, বাঃ, বেশ হচ্ছে— বেশ—

গাইড ঃ আরও দেখুন, পরখ ক'রে দেখুন, খাঁটি আগমার্কা লাস। লাস নাম্বার টু। নাইন্টিন সেভেন্টি টু। মাত্র দু'এক বছরের বাসি মড়া। লাস নাম্বার টু। (আলো এক শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরা উস্কোখুস্কো চুল ও খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফওলা একটা লোকের ওপর নিবদ্ধ হলো)— জীবিত অবস্থায় এর নাম ছিল হারাণচন্দ্র মাঝি। কারখানার শ্রমিক। চাষি কী ক'রে মারা হয় দেখলেন, এবার দেখুন এই সমাজতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকের লাস কীভাবে জাতীয়তাবাদের কড়াইয়ে সেদ্ধ হয়। ওহে হারাণ। চুপ ক'রে থাকিস্‌নে বাপ, শুরু কর্‌!

হারাণ : কী করবো?

গাইয় : কী আর করবি? তোর লাস হবার গল্প বলবি!

হারাণ : কী হবে ব'লে?

পতিতুণ্ড : এ কী রে বাবা! মড়াও শালা কথা শোনে না।

গাইড : এই দ্যাখ্, কত লোক এসেছে দেশবিদেশ থেকে, কত সাহেব-সুবো—

পতিতুণ্ড : কত সুন্দর সুন্দর মেম— তোর বাপের জন্মেও দেখিসনি, ম'রে গিয়ে কত সুবিধে দ্যাখ্, মেমেরাও তোর কথা শুনবে— ধন্য হয়ে যাবি—

গাইড : এ লোকটা মোটেই আপনার মতো নয় স্যার, কেমন গোঁ ধ'রে দাড়িয়ে আছে দেখুন— মেম দেখলেও এর জিভ দিয়ে জল ঝরে না—

পতিতুণ্ড : হ্যাঁ, খুব সতী!

হারাণ : শুনবেন! শুনবেন সবাই! এই সমাজতান্ত্রিক দেশে কী ক'রে একটা শ্রমিক—

[আলো পাল্টায়। একজন শ্রমিক ছুটতে ছুটতে ঢোকে]

শ্রমিক : হারাণ— হারাণ—

হারাণ : কী হলো? এমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

শ্রমিক : সর্বনাশ হয়ে গেছে— কারখানা লক-আউট?

হারাণ : কী বললি?

শ্রমিক : মেন গেটে নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে!

হারাণ : শালা— শুয়োরের বাচ্চা!

শ্রমিক : কী ক'রে চলবে বল্ তো মাইরি? দিনকে-দিন জিনিস পত্রের যা দাম বাড়ছে— এতগুলো বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কী ক'রে যে—

হারাণ : লড়তে হবে, মাটি কামড়ে লড়তে হবে—

শ্রমিক : লড়বার জন্যেই স্ট্রাইকের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল— প্রোডাক্সন বোনাসের দাবিতে—

হারাণ : ওভাবে নয়, ওভাবে নয়। ওতে মালিকের শালা সুবিধে। স্ট্রাইকের অজুহাতে শালা কারখানা বন্ধ ক'রে দিলে—

শ্রমিক : মালিকের তো পোয়া বারো! প্রচুর মাল জ'মে রয়েছে বাজারে, মালের চাহিদাও কমছে— তাই কারখানা বন্ধ রেখে মালের দাম চড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে জমানো মাল বাজারে ছাড়বে— মর্ শালা ওয়ার্কারের বাচ্চা না খেয়ে—

হারাণ : সবই যদি জানতিস, তবু কেন ও পথে—
শ্রমিক : ইউনিয়নের নেতারা যে বললো—
হারাণ : দালাল! দালাল সব! মালিকের টাকা খেয়েছে!
শ্রমিক : কিন্তু কী করবো এখন? বাড়িতে সবাই না খেয়ে মরবে— আমার আয়েতেই সংসার চলে—
হারাণ : আমারও তাই। কী করবো জানি না। তবে অন্যপথ— অন্যপথ চাই—
শ্রমিক : কোন্ পথ?
হারাণ : এখনও বুঝতে পারছি না। তবে শুধু ট্রেড ইউনিয়নবাজিতে আর ঐ বাঁজা নেতাদের দিয়ে যে আর চলবে না, তা বেশ বুঝতে পারছি।
শ্রমিক : চল্— গেটে যাই।
হারাণ : এলাম গেটের সামনে। লোকে লোকারণ্য, পুলিশ আর সি.আর.পি.-র ভিড়। আমাদের নেতাবাবু বক্তৃতা দিচ্ছেন—

[নেতাবাবুর প্রবেশ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পরিপাটি ভদ্রলোক]

নেতা : বন্ধুগণ, আমাদের সংগ্রাম চলবেই। মালিকের বন্ধ কারখানা আমরা খোলাবোই। তবে হ্যাঁ, শান্তি বজায় রেখে, আপষে মীমাংসা ক'রে। বন্ধুগণ, উত্তেজিত হবেন না। সব কাজ ধীরে-সুস্থে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে। আমরা তীব্র ভাষায় সরকারের কাছে লিখিত প্রতিবাদ করবো এই বেআইনী লক-আউটের—
শ্রমিক : শুকনো প্রতিবাদে মালিকের ঘেঁচু হবে!
নেতা : কে বললো কথাটা? কে? যা-ই হোক, বন্ধুগণ— আপনারা উত্তেজিত হবেন না, ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করুন, আস্তে আস্তে শৃঙ্খলা বজায় রেখে লড়াই করুন! আমরা পার্লামেন্টে এই লক-আউটের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা দেবো, প্রধানমন্ত্রীর কাছে গণদরখাস্ত পাঠাবো এবং আর কী করবো? হ্যাঁ, আরও নানা কাজ করবো— নানারকম কাজ— নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করবো— নানারকম চাপ— উর্দ্ধচাপ, নিম্নচাপ, সম্মুখে চাপ, নিতম্বে চাপ— আরও চাপ— আরও কোথায় যেন চাপ?
হারাণ : মালিককে ঘেরাও ক'রে চাপ!
নেতা : কে এমন বিশৃঙ্খলার চাপটি দিলি বাপ! যা-ই হোক, বন্ধুগণ— ওসব ঘেরাওটেরাওয়ের পথে যাবেন না, বড়ই

কষ্টকর, বড়ই বিশৃঙ্খলার পথ। আপনারা শান্তিতে মালিকের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা ক'রে খোল-করতাল বাজিয়ে নিমাই-নিতাই গেয়ে দাবি আদায়ের রাস্তা ধরুন— এইটেই হলো প্রকৃত লড়াইয়ের পথ!

হারাণ ঃ কত টাকা খেয়েছো চাঁদ?

নেতা ঃ কে বললো কথাটা? কে? এই দ্যাখো ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী— কে গোলমাল করছে। যা-ই হোক, বন্ধুগণ— আমরা শ্রম দপ্তরের সঙ্গে এখন বৈঠক করতে চললাম, সেখানে মালিকপক্ষও আসবে—

শ্রমিক ঃ খানাপিনাও হবে—

হারাণ ঃ মদ মাংসও চলবে—

শ্রমিক ঃ ঘুষঘাষও চলবে—

হারাণ ঃ মেয়েছেলেটেয়েছেলেও আসবে।

শ্রমিক ঃ বাইরে বেরিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে বিবৃতিও দেওয়া হবে।

নেতা ঃ কে? কে? কারা?— কাছা খোলে কারা? কারা?

হারাণ ঃ তোর বাবারা, বাবারা!

নেতা ঃ জনগণ বাপ তুলছে! ঠিক আছে— (পকেট থেকে তুলো বের ক'রে কানে গোঁজে) ঠিক আছে এই আমিও কানে দিয়েছি তুলো, (ঘুরে দাঁড়িয়ে পিঠে বাঁধা কুলো দেখিয়ে) পিঠে বেঁধেছি কুলো— ওদের কথায় কী এলো গেল!— যা-ই হোক, বন্ধুগণ আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি— আমার সব খুলে যায় যাক, তবু এই কারখানা আমি খোলাবোই, নয়তো আমার নাম ইয়ে চন্দ্র ইয়ে নয়।

শ্রমিক ঃ (কানের তুলোটা জোর ক'রে খুলে নিয়ে) সেটা কবে?

নেতা ঃ তা কি বলা যায়? এক বছরও লাগতে পারে—

হারাণ ঃ দশবছরও লাগতে পারে!

নেতা ঃ নিশ্চয়ই পারে, সব কাজ ধীরে সুস্থে পাকাপোক্তভাবে আটঘাঁট বেঁধে করতে হবে তো!

হারাণ ঃ ততদিন আমরা কী করবো?

নেতা ঃ লড়াই করবেন লড়াই। মজদুরের লড়াই।

হারাণ ঃ কীভাবে?

নেতা ঃ ওই যে গেটের সামনে তেরপল টাঙিয়ে তক্তপোষ পেতে

বসে বসে মৌজ করে আড্ডা মেরে লড়াই করবেন—
লড়াই!

হারাণ ঃ সংসার চলবে কী করে? না খেয়ে মরবো যে!

নেতা ঃ সে ভাবনাও ভেবে রেখেছি। আমি অত কাঁচা কাজ করি না। এইটে ধরুন। (কৌটো দেয়) —সব মুশকিল আসান!

হারাণ ঃ এটা কী?

নেতা ঃ কৌটো! চাঁদার কৌটো! চাঁদা তুলুন, লড়াই করুন। লড়াই করুন, চাঁদা তুলুন। মজুরের লড়াই। গেটের সামনে। বসে বসে। আড্ডা মেরে। মৌজ করে। লড়াই করুন। চাঁদা তুলুন। (সুর করে) মুশকিল আসান করুন। কৌটো নিয়ে লড়াই করুন। মুশকিল আসান করে। এবার আমি পড়ি সরে! [প্রস্থান]

শ্রমিক ঃ (বাঁধা গতের মতো) ধর্মঘটি শ্রমিকদের সাহায্য করে যান দাদারা— [প্রস্থান]

হারাণ ঃ অনেকেই আমায় দেখেছেন— ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, পাড়ায় পাড়ায়— হাতে এই চাঁদার কৌটো নিয়ে— ধর্ম্মঘটি শ্রমিকদের সাহায্য করে যান দাদারা, ধর্মঘটি শ্রমিকদের— (আস্তে আস্তে কথাগুলো পাল্টে যায়) দুটো পয়সা দেবে গো বাবা— দুটো পয়সা দেবে গো মা— দুটো পয়সা— ঘরে সাতটি প্রাণী বাবারা— এক মুঠো চাল দেবে গো মা— তিনদিন কিচ্ছু খাইনি, বাবারা— ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে বাবা, দুটো পয়সা দেবে ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা, বৌটা গলায় দড়ি দিয়েছে মা, দুটো বাসী রুটি দেবে গো— দারুণ খিদে— দারুন খিদে গো মা— দারুণ— (গলার স্বর নিস্তেজ হয়ে আসে, টলতে টলতে পড়ে যায়। আলো এবার গাইড, পতিতুণ্ড, ও ঘোষকের মুখে। তারা হাসছে)

গাইড ঃ এমনিভাবে বন্ধুগণ— শিখে নিন বিদেশী বন্ধুরা— কীভাবে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিকের লাস উৎপাদন করা হয়। প্রথমে কারখানা লক-আউট, ক্লোজার, ছাঁটাই— ইত্যাদি ইত্যাদি, মালিকপক্ষকে বলুন অটোমেশন চালু করতে— তবেই দেখুন কী করে একটা জ্বলজ্যান্ত মজুরের বাচ্চা প্রথমে ভিখিরি ও পরে লাসে পরিণত হয়!

পতিতুণ্ড ঃ এখান থেকে কিছু রঙবেরঙের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও ভাড়া

নিতে পারেন, এখানে কমিশনে নেতা ভাড়া দেওয়া হয়। ব্যাঙের ছাতার মতো এদেশে ইউনিয়ন গজায়, আর বিষ্ঠার পোকার মতো কিলবিল করে শ্রমিক দরদী বাবু নেতারা—

ঘোষক ঃ খেয়াল রাখবেন— ইণ্ডিয়ান মেড ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সবচেয়ে কাজের এবং দামেও সস্তা।

গাইড ঃ লাস নাম্বার থ্রি! (একটা ছেলে এসে দাঁড়ায়) লাস নাম্বার থ্রি। নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান। ধরুন এর নাম—

ছেলেটা ঃ আমার নাম সুমিত মিত্র। গ্র্যাজুয়েট বেকার!

গাইড ঃ শুরু করো বাছাধন— কত লোক এসেছে তোমার জন্যে—

সুমিত ঃ না! আমি শুরু করবো না। পুতুলনাচের পুতুল হবো না আর। কিছুতেই না!

পতিতুণ্ড ঃ দ্যাখো দিকি, এ কী কাণ্ড! পুরো প্রোগ্রামটাই মাইরি মাটি হবে!

সুমিত ঃ আমি তো জড় বস্তু নই। আমি তো একটা পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তি নই— আমি তো জ্বলজ্যান্ত মানুষ!

পতিতুণ্ড ঃ শালা, মড়া কি-না বলে— জ্বলজ্যান্ত মানুষ। বন্ধ্যা নারী শতপুত্রের জননী!

সুমিত ঃ আমার তো চিন্তা করার শক্তি আছে, আমার তো দেখার মতো চোখ আছে, শোনার মতো কান আছে, আমি নির্বোধ নই, বধির নই। আমি তোমাদের কথামতো চলবো কেন? তোমাদের প্রদর্শনীতে রঙচঙ মেখে বেশ্যার মতো দাঁড়াবো কেন?

পতিতুণ্ড ঃ ছি ছি! কী অশ্লীল কী অশ্লীল! কানে আঙুল! বেশ্যা বলেছে! ওহে ছোকরা— ভদ্রতা জানো না? বাপের বয়সী লোকের সামনে বেশ্যা বলা! মিসায় পুরে দেবো! বাঞ্চোৎ!

গাইড ঃ ভাই তুমি এমন করছো কেন? কত দেশবিদেশ থেকে লোক এসেছে— তাদের সামনে এভাবে দেশের সম্মান ডুবিয়ো না ভাই!

পতিতুণ্ড ঃ মড়াও শালা কথা শোনে না! একথা জানাজানি হ'লে বাইরে যে টি টি প'ড়ে যাবে— ভাই!

সুমিত ঃ না, আমি শুনবো না! কিচ্ছু শুনবো না, কোনো কথাটথা নয়। আমার যা খুশি আমি তাই করবো। সেই বাচ্চা বয়স থেকে কত কথাই তো শুনে এলাম---

গাইড ঃ শুরু হচ্ছে স্যার, শুরু হচ্ছে, ঠিক লাইনে এসে গেছে—

বলো ভাই, তোমার গল্প বলো—

সুমিত ঃ না! কিচ্ছু বলবো না আমি!

পতিতুণ্ড ঃ এ তো মহাবেয়াড়া লাস! কিছুতেই ভবি ভোলবার নয়! এমন করলে কিন্তু তোমায় জেলে পুরে দিয়ে গুলি ক'রে মেরে দেবো হ্যাঁ, আর বাইরে রটিয়ে দেবো— জেল হইতে পালাইতে গিয়া নিহত!

সুমিত ঃ (হেসে) আমাকে আবার মারবেন কী? আমি তো ম'রেই গেছি— মড়াকে আবার মারবেন কী?

গাইড ঃ কেন পিঁয়াজী করছো ভাই! যা বলি সেইমতো চলো। ছিঃ অবাধ্য হ'তে নেই— সুবোধ বালক!

সুমিত ঃ ঠিক, ঠিক এই কথাই তো বাচ্চা বয়েস থেকে শিখে আসছি। (পড়ার সুরে) গোপাল বড় ভালো ছেলে। সে গুরুজনদের ভক্তি করে। সে পিতা-মাতা ও শিক্ষকগণকে শ্রদ্ধা করে। গোপাল কাহারও অবাধ্য হয় না। তাই তাহাকে—

ঘোষক ঃ একটি আস্ত মদ্‌না বলিয়া ডাকা হয়!

সুমিত ঃ ঠিক বলেছেন! অবাধ্য না হওয়ার একটিই অর্থ হয় এখন— একটি আস্ত মদ্‌না। কিন্তু— কিন্তু বড় পরে বুঝলাম, ততদিনে আমি শেষ!

গাইড ঃ না না! শেষ হয়নি এখনও আসল ব্যাপারটাই বাকি। কী করিয়া একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবক লাসে পরিণত হয়— তা এখনও দেখানো হয়নি। থেমো না ভাই— বলো!

ঘোষক ঃ আর এইটেই আজকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম!

পতিতুণ্ড ঃ দি মোস্ট ইন্টারেস্টিং আইটেম অব দিস ডে-তে— আমাদের ঝুলিয়ে দিস্‌নি ভাই, তোকে দশ টাকার— আচ্ছা ঠিক আছে, পেট পুরে মাল খাওয়াবো। —ধুস্‌ শালা, মড়া আবার মাল টানবে কি? আমি তো নিজেই টেনে ব'সে আছি। ঠিক আছে তোর নামে গয়ায় পিণ্ডি দেবো বাপ আমার। এখন উদ্ধার কর্‌!

সুমিত ঃ আমার নাম সুমিত মিত্র। জন্মেছিলাম এক কেরাণীর ঘরে। সভ্য ভদ্র মার্জিত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে— স্কুল কলেজে মাস্টারমশাইরা শেখাতেন—

[মাস্টারমশাই ঢোকেন]

মাস্টার ঃ আমাদের সভ্যতার মূলমন্ত্র হইলো ত্যাগ। আমরা কখনোই ধনসম্পদ প্রাচুর্যের জন্য লালায়িত নই। এই—তুমি গোলমাল

করছো কেন? কান মুলে ছিঁড়ে দেবো শুয়োরের বাচ্চা! —কদাপি কাহাকেও কুবাক্য বলিও না। আমাদের ঋষিগণ ঐহিক সুখলালসাকে ঘৃণা করিয়া চিরকালই ত্যাগের মন্ত্র শিখাইয়াছেন। সুতরাং হে ছাত্রগণ তোমরা ত্যাগ করিও প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া—

গাইড ঃ মলমূত্র ত্যাগ করিও। ইহাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

মাস্টার ঃ কদাপি সুকুমার ছাত্রগণের রাজনীতি করা উচিত নয়। এই দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ও মহত্তম গণতন্ত্র, সুতরাং রাজনীতির ন্যায় অতীব নোংরা জিনিস হইতে দূরে থাকিও। ছাত্ররা রাজনীতি করিলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়, কারণ রাজনীতি শুধুমাত্র রাজনীতিবিদগণের জন্য। ইহাই গণতন্ত্রের সার কথা। কারণ নেতারা রাজনীতি করিলে দেশের উন্নতি হয় এবং—

ঘোষক ঃ এম.এল.এ. এম.পি. মিনিস্টারাদি হওয়া যায়।

পতিতুণ্ড ঃ লাইসেন্স পারমিট দু'হাতে বিলিয়ে প্রভূত টাকা গ্যাঁড়া মারা যায়।

মাস্টার ঃ সুতরাং হে ছাত্রগণ—

গাইড ঃ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নিজে চুষিও।

[মাস্টার মশাইয়ের প্রস্থান]

সুমিত ঃ ইত্যাকার প্রভূত জ্ঞানার্জনের পর একদিন—

[বাবার প্রবেশ]

বাবা ঃ খোকা, আমার রিটায়ারমেণ্টের আর ছ'মাস বাকি। তুমি যে আড্ডা মেরে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে— এ তো আর চলতে পারে না। —দু'-দুটো আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে আরও চারটে নাবালক ছেলে। বোঝোই তো বাবা, যা দিনকাল— কিছুই যে রেখে যেতে পারছি না, কাল যদি রিটায়ার্ড হ'তে হয়, পরশু থেকে বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না, এতগুলো প্রাণী বাড়িতে— কী হবে বল্ দেখি বাবা? —রাগ করিস্‌নে খোকা, তোর মনের কষ্ট কি আমি বুঝি না? কত আশা করেছিলিস এম. এস. সি. পাস ক'রে রিসার্চ করতে যাবি বিলেতে। কিন্তু এই গরিব বুড়ো বাপের আর যে সাধ্য নেই বাবা, যে-কোনোদিন রাস্তায় মাথা ঘুরে প'ড়ে যেতে পারি— এত ক্লান্ত আমি।

খোকা, বুড়ো মা-বাপের দিকে একটু তাকা, অত স্বার্থপর হোস্‌নি! ঘাড়ে তোর কত বড় সংসার— [প্রস্থান]

সুমিত   সুতরাং হে সুমিত মিত্র, হে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট— এইবার পথে নামো— (সারা স্টেজ ঘুরতে থাকে) আমায় একটা চাকরি দেবেন দাদা! যে-কোনো একটা চাকরি! আমার বড় দরকার— দেবেন দাদা! [জনৈক নিয়োগকর্তার প্রবেশ] স্যার— আপনার এখানে যদি কোনো ভ্যাকেন্সী থাকে—

জনৈক ঃ (উদাসীনতায়) কতদূর পড়েছেন?

সুমিত ঃ ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স। —এই যে মার্কশিট আর সার্টিফিকেট।

জনৈক ঃ হ্যাঙ্ ইওর সার্টিফিকেটস্! ডু ইউ নো টাইপিং? টাইপ জানেন? স্টেনোগ্রাফি?

সুমিত ঃ আজ্ঞে না— মানে—

জনৈক ঃ স্যরি জেন্টলম্যান! উই নিড এ স্টেনো-টাইপিস্ট। [প্রস্থান]

সুমিত ঃ (আরেকজনের কাছে যায়) দাদা, আপনার এখানে কোনো চান্স হবে?

আরেকজন ঃ কী করা হয়?

সুমিত ঃ আমি ফিজিক্সে অনার্স, ফার্স্ট ক্লাশ। এ ছাড়া টাইপ জানি, স্টেনোগ্রাফিও শিখেছি।

আরেকজন ঃ (হাই তুলে) ও-সবে কী হবে? ইলেক্ট্রিকের কাজ জানা আছে?

সুমিত ঃ অ্যাঁ? ইলেক্ট্রিক?

রেকজন ঃ আমাদের এখন ইলেক্ট্রিক মিস্তিরী দরকার। আচ্ছা এখন একটু ব্যস্ত আছি। পরে কথা হবে। [প্রস্থান]

সুমিত ঃ (অন্য আরেকজনকে) কাকাবাবু—

অন্য আরেকজন ঃ (কথায় ট বর্গের প্রভাব) কাকাবাবু! পিরিতের কাকাবাবু! কী রে কী!

সুমিত ঃ আপনার কনসার্ণে কি কোনো কাজটাজ হবে?

অন্য আরেকজন ঃ কিছু পাশটাস দিয়েছো ছোকরা? না, দিনরাত মেয়েদের পেছনে সিটি মেরে বেড়াও?

সুমিত ঃ আজ্ঞে আমি ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স।

অন্য আরেকজন ঃ ফিজিক্স? সেটা আবার কী হে? মেসিনপত্তরের কাজ না-কি?

সুমিত ঃ আজ্ঞে এ-ছাড়া আমি টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড শিখেছি। ইলেক্ট্রিকের কাজও জানি কাকাবাবু —

অন্য আরেকজন ঃ ইলেক্‌ট্রিক! হাসালে বাছাধন! বলি কাটিং জানো? আণ্ডারপ্যান্ট, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের কাটিং—

সুমিত ঃ আজ্ঞে?

অন্য আরেকজন ঃ আমার এখন দর্জির দরকার। আচ্ছা এসো! যত্তোসব ঝামেলা! [প্রস্থান]

সুমিত ঃ (সারা স্টেজে ঘুরতে থাকে) আমায় একটা চাকরি দেবেন? যে-কোনো একটা কাজ? বিশ্বাস করুন— আমি সব কাজ পারি— আমি ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স, আমি টাইপিস্ট, আমি স্টেনোগ্রাফার, আমি ইলেক্‌ট্রিকের কাজ জানি, আমি দর্জির কাজ জানি, আমি ধোপার কাজ জানি, রিক্সা চালাতে জানি, লেদের কাজ জানি— আমায় একটা কাজ দেবেন কেউ? যে-কোনো একটা কাজ? আমার বাবা রিটায়ার করেছেন, আমাদের সংসারে হাঁড়ি চড়ে না, আমার বোন দুটো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার ভাইগুলো ব'খে যাচ্ছে, চুরি-চামারি শিখছে, ওয়াগন ব্রেকারদের দলে ভিড়ছে। আমায় যে-কোনো একটা কাজ দিন, যে-কোনো— (ক্রমশ গলার স্বর উঁচুতে ওঠে) আমাকে এক্ষুণি যে-কোনো একটা কাজ দিন মহাপ্রভুগণ, আমার মাথার ভেতরে আগুন জ্বলছে, বুকের ভেতর বিষের জ্বালা, আমাকে বেঁচে থাকতে দিন মহাশয়েরা, না হ'লে— আমি সব লণ্ডভণ্ড ক'রে দেবো, আমি সব সাজানো গোছানো ঘরগুলো এলোমেলো ক'রে দেবো (চিৎকার ক'রে) আমার একটা কাজ চাই—

পতিতুণ্ড ঃ এই! চেঁচাচ্ছে! কাজ চাই কাজ চাই ব'লে চেঁচাচ্ছে!

গাইড ঃ এই ভাই— তোমার তো এমন করার কথা ছিল না, তোমার তো এবার ম'রে যাওয়ার কথা—

ঘোষক ঃ দেখছো না, স্যার রেগে গিয়ে মাল খাচ্ছে— স্যারেরা রেগে গেলে তোমাদের ম'রে যেতে হয়।

সুমিত ঃ না। আমি মরবো না। কিছুতেই মরবো না। আমাকে আমার সমাজকে সংসারকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতেই হবে, আমাকে একটা কাজ দিতেই হবে— আমার একটা কাজ চাই-ই চাই—

গাইড ঃ এই, তোমার এবার আত্মহত্যা করার কথা, তুমি গলায় দড়ি দিয়ে কড়িকাঠে ঝুলে যাও, আমরা খবরের কাগজে বড় বড় হরফে ছেপে দেবো— বেকারীর জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা!

ঘোষক ঃ এতবড় পাবলিসিটির সুযোগ কেন ছাড়ছিস ভাই, কতজনে তোর নাম জানবে—

পতিতুণ্ড ঃ কিংবা যে মাগীটার সঙ্গে তোর পিরিত ছিল, তোকে বেকার দেখে তার বাপ অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়েছে, সেই দুঃখে তুই কোনো লেকের ধারে কিংবা কোনো জলার ধারে গিয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করতে পারিস, তখন তোকে নিয়ে কত গল্প, কত গান, কত কবিতা, কত উপন্যাস, কত ব্যর্থ প্রেমিকের ইতিকথা লেখা হবে— ম'রে যা না শালা— আর কত ভোগাবি?

সুমিত ঃ না, আমি মরবো না— কিছুতেই নয়। আমি আত্মহত্যা করবো না, গলায় দড়ি দেবো না, বিষ খাবো না। আমি বেঁচে থাকবো, আমি আমার সংসারকে বাঁচাবো, আমাকে একটা কাজ দিতেই হবে, না হ'লে আমি সারা পৃথিবীটাকে উল্টে দেবো, সমস্ত কিছু গুঁড়িয়ে ফেলে দেবো, এখুনি আমায় একটা কাজ দাও শয়তানের দল— নয়তো বোমার মতো ফেটে প'ড়ে আমি সবকিছু নষ্ট ক'রে দেবো, সবার ফুলের বাগানে আমি আগুন ধরিয়ে দেবো।

পতিতুণ্ড ঃ হায়, হায়— এ কী কাণ্ড! নিখরচায় কত মড়া পেয়েছি, কত চাষাভুষোর বাচ্চারা ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে— আর এখন কি-না অহিংস পদ্ধতিতে মৃতদেহ উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি?

গাইড ঃ ভাই, তোমার মতো কত ছেলে চাকরি না পেয়ে মরেছে, আত্মহত্যা করেছে, তুমি এমন করছো কেন?

ঘোষক ঃ লাস বানানোর ব্যবসা ডকে উঠলো এবার!

পতিতুণ্ড ঃ শিগ্‌গির ম'রে যা না শালা অন্য সবার মতো—

সুমিত ঃ না, আমি মরবো না। এখন জমানা পাল্‌টে গেছে। এটা একাত্তর সাল, একাত্তর সালে কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরে না, বিষ খায় না, আমি হাতে তুলে নেবো গোলাপ ফুলের মতো বোমা, রাজদণ্ডের মতো পাইপগান—

পতিতুণ্ড ঃ এ কী! বোমা-পাইপগান নিয়ে হুজ্জোতি শুরু হচ্ছে!

ঘোষক ঃ ঠিক ঠিক প্ল্যানমতো ম'রে যা ভাই, প্রদর্শনীটা নষ্ট করিস নি—

গাইড ঃ এই দ্যাখো— রমজান মিঞা মরেছে ধুঁকে ধুঁকে, বিনা প্রতিবাদে। মরেছে হারাণ মাঝি, তুইও মর্ দাদা।

রমজান : (উঠে দাঁড়িয়ে) আমিও আর মরবো না ধুঁকে ধুঁকে পেটের আগুনে পুড়ে—

হারাণ : আমিও আর কারুর চালাকিতে ভুলে বোকার মতন ক্ষ'য়ে যাবো না—

পতিতুণ্ড : এ কী কাণ্ড! —এরাও বিদ্রো করছে!

সুমিত : আমরা এবার বাঁচবো আগুনের দাহ নিয়ে

রমজান : আমরা এবার বাঁচবো ঝড়ের মত্ততা নিয়ে

হারাণ : আমরা এবার বাঁচবো সমুদ্রের গর্জন নিয়ে—

পতিতুণ্ড : বাপ! গর্জনটর্জন নিয়ে বাঁচবে বলছে— লাসবিপণিতে লালবাতি জ্বালাতে হবে?

গাইড : মৃতদেহ-শিল্পে ঘোরতর সঙ্কট—

ঘোষক : অহিংস পদ্ধতিতে মৃতদেহ উৎপাদন বন্ধ—

পতিতুণ্ড : অহিংস পদ্ধতিতে মৃতদেহ উৎপাদন যখন বন্ধ হ'য়ে যায়, তখন আমরা সৃষ্টি করি— বারাসত (গুলির আওয়াজ), বেলেঘাটা (গুলির আওয়াজ), বরাহনগর, (গুলির আওয়াজ ও এই সময়ে সুমিত, হারাণ, ও রমজান ক্রমান্বয়ে গুলিবিদ্ধ হবে—)

ঘোষক : থানার লক-আপে খুন—

গাইড : জেলের ভেতরে খুন—

ঘোষক : লালবাজারে খুন—

পতিতুণ্ড : (নাচতে থাকে) কত লাস— কত লাস

ঘোষক : (নাচতে থাকে) দ্যাখো ভাই— কত লাস

গাইড : (নাচতে থাকে) চারিদিকে কত— লাস

পতিতুণ্ড : লাসবিপণির বাজারে

ঘোষক : কিনেছে মড়া শ' হাজারে

গাইড : এত লাস কী মজা রে, কী মজা রে, কী মজা রে—

পতিতুণ্ড : চতুর্দিকে লাসের ঢেউ

ঘোষক : ছেলে বুড়ো জোয়ান কেউ

গাইড : বাদ যাবে না— বাদ যাবে না

পতিতুণ্ড : এমন সুযোগ— আর পাবে না।

গাইড : আর পাবে না— আর পাবে না।

পতিতুণ্ড : (সুর ক'রে)
জ্যান্ত মানুষকে ভেসেক্টমি, মরা মানুষকে চালান
এমনি ক'রেই গ'ড়ে ওঠে সমাজবাদের দালান!—

যাক সমাজবাদের দালান গড়ার ঝামেলা চুকলো। আমার তো আবার ভয়ে ঐ দুটো পেটের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল—

গাইড : কোন্ দুটো স্যার?

পতিতুণ্ড : অশ্লীল— অশ্লীল! তোর এত অশ্লীল আগ্রহ কেন রে মেরুদণ্ডহীন বোকা খোকা—

গাইড : স্যার— আপনি আমায় অপমান করছেন আবার!

পতিতুণ্ড : অপমান করলাম কোথায়? তুমি স্বাধীন বুদ্ধিজীবী, তাই বোকা খোকা বলেছি, আসল কথাটা তো এখনও ছাড়িনি— (দর্শকদের মধ্যে হাসির গুঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে পতিতুণ্ডের খোলস ভেঙে অভিনেতা বেরিয়ে আসে)

অভিনেতা : হাসবেন না। এটা হাসির নাটক নয়। মানুষের পেটের খিদে আর জোয়ান ছেলেদের বুকের রক্ত নিয়ে আমরা ভাঁড়ামো করতে আসিনি এখানে। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম— আপনাদের এখনও হাসি আসে, এখনও আপনারা হাসতে জানেন— যখন গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষি শিয়ালদা স্টেশনে ম'রে প'ড়ে থাকে, কিংবা ছাঁটাই শ্রমিকের বুকের ফুসফুস ফেটে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে, কিংবা পাশের বাড়ির ছেলেটাকে যখন দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মারা হয়— তখনও আপনাদের ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে, তখনও কী অদ্ভুত সহিষ্ণু প্রশান্তিতে ভ'রে থাকে সারা বুক, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই— এদেশে কি কেউ বেঁচে আছে? আমরা অবাক হয়ে ভাবি— এখনও মানুষ আছে এই উলঙ্গের নিরন্নের দেশে? আমরা হিসাব মেলাতে পারি না— প্রতিবাদে প্রতিরোধে যখন রণক্ষেত্রের আকাশ মুখরিত হওয়ার কথা, তখন এমন করুণ নৈঃশব্দ্য কেন? কেন এমন ক্লীব নপুংসক বৃত্তি, নিজের সন্তানের ছিন্নশির সোনার থালায় সাজিয়ে কাকে নিবেদন করি আমরা, কোন্ নির্বোধ প্রত্যাশায়? তাই মনে হয়— এদেশ যেন কোনো নিস্তব্ধ কবরখানা, নির্জন শ্মশান, সারি সারি মৃতদেহ রাখা যেন কোনো হিমশীতল লাসকাটা ঘর— এ আমার বাংলাদেশ। আমার ভারতবর্ষ যেন আলোকোজ্জ্বল বিরাট এক লাসবিপণি, শো-কেসে শো-কেসে আপনার আমার মতো মৃতদেহের সজ্জিত স্তূপ— তবু এই দুঃসময়েও স্বপ্ন দেখি— এমন একদিন আসবে যেদিন এই ঘুমন্ত নিস্পৃহ ভিসুভিয়াস ফেটে পড়বে দুর্বার ক্রোধ

আর ঘৃণায় [ক্রমশ একটা মিছিল এগিয়ে আসতে থাকে] হ ভেঙে দেবে স্পর্ধিত অত্যাচারের এই পণ্যশালা—লাসবিপণি! আর সেই আশাতেই বুকের পাঁজরে ঘ'ষে ঘ'ষে শাণিত করি নির্মম জিঘাংসার উন্মুক্ত তরবারি! [মিছিলটা আক্রমণের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে যায়]

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

[এই নাটকে অভিনেতার বক্তব্যে অগ্রজ কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার দু'একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছি। এই নাটকের প্রযোজনাগত সাফল্যের জন্যে আমি ইউনিট থিয়েটার ও তার নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী]

(অভিনয়— দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)
এই সঙ্কলনের বিশেষ নিবেদন ঃ কবি কমলেশ সেন লিখেছেন, "লাসবিপনী তো একসময় মিথ হয়ে গিয়েছিল।" —না, এই গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এই গৌরবের হক্‌দার মফস্বল বাংলার অগণিত নাট্যকর্মী। ইউনিট থিয়েটার ছাড়াও আর বহু নাট্যদল বারবার আক্রান্ত হয়েও এই নাটক করা বন্ধ করেননি সেই ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ অ্যাণ্ড কোং-এর জমানায়। তাদের দুঃসাহসই এই নাটককে লোকপ্রিয় করেছিল। তবে 'লাসবিপনী'র প্রাথমিক সাফল্য সম্ভব হয়েছিল 'ইউনিট থিয়েটার' ও তার কর্ণধার আশিস চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে। আশিস আজ নেই। আমি তাই বিনম্র শ্রদ্ধায় এই নাটক উৎসর্গ করছি আশিস চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে।

—অমল রায়

ট্রিলজি—২

একাঙ্ক

ব্লাডব্যাঙ্ক

চরিত্র ।। ভারত, রতন, তরুণ, দালাল, ম্যানেজার, পতিতুণ্ড, স্যাম, এবং লুটলিয়াকভ।

[দর্শকদের মধ্যে দিয়ে চোঙা ফুঁকতে ফুঁকতে বিচিত্রবেশী দালালের প্রবেশ]

দালাল ঃ সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ, হেলায় হারাবেন না। পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ আর পাবেন না। বেকারদের জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। আজ থেকে এই অঞ্চলে একটি প্রাইভেট ব্লাডব্যাঙ্ক চালু হচ্ছে। পুরোপুরি গভর্ণমেন্ট রেজিস্টার্ড। রক্ত বিক্রি ক'রে মোটা টাকা রোজগার করুন। বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জনের এমন সুযোগ আর কোথাও পাবেন না। ন্যায্য দামে আমরা সব সময় ভালো রক্ত কিনে থাকি। যত খুশি রক্ত বেচুন, যত ইচ্ছে টাকা লুটুন। বিশেষ আকর্ষণ— এই রক্ত পুরোপুরি বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। বিলেতে, আমেরিকায়, রাশিয়ায় চালান যাবে আপনার রক্ত। এমন অপূর্ব সুযোগ মোটেই হাতছাড়া করবেন না। আসুন, চ'লে আসুন, আপনাদের সেবায় আমাদের প্রাইভেট ব্লাডব্যাঙ্ক—

[দর্শকদের মধ্যে থেকে হাবাগোবা একটি লোক উঠে দাঁড়ায়]

লোকটি ঃ বাবু— ও বাবু— শুনচো— ও বাবু—

দালাল ঃ কে? কী? কী চাই? খামোকা পেছু ডাকছো কেন?

লোকটি ঃ ঐ যে বেলাড ব্যাঙ্কো না কী বললে, উখানে গেলি টাকা পাবো?

দালাল ঃ নিশ্চয়ই, একবার গিয়েই দ্যাখো না, আমার সঙ্গেই চলো।

লোকটি ঃ হ্যাঁ বাবু, আমি তুমার সাথেই যাবো। ক'দ্দিন খেতি পাই নাই বাবু! উখানে গেলি খেতি পাবো তাই না গো?

দালাল ঃ উরিস্ শালা এ যে দেখি উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে রক্ত বেচতে এসেছে। যত্তোসব হাড়-হাভাতের দল।

লোকটি ঃ তুমরা যত অক্ত চাও আমি সব দিবো, শুদু আমারে খেতি দিতি হবে বাবু।

দালাল ঃ কী নাম?

লোকটি ঃ মোর নাম? এজ্ঞে ছিরি ভারত চন্দর দাস।

দালাল ঃ এঃ, একেবারে ভারত চন্দর দাস! নামের দেখছি বাহার আছে। টাকেতে চুল নেই, ইয়েতে জুলপি! তা বাপু ভারত চন্দর, কী করা হয়?

ভারত ঃ এজ্ঞে গেরামে নাঙল ঠেলতাম। এ্যাকুন কিচু করিনা। পথে পথে ঘুরি!

দালাল ঃ তার মানে পুরোদস্তুর একটি গেঁয়ো চাষি। ভালোই হলো, চাষাভুষোদের গায়ে অনেক রক্ত থাকে। গ্রামের মশা মাছিগুলো পর্যন্ত চাষিদের রক্ত খেয়ে ধুমসো হাতি ব'নে গেছে। চলো আমার সঙ্গে।

ভারত ঃ এজ্ঞে বাবু চলো!

দালাল ঃ হ্যাঁ রে, আগেভাগেই একটা কথা ব'লে নিই, মানে তোর নার্ভ কেমন?

ভারত ঃ নাক? নাকের কথা বলতিছো? এই যে মোর নাক!

দালাল ঃ দুর হাঁদারাম! নাকের কথা কে বলেছে? আমি বলছি, নার্ভ! মানে রক্ত দিতে গিয়ে ভয় পাবি না তো?

ভারত ঃ ভয় পাবো কেনে বাবু? অক্ত দিতে ভয় কী? কত অক্ত দিইচি—

দালাল ঃ সে কী? তুই আগেও রক্ত বেচেছিস না-কি?

ভারত ঃ না বাবু অক্ত বেচি নাই, কিন্তু অক্ত দিইচি—

দালাল ঃ কোথায় দিলি? কোন্ ব্লাডব্যাঙ্কে?

ভারত ঃ কুনো ব্যাঙ্কোতে দিই নাই গো বাবু, অক্ত দিইচি পোকা-মাকড়-মশা-মাছি-সাপ-জোঁক-জোতদার-মহাজনের কাচে—

দালাল ঃ তার মানে?

ভারত ঃ জোতদারের জমিতে অক্ত দিইচি, মহাজনের দ্যানা শুধতি অক্ত দিইচি, আবার পুলুশের লাঠিতেও অক্ত দিইচি বাবু— অক্ত দিতি ভয় কী?

দালাল ঃ শালা তো হেভি সেয়ানা! যতটা হাবাগোবা মনে হয় ততটা নয়! চল্, চ'লে আয়, দেরি করিস্‌নি।
[আরেকজন উঠে দাঁড়ায়]

আরেকজন ঃ যাবেন না, দাঁড়ান। আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

দালাল : উরিব্বাস! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল! চোঙা ফোঁকা মাত্তর দলে দলে লোক আসছে! সারা দেশে যে রক্ত বেচার জন্যে এত লোক আছে— আগে তো জানতুম না! আগেরটাকে পেলাম চাষি, আর এটা মনে হচ্ছে—কালি-ঝুলি মাখা কারখানার মজুর!

আরেকজন : ছিলাম! এখন নেই! কারখানা লক-আউট!

দালাল : ভালোই হয়েছে— কারখানাগুলো বন্ধ না হ'লে আমাদের ব্লাডব্যাঙ্কে লোক জুটবে কী ক'রে? নাম কী?

আরেকজন : নাম জেনে কী হবে? রক্ত চাও— রক্ত দিচ্ছি; ফ্যালো কড়ি— মাখো তেল। ন্যায্য দাম চাই— তবে রক্ত দেবো।

দালাল : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই— নায্য দামই দেওয়া হবে, আমাদের কোম্পানি সবচেয়ে চড়া দামে রক্ত কেনে, কেননা আমরা সমস্ত রক্তই ফরেনে সাপ্লাই করি—

আরেকজন : ফরেনেই পাঠাও, আর যেখানেই পাঠাও, আমার টাকা পাওয়া নিয়ে কথা— টাকা কম হ'লে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।

দালাল : শালা তো হেভি টেঁটিয়া— প্রথমেই টাকার ধান্দা।

আরেকজন : আমার নাম রতন সামন্ত। নাম যখন জানতে চেয়েছো, তখন ব'লেই দিলাম। ছ'মাস ধ'রে বেকার ব'সে আছি। ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।

দালাল : ঠিক আছে ঠিক আছে— আর বলতে হবে না। সবাই দেখছি অভাব-অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি নিয়ে ব'সে আছে। শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যা-ই হোক, চলো সবাই—

ভারত : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চলো বাবু— আর দেরি নয়!

দালাল : আসুন, আসুন, সবাই আসুন— সুবর্ণ সুযোগ। আজ থেকে এখানে ব্লাডব্যাঙ্ক খোলা হচ্ছে। আজকে যারা রক্ত দেবেন, তাঁদের অতিরিক্ত দু'টাকা বেশি দেওয়া হবে।

[জনৈক তরুণ এগিয়ে আসে]

তরুণ : আচ্ছা আপনারা আমার রক্ত নেবেন?

দালাল : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই— এমন অল্পবয়েসী জোয়ান ছেলের তরতাজা রক্ত নেবো না মানে? খুব ভালো দামেই নেবো। তোমার তো ফার্স্ট প্রেফারেন্স। ফরেনে আবার তোমার মতো জোয়ান ছেলের রক্তের খুব ডিমাণ্ড!—চ'লে এসো।

[দালাল লোকটি ভারত, রতন, ও তরুণকে নিয়ে মঞ্চে ওঠে। পর্দা খুলে যায়। মঞ্চের পেছনের পর্দায় বড় বড় হরফে লেখা— "প্রাইভেট ব্লাডব্যাঙ্ক (গভঃ রেজিঃ নং-৪২০)"। পেছনের দিকে একটা বিশাল খাঁচা। তার সামনে মাঝবয়েসী একটা লোক চেয়ার-টেবিলে ব'সে একগাদা খাতা নিয়ে কাজ করছে। দালাল তার কাছে যায়]

দালাল ঃ এই যে ম্যানেজার বাবু, কী এত কাজ করছেন মাইরি? এখনও কোম্পানিই স্টার্ট হলো না, আপনি এখনই খাতাপত্তর নিয়ে পড়েছেন।

ম্যানেজার ঃ ও তুমি! তা বাজারের অবস্থা কেমন দেখলে?

দালাল ঃ বাজার মাইরি প্রথম দিনেই বেশ গরম। চোঙা ফুঁকতে না ফুঁকতেই হুড়হুড় ক'রে লোক আসছে। এই নিন আপনার মাল।

ম্যানেজার ঃ ক'জন এনেচো? তিনজন? বেশ, বেশ— ভালো। প্রথম দিনেই তিনজন! মনে হচ্ছে ব্যবসা এখানে জ'মে যাবে! ভালোই সাপ্লাই পাওয়া যাবে দেখছি!

দালাল ঃ সাপ্লাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ম্যানেজার বাবু। অঢেল সাপ্লাই মিলবে। কত চান?

ম্যানেজার ঃ সাপ্লাই যত বাড়বে, ততই আমাদের পোয়া বারো।

দালাল ঃ সাপ্লাই বাড়বে না মানে? ঘরে ঘরে অনাহার, অভাব-অনটন, ব্লাডব্যাঙ্কের খবরটা ভালো ক'রে একবার র'টে যাক, দেখবেন— সকাল থেকেই এখানে রক্ত বেচার জন্যে লাইন পড়বে।

ম্যানেজার ঃ তাহলে আর কী! মন দিয়ে কাজ ক'রে যাও। যত পারো লোক ধ'রে আনো আর দু'হাতে কাঁচা পয়সা রোজগার করো, তোমার আর ভাবনা কী!

দালাল ঃ আজকের মতো আমার কাজ শেষ। প্রথম দিনেই তিন-তিনটে শিকার ধ'রে দিয়েছি। কমিশনটা এবার বুঝিয়ে দিন, বাড়ি চ'লে যাই।

ম্যানেজার ঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও— অত তাড়াহুড়ো কোরো না। সাহেব আসুন, খদ্দেররাও আসুক, ব্যাঙ্ক চালু হোক, হিসেবপত্তর হোক, তবে তো তোমার কমিশন পাবে।

দালাল ঃ ওরে ব্বাবা! সে যে কয়েক ঘণ্টার ধাক্কা!

ম্যানেজার ঃ না, না— সাহেব এখুনি এসে পড়বেন।

দালাল ঃ কিন্তু এরা? এদের কোথায় রাখবো?

ম্যানেজার ঃ ঐ খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, ওখানে ওরা বসুক!

দালাল ঃ এই— চলো হে সব, ওখানে বসবে চলো!

ম্যানেজার ঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও— আগে এদের নাম-ঠিকানাগুলো খাতায় তুলে নিই— (এক টিপ নস্যি নিয়ে) হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!

দালাল ঃ এঃ হেঃ হেঃ, আমার গায়েই হাঁচলেন।

ম্যানেজার ঃ স্যরি, বুঝতে পারিনি। কী যেন নাম মক্কেলদের?

দালাল ঃ (ভারতকে) এই— নাম বলো।

ভারত ঃ এজ্ঞে বাবু ছিরি ভারত চন্দর দাস।

ম্যানেজার ঃ নামখানা দেখছি পেল্লাই। একেবারে ভাবতচন্দর। তা, বাপের নাম কী? আমেরিকা, না রাশিয়া?

দালাল ঃ দুটোই! হেঃ হেঃ—

ভারত ঃ এজ্ঞে কী বললেন বাবু?

দালাল ঃ বাপের নাম বলো—

ভারত ঃ এজ্ঞে— ইচ্ছর কালীচরণ দাস।

ম্যানেজার ঃ সাকিন কোথায়? মানে কোথায় থাকো?

ভারত ঃ এজ্ঞে রাস্তায়।

ম্যানেজার ঃ রাস্তায়! সে কী!

ভারত ঃ এজ্ঞে— হুই বড় রাস্তায় লাল মতন বাড়িটার বারান্দার তলায় থাকি বাবু। আমি একা নই— আমার মতুন আরো অনেকে—

ম্যানেজার ঃ হুঁ! তার মানে পুরোদস্তুর ভ্যাগাবণ্ড! ভালোই হয়েছে, সস্তায় সাপ্লাই মিলবে।

ভারত ঃ এজ্ঞে চিরটাকাল আমি রাস্তায় ছিলাম না বাবু, হুই ইছামতী নদীর পাড়ে বাবুগঞ্জের জেলেপাড়ায় ঘর ছিল মোর। মহাজনের তাড়া খেয়ি তিন বছর হলো গেরাম ছাড়ি শউরে এয়েছি বাবু—

ম্যানেজার ঃ থাক্ থাক্— তোমার শহরে আসার ইতিহাস কেউ শুনতে চায়নি ভারত চন্দর! তুমি চুপ করো— (রতনকে) নাম কী?

রতন ঃ আমার নাম রতন সামন্ত, বাবার নাম গজেন সামন্ত, ঠিকানা তেরো নম্বর লেবুবাগান বস্তি। আর কিছু জানতে চান?

ম্যানেজার ঃ ওরে ব্বাবা! এ যে দেখছি জাতকেউটে। ফণা তুলেই আছে!

রতন ঃ ছ'মাস কারখানা লক-আউট। ঘরে একফোঁটা খাবার নেই।

ফণা তুলে থাকবো না তো কি হরিনাম করবো? তাও তো এখনও ছোবল মারিনি— ছাঁটাই শ্রমিকের বুকে অনেক বিষ জ'মে আছে।

ম্যানেজার : থাক্ থাক্— আর ছোবল মেরে কাজ নেই। তোমায় দেখেই আমার কাপড়চোপড় নষ্ট হবার উপক্রম, আর ভয় দেখিও না বাবা, তাহলে এবার নির্ঘাত হার্টফেল করবো।

দালাল : লোকটা ভীষণ ত্যাঁদোড় ম্যানেজার বাবু, একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবেন—

ম্যানেজার : তা, জেনেশুনে এমন একটা ডেঞ্জার‍্যাস লোককে এখানে নিয়ে এলে কেন?

দালাল : কী করবো? প্রথম দিন, যা পাওয়া যায়—

ম্যানেজার : অতি লোভেই তুমি মরলে। এর জন্যে শেষকালে না ঝুটঝামেলা বাঁধে, ব্যবসায় না লালবাতি জ্বালতে হয়।

দালাল : না, না— তা হবে কেন?

ম্যানেজার : আর হবে কেন? এসব কলকারখানার ওয়ার্কারদের আমি বড় ভয় করি। এরা কথায় কথায় ইউনিয়ন দেখায়।

রতন : আচ্ছা, রক্তের দাম আপনারা কত ক'রে ধরেছেন? মানে এক বোতল রক্ত দিলে আমি কত পাবো?

ম্যানেজার : এ কী! এ যে প্রথমেই দাম জানতে চায়!

রতন : কেন চাইবো না? আপনারা আমার শরীর থেকে রক্ত নেবেন— আর ন্যায্য দাম দেবেন না?

ম্যানেজার : হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবো, ভালো দামই দেবো'খন! ওঃ এর সঙ্গে কথা বলতেই আমার বুক কাঁপছে। এ শালা নির্ঘাৎ মিছিল করতো, স্লোগান দিতো—

রতন : ঘেরাও পর্যন্ত করেছি। ঘেরাওয়ের সময় আপনার মতো মক্ষীচুষ ম্যানেজারের মাথায় লোহার ডাণ্ডাও বসিয়ে দিয়েছি— বুঝেছেন?

ম্যানেজার : ওরে বাবারে, শুনেই আমার প্রেশারটা চড়চড় ক'রে বেড়ে গেল! (দালালকে) —তুমি আর লোক পেলে না? যত রাজ্যের খুনে গুণ্ডাকে ধ'রে এনেছো?

দালাল : খুনেই হোক, আর গুণ্ডাই হোক— কী রকম তাগড়াই চেহারা দেখেছেন? একেবারে লোহাপেটা মজুর, প্রচুর রক্ত মিলবে।

ম্যানেজার : তার আগেই না শালা এখানেও ইউনিয়ন বানিয়ে ফ্যালে!

তাহলে এখানেও লক-আউট হয়ে যাবে, তার মানে তোমার আমার দু'জনেরই কপাল পুড়বে।

দালাল ঃ অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? দু'একবার রক্ত দিক, দেখবেন ওর এত তেজ কোথায় উবে যায়, একেবারে নেতিয়ে পড়বে, চিঁ চিঁ ক'রে কথা বলবে, যদ্দিন রক্ত গরম আছে তদ্দিনই লম্ফঝম্ফ করবে, আর যখন রক্ত চুষে একে একেবারে ছিবড়ে বানিয়ে দেবো, তখন দেখবেন, ওর মতো শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট জীব আর ভূভারতে নেই—পুরোদস্তুর গান্ধীর চেলা ব'নে যাবে।

ম্যানেজার ঃ হ'লেই ভালো। (তরুণকে) —তোমার নাম কী ভাই?

তরুণ ঃ তরুণকুমার চক্রবর্তী।

ম্যানেজার ঃ বয়েস দেখছি নেহাতই কম! একেবারে কচি ছেলে! এত কম বয়সে, রক্ত বেচতে এলে কেন? বাড়ি থেকে হাতখরচ দেয় না বুঝি! সিগারেট-বিড়ির পয়সাও পাও না?

তরুণ ঃ আমি বিড়ি-সিগারেট খাই না। আমার কোনো হাতখরচ নেই।

ম্যানেজার ঃ কী করো? কলেজে পড়ো নিশ্চয়ই—

তরুণ ঃ পড়তাম। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর পয়সার অভাবে কলেজ ছেড়ে দিয়েছি। এখন ঘরে ব'সে চাকরির দরখাস্ত লিখি আর ডাকে পাঠাই— কিন্তু কোনো জবাব পাই না।

ম্যানেজার ঃ এ যে বড়ই রোগা দুর্বল শরীর! এমনিতেই শরীরে রক্ত কম। একে নিয়ে এলে কেন? রক্ত নিতে গিয়ে শেষকালে না কোনো কেলেঙ্কারী হয়—

দালাল ঃ আরে, আমি কী করবো? এ তো নিজে থেকেই এলো, যেচে যদি কেউ হাড়িকাঠে গলা দেয় তো আমি কী করতে পারি?

তরুণ ঃ ভাববেন না রক্ত বেচে আমি সিনেমার টিকিটের দাম জোগাড় করতে এসেছি। সব জেনেশুনেই এখানে এসেছি স্রেফ আমার সংসারের মুখ চেয়ে। এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। বেকার হয়ে বুড়ো বাপের ঘাড়ে ব'সে খাওয়ার চেয়ে রক্ত বেচা অনেক ভালো। দোহাই— আমার বয়েস কম ব'লে আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না!

দালাল ঃ না, না— ফেরাবো কেন? এখানে যখন একবার এসে পড়েছো, তখন ছিবড়ে না ক'রে তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না।

ম্যানেজার ঃ সাহেবের আসার সময় হয়ে গেছে, যাও— এদের খাঁচায় পুরে দাও।

রতন ঃ তার মানে? আমাদের খাঁচায় পোরা হবে কেন? আমরা কি তাহলে মানুষ নই? জানোয়ার?

ম্যানেজার ঃ ওঃ, এ দেখছি পদে পদে গণ্ডগোল বাঁধাচ্ছে! দ্যাখো বাপু, স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি— ঐ খাঁচায় ঢুকতে না চাইলে তুমি চ'লে যেতে পারো, তোমার রক্ত আমরা নেবো না।

রতন ঃ ও, তাহলে পেটের জ্বালায় ব্লাডব্যাঙ্কে যারা রক্ত বেচতে আসে, তারা আপনাদের চোখে মানুষ নয়— চিড়িয়াখানার জন্তু? ঐ জন্যে খাঁচায় ঢোকাতে চান?

ম্যানেজার ঃ নাঃ, এর সঙ্গে কথায় পারবো না। যত কথা বলছি— ততই আমার মাথাটা বনবন ক'রে ঘুরছে।

দালাল ঃ (রতনকে) —কেন মিছিমিছি মাথা গরম করছো ভাই? সামান্য সেন্টিমেন্ট দেখাতে গিয়ে নিজের রোজগারটাও মাটি করবে, আমারও কমিশনটা মার যাবে।

ভারত ঃ (রতনকে) চলো ভাই— মাথা গরম করতি নাই।

দালাল ঃ ভেবে দ্যাখো, আজকে রক্ত বেচে টাকা আনলে তবে তোমার বৌ-ছেলেমেয়ে খেতে পাবে। রক্ত দিলেই কড়কড়ে টাকা পাবে, ভেবে দ্যাখো—

ভারত ঃ গরিব মাইন্‌সের রাগ থাকতি নাই। মান-অপমান গায়ে লাগে না মোদের।

দালাল ঃ চলো, চলো সবাই— ওখানে গিয়ে বসবে চলো। সময় হ'লেই তোমাদের একে একে ডাক পড়বে।

[দালাল ওদের তিনজনকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়।]

ম্যানেজার ঃ ওঃ, শালারা বকবক ক'রে মাথাটা একেবারে গুলিয়ে দিয়েছে: রক্ষে করো বাবা, আর এখানে পার্টি-পলিটিক্স করা লোকজনকে ঢুকতে দিচ্ছি না! তাতে যদি রক্ত বেচার মতো লোক না-ও পাওয়া যায়— সেও-ভি আচ্ছা।

দালাল ঃ আর আমি থাকতে পারবো না ম্যানেজার বাবু, এবার আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিন, আমি কেটে পড়ি।

ম্যানেজার ঃ আহা— অত ব্যস্ত হবার কী আছে? সাহেব এক্ষুণি চ'লে আসবেন—

দালাল ঃ গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছি। ঐ বুঝি সাহেব এলেন—

ম্যানেজার ঃ চলো, চলো— তাড়াতাড়ি চলো! সাহেবকে নিয়ে আসি।

[ম্যানেজার ও দালালের দ্রুত প্রস্থান]

ভারত ঃ আচ্ছা ভাই— আমি তো জেবনে অক্ত বিক্কিরি করি নাই! খুব ব্যথা লাগবে, তাই না? মরি যাবো না তো ভাই?

রতন ঃ না না— মরবে কেন? গরিব মানুষ অত সহজে মরে না! আমি এর আগেও অন্তত ছ'বার রক্ত বেচেছি। কারখানা লক-আউট হবার পর তো ঐ রক্ত বেচেই সংসার চলেছে আমার। তবে সরকারী হাসপাতালগুলোয় বারবার রক্ত বেচতে দেয় না। শালাদের আবার বড় নিয়মের কড়াকড়ি। পেটে ভাত দিতে পারে না— আইন দেখায়। সাধে কি আর এইসব দু'নম্বরী প্রাইভেট কারবারে আসি?

তরুণ ঃ জানেন, আজকে আমার রক্ত না বেচে উপায় নেই। আমার মা দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। পয়সার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না। আজকে ক'টা টাকা পেলে মা'র জন্যে ওষুধ আর ফলমূল কিনে নিয়ে যাবো।

রতন ঃ আরে ভাই, সবারই এক অবস্থা! আমার ছেলেমেয়েরাও দিনের পর দিন আধপেটা খেয়ে আছে! বলো দেখি ভাই, কোন্ বাপ তার ছেলেমেয়ের কষ্ট সহ্য করতে পারে?

ভারত ঃ ঠিক কতা কইচো ভাই। ছেলেপিলে না খেয়ি মরবে, এটা কুন্ বাপ দেখতি পারে?

রতন ঃ তাই তো ঠিক করেছি— বাঁচার অন্য কোনো রাস্তা যখন খোলা নেই, তখন শরীরের রক্ত বেচেই ওদের মুখে ভাত তুলে দেবো, তাতে যদি আমি তাড়াতাড়ি ম'রেও যাই, তবু দুঃখ নেই। জানবো, মরার আগেও আমি ছেলেমেয়ের মুখে দু'টি ভাত তুলে দিতে পেরেছি।

ভারত ঃ আমিও তাই ভাবি ভাই; মরি যাই— তাতে কুনো দুঃখু নাই, বরং মরাই মোদের বাঁচনের পথ—

রতন ঃ গ্রামে তো ভালোই ছিলে, মরতে কেন শহরে এলে?

ভারত ঃ না রে ভাই, ভালো থাকলি কি আর শউরে আসি? গরিব মাইনসে কুথাও ভালো নাই, না শউরে— না গেরামে—

তরুণ ঃ তবু নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে এলে কেন?

ভারত ঃ কী করবো বলো? মহাজনের দেনা, মোর সর্বস্ব গ্রাস করিও তার খিদা মেটে নাই, মিথ্যি দেনার দায়ে গোবিন্দ নস্কর

মোর ভিটে-জমি কেড়ি নিলো, মহাজন তো নয়, যেন এ্যাকখান অক্তচোষা জোঁক। গেরামে থাকতি আর মন চাইলোনি। বৌ-ছেলের হাত ধরি পথে বেরোয়ে পড়লাম। তারপর স্রোতের শ্যাওলার মতো ভাসতি ভাসতি তুমাদের এই শউরে আসি আস্তায় ডেরা বাঁধলাম।

তরুণ : শহরে এসেও কি সুখে আছো? এখানে এসে তো প্রায় ভিখিরি বনেছো?

ভারত : তাই তো বলচি রে ভাই— কুথাও নিস্তার নাই, কুথাও না। গেরামে মহাজন গোবিন্দ নস্কর অক্ত চোষে, আর শউরে ঐ বাবুর দল।

রতন : তোমার মহাজনের মতো আমাদের কারখানার মালিকও শ্রমিকের রক্ত চুষে মুনাফার পাহাড় তৈরি করে। এস. কে. কানোরিয়ার নাম শুনেছো? শালা একটা আস্ত ডাকাত। আমাদের হাড়ভাঙা খাটুনীর পয়সা মেরে দিয়ে বাড়ি-গাড়ি-টাকার কাঁড়ি তৈরি করেছে শয়তান। অমন ধড়িবাজ বদমাইস এ দুনিয়ায় খুব কমই আছে।

তরুণ : ইন্টারভিউ দেবার জন্যে মাঝে মাঝে আমি যে-সব আমলাদের মুখোমুখি হতাম, তাদের চোখের দৃষ্টিতেও বীভৎস শোণিত পিপাসা দেখেছি আমি।

রতন : ঠিক বলেছো, অফিসারগুলোও শালা রক্তচোষা জোঁকেরই মতন।

তরুণ : সারা দেশটাই যেন একটা বিরাট ব্লাডব্যাঙ্ক। আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে।

[ব্লাডব্যাঙ্কের মালিক পাতিরাম পতিতুণ্ড, ম্যানেজার, ও দালাল ঢোকে]

পতিতুণ্ড : এদিকে তাহলে সব ব্যবস্থাই কমপ্লিট?

ম্যানেজার : হ্যাঁ স্যার, তিনজন ব্লাডডোনারও ফিট, ওদের সঙ্গে করতে পারেন মিট।

পতিতুণ্ড : এখন নয়, পরে ওদের করবো টিট—

ম্যানেজার : যা বলেন, আমি দাসানুসাস কীটস্য কীট—

দালাল : মোটেই নয়, তুমি ভিজে বেড়াল, মস্ত বড় চীট—

পতিতুণ্ড : থামো এবার— নিজেদের মধ্যে কোরো না খিটখিট,

ম্যানেজার : সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ। এবার খদ্দেররা এলেই হয়।

পতিতুণ্ড : আয় খদ্দের ন'ড়ে-চ'ড়ে, ডলার রুবলের পিঠে চ'ড়ে। খদ্দেরদের নিয়ে আমার ভাবনা নেই। পাতিরাম পতিতুণ্ডের সব কাজকারবারই ফরেনের সঙ্গে, সাহেব-মেমেরাই আমার সবচেয়ে বড় খদ্দের।

দালাল : সত্যি স্যার! মেমেরা আসবে এখানে?

পতিতুণ্ড : বাপের জন্মে মেম দেখিসনি বুঝি? মেমের কথাটা শুনেই জিভ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়লো দেখছি।

ম্যানেজার : আর যা-ই করো বাপু, কোনো মেমের প্রেমে কখনও পোড়ো না। বেটিদের গায়ে যা বোটকা গন্ধ, সাতজন্মেও চান করে না—

পতিতুণ্ড : থাক্ থাক্— মেমেদের নিন্দে কোরো না, তারা আমার কারবারের লক্ষ্মী। আমার গাঁটছড়া ফরেনের সঙ্গে বাঁধা, তোমাদের এই ইণ্ডিয়া থুড়ি ভারতবর্ষকে আমি থোড়াই কেয়ার করি, ইণ্ডিয়ার রক্ত চুষে সোজা পাঠিয়ে দেবো রাশিয়ায়, আমেরিকায়— আর দু'হাতে মুনাফা কুড়োবো, হাঃ হাঃ।

দালাল : কিন্তু স্যার, আপনার আগের কারবারে না-কি লালবাতি জ্ব'লে গেছে?

পতিতুণ্ড : সে দুঃখের কথা আর কী বলবো ভাই, সে অনেক কাহিনী। ফরেনে মড়া চালান দিয়ে বেশ টু পাইস ইনকাম হচ্ছিল আমার।

ম্যানেজার : আপনি মড়া চালান দিতেন স্যার?

পতিতুণ্ড : হ্যাঁ গো ঘাটের মড়া,— তাই দিতাম।

ম্যানেজার : স্যার, আপনি আমায় ঘাটের মড়া বললেন?

পতিতুণ্ড : হ্যাঁ গো বুড়ো ভাম, তাই বললাম।

দালাল : (গান গায়)

বলি ও বুড়ো ভাম, ঘাটে যেতে দেরি কত তোর? / তুই মরলে 'পরে নাচবো আমি সারা জীবন ভর।

ম্যানেজার : দেখেছেন স্যার, আমায় নিয়ে গান বেঁধেছে—

পতিতুণ্ড : ঘাটের মড়া, আমার মড়া চালানের ব্যবসার সময় পেতাম যদি তোমায়, তাহলে জ্যান্ত মড়া ব'লে সোজা মস্কোয় চালান দিতাম।

দালাল : আপনার মড়া চালানের ব্যবসার কথা বলুন স্যার।

পতিতুণ্ড : আমার কোম্পানির নাম ছিল 'লাসবিপণি'— বুঝেছো? সারা পৃথিবীতে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। অত্যন্ত সস্তায় একেবারে গান্ধীবাদী অহিংস পদ্ধতিতে এমন আগমার্কা খাঁটি মড়া আর কোনো কোম্পানি তৈরি করতে পারতো না। আর সাপ্লাইও ছিল অঢেল, একেকটা দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে লক্ষ লক্ষ মড়া পেতাম— তাতেও যদি সাপ্লাইয়ে টান পড়তো তখন আমার পিসি।

ম্যানেজার : আপনার আপন পিসি স্যার?

পতিতুণ্ড : আপন ব'লে আপন! একেবারে বরের ঘরের পিসি আর কণের ঘরের মাসি, সে হলো আমার পিসি! সেই পিসির গুণ্ডারা আমাকে বাদবাকি মড়া সাপ্লাই দিতো। একেকটা ক'রে বারাসত, বরানগর, বেলেঘাটা, বহরমপুর— আর শতশত জোয়ানমদ্দ ছেলের লাস! আহা, কত মুনাফাই করেছি তখন! কিন্তু হায়, আমার কপালে অত সুখ সইলো না।

ম্যানেজার : ভাববেন না স্যার, আবার এখন আপনার ব্যবসা ঠেকায় কে?

পতিতুণ্ড : আরে ভাই, সেজন্যেই তো আবার কপাল ঠুকে নেমে পড়েছি। তবে এবার আর লাসবিপণি নয়, মড়ার কারবারটা শেষপর্যন্ত বড় বেশি জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। এবার আর ঐ লাইনে নয়। জ্বলজ্যান্ত মানুষকে মড়া বানানো অনেক ঝঞ্ঝাট, এবার তার বদলে জ্যান্ত মানুষের রক্ত চুষে তাকে ছিবড়ে বানিয়ে দেওয়া! লাসবিপণির বদলে প্রাইভেট ব্লাডব্যাঙ্ক, গভর্ণমেন্ট রেজিস্টার্ড— হাঃ হাঃ।

দালাল : কিন্তু স্যার, লাসবিপণির মতো আপনার ব্লাডব্যাঙ্কেও লাল বাতি জ্বলবে না তো?

পতিতুণ্ড : কক্ষণো না। সবদিক ভেবেচিন্তেই এবার আমি কারবারে নেমেছি। বিদেশের বাজারে আবার চড়া দামে মানুষের রক্ত বিকোতে শুরু করেছে।

ম্যানেজার : কেন স্যার?

পতিতুণ্ড : কেন— বোঝো না! মদন! জানো না, সারা দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধবিগ্রহ-হাঙ্গামা-হুজ্জোত লেগে গেছে— তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রায় বাঁধে বাঁধে— এখনই তো রক্তের দরকার। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের দেহে রক্ত জোগাবে কে?

দালাল : (স্লোগানের ভঙ্গিতে) পাতিরাম পতিতুণ্ড, আবার কে?

পতিতুণ্ড : গুড, ভেরি গুড, মাথায় ঢুকেছে দেখছি। হ্যাঁ— স্রেফ এই কারণেই আমার ব্যবসা আজ রমরমিয়ে চলবে। যত যুদ্ধ বাঁধবে, ততই আমার পোয়া বারো। ভিয়েৎনামে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন সবচেয়ে বেশি রক্তের চাহিদা ছিল আমেরিকার। এখন আমেরিকা ঠুঁটো জগন্নাথ বনেছে। আর তার জায়গা নিয়েছে রাশিয়া। আফগানিস্তানে রাশিয়ান সৈন্য— বিদ্রোহীদের হাতে যত বেশি ঝাড় খাবে, ততই রাশিয়ান খদ্দেররা আমার কাছে আসবে। তার ওপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো শুরু হয়েছে পোল্যাণ্ডের গণ্ডগোল।

দালাল : কিন্তু স্যার, রাশিয়ানদের হঠাৎ এত রক্তের দরকার পড়লো কেন?

পতিতুণ্ড : দরকার হবে না! রাশিয়ার রক্তপিপাসা যে আজ চরমে পৌঁছেছে। দুনিয়ায় যেখানে যত ঝঞ্ঝাট বেঁধেছে সেখানেই শালারা নাক গলিয়ে বসেছে, সে আফগানিস্তানই হোক, কী কাম্পুচিয়াই হোক, কী আজকের পোল্যাণ্ডই হোক— সব জায়গাতেই শালারা ময়দানে নেমে পড়েছে।

ম্যানেজার : ছি ছি ছি স্যার— আপনি শেষপর্যন্ত রাশিয়াকে শালা বললেন? মনে বড় ব্যথা পেলাম।

পতিতুণ্ড : রাশিয়াকে শালা বলেছি না-কি?

দালাল : হ্যাঁ স্যার, একবার নয়— দু'-দু'বার বলেছেন।

পতিতুণ্ড : তাই না-কি! এই নাক মুলছি কান মুলছি। শেষকালে আমি রাশিয়াকে শালা বলেছি— ছি ছি— আমার যে নরকেও গতি হবে না।

ম্যানেজার : রাশিয়া হলো আমাদের সবচেয়ে বড় খদ্দের, আর খদ্দের হলো বাপের সমান, বাপ কি কখনও শালা হয় স্যার?

পতিতুণ্ড : না, হয় না— বাপ কখনও শালা হয় না। তাই আমাদের রাশিয়ান বাবারা—

দালাল : ক'টা বাবা স্যার?

পতিতুণ্ড : মানে?

দালাল : আপনি বহুবচন ব্যবহার করলেন কি-না। তাই জানতে চাইছি ক'টা বাপ?

পতিতুণ্ড : সে অনেক, সে অনেক। আমাদের অনেক বাপ, অনেক অনেক খদ্দের। একটা বাপে কি আর ব্যবসা চলে?

ম্যানেজার : এ লাইনের নিয়মই তাই। আমেরিকা একটা বাপ, রাশিয়া আরেকটা বাপ—

পতিতুণ্ড : আরও আগে ইংরেজরাও বাপ ছিল—

দালাল : কিন্তু আপনি তো রাশিয়ান বাবারা বলেছেন।

পতিতুণ্ড : ওটা গৌরবে বহুবচন। যে-সে বাপ তো নয়, রাশিয়ান বাপ, তার ভীষণ ভারি চাপ, প্রগতির পয়লা ধাপ, গায়ে লাগে তার তাপ, বুক ফুলিয়ে করে পাপ, এমনি জবর্‌দস্ত্‌ বাপ।

ম্যানেজার : থাক্‌ স্যার, এসব রাজনীতির কথা থাক্‌। দিনকাল ভীষণ গোলমেলে। কে কোত্থেকে শুনে ফেলবে— কে জানে! আপনি বরং আমাদের ব্লাডডোনারদের দেখে নিন, মাল ঠিক আছে কি-না।

পতিতুণ্ড : নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই— ঐ খাঁচার চিড়িয়াগুলো তো?

দালাল : হ্যাঁ স্যার, ভালো ক'রে দেখে নিন— প্রথম দিনেই আমি তিনজনকে জোগাড় ক'রে এনেছি। পরে আরও মিলবে।

পতিতুণ্ড : বাঃ, বাঃ, বেশ ভালোই কাজ করেছো, তবে এদের মধ্যে গেঁয়োভূতটাকে জোটালে কোত্থেকে? শালার যা হাড়জিরজিরে চেহারা, তাতে আখ-মাড়াই কলে ফেললেও এক বোতলও রক্ত বেরুবে কি-না সন্দেহ। আর একটা তো একেবারে কচি ছেলে, এখনও ভালো ক'রে গোঁফও ওঠেনি—

দালাল : কিন্তু বাকি লোকটাকে দেখুন স্যার, কী মোটাসোটা তাগড়াই চেহারা দেখেছেন! ও একাই বাকি দু'জনের রক্তের ঘাটতি পুষিয়ে দিতে পারবে, কারখানার মজুর, লোহা পিটিয়ে খেতো, শরীরে যেমন শক্তি তেমনই অঢেল রক্ত।

পতিতুণ্ড : হ্যাঁ এই ধর্মের ষাঁড়টাকে দিয়ে অবশ্য ভালোই কাজ চলবে, অনেক দিন ধ'রে একে চুষে চুষে খাবো— হাঃ হাঃ

ম্যানেজার : কিন্তু স্যার লোকটা ভীষণ ডেঞ্জারাস। কারখানায় ইউনিয়নবাজি ক'রে লক-আউট করিয়েছে। এখন না এখানেও আবার ইউনিয়ন বানিয়ে বসে।

পতিতুণ্ড ঃ এখানে বানাবে ইউনিয়ন, হাসালে বাছাধন! কীসের ইউনিয়ন? রক্তবিক্রেতা সমিতি! হাঃ হাঃ—

(ওরা সবাই হাসতে থাকে)

রতন ঃ এই লোকটা কে? আমাদের এমনভাবে দেখছে কেন? আমরা কি চিড়িয়াখানার জন্তু?

তরুণ ঃ মনে হচ্ছে— এই লোকটাই মালিক

ভারত ঃ মোর মনে সন্দো হতিচে— উয়ারে য্যানো আমি চিনি—

রতন ঃ আরে তাই তো, আমারও লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

ভারত ঃ ও মা, এ তো গোবিন্দ নস্কর গো— শালা মহাজন—ফতুয়া আর কাপড় ছাড়ি ইখানে এসি কোট প্যাণ্ট পরি সাহেব সাজিচে! শালা রক্তচোষা জোঁক একখান!

পতিতুণ্ড ঃ (গ্রাম্য ভঙ্গিতে) দ্যাখ্ ভারত, বেশি আইন দেখাবিনে, সোজা কতা ব'লে দিচ্ছি— তিন দিনের মধ্যে তুই যদি তোর ভিটেমাটি ছেড়ে চ'লে না যাস, তাহলে তোকে মারতে মারতে এ গ্রাম থেকে তাড়াবো। জলে বাস ক'রে কুমিরের সাথে বিবাদ করার মজাটা টের পাবি, বেশি যদি চালাকি করিস, লাল পার্টির বাবুদের কাচে গিয়ে যদি আমার নামে নালিশ করতে যাস, তবে তোর চামড়া চিরে ডুগডুগি বানাবো— শালা। মনে রাখিস, আমার নাম গোবিন্দ নস্কর— এই বাবুগঞ্জের সবক'টা হাড়-হাভাতের টিকিটি আমার কাছে বাঁধা, সবার ঘটি-বাটি পর্যন্ত দেনার দায়ে আমার সিন্দুকে পোরা আছে। দারোগা, পুলিশ, জজ, ম্যাজেস্টর, মন্তিরি, এমেলে— সব আমার ট্যাকে গোঁজা, আমার সঙ্গে চালাকি করতে যাসনি ভারত, ধনে-প্রাণে মারা পড়বি।

ভারত ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো গোবিন্দ নস্কর, শউরে এসে বেশ বদলেচে, কিন্তু আমার চখি ধুলো দিতি পারবেনি, ওরে আমি ঠিক চিনেচি, ঐ গোবিন্দ নস্করই মোরে গেরাম- ছাড়া করিচে।

রতন ঃ না না, ও তোমাদের গোবিন্দ নস্কর নয়, ও আমাদের কারখানার মালিক এস. কে. কানোরিয়া। শয়তানটা আবার এখানে এসে ভোল বদলে নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে, ওর মতো ধড়িবাজ খুব কম আছে, শালা শ্রমিকের রক্ত চুষে মুনাফার পাহাড় তৈরি করেছে।

পতিতুণ্ড : (অবাঙালির ভঙ্গিতে) —দেখো রোতনবাবু, তুমলোগোঁকো হামি সাফ সাফ ব'লে দিচ্ছি— তুমাদের কোনো মাঙ হামি মানবো না, এক পয়সা মজুরি-ভি বাড়াবো না, ব্যাস! সিধা বাত্। তুম্‌লোগ ইউনিয়ন ছোড় দো, ইউনিয়ন নেহি ছোড়েগা তো হাম ফ্যাক্টরি লকআউট কর্ দেগা, হাঁ। আরে ইতনা বড়া বড়া বাত্ মত্ বোলো। ও কানুন-ভি হামি বহুত দেখেছি। ও কোর্ট-কাছারি পুলিশ মিলিটারি সোব হামার পাকিট-মে হ্যায়। তুম্‌লোগ ক্যা করোগে? যাও যাও, হিঁয়াসে হট যাও, নেহি তো পুলিশ ডাকবো আউর গোলি চালাবার হুকুম-ভি দিবো— যাও শালে ভাগো।

তরুণ : আপনি বলছেন— এ আপনাদের কারখানার মালিক, কিন্তু না, আমার মনে হয়— আমিও ওকে বহুবার দেখেছি; আমি যখন একটার পর একটা অফিসে চাকরির খোঁজে যেতাম, তখনই ওকে দেখতাম।

পতিতুণ্ড : কী চাই? না না— আমার এখানে কোনো চাকরিটাকরি খালি নেই— যাও চ'লে যাও! —হ্যালো, কে? মুখার্জি? তোমার ভাগ্নেকে পাঠিয়ে দাও, জুনিয়ার অফিসারের পোস্টে একটা ভ্যাকেন্সি হয়েছে, নামকাওয়াস্তে একটা ইন্টারভিউ নিয়ে তোমার ভাগ্নেকে ঢুকিয়ে নেবো, তার বদলে তুমি তোমাদের কোম্পানিতে আমার শালীর ছেলেটাকে ঢুকিয়ে দিও, তাহলেই শোধবোধ হয়ে যাবে। রাখছি। কী ব্যাপার, তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো? বললাম তো চাকরি খালি নেই! গেট আউট, আই সে গেট আউট, বেয়ারা—

ভারত : চিনেছি চিনেছি— এই তো গোবিন্দ নস্কর, শালা মহাজন।

রতন : শালা মালিক কানোরিয়া— হারামী

তরুণ : সেই ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ অফিসারটা—

রতন : এই শালাই আমাদের রক্ত চুষে খায়—

ভারত : এই মহাজনটাই গরিব মাইন্‌সের সর্বনাশ করিচে—

তরুণ : এরাই বেকার সমস্যা জিইয়ে রাখে—

পতিতুণ্ড : এ কী! এরা সবাই আমাকে দেখে এমন খেপে উঠেছে কেন?

ম্যানেজার : স'রে আসুন স্যার, স'রে আসুন! মনে হচ্ছে ঐ হোঁৎকা মজুরের বাচ্চাটাই সবাইকে উস্কেছে— ব্যাটা খুনে ডাকাত!

পতিতুণ্ড : না না— এরা আমার কিছু করতে পারবে না। আমি

পাতিরাম পতিতুণ্ড, রাশিয়া আমেরিকা আমার পক্ষে, এরা চেঁচামেচি ক'রে আমার কী করবে?

দালাল : এই— তোমরা চেঁচাচ্ছো কেন? স্যার রেগে গেলে কিন্তু তোমাদের সব-ক'টাকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে জেলে পোরা হবে।

ম্যানেজার : চ'লে আসুন স্যার, ঝুটঝামেলায় না থাকাই ভালো!

[বাইরে কলিংবেলের আওয়াজ]

পতিতুণ্ড : এই দ্যাখো, আমার খদ্দেররা বুঝি এসে পড়েছে—

ম্যানেজার : চলুন স্যার— তাঁদের নিয়ে আসি। এখানে বেশিক্ষণ না থাকাই ভালো।

দালাল : তা-ই চলুন স্যার— [তিনজনে চ'লে যায়]

রতন : এই একই লোক একদিকে আমাদের রক্ত চুষে ছিবড়ে বানিয়েছে, আবার অন্যদিকে ব্লাডব্যাঙ্ক খুলে সেই রক্ত বিদেশে চালান দিচ্ছে।

তরুণ : কখনও সে গ্রামে জোতদার-মহাজন সেজে নিরন্ন কৃষকের রক্তপান করে, কখনও-বা মিল মালিকের ভূমিকায় শ্রমিকের খুন ঝরায়—

ভারত : এ কুথায় আমরা এসে পড়লাম গো, এ যে কয়েদখানা!

তরুণ : সারা দেশটাই তাই— সবাই আমরা খাঁচায় বন্দী গিনিপিগ!

[রাশিয়ান খদ্দের লুটলিয়াকভকে নিয়ে ওরা ফিরে আসে]

পতিতুণ্ড : আসুন মিস্টার লুটলিয়াকভ, আমাদের মহান বন্ধুরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উদার দাক্ষিণ্যে আজই প্রাইভেট ব্লাডব্যাঙ্ক খোলা হলো, আজকের উদ্বোধনী দিবসে আপনার শুভাগমনে আমরা ধন্য হলাম।

লুটলিয়াকভ : আমি কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি করতে পারবো না মিস্টার পতিতুণ্ড।

পতিতুণ্ড : না না, আপনাকে মোটেই দেরি করতে হবে না মহামান্য। রক্ত আমার মজুতই রয়েছে। আপনি বললেই এনে দেবো?

লুটলিয়াকভ : সে কী বাসি রক্ত দেবেন? এমন তো কথা ছিল না। আমার একেবারে টাটকা রক্ত চাই। ফ্রিজের রক্ত আমি নেবো না।

পতিতুণ্ড : আপনাকে টাটকা রক্তই দেওয়া হবে স্যার, রক্ত মজুত আছে বলতে আমি বুঝিয়েছি রক্ত দেবার লোক মজুত আছে। ঐ যে ওরা রক্ত দেবে। একজন চাষি, একজন মজুর আর

একজন মধ্যবিত্ত যুবক। কেমন আইডিয়াল কম্বিনেশন দেখুন স্যার, যেন পুরো ভারতবর্ষের প্রতিচ্ছবি— এই তিনজনের রক্ত নেওয়া মানেই যেন সারা ভারতবর্ষের রক্ত শুষে নেওয়া, হাঃ হাঃ—

লুটলিয়াকভ : আপনার বক্তৃতা থামান। ভারতীয়দের এই এক দোষ। বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলে আর ছাড়তে চায় না। যান, যান, শিগ্‌গির রক্ত নিয়ে আসুন।

দালাল : খদ্দের দেখছি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের মালিককে একেবারে চাকরবাকরের মতো হুকুম করছে।

ম্যানেজার : করবে না? আমাদের মালিকেরও মালিক ওরা।

লুটলিয়াকভ : কই— রক্ত আনুন। এত দেরি করছেন কেন?

পতিতুণ্ড : বলুন স্যার, কত রক্ত আপনার চাই?

লুটলিয়াকভ : কত রক্ত মানে? আমার সব রক্ত চাই।

পতিতুণ্ড : সব রক্ত? তার মানে?

লুটলিয়াকভ : কানে কি কম শোনেন? এখানে যত রক্ত সাপ্লাই আসবে, সব আমি নেবো।

পতিতুণ্ড : সে কী স্যার! তাহলে অন্য খদ্দেরদের আমি কী দেবো?

লুটলিয়াকভ : আমিই আপনার একমাত্র খদ্দের। অন্যদের কিচ্ছু দেবেন না।

পতিতুণ্ড : না— মানে, অন্যদেরও তো আজ আসতে বলেছি।

লুটলিয়াকভ : দেখুন মিস্টার পতিতুণ্ড, আপনাকে আমি সেভেণ্টি ফাইভ পার্সেণ্ট অ্যাডভ্যান্স করেছি ইন ক্যাশ। এখন বাজে কথা আমি শুনবো না। সব রক্ত আমার চাই। কোনো ব্যাপারে কোনো ভাগাভাগিতে আমরা রাজি নই। আমরা যা নেবো, সব একাই নেবো। অন্য কাউকে কিচ্ছু নিতে দেবো না। আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা, কাম্পুচিয়াকে দেখেও কি আপনাদের শিক্ষা হয়নি?

পতিতুণ্ড : কিন্তু স্যার— আমি যে আমেরিকার মিস্টার স্যামকেও আসতে বলেছি।

লুটলিয়াকভ : হোয়াট? তার মানে? আমেরিকাকেও ডেকেছেন? আপনাদের তো স্পর্দ্ধা দিনকে-দিন বেড়ে চলেছে।

পতিতুণ্ড : কী করবো স্যার? মিস্টার স্যাম আমাদের পুরোনো খদ্দের।

লুটলিয়াকভ : আগে ছিল, এখন নয়। এখন আমিই একমাত্র খদ্দের। আপনাদের সঙ্গে এইরকমই চুক্তি হয়েছিল। এখন তো উল্টো কথা বললে শুনবো না।

পতিতুণ্ড : কী করবো স্যার? ব্যবসা করতে গেলে সবাইকেই হাতে রাখতে হয়।

লুটলিয়াকভ : সবাইকে খুশি রাখে বেশ্যারা! আপনিও কি তাই?

দালাল : ছি ছি— কানে আঙুল। মালিককে বেশ্যা বলেছে।

লুটলিয়াকভ : তাছাড়া আমেরিকা এত রক্ত নিয়ে কী করবে? ভিয়েতনামে ঝাড় খেয়ে ও তো এখন ঢোঁড়া সাপ. খোমেনিও তাকে লাথি মারে। কিন্তু আমরাই এখন সারা দুনিয়ার বাজার দখল করতে চলেছি। ভারতের সব রক্তই আমাদের চাই— কোনো ওজর-আপত্তি শুনবো না।

পতিতুণ্ড : আমি যে এখন কী করি, কোন্‌দিকে যাই!

ম্যানেজার : এঁকেই আজকের মতো সব রক্ত দিয়ে দিন স্যার, উনিই যখন আগে এসেছেন।

লুটলিয়াকভ : না, না, শুধু আজকে নয়, প্রতিদিন, চিরকাল ভারতের সব রক্ত আমরাই নেবো, কাউকে ছিটেফোঁটা ভাগও দেবো না।

পতিতুণ্ড : কী আর করা? এঁকেই সবটা দিয়ে দাও, মিস্টার স্যাম না হয় খালি হাতেই ফিরবেন।

[দ্রুত মিস্টার স্যাম ঢোকে]

স্যাম : আমি বোধহয় একটু দেরি ক'রে ফেলেছি তাই না মিস্টার পতিতুণ্ড?

লুটলিয়াকভ : এ কী স্যাম! তুমি এখানে কী ক'রে ঢুকলে?

স্যাম : তুমি আগে এসেছো ব'লেই দরজাটা খোলা পেয়ে গেলাম। তোমার পেছুপেছুই এসে পড়েছি লুটলিয়াকভ।

লুটলিয়াকভ : এসেও কোনো লাভ হবে না। তোমার কপালে কাঁচকলা জুটবে।

স্যাম : কী জুটবে সেটা আমি বুঝবো। মিস্টার পতিতুণ্ড, আমার রক্ত কই?

লুটলিয়াকভ : একফোঁটা রক্তও তোমাকে দেওয়া হবে না। সব আমার।

স্যাম : মামার বাড়ির আব্দার, সব তোমার! আমি কি আঙুল চুষবো?

লুটলিয়াকভ : হ্যাঁ, তা-ই চুষতে হবে। সব জায়গাতেই আজ তাই চুষছো, এখানেও চোষো।

স্যাম : দ্যাখো লুটলিয়াকভ, তোমার এত বাড়াবাড়ি কিন্তু ভালো না। ভেবো না, চিরকাল তুমি দাদাগিরি ক'রে যাবে আর

আমি মুখ বুজে সহ্য করবো! দ্যাখো না, ক'দিন বাদে তোমার দেশেই ঘটি উল্টে দেবো।

লুটলিয়াকভ : কী! তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছো?

স্যাম : জেনে রেখো, আমিই এদের পুরোনো খদ্দের, আমি যখন ভারতে প্রথম রক্ত নিতে আসি তখন তোমার টিকিটিও ধারেকাছে ছিল না।

লুটলিয়াকভ : তাতে কী হয়েছে? সব জায়গাতেই তো তুমি আগে একমাত্র খদ্দের ছিলে, সব জায়গা থেকেই তোমাকে তাড়িয়েছি— এখান থেকেও তাড়াবো।

স্যাম : তাড়িয়ে দ্যাখোই না একবার! ভেবো না— আমরা একেবারে শুয়ে পড়েছি, বরং আর ক'টা বছরের মধ্যে ক্রেমলিন থেকেই ঐ জালি লাল ঝাণ্ডাটা নামিয়ে দেবো। সিয়া সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। তাই এখানে আমাদের পিছনে লাগলে মজাটা দেখিয়ে দেবো।

লুটলিয়াকভ : আয় দেখি— মজা দ্যাখা— দেখি তোর কতখানি দৌড়—

দালাল : এ কী— এরা যে মারামারি শুরু করবে দেখছি!

পতিতুণ্ড : আমি যে এখন কী করি? কাকে সামলাই— কার মন রাখি?

ম্যানেজার : কিচ্ছু করার নেই! আমাদের দুই বাপে লড়াই বেঁধেছে, আমরা কী করবো? চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

স্যাম : তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি লুটলিয়াকভ, সব রক্ত তুমি একা নিও না, আমাদেরও কিছু হিস্‌সা দাও।

লুটলিয়াকভ : একফোঁটাও দেবো না। দেখি কী করতে পারিস!

স্যাম : এর ফলে কিন্তু বিশ্বশান্তি বিপন্ন হবে—

লুটলিয়াকভ : গুলি মারি তোমার বিশ্বশান্তির। সারা পৃথিবীটা আমার, একা আমার, একা আমিই ভোগ করবো, তাহলেই শান্তি আসবে।

স্যাম : তুমি তাহলে আমার ভাগের রক্ত দেবে না?

লুটলিয়াকভ : না, দেবো না! দরকার পড়লে এই ব্লাডব্যাঙ্কটাকে কিনে নেবো, তবু কাউকে কিচ্ছু দেবো না।

স্যাম : শেষবারের মতো বলছি— দিবি কি-না—

লুটলিয়াকভ : না— দেবো না, যা পারিস ক'রে নে।

স্যাম : তবে রে শালা— [দু'জনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়]

পতিতুণ্ড : স্যার স্যার— এ কী করছেন আপনারা?

ম্যানেজার : ও রাশিয়ান বাবা-- ও মার্কিন বাবা, লড়াই থামাও।

পতিতুণ্ড : এমন করলে আমার ব্যবসাই ডকে উঠবে, লাসবিপণির মতো ব্লাডব্যাঙ্কেও লাল বাতি জ্বলবে— দোহাই ঝগড়া থামান।

দালাল : (পতিতুণ্ডকে) ---পালিয়ে আসুন স্যার, দুটো বুনো মোষ লড়ছে— মাঝখানে প'ড়ে গেলে দু'জনেই আমাদের গুঁতিয়ে দেবে—

লুটলিয়াকভ ও স্যাম : (পরস্পরকে) বল্ শালা— রক্ত দিবি কি-না?

[সবাই বিচিত্র ভঙ্গিতে স্থির। খাঁচার ভেতর থেকে ভারত, রতন, ও তরুণ সমস্বরে ব'লে ওঠে---]

তিনজন : না! আমরা আর কেউ রক্ত দেবো না। কাউকে রক্ত শুষতে দেবো না। সব-ক'টা রক্তচোষা দেশী-বিদেশী শয়তানকে মেরে তাড়াবো। ওদের দেশজোড়া রক্তশোষণের ব্লাডব্যাঙ্ক আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো। দর্শকের আসনে যাঁরা ব'সে আছেন, এখনও যাঁরা দূর থেকে এদের কামড়াকামড়ি দেখছেন— তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ান, ভারতবর্ষকে লুট করার জন্যে রুশ-মার্কিন— দুই অতি বৃহৎ শক্তির খেয়োখেয়িতে আমাদের আকাশে চরম সর্বনাশের মেঘ ঘনিয়ে আসছে, রুখে দাঁড়ান— এদের বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করুন— সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধে আমরা আর কামানের খোরাক হবো না। কক্ষনও না। কোনোদিন না।

।। পর্দা নামে।।

ট্রিলজি—৩

পথনাটক

বেচারাম সরকার অ্যাণ্ড কোং

চরিত্র ।। বড়বাবু, কেরাণী, মগনলাল, বেচারাম, ১ম এন.আর.আই., ২য় এন.আর.আই., ১ম দস্যু ও ২য় দস্যু।

[নাটকের কুশীলবগণ বিভিন্ন রূপসজ্জায় রঙ্গস্থলে আসে ও রঙ্গভূমি পরিক্রমা করতে করতে গান গায় বা সুরে ছড়া কাটে—]

বিশ্বায়নের যুগে কাকে ভাই দরকার?/বেচারাম সরকার, বেচারাম সরকার।
কোম্পানি খুলেছে তাই মিস্টার বেচারাম—/বেচে দেবে সবকিছু, যদি পায় ঠিক দাম।
মুক্ত বাজার আজ— এই তার রীতিনীতি/জংলী আইন তার— মানবতার হোক ইতি।
তাতে কোনো দোষ নেই কী, কী চাই কার কার/ভাণ্ডার খুলেছে হেথা, বেচারাম সরকার।
বেওসায়ী এসো হেথা, এসো ভাই এন.আর.আই./বিদেশীরা সব এসো, বলো কার কী কী চাই।
সবকিছু দিয়ে দেবে বেচারাম সরকারই / বিশ্বায়নের যুগে বেচুবাবুই দরকারী।

[কুশীলবরা চ'লে যায়। দু'-একজন অভিনেতা একটা টেবিল ও দু'-তিনটে চেয়ার এনে রাখে। প্রবীণ বড়বাবু ও নবীন কেরাণীর প্রবেশ]

বড়বাবু ঃ উঃ, আজ আবার লেট! অথচ আজ থেকে টেণ্ডার নেওয়া শুরু হবে। আর আজকেই কি-না ঠিক সময়ে অফিসে আসতে পারলাম না। নাঃ চাকরিটা আর থাকবে না।

কেরাণী ঃ আমাদের কী দোষ বড়বাবু? রাস্তায় যা অবস্থা— বাসটাস ঠিকমতো চলছে না, এদিকে বাড়তি ভাড়া— পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিলো— রান্নার গ্যাস-কেরোসিন—

বড়বাবু ঃ কেন— আমাদের দিদিভাই তো অনেক লড়াই ক'রে দাম কমিয়ে দিয়েছে।

কেরাণী ঃ হ্যাঃ রান্নার গ্যাস মোটে দশ টাকা আর কেরোসিন মোটে এক টাকা! একে কি কমা বলে? আর তাই নিয়ে কত নাটক! ছোঃ!

বড়বাবু ঃ শোনো শোনো— একটা গল্প বলি। একটা গাধা ছিল। সে

বেচারা বড়জোর তিরিশ কে.জি. ওজন বইতে পারতো। তা তার ঘাড়ে চাপানো হলো সত্তর কে.জি. বোঝা। হাড়জিরজিরে গাধাটা তো ঐ সত্তর কে. জি.-র ভারে একেবারে শুয়ে পড়ে আর কী। তখন দয়াশীল করুণাপ্রবণ মালিক তার ঘাড় থেকে পাঁচ কে.জি. বোঝা তুলে নিলো। বোকা গাধাটা ভাবলো— আঃ বোঝাটা কত হাল্কা হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে পঁয়ষট্টি কে.জি. বোঝা নিয়ে ছুটতে লাগলো। ভাবো একবার, যে বেচারা বড়জোর তিরিশ কে.জি. বইতে পারে সে এখন মনের আনন্দে পঁয়ষট্টি কে. জি. বোঝা বইছে। আমরাও হলাম তেমনই গাধা। কেরোসিনের দাম এক টাকা কমলে আমরা সবুজ আবির মেখে বিজয়োৎসব করি।

কেরাণী ঃ তুলনাটা দারুণ দিয়েছেন বড়বাবু— দারুণ!

বড়বাবু ঃ নাও, নাও, ফাইলপত্তর গুছিয়ে নাও— আর গল্প করার সময় নেই। মনে রেখো, আমরা বেচারাম সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানির কর্মচারী। আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কোম্পানির কাজকর্ম প্রচুর বেড়ে গেছে।

কেরাণী ঃ আমি তো নতুন এই কোম্পানিতে ঢুকেছি— কিন্তু আপনি তো অনেকদিন এখানেই চাকরি করছেন। আমাদের মালিক ঠিক কীরকম লোক বলুন তো।

বড়বাবু ঃ বেচারাম সরকার? তার মতো ধড়িবাজ, ধুরন্ধর বিজনেসম্যান— ভূভারতে নেই। তবে অবশ্য বেচারামের মাতামহ— মানে মায়ের বাবা— পরলোকগত পাতিরাম পতিতুণ্ড ছিল আরও ধড়িবাজ, নেহেরু-গান্ধী পরিবারের সময়ে দেশে-বিদেশে মড়া চালান দিয়ে আর আন্তর্জাতিক রক্ত পাচার চক্র খুলে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছিল পাতিরাম। দাদুর সেই রক্তই পেয়েছে— নাতি বেচারাম সরকার। একবার তো এই অফিস থেকেই হাওড়া ব্রিজ আর মনুমেন্টটাকে প্রায় বেচেই দিয়েছিল, তারপর রাইটার্স বিল্ডিংটা বেচতে গিয়েই ঝামেলায় ফেঁসে গেল। তখন এই অফিসে তালা লাগিয়ে আমরা ফেরার হলাম। তারপর এতগুলো বছর বাদে দিল্লিতে নতুন সরকার আসায় আমরা আবার এখানে অফিসটা নতুন ক'রে খুললাম।

কেরাণী ঃ কী বলছেন বড়বাবু? তার মানে এখানে চাকরি করা ভীষণ বিপজ্জনক! যে-কোনো সময় পুলিশ পেছনে লাগতে পারে।

বড়বাবু ঃ না হে না। এখন আর তেমন কোনো বিপদ নেই। দিল্লির

সরকারের সঙ্গে আমাদের মালিকের একেবারে হটলাইন কানেক্‌শন। আগে আমরা যা কিছু বেচতাম, সব— লোকের চোখের আড়ালে। কিন্তু এখন একেবারে আইনী ব্যবসা। কেন্দ্রীয় সরকারের লাইসেন্স নিয়ে তবে বেচাকেনা করা হচ্ছে। সত্যি বলতে কী, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টই আমাদের মালিকের এই বেচাকেনা চালিয়ে যেতে বলেছে।

কেরাণী ঃ তবু আমার কেমন ভয় করছে! এখানে তো সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট নেই— বরং লাল সরকার। আমরা না এবারেও ফেঁসে যাই! না বড়বাবু— এ চাকরি আমার পোষাবে না।

বড়বাবু ঃ আরে বাবা লাল নীল যে সরকারই হোক, সবই এখন একই লাইনে চলছে, শুধু মুখের বুলিটাই আলাদা।

কেরাণী ঃ যা-ই বলুন, সারাক্ষণ ভয় নিয়ে চাকরি করবো কী ক'রে?

বড়বাবু ঃ বাপু হে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। ইয়াং ছেলেরা চাকরির জন্যে চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরছে। সমস্ত চাকরির রাস্তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শুধু এই কেনাবেচার বিজনেস ছাড়া। যাও যাও, টেণ্ডারের বাক্সটা নিয়ে এসো। এক্ষুণি লোকজন সব আসতে শুরু করবে।

[কেরাণীর প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়ে ব্যবসায়ী মগনলাল বাজোরিয়ার প্রবেশ]

মগনলাল ঃ শুনলাম, ইখানে না-কি টেণ্ডার নেওয়া হচ্ছে?

বড়বাবু ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ! এক্ষুণি টেণ্ডার বাক্স রাখা হবে। বসুন স্যার।

মগনলাল ঃ না না— বেশি বোসতেটোসতে পারবো না। ইখানে টেণ্ডার জমা করিয়ে আমাকে এক্ষুণি আবার বড়বাজারে গদিতে গিয়ে বোসতে হবে!

বড়বাবু ঃ স্যার বুঝি বড়বাজারে ব্যবসা করেন? তা কীসের বিজনেস?

মগনলাল ঃ কীসের আবার? সুদি-কিস্তির কারবার! যাকে গিয়ে বোলবেন মগনলাল বাজোরিয়া মহাজন-কি গদি কিধার হ্যায়— সব লোকে দেখিয়ে দিবে। তিন পুরুষের তেজারতি কারবার হামাদের— হাঁ!

[বাক্স নিয়ে কেরাণীর প্রবেশ]

কেরাণী ঃ বাক্সটা কোথায় রাখবো স্যার?

বড়বাবু ঃ ঐ ওদিকটায় রাখো—

মগনলাল ঃ আরে টেণ্ডার বাক্স আসিয়া গিয়াছে, তো আমি ফার্স্ট টেণ্ডারখানা জমা করিয়ে দিই—কী বোলেন?

বড়বাবু ঃ তা, স্যার— আপনি কীসের জন্যে টেণ্ডার জমা দিচ্ছেন তা না জানলে—

মগনলাল ঃ কীসের জন্যে টেণ্ডার দিচ্ছি? আপনি তো আচ্ছা বুড়বক আছেন মোশাই! শুনলেন আমার তেজারতির কারবার, সুদি-কিস্তির বেওসা, তো এখনও সমঝালেন না— হামি কীসের জন্যে টেণ্ডার দিচ্ছি?

বড়বাবু ঃ আজ্ঞে না। আপনি কী কিনবেন ব'লে টেণ্ডার দিচ্ছেন স্যার?

মগনলাল ঃ ব্যাঙ্ক! ব্যাঙ্ক খরিদ কোরবো! এইবার সমঝালেন তো?

বড়বাবু ঃ ব্যাঙ্ক? আপনি ব্যাঙ্ক কিনবেন?

মগনলাল ঃ ব্যাঙ্ক খরিদ কোরবো। ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক— সোব!

বড়বাবু ঃ সুদের কারবারী কিনবে ব্যাঙ্ক?

মগনলাল ঃ হাঁ, এই জমানায় সুদের কারবারীই ব্যাঙ্ক খরিদ কোরবে। এই লেন হামার টেণ্ডার পেপার— যান বাক্সে ফেলিয়ে দিন। (কাগজ দেয়)

বড়বাবু ঃ (কেরাণীকে) এই নাও, বাক্সে ফেলে দাও— (কাগজ দেয়)

কেরাণী ঃ আচ্ছা বড়বাবু— বাক্সে ফেলে দিচ্ছি। (কাগজ নিয়ে বাক্সে ফেলে দেয়)

বড়বাবু ঃ তাহলে স্যার আপনার টেণ্ডারই প্রথম জমা পড়লো।

মগনলাল ঃ দেখবেন বাবু— হামি যেন ব্যাঙ্ক খরিদ কোরতে পারি। জরুরৎ হ'লে অন্য টেণ্ডার ফেঁড়ে ফেলবেন, বাক্সে দিবেন না। হামি আপনাদের খুশি কোরিয়ে দিবে, জলপানি দিবে— সামঝালেন? আচ্ছা, চলি— নমস্তে। [প্রস্থান]

কেরাণী ঃ সুদখোর মহাজনগুলো ব্যাঙ্ক কিনবে?

বড়বাবু ঃ হ্যাঁ ভাই, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের পলিসির ফলে মনে হচ্ছে— তেমনই একটা কিছু ঘটতে চলেছে। আর, তার মানে বোঝো? যে-কোনোদিন ওরা ব্যাঙ্কে লালবাতি জ্বালিয়ে স'রে পড়বে, আর মারা পড়বে সাধারণ মানুষ— যারা বিশ্বাস ক'রে সর্বস্ব রেখেছে ঐসব ব্যাঙ্কে। 'সঞ্চয়িতা'র কথা মনে নেই? ওখানে যারা টাকা রেখেছিল, তাদের কপাল কীভাবে পুড়েছিল— জানো না? কত লোক হতাশায় আত্মহত্যা করেছে। মনে হচ্ছে সেইসব দিনগুলোই আবার ফিরে আসছে। একটা নয়, হাজার হাজার সঞ্চয়িতা!

[স্যুটেড বুটেড মালিক বেচারাম সরকারের প্রবেশ]

বেচারাম ঃ সব ঠিক আছে বড়বাবু? টেণ্ডার বাক্স ওপেন করেছেন?

বড়বাবু ঃ (উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ার ছেড়ে দেয়) বসুন স্যার, বসুন। টেণ্ডার বাক্স শুধু ওপেনই হয়নি, টেণ্ডার জমা পড়তেও শুরু করেছে।

বেচারাম ঃ হবে হবে, এবার একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাবে। এই বেচারাম সরকার এবার সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ইকনমিক পলিসি পর্যন্ত কণ্ট্রোল করবে। মাল বেচে এবার হেভি মুনাফা কামাবো। মন্ত্রীদের দিয়েথুয়েও প্রচুর থাকবে। যা জমানা পড়েছে— একেবারে লুটেপুটে খাবো!

[আরেকজন সুটেড বুটেড এন.আর.আই. ভদ্রলোকের প্রবেশ]

১ম এন.আর.আই ঃ ইজ ইট দ্য অফিস অফ বেচারাম সরকার অ্যান্ড কোম্পানি?

বেচারাম ঃ ইয়েস, ইয়েস স্যার। অ্যা অ্যাম মিস্টার বেচারাম সরকার।

১ম এন.আর.আই ঃ (হ্যাণ্ডশেক করে) গ্ল্যাড টু মিট উইথ ইউ।

বেচারাম ঃ হোয়াট ক্যান ইউ ডু ফর ইউ স্যার?

১ম এন.আর.আই ঃ আর উই এ সেলিং এজেন্ট?

বেচারাম ঃ অ্যা অ্যাম দ্য অনলি সেলিং এজেন্ট, রিকগ্নাইজ্ড বাই দ্য গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আমার লাইসেন্স আছে স্যার। দেখবেন?

১ম এন.আর.আই ঃ নো নো, নট নেসেসারী। অ্যা অ্যাম শুভাশিস ভট্টাচারিয়া, নন রেসিডেন্সিয়াল ইণ্ডিয়ান— এন.আর.আই. কামিং ফ্রম ইউ.কে.!

বেচারাম ঃ আপনি কি স্যার টেণ্ডার জমা দিতে চান?

১ম এন.আর.আই ঃ অফ কোর্স। সেজন্যেই তো এসেছি।

বেচারাম ঃ আপনি কী কিনবেন স্যার?

১ম এন.আর.আই ঃ যত ইনস্যুরেন্স কোম্পানি আছে, যত ব্যাঙ্ক আছে সব কিনতে চাই, সব ক'টার জন্যেই টেণ্ডার সাবমিট করবো।

বেচারাম ঃ সব ইনস্যুরেন্স কোম্পানি সব ব্যাঙ্ক ! ওরে ব্বাবা! আর্নেস্ট মানি অনেক পড়বে।

১ম এন.আর.আই ঃ নো প্রবলেম! আপনি শুধু আমাকে পাইয়ে দিন, ব্যাস্। ছ'মাসে সব টাকা তুলে নেবো। আপনিও কাট্‌মানি পাবেন। এগ্রিড?

বেচারাম ঃ চলুন স্যার, আপনি আমার প্রাইভেট চেম্বারে চলুন।

আমি ওখানেই আপনার সব পেপার তৈরি ক'রে দিচ্ছি। আসুন।

[দু'জনের প্রস্থান]

বড়বাবু ঃ বেচারাম সরকার মনে হচ্ছে একটা বড় দাঁও মারবে। ঐজন্যেই আমাদের সামনে ডিল্‌টা করলো না। নিজের প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে গেল।

কেরাণী ঃ ঐ এন.আর.আই. ভদ্রলোক যে বললেন, ছ'মাসে সব টাকা তুলে নেবেন। এটা আবার হয় না-কি?

বড়বাবু ঃ হয়, হয়, ছ'মাস বাদে সব টাকা নিয়ে লণ্ডনে কেটে পড়বে শালা। কোটি কোটি টাকা একদিনে বিদেশে চ'লে যাবে। এমনটিই হয়েছে মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোতে। উদার অর্থনীতি চালু করতে গিয়ে একদিনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল দেশের ইকনমি।—

[আরেকজন এন.আর.আই. ঢোকে]

২য় এন.আর.আই ঃ মেসার্স বেচারাম সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানি?

বড়বাবু ঃ হ্যাঁ স্যার। আপনি?

২য় এন.আর.আই ঃ নাম জেনে কী হবে? শুধু জেনে রাখুন আমি একজন এন.আর.আই.।

কেরাণী ঃ বাব্বা! আবার এন.আর.আই.? দেশটা কি এদের দখলেই যাবে?

বড়বাবু ঃ না, এরা অ্যাডভান্স পার্টি। বাঘের আগে যেমন ফেউ!

২য় এন.আর.আই ঃ আমি টেণ্ডার জমা দেবো।

বড়বাবু ঃ নিশ্চয়ই দেবেন স্যার, কিন্তু কোন্ ক্যাটেগরিতে? মানে, কী কিনবেন?

২য় এন.আর.আই ঃ ইণ্ডাস্ট্রি— মানে শিল্প।

বড়বাবু ঃ সে তো খুব ভালো কথা স্যার। দেশের রুগ্ন শিল্পগুলো যদি আপনাদের দাক্ষিণ্যে আবার সজীব হয়ে ওঠে—

২য় এন.আর.আই ঃ সিক ইণ্ডাস্ট্রি? নো, নেভার, আমি সিক ইণ্ডাস্ট্রি কিনবো কেন? আমি কিনবো সরকারী উদ্যোগের সব লাভজনক শিল্পগুলো। কোন্‌গুলো লাভজনক ইণ্ডাস্ট্রি— আপনি তার কতগুলো টিপস্ দিন তো, আমি সেগুলোতে টেণ্ডার জমা ক'রে দিই।

বড়বাবু ঃ কিছু মনে করবেন না স্যার— ঐ টিপস্‌গুলো আমিও

জানি না— টপ সিক্রেট। আপনি বরং আমাদের মালিক বেচারাম সরকারের সঙ্গে কথা বলুন।

২য় এন.আর.আই. ঃ হ্যোয়ার ইজ হি?

বড়বাবু ঃ প্রাইভেট চেম্বারে। (কেরাণীকে) —এই, তুমি এঁকে স্যারের কাছে নিয়ে যাও।

কেরাণী ঃ (২য় এন.আর.আই.-কে) আসুন স্যার, আমার সঙ্গে আসুন।

[দু'জনের প্রস্থান]

বড়বাবু ঃ কী চলছে রে বাবা! গোটা দেশটাই টেণ্ডার ডেকে বিক্রি ক'রে দিচ্ছে?

(হঠাৎ দু'হাতে দুটো রিভলবার উঁচিয়ে টেক্সাসের মস্তানী জামা প্যাণ্ট টুপি পরা ১ম সাহেব দস্যুর প্রবেশ)

১ম দস্যু ঃ (চিৎকার ক'রে) —হ্যোয়ার ইজ দ্যাট বাস্টার্ড?

বড়বাবু ঃ (ভয়ে চমকে) —কে, কে স্যার? কার কথা বলছেন?

১ম দস্যু ঃ ইউ ব্লাডি ফুল— ডোণ্ট ইউ নো হিম? (বুকে রিভলবার ঠেকায়)

বড়বাবু ঃ বিশ্বাস করুন স্যার, বিলিভ মি— আমি সত্যিই জানি না কাকে খুঁজছেন?

১ম দস্যু ঃ দ্যাট বেচারাম সরকার— সান অফ এ বীচ! হ্যোয়ার ইজ হি?

বড়বাবু ঃ এখানেই আছেন সাহেব— কিন্তু কী দরকার তাকে?

১ম দস্যু ঃ হি ইজ এ ড্যাম লায়ার! সে আমাকে ইণ্ডিয়ান আর্মি সেল করবে ব'লে অ্যাডভ্যান্স নিয়েছে! তারপর থেকেই তার— নো ট্রেস।

বড়বাবু ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী আপনার কাছে বেচে দিয়েছে বেচারাম সরকার?

১ম দস্যু ঃ ইয়েস! অ্যা অ্যাম দ্য গডফাদার অব গ্যাংস্টার গ্রুপস্ অব শিকাগো! আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি! আই শ্যাল টিচ হিম এ লেসন!

বড়বাবু ঃ ওরে বাবা— আমেরিকার ডাকাত সর্দার! বুশ সাহেবের ভায়রাভাই! ইণ্ডিয়ান আর্মি কিনছে!

১ম দস্যু ঃ মাই নেম ইজ ম্যাক! আই শ্যাল কিল বেচারাম— ইফ হি বিট্রেস মি!

বড়বাবু ঃ ওরে বাবা— হাওড়া ব্রিজ আর মনুমেণ্ট বেচার মতো

আর একটা কীর্তি করেছে দেখছি! বেচারাম সরকার এবার বাঁচলে হয়!

[ঐ একই বেশে ২য় সাহেব দস্যুর প্রবেশ]

২য় দস্যু : হোয়ার ইজ বেচারাম? আই ওয়াণ্ট টু টক টু হিম।

বড়বাবু : ওরে বাবা, আরেকটা সাহেব ডাকাত!

১ম দস্যু : (২য়-কে) হু আর ইউ?

২য় দস্যু : অ্যা অ্যাম জ্যাক ফ্রম ইতালী। অ্যা অ্যাম দ্য রিংলিডার অফ ইতালিয়ান মাফিয়া গ্রুপস্।

বড়বাবু : ওরে বাবা, ইতালীর মাফিয়া সর্দার। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান!

২য় দস্যু : বেচারাম হ্যাজ প্রমিজ্‌ড মি টু সেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স অ্যাণ্ড পোলিশ।

বড়বাবু : এর কাছে বি.এস.এফ. আর পুলিশ বেচে দিয়েছে?

দু'জনে : (রিভলবার উঁচিয়ে) হোয়ার ইজ বেচারাম? কল হিম অ্যাট ওয়ান্স।

বড়বাবু : (তারস্বরে) স্যার স্যার, এখানে আসুন— এখানে তাণ্ডব চলছে। আমায় বাঁচান!

দৌড়ে বেচারাম ও কেরাণী ঢোকে)

বেচারাম : উরি ব্বাবা! জ্যাক আর ম্যাক— একসঙ্গে দু'জনে— কী সর্বনাশ! (দুই দস্যু ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বেচারামকে [হিন্দি সিনেমার কায়দায় মারতে থাকে]

ম্যাক : ইউ বাস্টার্ড, সান অফ এ বীচ!

জ্যাক : ব্লাডি নিগার—

বেচারাম : বাঁচাও, বাঁচাও— হেল্প— হেল্প মি—

[বেচারাম ও বড়বাবু দৌড়ে পালাতে যায়। জ্যাক ও ম্যাক গালাগাল দিতে দিতে তাদের পিছু নেয়। ওরা চারজন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে]

কেরাণী : (দর্শকদের) হাসছেন! হাসুন। —কিন্তু এমন ঘটনা খুব শিগ্‌গিরই ঘটতে চলেছে। বেচারাম সরকার সত্যিসত্যিই দেশটাকে বেচে দিচ্ছে। আর আপনারা হাত গুটিয়ে ব'সে আছেন। মনে রাখবেন কেউ রেহাই পাবেন না। তাই চূড়ান্ত সর্বনাশ আসার আগেই বেচারাম সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গ'ড়ে তুলুন।

[প্রথম প্রকাশ : অসময়ের নাট্যভাবনা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০১]

জরুরী অবস্থায় আক্রান্ত একাঙ্ক নাটক

নিজবাসভূমে

চরিত্র ঃ সমীরণ, রফিক, প্রশান্ত, বিদ্যুৎ, সুগত, ফাদার, কান্তি, ও অনির্বাণ।

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ যদিও আজ নতুন শতাব্দীতে বিগত শতকের অগ্নিগর্ভ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাতের দশকের সেই আগ্নেয় উত্তাপ অনেকটাই প্রশমিত হয়ে এসেছে, যদিও সেই রক্তাক্ত অন্ধকার ঘটনাবহুল জটিল সময়ের রেশ আজ আর ততখানি প্রকট নেই, তবুও আগুন বোধহয় কখনও নেভে না, আপাত শান্ত নিরীহ নিরুপদ্রব এই মাটির গভীরে অন্তঃশীলা এক আগুনের স্রোত আজও বয়ে যায়, আজও এক ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস প্রতীক্ষারত— অভাবিত চকিত বিস্ফোরণের; তাই-ই আজ বারবার ফিরে দেখা দরকার— বিস্মৃতপ্রায় অতীতের রক্তাক্ত কঠিন পথে কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতার কোন্ দুর্মূল্য সঞ্চয় ফেলে এসেছি আমরা; যাচাই ক'রে নেওয়া দরকার— বিগত সময় তার নির্ভুল অঙ্গুলিসঙ্কেতে নির্দেশ দেয় সম্ভাবিত ভবিষ্যতে কোন্ পথে যেতে হবে মানুষের মুক্তির সন্ধানে। তাই তো আমরা দূরবর্তী অতীতের সেই ঝড়ের দিনগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাই এই মঞ্চে, যখন স্বৈরাচারী এক দানবীয় জিঘাংসার শাণিত নখরাঘাতে সারা দেশ ছিন্নভিন্ন— রক্তাক্ত; যখন সারা দেশ জুড়ে এক বিশাল বন্দীশিবির 'স্বাধীনতা' শব্দটিকেই ব্যাঙ্গ করছে— সেই কালো অন্ধকার জরুরী অবস্থার সন্ত্রাস শাসিত পটভূমিতেই আমাদের নাটকের বিস্তার। কেননা, আমরা শুধু স্বৈরাচারী ঘাতক বাহিনীর স্বরূপই উদ্‌ঘাটন করতে চাই না, তার সঙ্গে চিনে নিতে চাই সেইসব ভণ্ড বেইমান ক্লীব নপুংসকদের, যাদের কাপুরুষ চক্রান্তের পথ বেয়েই ঐ হত্যাকারীর দল ক্ষমতায় এসেছিল, যাদের হীন স্বার্থসিদ্ধির যূপকাষ্ঠে সেদিন বলি হয়েছিল মানবমুক্তির শাশ্বত স্বপ্ন। তাই এ নাটকের বর্শামুখ শুধু ফ্যাসিস্ত লুটেরা ও খুনীদের বিরুদ্ধেই নিবদ্ধ নয়, এ নাটক আক্রমণ শাণিয়েছে সংশোধনবাদী ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধেও। এ নাটকের সময়—১৯৭৬ সাল, যখন অত্যাচারিত পশ্চিমবাংলার বহু রাজনৈতিক কর্মী এলাকাছাড়া, গৃহহীন, পলাতক, নিরাশ্রয়—

[মঞ্চের পর্দা অপসারিত হয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে মায়াময় নীলাভ দ্যুতি। আবহে মোহময় যন্ত্রসঙ্গীত। এই প্রায়-অলৌকিক পরিপার্শ্বিকে— সুগত একা একা ঘুরে ঘুরে গান গাইছে— "এ পরবাসে রবে কে...."। গানের বিলম্বিত সুরেলা মায়ায় ক্রমশ যেন ঘন হয়ে ওঠে স্বপ্নের জগৎ। এই কোমল রোম্যান্টিক পরিবেশ যখন চরম বিন্দুতে পৌঁছে টলমল করছে, তখনই তিনজন লোক সুতীব্র চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে—]

প্রশান্ত, রফিক, ও বিদ্যুৎ। সুগত, সুগত— খুন, নাণ্টু খুন হয়ে গেছে কাল!

সুগত ঃ (চমকে) কী? কে?

বিদ্যুৎ ঃ নাণ্টু নেই— নাণ্টুকে মেরে ফেলেছে—

সুগত ঃ (বিমূঢ়) কী বলছিস তোরা, যাঃ! এ অসম্ভব!

রফিক ঃ আমি, আমি এক্ষুণি খবর এনেছি—

প্রশান্ত ঃ নাণ্টু নেই— নাণ্টু ফিনিশ্‌ড—

সুগত ঃ (বুক ফাটা আর্তনাদ ক'রে) কী ক'রে? কী ক'রে এমন হলো? [মুহূর্তে মঞ্চে যেন ওলটপালট হয়ে যায়। আবহে বিসর্জনের ভয়ানক বাদ্য। প্রশান্ত হয়ে যায় নাণ্টু, আর বাকি দু'জন দুই মস্তান, ছুরি হাতে তারা যেন এগিয়ে আসতে থাকে]

নাণ্টু ঃ (পেছুতে পেছুতে) এ কী হলো? আপনারা এমনভাবে এগিয়ে আসছেন কেন? (কোনো উত্তর নেই) —সত্যি বলছি, আমি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই পাড়ায় ঢুকিনি, বিশ্বাস করুন, আমার মায়ের খুব অসুখ, শুধু মাকে দেখতে এসেছি, এখুনি চ'লে যাবো— (মস্তান দু'জন চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, মধ্যে নাণ্টু) —আপনারা কোনো কথা বলছেন না কেন? বিশ্বাস করুন, আমি আর রাজনীতি করি না, আমি পার্টি ছেড়ে দিয়েছি, আপনারা আমায় ছেড়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি—আর কোনোদিন এখানে আসবো না। (বৃত্তটা ক্রমশ ছোটো হ'তে থাকে) —দেখুন, সত্যি বলছি— বাহাত্তরের ইলেক্‌শনের পর থেকে আমি আর কোনো ঝামেলায় নেই, বিশ্বাস করুন— শুধু মাকে দেখতে এপাড়ায় এসেছি—মাইরি বলছি— (প্রচণ্ড সন্ত্রাসে চিৎকার ক'রে) পায়ে পড়ি আপনাদের, আমায় মারবেন না, আমায় মারবেন না, দয়া করুন—

মস্তানদ্বয় ঃ (ছুরি চালানোর ভঙ্গিতে)—চোপ শালা হারামী মাকুর বাচ্চা! (মৃত্যুচিহ্নিত মুহূর্তে ওরা স্থির, চিত্রার্পিত। নেপথ্যে নারীকণ্ঠে বুকফাটা আর্তনাদ— নাণ্টু-উ-উ-রে-এ-এ। এতক্ষণ একপাশে

দাঁড়ানো দর্শকপ্রায় সুগত আরও বিলম্বিত লয়ে "এ পরবাসে রবে কে...." গানটি গাইতে গাইতে মঞ্চের পশ্চাদভূমিতে আস্তে আস্তে হেঁটে যায় মাথা নিচু ক'রে। ওরা তিনজনও ওদের পূর্বদৃষ্ট ভূমিকাগুলি থেকে বেরিয়ে আসে)

প্রশান্ত ঃ যাচ্ছিস কোথায়? সুগত—

[সুগত কোনো উত্তর না দিয়ে চ'লে যেতে থাকে]

বিদ্যুৎ ঃ ওর কথা ছাড়্, শালা কবিতা লেখে, আঁতেল বনেছে, ওর সবকিছুই অদ্ভুত!

[সুগত মঞ্চের অদেখা অন্ধকারে তার গান নিয়ে হারিয়ে যায়। মঞ্চ ক্রমশ আলোকিত হয়ে ওঠে। দর্শক দেখতে পান— একটা ভাঙাচোরা গীর্জার ছাঁদে মঞ্চ সাজানো। প্রশান্ত, রফিক, ও বিদ্যুৎ মঞ্চের সামনের দিকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ব'সে পড়ে]

প্রশান্ত ঃ (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) কতবার বললাম— যাসনি, পাড়ায় ঢুকতে যাসনি, পরিস্থিতি এখনও খারাপ। কিছুতেই শুনলো না!

বিদ্যুৎ ঃ মাকে যে বড় ভালোবাসতো নাণ্টু! ঐ জন্যেই মায়ের অসুখের খবর পেয়ে আর স্থির থাকতে পারেনি।

প্রশান্ত ঃ কবে যে এই দুর্যোগ কাটবে, কবে যে বাড়ি ফিরতে পারবো—

বিদ্যুৎ ঃ থাক্, আর বাড়ি ফেরার কথা বলবেন না প্রশান্তদা, একজন তো বাড়ি ফিরতে গিয়ে শেষ হয়ে গেল—

রফিক ঃ হতাশ হোয়ো না কমরেড, চাকা আবার ঘুরবে। নাণ্টুর খুনের বদলা নেবার দিন আসবেই আসবে!

প্রশান্ত ঃ থাক্ থাক্ এসব বড় বড় বুলি ময়দানের সভাতেই মানায় ভালো, এখানে নয়! উঃ আর কতদিন যে তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো পালিয়ে পালিয়ে ঘুরতে হবে, কে জানে! আমার এখন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে!

বিদ্যুৎ ঃ কী থেকে যে কী হলো! এত বড় সংগঠনী শক্তি, এত জনসমর্থন— সব হাওয়া!

রফিক ঃ এত ভেঙে পড়ছো কেন বিদ্যুৎ? খারাপ সময় বেশিদিন থাকে না!

প্রশান্ত ঃ বাড়ির সকলে যে কীভাবে আছে কে জানে! আমি একা আর্নিং মেম্বার ছিলাম, সেই আমিই যখন ঘরছাড়া তখন ছেলেমেয়েগুলো যে কী খেয়ে বেঁচে রয়েছে—

বিদ্যুৎ ঃ জনসাধারণ নিশ্চয়ই সাহায্য করে—

প্রশান্ত ঃ জনসাধারণ? সব জানা আছে আমার! জনসাধারণ ভেড়ার পাল, যেদিকে চালাবে— চলবে!

রফিক ঃ (ধমকের সুরে) আপনার হতাশার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে কমরেড। একজন কমিউনিস্ট— জনসাধারণকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। জনতাকে ভেড়া ব'লে অবজ্ঞা করে না।

প্রশান্ত ঃ আর জ্ঞান দিও না বাপু। সারাক্ষণ একটা ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়েছি যেন! পালাতে পালাতে শেষপর্যন্ত এই ভাঙাচোরা গীর্জাটায় এসে ডেরা বেঁধেছি। কবে যে এই আস্তানাটিও ঘুচবে, কে জানে! ওঃ, ওরা যদি একবার টের পায় আমরা এখানে আছি, তাহলে যে কী হবে—

বিদ্যুৎ ঃ আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যেন জানতে না পারে—

প্রশান্ত ঃ আজ নান্টু গেল, কাল হয়তো অন্য কেউ যাবে, একে একে সবাই— কারো নিস্তার নেই—

রফিক ঃ (প্রবল আবেগে) একদিন ওদেরও এইভাবে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে কমরেড, একদিন ওরাও কোথাও আশ্রয় পাবে না, পালাতে পালাতে একদিন ওরাও দেখবে, সারা পৃথিবীটাই ওদের জন্যে জেলখানা হয়ে গেছে—

প্রশান্ত ঃ (বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে) স্টপ! আই সে স্টপ ইট!

রফিক ঃ (বিস্ময়ে) প্রশান্তবাবু—

প্রশান্ত ঃ শুকনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না! ওঃ, কেন যে এইসব রাজনীতি করতে এসেছিলাম!

রফিক ঃ এসব কী বলছেন কমরেড? একদিন এই আপনিই তো ছিলেন আমাদের মতো শ্রমিকদের নেতা, একদিন আপনিই তো আমাদের বিপ্লবের কথা বোঝাতেন—

প্রশান্ত ঃ (ছটফট করে) চুপ করো, ভুল করেছি— মস্ত বড় ভুল, এদেশে বিপ্লবটিপ্লব হবে না—

রফিক ঃ আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? চুপ ক'রে বসুন এক জায়গায়!

প্রশান্ত ঃ দু-দু'বার মন্ত্রীত্ব পেয়ে আমাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। গলায় লাল রুমাল বেঁধে হাফ-পার্টিজান ওয়ারের খোয়াব দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম— দুনিয়া বুঝি আমাদের দখলে। এক ফুঁয়েতে সব লোপাট! কোথায় গেল সেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী? ইন্দিরা গান্ধীর এক ধাক্কায় নেতারা সব গর্তে গিয়ে ঢুকেছে—

রফিক : থামুন! নিজের হতাশাকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করুন বলছি—

প্রশান্ত : তোমার হুকুমে? আমায় চোখ রাঙিও না রফিক, কারও চোখরাঙানির ধার ধারি না আমি—

বিদ্যুৎ : কী হচ্ছে প্রশান্তদা? চুপ করুন, আপনি না এল.সি.এস.? এলাকার লোক সি.পি.এম.-এর নেতা ব'লে আপনাকেই জানে— বাহাত্তরে আপনি ইলেকসনেও ক্যাণ্ডিডেট ছিলেন—

প্রশান্ত : ওসব ছেঁদো কথায় কাজ হবে না, এদেশে বিপ্লবও হবে না, কমিউনিজমও আসবে না—

রফিক : (সজোরে ধাক্কা মেরে) চুপ, একদম চুপ করবেন—

প্রশান্ত : (ছুটে মারতে যায়) শালা নেড়ের বাচ্চা— আমার গায়ে হাত! খুন ক'রে ফেলবো—

বিদ্যুৎ : প্রশান্তদা, প্রশান্তদা, কী করছেন—

(দ্রুত সমীরণের প্রবেশ)

সমীরণ : (ছুটে এসে আটকায়) কী, হচ্ছে কী!

প্রশান্ত : রফিক আমার গায়ে হাত দিয়েছে। ওকে আমি—

সমীরণ : আস্তে, আস্তে! অত চেঁচাচ্ছেন কেন?

প্রশান্ত : বেশ করবো চেঁচাবো। কার বাপের কী?

সমীরণ : (চাপা রাগে) কী পেয়েছেন আপনারা? খুব মজায় আছেন, তাই না? হোটেলে ফুর্তি করতে এসেছেন বুঝি? আপনার চিৎকারের চোটে চারপাশ থেকে যদি লোক ছুটে আসে, তাহলে কী হবে জানেন? জীবনে আর আপনাকে নির্বাচনে লড়তে হবে না— খতম হয়ে যাবেন।

প্রশান্ত : থাক্ থাক্— আর জ্ঞান দিও না। সর্বনাশ হয়ে গেল আমার, সর্বনাশ— [দ্রুত প্রস্থান]

বিদ্যুৎ : বড্ড বেশি ভেঙে পড়েছে লোকটা! বাড়ির চিন্তা করতে করতে—

সমীরণ : অমন হয়; মধ্যবিত্ত সখের কমিউনিস্ট কি-না, বিপদ দেখলেই কেটে পড়তে চায়—

রফিক : প্রশান্তবাবু ইদানিং এত অধৈর্য হয়ে উঠেছে, আবার না নাণ্টুর মতো বাড়ি ফিরতে গিয়ে কোনো কাণ্ড বাঁধায়—

সমীরণ : তুমি তো খবর আনতে বাইরে গিয়েছিলে, নাণ্টুর খবর ছাড়। আর কী জানলে?

রফিক : নতুন আর কী? অত্যাচার সব এলাকাতেই নেমেছে, ক্যাডাররা

বেশিরভাগই আমাদের মতো পাড়াছাড়া, যারা রয়েছে— তারাও ব'সে গেছে, মানে পুরো পার্টিটাই যেন বেপাত্তা হয়ে গেছে। তবু ডালহৌসির কেরাণীদের মধ্যে কিছু ইনফ্লুয়েন্স এখানেও রয়েছে কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে শ্রমিক বেল্টগুলো, একদিনে পুরো রঙ বদল—

বিদ্যুৎ ঃ কী ক'রে হয় এটা? চিরকাল জেনে এলাম— শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে বিপ্লবের নেতা, তারাই সবচেয়ে সচেতন, সবচেয়ে অগ্রসর! অথচ সেই শ্রমিক-বেল্টেই সবার আগে পার্টি ভেঙে গেল?

রফিক ঃ আমাদের বুঝতে হবে, ভাবতে হবে, একদিন যে বাহাদুর শ্রমিকরা সিটুর ইউনিয়ন করতো, লাল ঝাণ্ডা হাতে মিছিল করতো— আজ কেন তারা তেরঙ্গা ঝাণ্ডার তলায় দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে, সাট্টা খেলছে— কী ক'রে সম্ভব হলো এটা?

সমীরণ ঃ আসলে আমরা শুধু পাইয়ে দেবার আন্দোলন করেছি, শ্রমিকদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিকভাবে সচেতন করিনি, তারই ফল এটা!

বিদ্যুৎ ঃ কী অদ্ভুত কথা! ঠিক এই অভিযোগ তো এতকাল নকশালরা ক'রে এসেছে আমাদের বিরুদ্ধে। আজ তোমার গলায় ওদের স্বর শুনছি কেন?

রফিক ঃ আহা— নকশালরা যা বলতো, তার সবই তো মিথ্যে ছিল না!

বিদ্যুৎ ঃ জানি, জানি, চিরদিনই তোমরা ওদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক!

সমীরণ ঃ থাক্ এসব কথা! প্রশান্তর কানে গেলে সে এক্ষুণি পার্টিবিরোধী চক্রান্তের জিগির তুলবে!

বিদ্যুৎ ঃ আচ্ছা কমরেড রফিক, জরুরী অবস্থার পরেও লোকের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি?

রফিক ঃ মোটেই না। বরং সবাই ভয়ে মরছে। অবশ্য লোকের আর দোষ কী? পার্টিই যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকে, কোনো লড়াই কোনো আন্দোলন যদি সংগঠিত করা না হয়— তাহলে সাধারণ মানুষ তো ভয় পাবেই।

বিদ্যুৎ ঃ সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল। এতকাল নেতারা ব'লে এলেন, যত অত্যাচার হবে— ততই লড়াই জোরদার হবে; কমরেড পি. ডি. বীরদর্পে ঘোষণা করলেন— শাসকশ্রেণীর বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে যাবে, তবু জনগণ শেষ হবে না—

সমীরণ ঃ তার মানে যতদিন না শাসকশ্রেণীর বন্দুকের গুলি ফুরোয়, ততদিন কিছু করা চলবে না।

রফিক ঃ আঃ সমীরণ! কেন মিছিমিছি খুঁচিয়ে ঘা করছো—

বিদ্যুৎ ঃ অথচ এত অত্যাচার বাড়ছে, তবু কোথাও প্রতিরোধের ইঙ্গিত নেই! জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত, আর জনগণের নেতারা পলাতক রণক্ষেত্র ছেড়ে! কী ক'রে হয় এটা?

সমীরণ ঃ নেতারা ড্রইংরুমে ব'সে আবার কবে ইলেক্শন হবে তার আশায় আশায় দিন গুনছে!

বিদ্যুৎ ঃ অসম্ভব, এদের দ্বারা বিপ্লব হবে, না কচু!

সমীরণ ঃ না, তা নয়। আমি জানতে চাই বুঝতে চাই জরুরী অবস্থার জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চেপে ব'সে রয়েছে— এখনই তো সময়— প্রতিরোধ-সংগ্রাম গ'ড়ে তোলার। অথচ নেতারা হাত পা গুটিয়ে ব'সে রয়েছে, নির্বাচনী খোয়াব দেখছে, কেন— কেন এটা হবে? ঐ জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাইদেরও যতটুকু সাহস আছে রুখে দাঁড়াবার— এদের তাও নেই কেন?

রফিক ঃ একটা প্রশ্ন কি কখনও তোমার মনে আসে না কমরেড, যে ইন্দিরা— জয়প্রকাশ-মোরারজী-বাজপেয়ীদের মতো মার্কা-মারা দক্ষিণপন্থী লোকেদেরও জেলের ভেতর পাঠিয়েছে, সেই ইন্দিরা আমাদের পার্টির বিপ্লবী নেতাদের বাইরে ছেড়ে রাখে কেন?

বিদ্যুৎ ঃ কমরেড রফিক— তোমার ইঙ্গিতটা ভয়ঙ্কর একটা গোপন সত্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে— [সুগত ঢোকে]

সুগত ঃ স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, এদেশ তোদের নয়—

বিদ্যুৎ ঃ কবি! কবির ভাব এসেছে! মারবো শালা পাছায় এক লাথি।

সমীরণ ঃ কোথায় ছিলিস এতক্ষণ?

সুগত ঃ বাইরে মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ঝড় উঠবে হয়তো, শেষ বিকেলের আকাশে একটা আশ্চর্য উজ্জ্বলতা, আর তার মাঝে কালো মেঘের দল সেজেগুজে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেছে; নিঃশব্দ নির্জনে রেশমের নরম জালের মতো অন্ধকার ক্রমশ ঘিরে ফেলছে চারিদিক— দূর বনের প্রান্তে ক্লান্ত সূর্যটা একরাশ রক্ত ছড়িয়ে এইমাত্র ডুবে গেল—

বিদ্যুৎ ঃ শাল্‌লা। এখানে কবিত্ব মারাচ্ছে— যত্তোসব উজবুক!

সুগত ঃ কী শান্ত স্তব্ধতা চারিদিকে, তুলোর মতো হাল্কা বাতাস—

বিদ্যুৎ ঃ তোর ইয়েতে কাঁচা বাঁশ ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত—

সুগত : [হেসে চ'লে যায়] এই কী রে দেশ, জন্মভূমি; ডাকাতদলের থাবার নিচে দেহ পসারিণী আমার দেশ— [প্রস্থান]

বিদ্যুৎ : সাধে কি আর মুখ খারাপ করি? মরতে বসেছি সবাই, তবু শালার কবিত্ব ঘোচে না!

সমীরণ : চুপ কর! হয়তো সুগত আমাদের ভেতরের সেই চিরন্তন স্বপ্ন, হাজার দুর্যোগেও যা মরে না—

রফিক : চলুন কমরেড, অনেক দেরি হয়ে গেছে— রান্নাবান্নার যোগাড় করিগে—

সমীরণ : চাল ফুরিয়ে এসেছে প্রায়, টেনেটুনে আর বড়জোর কালকের দিনটা, হাতে পয়সাও নেই—

বিদ্যুৎ : এখনও সাহায্য এসে পৌঁছোলো না কেন? মাসের প্রায় অর্ধেক হ'তে চললো—

রফিক : হয়তো এবারে কোনো অসুবিধে হচ্ছে—

বিদ্যুৎ : কীসের অসুবিধে? আমরা কি পার্টির জন্যে জানপ্রাণ লড়িয়ে খাটিনি? নেতারা ঠাণ্ডাঘরে ব'সে আরাম করবে, আর ক্যাডাররা না খেয়ে প'চে মরবে?

সমীরণ : আঃ, আবার তুই— [দ্রুত প্রশান্তর প্রবেশ]

প্রশান্ত : সর্বনাশ হয়েছে! ঐ দ্যাখো— একটা লোক আসছে এদিকে—

সমীরণ : কোথায়, কই দেখি—

প্রশান্ত : ঐ যে— নিশ্চয়ই আই.বি.-র লোক, খোঁচড়, জেনে ফেলেছে আমরা এখানে আছি—

রফিক : হুঁশিয়ার— একদম হুঁশিয়ার সবাই, মাথা ঠাণ্ডা রাখো—

বিদ্যুৎ : (সমীরণকে)— কী করবে? ঝেড়ে দেবে?

সমীরণ : কী আর করবো? শালাকে আর ফিরে যেতে দেবো না—

প্রশান্ত : তার মানে? খুন করতে চাও?

সমীরণ : কুইক! বী রেডি! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না!

রফিক : একাই এসেছে মনে হয়! ঠিক আছে, কাজ সেরে পেছনের কুয়োয় ফেলে দেবো—

প্রশান্ত : না, কক্ষণো না! এসব হঠকারিতা, অতিবাম বিচ্যুতি। এমনিতেই বাড়ি ফিরতে পারছি না, তার ওপর আবার খুনের চার্জে জড়িয়ে পড়লে—

বিদ্যুৎ : প্রশান্তদা— স'রে যান বলছি—

প্রশান্ত : খুনটুনের ঝামেলায় যাবার দরকার নেই, তার চেয়ে চল আমরাই পালিয়ে যাই—

নেপথ্যে ঃ এই যে, কেউ কি আছেন— উঃ কী অন্ধকার, কিছু দেখা যাচ্ছে না—

রফিক ঃ হিস্-স্— চুপ! এসে গেছে! অন্ধকারে গা ঢাকা দাও! তৈরি থাকো—

প্রশান্ত ঃ না— কিছুতেই না— মানুষ মারা অন্যায়—

সমীরণ ঃ (এক ঘুষি মেরে ফেলে দেয়) —শালা, ভীতুর ডিম, গান্ধীর বাচ্চা, লাল ঝাণ্ডা ওড়াবে, কিন্তু হাতে রক্ত মাখবে না—
[অন্ধকারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি লোক ঢোকে]

লোকটি ঃ কেউ কি আছেন? বাইরে থেকে আলো দেখলাম যেন, গলার আওয়াজও শুনলাম— শুনুন, সাড়া দিন, আমি ভীষণ ক্লান্ত— একটু আশ্রয় চাই—
(ওরা অতর্কিতে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির ওপরে)

প্রশান্ত ঃ খুন খুন হচ্ছে— মেরে ফেলছে— (চেঁচাতে থাকে)

লোকটি ঃ এ কী! এ কী করছেন! আমায় মারছেন কেন? আ-আ—

প্রশান্ত ঃ সুগত— সুগত— দৌড়ে এসো— শিগ্‌গির, ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেল— সর্বনাশ—

লোকটি ঃ মারছো কেন? আমি কী করেছি? আ—
[ছুটে সুগত ঢোকে। হাতে টর্চ]

সুগত ঃ কে? কী হয়েছে? কাকে মারছো? (টর্চের আলো ফেলে চিৎকার ক'রে ওঠে) আরে —এ কে? এ যে কান্তিদা—

সমীরণ ঃ (চিৎকার) কী বললি? কে?

সুগত ঃ চিনতে পারছো না সমীরণদা? তোমার মাসতুতো ভাই-- কান্তিদা, বিল্টুর দাদা!

সমীরণ ঃ (আর্তনাদ) —কান্তিদা! বিল্টুর দাদা—

লোকটি ঃ (স্তম্ভিত বিস্ময়ে) —সমীরণ তুই! [টর্চের আলো নিভে যায়। অসহ্য স্তব্ধতা]

নেপথ্যে ঃ লেট দেয়ার বি লাইট, মাই বয়, লেট দেয়ার বি লাইট!
[মোমবাতি হাতে বৃদ্ধ ফাদার ঢোকে]

ফাদার ঃ লেট দেয়ার বি লাইট, ঈশ্বর কহিলেন— লেট দেয়ার বি লাইট! আলোকিত হইলো সমগ্র ভূমণ্ডল। [একই কথা বলতে বলতে চ'লে যায়]

প্রশান্ত ঃ কান্তি! বিল্টুর দাদা? কে বিল্টু!

রফিক ঃ কে বিল্টু— তা কি আপনি জানেন না প্রশান্তবাবু? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন?

প্রশান্ত ঃ ও! সেই বিল্টু! কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! [ছুটে পালিয়ে যায়]

প্রশান্ত ঃ (সমীরণকে) বিল্টু তোমার মাসতুতো ভাই হতো, কোনোদিন বলোনি তো?

সুগত ঃ আমি জানি। ঐজন্যেই তো কান্তিদাকে দেখেই চিনতে পেরেছি—

কান্তি ঃ (হাঁফাতে হাঁফাতে) ভাগ্যে চিনেছিলিস—! না হ'লে এতক্ষণে হয়তো—

সমীরণ ঃ আমায় ক্ষমা করো! আমি বুঝতে পারিনি। তোমার খুব লেগেছে?

কান্তি ঃ (হেসে) —না, তেমন আর লাগলো কই? গলাটা যেভাবে টিপে ধরেছিলিস, তাতে আরেকটু হ'লেই দমবন্ধ হয়ে ফুসফুসটা ফেটে যেতো—

রফিক ঃ আমায় মাপ করুন কমরেড! আমিই আপনার গলায় হাত দিয়েছিলাম—

কান্তি ঃ না, না, তাতে কী হয়েছে? ভুল মানুষমাত্রেরই হয়। কিন্তু তোরা আমায় হঠাৎ মারতে গেলি কেন? কী ভেবেছিলিস আমায়— শত্রু? দুশমন?

সমীরণ ঃ হ্যাঁ তাই। আসলে দিনরাত একটা চাপা আতঙ্কের মধ্যে থাকতে থাকতে আমাদের কারুরই মাথার ঠিক নেই! শত্রু-মিত্রের ভেদরেখা গুলিয়ে গেছে!

বিদ্যুৎ ঃ ইস, আর একটু হ'লেই মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে যেতো, অনুতাপের আর শেষ থাকতো না—

সুগত ঃ হ্যাঁ, আমি যদি আরেকটু দেরিতে আসতাম— তাহলে যে কী হতো, ভাবতেই শিউরে উঠছি—

বিদ্যুৎ ঃ আচ্ছা, উনি কোনো রাজনীতি করেন? বিল্টু তো নকশাল ছিল—

সুগত ঃ না, না— কান্তিদা কোনোদিন পার্টি-পলিটিক্স করেননি। আমার পাড়ার লোক, আমি সব জানি। বড় সাদাসিধে ভালোমানুষ! বিয়ে-থা করেননি।

কান্তি ঃ কী রে, তোরা সবাই এমন চুপ মেরে গেলি কেন? এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে একটা ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত গীর্জার ভেতরে তোরা করছিসটা কী? এখানে এলি কীভাবে?

সমীরণ ঃ তুমিই-বা এখানে এলে কী ক'রে?

কান্তি ঃ আমার কথা ছাড়্ ! আমি কী আর মানুষ আছি? আমার সব গেছে, সব আশা, সব স্বপ্ন— এখন— এখন শুধু একটা কাজই

বাকি এ জীবনে। —থাক্, সেকথা থাক্! তা তোরা বোধহয় সব বাড়িঘর ছাড়া? পাড়ায় ফিরতে পারিস না বুঝি?

সমীরণ ঃ কেন, তুমি কিছু জানো না?

কান্তি ঃ আমি আর কোত্থেকে জানবো বল্? বাড়িঘর ছেড়েছি— সে অনেকদিন, ঐ কাণ্ডটা ঘ'টে যাবার পরেই! কীসের জন্যে আর বাড়িতে থাকবো? আর কে আছে আমার?

রফিক ঃ আপনার সংসারে আর কেউ ছিল না বুঝি?

কান্তি ঃ নাঃ, ভাইটা ছাড়া আর কেউই ছিল না। আর সে-ই যখন অমনভাবে শেষ হয়ে গেল— আর তাছাড়া কারখানায় শালা নিত্যদিন ঝামেলা। যেহেতু আমি বিল্টুর দাদা, তাই কত্তারা সন্দেহ করলো, আমি নিশ্চয়ই তলে তলে কারখানার মধ্যে ওদের পার্টি করি। —দিলাম চাকরিটা ছেড়ে! যাক্‌গে, কার জন্যে আর চাকরি করবো? তার চেয়ে এই ভালো! পথে পথে ঘুরি, ভাবনা নেই চিন্তা নেই— একেবারে সর্বহারা—হাঃ হাঃ!

বিদ্যুৎ ঃ তা, হঠাৎ এইখানেই-বা এলেন কী ক'রে?

কান্তি ঃ আরে যাচ্ছিলাম একটা জায়গায়— মাঠের মাঝামাঝি আসতে না আসতেই দেখি— ভীষণ মেঘ ক'রে এসেছে, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে— জবরদস্ত্ একটা বৃষ্টি নামবেই নামবে! কাছেপিঠে একটা ঘরবাড়িও নেই যে, একটু আশ্রয় নেবো! হঠাৎ আবছা আঁধারে চোখে পড়লো এই ভাঙাচোরা গীর্জাটা! ওঃ, আরেকটু হ'লেই গিয়েছিলাম আর কী!

সমীরণ ঃ যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসো! আজ রাতটা না হয় এখানেই থাকবে!

সুগত ঃ আমার সঙ্গে আসুন। জলের জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছি—

কান্তি ঃ তা-ই চলো, হাতে-পায়ে ভীষণ টান ধরেছে— মুখ-হাত ধুয়ে একটু শুতে পারলে হয়—

সুগত ঃ সাবধানে আসুন! [টর্চ জ্বেলে কান্তিকে নিয়ে বেরিয়ে যায়]

বিদ্যুৎ ঃ ভাগ্যের কী পরিহাস! আজ এতকাল বাদে বিল্টুর দাদা আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে!

রফিক ঃ উনি বোধহয় জানেন না, আসলে ঘটনাটা কী ঘটেছিল?

বিদ্যুৎ ঃ নিশ্চয়ই না, জানলে ওঁর ব্যবহারে ধরা পড়তোই। তাছাড়া অপারেশনটা নিখুঁত হয়েছিল, কেউ আমাদের সন্দেহ করেনি, তাই না?

সমীরণ ঃ (উদাসভাবে) —হবে বোধহয়!

বিদ্যুৎ : আসলে সেই সত্তর-একাত্তর সালে চতুর্দিক থেকে ওরা মার খাচ্ছিল। পুলিশ মারছিল, কংগ্রেসী গুণ্ডারা মারছিল, অনান্য পার্টিরাও মারছিল। সবাই ছিল ওদের বিরুদ্ধে। কে ধরবে কাকে? কে মেরেছে— কে বুঝবে?

রফিক : বিরাট বড় ভুল হয়ে গেল! এত বড় ভুল জীবনে আর কখনও করিনি! যাক্‌গে, ভেবে কী হবে? তীর ছোড়া হয়ে গেছে বহুকাল, আর সে ফিরবে না—

বিদ্যুৎ : যতই হোক, ছেলেটা মনে হয় ভালোই ছিল, কী নিষ্পাপ চোখ দুটো—

সমীরণ : (বোমার মতো ফেটে পড়ে) —যা চ'লে যা তোরা এখন—

বিদ্যু : (বিস্ময়ে) কী হলো তোর?

সমীরণ : কিছু না, কিছু না, আমাকে একটু একা থাকতে দে, দোহাই— [রফিক আর বিদ্যুৎ অবাক হয়ে চ'লে যায়। তীরবিদ্ধ হরিণের মতো সমীরণ যন্ত্রণায় ছটফট করে। সুগত কখন যেন মঞ্চে ঢুকে পেছনের ছেঁড়া অন্ধকারে একা একা আবার "এ পরবাসে রবে কে...." গাইতে শুরু করেছে— তার গানের রেশ দূরাগত ধ্বনির মতো বাতাসে ভাসে]

সমীরণ : আমি জানি— আমি বারবার নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি— যা ঘটেছে তা ছিল অনিবার্য, অবধারিত। তা ঘটতোই। সময়টাই ছিল তখন অন্য মেজাজে ভরা, আক্রোশক্ষিপ্ত উন্মাদ ঘোড়ার মতো। এমন ঘটনা বহু ঘটেছে তখন— অজস্র! কিন্তু তবু— তবু— সেই যে— ডাকনাম যার বিল্টু, ভালো নাম যার অনির্বাণ— আজ যেন মনের ভেতর— চেতনার অতল গভীরে ব'সে অবিরাম প্রশ্ন ক'রে যায়— এই ভয়ঙ্কর আগ্রাসী দুঃসময়েও, এই পলাতক উদ্বাস্তু জীবনেও কে যেন দীর্ঘবিস্তারী সংশয়ের ছায়া ফেলে—[অন্ধকারে একটি কিশোর : কেমন! হলো তো?]

সমীরণ : (ভীষণ চমকে) ক্‌-কে? [একটি সরু আলোর রেখায় উদ্ভাসিত হয় এক কিশোরের মুখ]

কিশোর : সেই যে বস্তাপচা পুরোনো প্রবাদটা— ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে! একদিন তোমরাও প্রাণ খুলে হেসেছিলে না?

সমীরণ : বিল্টু!

বিল্টু : থানার লক্‌-আপে, জেলখানার চাতালে, বারাসতের মাঠে, বরাহনগর-কাশীপুরের রাস্তায় লাসের পর লাস যখন পড়েছিল স্তূপাকৃতি— তখন কোথায় ছিলে তোমরা হে মহাবিপ্লবীরা?

একবারও সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলে দেশজোড়া এই হত্যার বিভীষিকার বিরুদ্ধে?

সমীরণ : কী যা তা বলছিস?

বিন্টু : বরং সেদিন তোমাদের নেতা ঐ হত্যাকারীদের স্বপক্ষে নির্লজ্জের মতো ওকালতি করেছিল— বলেছিল— পুলিশের গুলিতে কি নিরোধ লাগানো আছে, না হ'লে এখনও ওরা শেষ হচ্ছে না কেন?

সমীরণ : আবার তুই আজেবাজে কথা বলছিস?

বিন্টু : সেদিন বুঝি ভেবেছিলে— ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাচ্ছে, ষাঁড়ের তাতে কী? হায় রে, হতভাগা ষাঁড় সেদিন ভাবতেও পারেনি, একদিন না একদিন বাঘ তাকেও পেটে পুরবে, তাকেও একদিন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে—

সমীরণ : চুপ কর্, চুপ কর্ বলছি!

বিন্টু : (গলা তুলে) হিটলার প্রথমে যখন কমিউনিস্টদের পাইকিরি হারে কোতল করতে থাকে, তখনও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ভেবেছিল— আমাদের কী, মারছে তো হতচ্ছাড়া কমিউনিস্টদের; তারপর তারা নিজেরা যখন খুন হ'তে লাগলো হিটলারী ঝটিকা বাহিনীর হাতে, তখন তাদের সেই মর্মান্তিক আর্তনাদেও কান দেয়নি কোনো গণতান্ত্রিক দল, গণতান্ত্রিকরা তখন চোরাবালিতে মুখ লুকিয়ে ভেবেছিল— আমরা তো নিরাপদ, মরছে তো শুধু কমিউনিস্ট আর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা। তারপর নাটকের শেষ অঙ্কে যখন প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষ, প্রতিটি ইহুদী, প্রতিটি স্বাধীনচেতা নাগরিক হিটলারী যূপকাষ্ঠে বলি হ'তে লাগলো লাখে লাখে, তখন সেই প্রতিরোধহীন করুণ শ্মশানে মৃত্যুর নিশ্চিত হাতছানির মধ্যে দাঁড়িয়ে সবাই বুঝলো— ফ্যাসীবাদ কাউকে ছাড়ে না, সে আগে মারে কমিউনিস্টদের— তারপর অন্য সবাইকে—

সমীরণ : চ'লে যা, এক্ষুণি চ'লে যা— খারাপ হয়ে যাবে, বলছি! [বিন্টু অদৃশ্য হয়] —জ্ঞান! আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছে! আমার কাছেই রাজনীতি শিখলো, এখন আমাকেই জ্ঞান দিচ্ছে—

[বিস্মিত বিদ্যুৎ ছুটে আসে]

বিদ্যুৎ : কী হলো? একা একা এভাবে চিৎকার করছিস কেন?

সমীরণ : কী? ও, তুই! কিছু না! মাথার মধ্যে কীরকম যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল—

বিদ্যুৎ ঃ কান্তিদা রফিকের সঙ্গে গল্প করছে— আমি থাকতে পারলাম না, চ'লে এলাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে—

সমীরণ ঃ খুবই স্বাভাবিক! আমিই চোখ তুলে তাকাতে পারছি না!

বিদ্যুৎ ঃ উনি নিশ্চয়ই আসল ব্যাপারটা জানেন না। সেদিক থেকে ভয় নেই। তবু— ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, ভদ্রলোককে দেখে কেমন যেন— বুকের মধ্যে একটা— মানে সঙ্কোচ.... দ্বিধা—

[দ্রুত প্রশান্তের প্রবেশ]

প্রশান্ত ঃ (চাপা স্বরে) ঐ লোকটা কেন এসেছে?

সমীরণ ঃ কে? কান্তিদা?

প্রশান্ত ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনির্বাণের দাদা! কী চায় ও? কেন এসেছে? নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে ওর, ওপরে ওপরে যতই ভালোমানুষী দেখাক—

বিদ্যুৎ ঃ আজেবাজে বকবেন না তো!

প্রশান্ত ঃ ও নিশ্চয়ই জানে। সব জানে। না জানার ভান করছে শুধু। আঃ, কেন যে তোমাদের বাধা দিলাম, কেন খুনটা করতে দিলাম না?

সমীরণ ঃ প্রশান্তদা! ছেলেমানুষী করবেন না!

প্রশান্ত ঃ আচ্ছা— এখনও তো সময় আছে— এখনও তো লোকটাকে—

বিদ্যুৎ ঃ যাঃ! কী বলছেন যা তা?

প্রশান্ত ঃ কেউ জানতে পারবে না। ওই কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে—

বিদ্যুৎ ঃ খবরদার! আর একবারও যেন এসব কথা না শুনি—

প্রশান্ত ঃ ওঃ! খুব যে দরদ! একটা নটোরিয়াস উগ্রপন্থী ক্রিমিন্যালের জন্যে এত পিরীত?

বিদ্যুৎ ঃ একদিন আপনার জবরদস্তিতেই একটা নোংরা কাজ করতে হয়েছিল আমাদের— মনে আছে? আমরা কেউ চাইনি, তবু বাধ্য হয়েছিলাম আপনার কথায়—

প্রশান্ত ঃ বটে? আ-চ্ছা, এত দূর!

বিদ্যুৎ ঃ আজ কিন্তু চাকা ঘুরে গেছে প্রশান্তদা, আজ যদি আবার সেই ঘটনা ঘটাতে চান—

প্রশান্ত ঃ (এগিয়ে আসে) কী? কী করবে আমায়?

বিদ্যুৎ ঃ (চিৎকার ক'রে ছুটে যায়) তোকেই মেরে দেবো শালা! [রফিক ও কান্তি ঢোকে]

রফিক : ওঃ, আবার গণ্ডগোল! আপনারা কি কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবেন না?

প্রশান্ত : (কান্তিকে দেখে) না না— কিছুতেই সহ্য করতে পারি না, কিছুতেই না— [ছুটে পালিয়ে যায়]

কান্তি : (অবাক হয়ে) কী ব্যাপার! ভদ্রলোক আমাকে দেখে এভাবে পালিয়ে গেলেন কেন?

সমীরণ : (চাপা দিতে চায়) কিছু না, কিছু না— অনেকদিন বাড়ির লোকজনের কাছ ছাড়া তো, ঐ জন্যেই একটু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে— যতই হোক সংসারী লোক তো—

কান্তি : তা অবশ্য হ'তেই পারে। বৌ-ছেলেমেয়ে-ভাইবোনের ওপর সবারই ভালোবাসা থাকে। আমার কথাই ধরো না কেন, বিন্টুর খবরটা যখন পেয়েছিলাম তখন চিৎকার ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছিল, অথচ কাঁদতে পারছিলাম না, বুকটা এত ভারী, গলার কাছে কী যেন একটা ডেলার মতন আটকে ছিল, মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা, বিশ্বাস কর্—আমার চোখে একটুও জল ছিল না, একটুও না—

সমীরণ : থাক্ কান্তিদা, এসব কথা থাক্!

কান্তি : অ্যাঁ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাক্, সেকথা থাক্! এমনিতেই তোরা নানাদিক থেকে ব্যতিব্যস্ত, আর তোদের বিরক্ত করি কেন? এ আমার বোঝা, আমাকেই বইতে হবে একা। এখন শুধু এ জীবনে একটামাত্র কাজ বাকি, একটা কাজ—

সমীরণ : কান্তিদা—

কান্তি : তুই তো জানিস সমীরণ— বিন্টু যখন খুব ছোটো, তখন বাবা-মা দু'জনেই মারা যান। সেই থেকে কোলেপিঠে ক'রে আমিই ওকে মানুষ করেছিলাম। যোলোবছর বয়েসে ওরই জন্যে কারখানায় কাজ নিয়েছিলাম। সেই বিন্টু ছোটো থেকে বড় হলো, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলো.... তুই তো জানিস, পড়াশোনায় ও কত ভালো ছিল— আশা করেছিলাম— বিন্টু মস্ত বড় হবে, অনেক বড়, সারা দেশ জুড়ে তার নাম হবে—

সমীরণ : (চিৎকার ক'রে) থামো, থামো কান্তিদা! কী লাভ এসব ব'লে?

কান্তি : না, না, কোনো লাভ নেই! কিচ্ছু হবে না আর! যা হবার সব শেষ হয়ে গেছে চিরদিনের মতো—

রফিক : স্থির হোন, একটু স্থির হোন কান্তিবাবু—

কান্তি : আমি তো স্থির আছিই ভাই— আমার তো পাগল হয়ে যাওয়া

উচিত ছিল। লেবুতলার নোংরা নর্দমাটায় মুখ গুঁজে যে লাসটা পড়েছিল, তার ঠাণ্ডা হিম শরীরে আঠেরোটা ছুরির রক্তাক্ত চিহ্ন দেখেও তো আমি পাগল হইনি! ঐটুকু বাচ্চা ছেলে, তার ফুলের মতো নরম দেহে আঠেরোবার ছুরি চালিয়েছে— একের পর এক, একের পর এক, আঘাতের পর আঘাত, আঘাতের পর আঘাত—

সমীরণ : (তীব্র যন্ত্রণায় কান্তিকে ধ'রে ঝাঁকিয়ে) চুপ, একদম চুপ—

বিদ্যুৎ : এই সমীরণ— কী হচ্ছে কী? পাগল হলি!

রফিক : এই সমীরণবাবু— ছাড়ুন! (বিদ্যুৎ ও রফিক জোর ক'রে ছাড়িয়ে দেয়)

কান্তি : বিল্টুর কথা ভাবলে তোরও বুঝি আমারই মতন মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়? হওয়ারই কথা! তুই তো ওকে একসময় খুবই ভালোবাসতিস, তোর কাছেই তো সে পার্টি করা শিখেছিল—

সমীরণ : আবার এক কথা? চুপ করো বলছি—

কান্তি : অবশ্য পরে যে কেন তোর সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তা আমি আজও বুঝিনি, দু'জনেই দু'জনকে দেখলে খেপে উঠে ঝগড়া বাঁধাতিস! আমি কতবার ওকে বলেছি— হ্যাঁ রে বিল্টু, তুই আর সমীরণদের সঙ্গে নেই, নারে?

[গাঢ় অন্ধকারে বিল্টুর আলোকিত মুখ ভেসে ওঠে]

বিল্টু : [এগিয়ে আসে] —না!

কান্তি : সে কী কথা! এই এতদিন সমীরণ তোর গুরু ছিল, ওর বিরুদ্ধে কোনো কথা তুই সহ্য করতে পারতিস না, আর আজ হঠাৎ ঝগড়া হয়ে গেল?

বিল্টু : ওসব তুমি বুঝবে না।

কান্তি : এটা কিন্তু মোটেই ভালো হচ্ছে না। যতই হোক— সমীরণ, সম্পর্কে তোর মাসতুতো দাদা। ছোটোবেলায় ওদের বাড়িতে রাণু মাসিমার কাছে তুই কতদিন থেকেছিস, খেয়েছিস—

বিল্টু : সমীরণদা আর আমাদের পথ এখন একেবারে আলাদা—

কান্তি : আলাদা মানে? ওরাও লালঝাণ্ডা, তোরাও লালঝাণ্ডা— ওরাও কমিউনিস্ট, তোরাও—

বিল্টু : না! ওরা কমিউনিস্ট নয়। ওরা মন্ত্রীত্বের লোভে গণ আন্দোলনকে বিসর্জন দিয়েছে, গদি রাখার জন্যে নকশাল বাড়ির চাষিদের ওপর গুলি চালিয়েছে, ওদের মগজটাই এখন একটা ভোটের বাক্স, মার্ক্সবাদের বদলে ব্যালট পেপারে ভর্তি—

কান্তি ঃ বুঝি না বাপু তোদের এসব গোলমেলে কথাবার্তা—

বিল্টু ঃ তোমাকে বুঝতে হবেও না। তবে এইটুকু জেনে রাখো, সমীরণদারা আজ সংশোধনবাদের পচা পাঁকে ডুবে গেছে, শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের ফেরিওলা, শাসকশ্রেণীর ঘৃণ্য দালাল বনেছে—

সমীরণ ঃ [ছুটে যায়] চুপ কর্, এইসব হঠকারী, অতিবাম—

[বিল্টু গাঢ় আঁধারে ঢেকে যায়]

কান্তি ঃ তুই রাগ করলি বুঝি? আরে না, না বিল্টু সত্যিসত্যিই তোকে খুব ভালোবাসতো। মনে মনে শ্রদ্ধাও করতো। এমন-কি তোদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরেও—

সমীরণ ঃ (ক্লান্ত স্বরে) কেন, কেন এসব কথা বলছো?

কান্তি ঃ না, না, সত্যি বলছি, বিশ্বাস কর্, কতদিন ও নিজে আমায় বলেছে— [বিল্টুর মুখে আলো]

বিল্টু ঃ জানো দাদা, আমি কতদিন ভেবেছি— সমীরণদা নিশ্চয়ই তার ভুল বুঝতে পারবে একদিন, আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। আসলে সমীরণদার মতো নিষ্ঠাবান কর্মী পাওয়া যায় না। দিন নেই, রাত নেই, পার্টির জন্যে খেটে চলেছে। কিন্তু তুমি দেখে নিও, ওর এই পরিশ্রম ব্যর্থ হবেই। ভুল, একেবারেই ভুল রাস্তায় ছুটে চলেছে পাগলের মতো—

কান্তি ঃ ঠিক এই একই কথা হয়তো সেও তোর সম্পর্কে ভাবে—

বিল্টু ঃ তা ভাবুক, তাতে তো ইতিহাস মিথ্যে হবে না। আমরা হাতে-কলমে বিপ্লব করছি, শত্রুর রাইফেলের মোকাবিলা করছি। আজ হোক, কাল হোক— আমরা জিতবোই। কিন্তু সমীরণদার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে আমার কষ্ট হয় ভীষণ! যতই হোক, তার কাছেই মার্ক্সবাদ কী, তা প্রথম শিখেছি— তাই বড় ইচ্ছে করে— সমীরণদা যদি আমাদের সঙ্গে আসতো! তুমি দেখে নিও দাদা, অনেক দুঃখের মূল্যে বহু রক্ত ঝরিয়ে একদিন না একদিন তাকেও আমাদের পথেই আসতে হবে— [ছুটে চ'লে যায়]

সমীরণ ঃ (চিৎকার ক'রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে) বিল্টু-উ-উ-উ!

রফিক ঃ সমীরণ, সমীরণবাবু—

বিদ্যুৎ ঃ কেন? কেন এসব বলছেন কান্তিদা? এসব তো অনেক আগেই মিটে গেছে—

কান্তি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসব পুরোনো কথা না বলাই উচিত। সমীরণ

মিছিমিছি কষ্ট পাবে। আমি তো জানি— যতই মতবিরোধ থাক্, বিল্টুকে ও দারুণ ভালোবাসতো, বিল্টুর মৃত্যুতে—

সমীরণ ঃ (ছিট্‌কে স'রে যায়) না, না, কক্ষণো না— [ছুটে প্রস্থান]

কান্তি ঃ না বললেই হতো। কিন্তু আমি কী করবো বলো? আমার মাথাটাও কেমন যেন আজকাল— মানে সবসময় শুধু ওরই কথা ভাবি, সবার কাছে ওর কথাই ব'লে ফেলি—

বিদ্যুৎ ঃ কান্তিদা, দোহাই আপনার, থামুন!

কান্তি ঃ সারাটা বুক জুড়ে সে ব'সে আছে! কত অজস্র স্মৃতি, কত বিচিত্র ঘটনার মিছিল, ওর হাবভাব চলাফেরা সারাক্ষণ চোখের সামনে ছবির মতো ভাসে! অন্ধকার, মাথার ভেতরে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে— হিমশীতল অন্ধকার—

নেপথ্যে ঃ লেট দেয়ার বি লাইট মাই বয়, লেট দেয়ার বি লাইট—

বিদ্যুৎ ঃ (কথা ঘোরাতে চায়) ঐ দেখুন, ফাদার আসছে— ভাঙা গীর্জার পাগলা ফাদার!

[মোমবাতি হাতে সেই বৃদ্ধ ঢোকে]

ফাদার ঃ ঈশ্বর কহিলেন— লেট দেয়ার বি লাইট! আলোকিত হইলো সমগ্র ভূমণ্ডল। [প্রস্থান]

বিদ্যুৎ ঃ পাগল, পুরোদস্তুর পাগল! সারাক্ষণ মুখে এক বুলি— লেট দেয়ার বি লাইট!

কান্তি ঃ আশ্চর্য তো!

রফিক ঃ নদীর ওপারে নতুন আরেকটা গীর্জা তৈরি হয়েছে— তবু বুড়ো এখান থেকে নড়তে চায় না। অবশ্য নিজের মনেই থাকে, আমাদের ঘাঁটায় না—

কান্তি ঃ কত রকমের লোক যে আছে পৃথিবীতে, কত বিচিত্র মেজাজের! আমার কথাই ধরো না কেন? —আমিও কি পুরোপুরি সুস্থ? বিল্টুর কথা ভেবে ভেবে আমার মাথাটায়—

রফিক ঃ আসুন, অন্য গল্প করি, কী হবে এসব কথা ভেবে?

কান্তি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্য কথাই বলি। আচ্ছা, ইয়ে, তোমরা কতদিন এইভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছো?

রফিক ঃ তা ধরুন, বাহাত্তরের ইলেকশনের পর থেকেই— মানে ওরা যখন আমাদের মেরে ধ'রে পাড়াছাড়া করতে লাগলো—

কান্তি ঃ কী দেশে যে বাস করছি! আমি অবশ্য ঠিক রাজনীতি বুঝি না, তবে আজকাল বিল্টুর কথাগুলো বারবার মনে প'ড়ে যায়। আমার মনে হয়— এমন ঘটনা যে ঘটবে তোমাদের আগেই

বোঝা উচিত ছিল, তোমরা বিনা যুদ্ধে মজা ক'রে দেশটাকে জিতে নেবে, আর ওরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, এ তো হ'তেই পারে না।

রফিক ঃ ঠিক বলেছেন আপনি, বিলকুল ঠিক!

কান্তি ঃ আমি অবশ্য সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবো না— তবে আমার মনে হয়— ইন্দিরা গান্ধী যে আজকে জরুরী অবস্থা জারী ক'রে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম চালাতে পারছে, তার জন্যে দায়ী কিন্তু তোমরা—

বিদ্যুৎ ঃ কী বলছেন কান্তিদা?

কান্তি ঃ ঠিকই বলছি— তোমাদের নেতারাই তো ইন্দিরা গান্ধীর স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভি. ভি. গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তোমরা ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করোনি? কংগ্রেস যখন ভাগ হলো, তখন তোমরা মোরারজীর চেয়ে ইন্দিরাকে বেশি প্রগতিশীল বলোনি? একাত্তর সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তোমরা সবাই মিলে ইন্দিরার পক্ষে দাঁড়াওনি? আর তার একবছর বাদে ঐ ইন্দিরার হাতে মার খেয়ে আজ কাঁদুনী গাইতে এসেছো? আরে বাবা, ওরা যে রিগিং করবে, ভোটের বাক্সে জালিয়াতী করবে, এটা তো জানা কথা, কিন্তু তোমরা কেন প্রস্তুত ছিলে না? তোমরা কেন রুখে দাঁড়াওনি?

বিদ্যুৎ ঃ তাতে খুনোখুনি হতো, ঝামেলা বাঁধতো, রক্তগঙ্গা বয়ে যেতো সারা দেশে—

কান্তি ঃ বাহ্‌বা, চমৎকার! খুনোখুনি ঝামেলা এখন কিচ্ছু নেই, না? এখন জরুরী অবস্থায় সারা দেশ জুড়ে রক্তগঙ্গা বইছে না? তবু তোমরা নিশ্চুপ, নিষ্ক্রিয়, সারা দেশ আজ বন্দীশালা, তবু তোমাদের পার্টি হাত গুটিয়ে ব'সে রয়েছে, শুধু তা-ই নয়, ভেতরে ভেতরে ইন্দিরা গান্ধীর বিশ দফা কর্মসূচীকে সমর্থন করছে—

বিদ্যুৎ ঃ (চমকে) কে বললো একথা? আপনি মিথ্যে কথা বলছেন—

রফিক ঃ না, মিথ্যে নয়, আমি জানি। পার্টির কাগজে বেরিয়েছে— বিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যেও না-কি কিছু ভালো ভালো দিক আছে— জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী ধারা আছে—

বিদ্যুৎ ঃ কমরেড রফিক— কী বলছেন, এ যে বেইমানী!

কান্তি ঃ খুনোখুনি হবে ব'লে তোমরা লড়াই করছো না? খুনোখুনি হবে

না, রক্ত ঝরবে না, তবু তোমরা বিপ্লব করবে? বিনা রক্তে অপারেশন হয়? ছেলে বিয়োতে প্রসূতির রক্ত ঝরে না? কোন্ পাঠশালায় পড়েছো তোমরা? যাও, যাও, লালঝাণ্ডা গুটিয়ে ফেলে গলায় কণ্ঠির মালা ঝুলিয়ে হরিনাম করোগে যাও!

বিদ্যুৎ ঃ বিল্টু! একেবারে বিল্টুর মতো কথা বলছেন আপনি!

কান্তি ঃ কী বলছো?

বিদ্যুৎ ঃ আপনি তো রাজনীতি করেন না। এসব কথা কোত্থেকে জানলেন?

কান্তি ঃ জানি না, জানি না, জানি না—

বিদ্যুৎ ঃ হ্যাঁ, একেবারে বিল্টুর মতো, বিল্টুই যেন কথা বলছিল আপনার গলায়—

কান্তি ঃ (চিৎকার ক'রে) —না!

বিদ্যুৎ ঃ হ্যাঁ, এইভাবেই তো সেই উনসত্তর-সত্তরে বিল্টু আমাদের রাস্তায়-ঘাটে তীব্র ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপে বিধ্বস্ত করতো—

[অন্ধকার থেকে যেন বিল্টু আবার উঠে আসে]

বিল্টু ঃ কেন রাজনীতি করছো বিদ্যুৎদা? হাতের ঝাণ্ডাটা এবার ফেলে দিলে হয় না? লেনিনের সেই কথাটা জানো তো? তোমাদের মতো সমাজতন্ত্রী নেতারা যখন বুর্জোয়া সরকারের মন্ত্রী হয়, তখন তারা হয় পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল, জনতার কাছে মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ধাপ্পা দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শোষণযন্ত্রটাকে জনতার ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা করে—

বিদ্যুৎ ঃ যা, যা, এসব জ্ঞান অন্য জায়গায় দিগে যা। শুধু জেনে রাখিস, আমরাও বিপ্লব করবো, তবে এখন সময় হয়নি—

বিল্টু ঃ না না, থাক্। তোমাদের আর কষ্ট ক'রে বিপ্লব করতে হবে না। তোমরা বরং একটা মুদির দোকান ক'রো, মুদির দোকানে যেমন লেখা থাকে— আজ নগদ, কাল ধার— তোমরাও তেমনি লিখে রেখো— আজ ভোট, কাল বিপ্লব, যে কাল কোনোদিনই আসবে না, যে সময় কোনোদিনই হবে না— [চ'লে যায়]

বিদ্যুৎ ঃ রাগ হতো, প্রচণ্ড রাগ হতো, যত উত্তর দিতে পারতাম না, ততই ভেতরটা বিষিয়ে উঠতো, মাঝে মাঝে মনে হতো— দিই শালার লাসটাকে ফেলে—

কান্তি ঃ (তীব্র বেগে উঠে দাঁড়ায়) কী? কী বললে? তোমরা? তোমরা করেছো?

বিদ্যুৎ ঃ (ভয়ে) না, না, বিশ্বাস করুন, আমরা নই— [ছুটে প্রস্থান]

রফিক ঃ (মাথা নেড়ে) পাগল, সবাই পাগল হয়ে গেছে—

কান্তি ঃ ও কী ব'লে গেল?

রফিক ঃ কিছু না, কিছু না। ওটা একটা কথার কথা মাত্র।
[সুগত ঢোকে]

সুগত ঃ আমি রান্না চাপিয়ে দিয়েছি।

রফিক ঃ সে কী! সূর্য আজ কোন্‌দিকে উঠেছে! কবি রান্না করছে! এ তো বড় গোলমেলে ব্যাপার!

সুগত ঃ আজ বিকেল থেকে তো গোলমেলে কাণ্ডই ঘটছে। প্রশান্তদা ওদিকে পাগলের মতো—

রফিক ঃ কে? প্রশান্তবাবু? সে আবার কী করছে?

সুগত ঃ আবোলতাবোল বকছে, আপনি চলুন, ওরা কেউ সামলাতে পারছে না!

কান্তি ঃ কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

সুগত ঃ কিছু না। কমরেড রফিক, আসুন আপনি!

কান্তি ঃ কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই তলে তলে ঘটছে। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, কিচ্ছু না।

সুগত ঃ আপনি একটু থাকুন, আমরা আসছি— [প্রস্থানোদ্যত]

কান্তি ঃ (পথ আটকে) না! কী হয়েছে, আমাকে বলতেই হবে।

সুগত ঃ এ তো মহাজ্বালা! কমরেড রফিক—

রফিক ঃ কান্তিবাবু, আমরা এক্ষুণি ঘুরে আসছি, অস্থির হবেন না!

কান্তি ঃ না, আগে বলতেই হবে। সবাই যেন আমাকে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে! বলো, বলো শিগ্‌গির— এমন কী ঘটেছে, কেন আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো সবাই— (চেপে ধরে)

সুগত ঃ আঃ, যেতে দিন না, কমরেড রফিক— কিছু একটা করুন!

কান্তি ঃ এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে আসছে যেন—

রফিক ঃ কান্তিবাবু ছেড়ে দিন, পাগলামী করবেন না—

কান্তি ঃ এতক্ষণ পাগল ছিলাম, তাই কিচ্ছু বুঝতে পারিনি, নিশ্চয়ই বিণ্টুর ব্যাপার—

সুগত ঃ (চিৎকার) না! বিশ্বাস করুন! না!

কান্তি ঃ (আরো জোরে চেপে ধরে) বলো, বলো, বিণ্টুর খুনের ব্যাপারে আর কী জানো?

সুগত : না, কিচ্ছু জানি না। অনির্বাণ আমার বন্ধু ছিল, একসঙ্গে কলেজে পড়েছি, আর কিচ্ছু জানি না!

কান্তি : আমার ভেতরে ঝড় বইছে এখন, বলো কে মেরেছে বিল্টুকে?

সুগত : আমি নই, বিশ্বাস করুন আমি নই, অনির্বাণকে আমি ভালোবাসতাম, আলাদা পার্টি করলেও— বিশ্বাস করুন, আমি ছিলাম না—

কান্তি : তবে কে ছিল? কারা মেরেছে?

সুগত : জানি না। রফিক, কমরেড রফিক—

রফিক : আমি জানতাম— এ ঘটনা ঘটবেই, ইতিহাস একদিন জবাব চাইবেই—

কান্তি : আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না, বলো, নয়তো— নয়তো আমি ভয়ানক কিছু ক'রে বসবো—

সুগত : (জোরে ধাক্কা দিয়ে কান্তিকে ফেলে দেয়) জানি না, কিচ্ছু জানি না— [দৌড়ে বেরিয়ে যায়]

রফিক : (কান্তিকে তুলে ধরে) —ব্যস্ত হবেন না। সব কিছুর মীমাংসা আজ রাতেই হয়ে যাবে, আজই! [প্রস্থান]

কান্তি : এতদিনে তাহলে ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি। এতদিনে সব প্রতীক্ষার অবসান! উঃ, কী বীভৎস সেই দৃশ্য— আঠেরোটা ছুরির দাগ! মানুষ কত নিচে নামলে— কত অন্ধ হ'লে তবে এমন ঘটনা ঘটে! আমি রাজনীতি করি না! কোনো পার্টিতে নাম লেখাইনি কোনোদিন; কতদিন তোকে বলেছি বিল্টু— এসব ছেড়ে দে, সময়টা খুবই খারাপ, মানুষগুলো সব বদলে যাচ্ছে, চেনামুখ অচেনা হয়ে যাচ্ছে, লুকোনো নখ-দাঁত বের ক'রে ফেলেছে সবাই— এখন রাজনীতি করা খুবই বিপজ্জনক। কে যে কাকে মারছে, কে যে গোপনে কার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে— কিছুই বোঝা যায় না। কে বা কারা পুলিশের চর, আর কেই-বা আসলে বিরুদ্ধ পার্টির লোক— সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে, গুলিয়ে গেছে শত্রু-মিত্রের ভেদরেখা। ছেড়ে দে রাজনীতি, পার্টি করা ছেড়ে দে বিল্টু। তোকে নিয়ে আমার কত আশা, কত স্বপ্ন, তুই মস্তবড় চাকরি করবি, প্রচুর-প্রচুর টাকা উপায় করবি, পড়াশোনায় তোর এত ভালো মাথা, তুই এসব ছেড়ে দে বিল্টু, ছেড়ে দে। তবু তুই শুনলি না, কী এক প্রচণ্ড নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তোর মন! তোকে আজকাল বুঝতেই পারি না আমি— আগুনের ফুলকির মতো

দুরন্ত ঝড়ের টানে তুই কোথায় উড়ে চলেছিস বিল্টু, আমি তোর নাগাল পাচ্ছি না, কখন আসিস, কখন যাস— কিচ্ছু জানতে পারি না। তুই কবে থেকে এমনভাবে বদলে গেলি বিল্টু, কবে থেকে...., সেই কত ছোটোটি ছিলিস, আমার ওপর নির্ভরশীল, আমাকে ছাড়া দুনিয়ায় কাউকে চিনতিস না তুই, আর এখন কোথায় তুই ছুটে চলেছিস বিল্টু, কোন্ মরীচিকার টানে, তোকে যে আমি চিনতেই পারছি না, বিল্টু— ফিরে আয়, কথা শোন্, আবার সেই ছোট্ট ছেলেটা হয়ে যা, আমি স্বপনপুরের মেলা থেকে তোর জন্যে রঙিন ঝুমঝুমি কিনে আনবো। বিল্টু রে, চারিদিকে সর্বনাশের ঘণ্টা বাজছে— শুনতে পাচ্ছিস? সব কিছু ভেঙে যাচ্ছে, সব কিছু— চারিদিকে লোক মরছে, ঠেলাগাড়ির পর ঠেলাগাড়ি ক'রে লাসের পর লাস চলেছে বরানগরের রাস্তা দিয়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরছে— বহরমপুর জেলের ভেতরে, ভবানী দত্ত লেনে, বেলেঘাটায় মা-বাবার সামনে, বালীগঞ্জ লেকের ধারে। বিল্টু, একবার ফিরে দ্যাখ্, আমার ভীষণ ভয় করছে, হাজার হাজার ছুরি এখন রক্ত মেখে নেচে চলেছে উদ্দাম, লাখ লাখ বুলেট তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন— প্রতিহিংসার সারিবাঁধা কারখানায়, কোটি কোটি রাইফেল অবিরাম পাচার হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা অগণিত গুপ্তঘাতকের হাতে, বিল্টু, ফিরে আয় ভাই, আমরা দু'জন এই অন্ধকার বনভূমি ছেড়ে এই হিংস্র আগ্রাসী মরণের ফাঁদ এড়িয়ে পালিয়ে যাই অন্য কোনোখানে, অন্য কোনো দেশে, স্বদেশ এখন বিদেশের মতো অপরিচিত! (হঠাৎ) বিল্টু-উ, তোকে ওরা খুন করেছে!

নেপথ্যে ঃ লেট দেয়ার বি লাইট মাই বয়, লেট দেয়ার বি লাইট!

কান্তি ঃ (চিৎকার করে) না! এখন আর কোনো আলো নয়, এখন প্রতিহিংসার মতো নিরেট অন্ধকার চাই, অন্ধকারের ভয়ার্ত শীতল স্রোত বয়ে যাক আমার সমস্ত শরীরে— শিরায় শিরায়— রক্তের স্রোতে। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেই আমার শেষ কাজ বিদ্যুতের তলোয়ারের মতো ঝলসে উঠুক! [মোমবাতি হাতে ফাদার ঢোকে]

ফাদার ঃ লেট দেয়ার বি লাইট— ঈশ্বর কহিলেন—

কান্তি ঃ (উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে) আলো নয়, অন্ধকার চাই— আলো

দেখাবার ভণ্ডামি শেষ ক'রে দেবো তোর—(আঘাত করে, ফাদার প'ড়ে যায়। ছুটে রফিক ঢোকে)

রফিক : সবার মতো আপনার গায়েও কি পাগলামীর হাওয়া লেগেছে? এ কী করছেন?

কান্তি : প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা! সব আলো নিভিয়ে দেবো!

রফিক : এই বুড়ো পাগলটার ওপর প্রতিশোধ নেবেন? উঠুন, উঠে দাঁড়ান! মারতে হয়, আমাকে মারুন।

কান্তি : (অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায়) কী বলছো তুমি!

[ফাদার দৌড়ে পালায়]

রফিক : সবাই আপনাকে ভয় করছে, লজ্জায় দূরে স'রে যাচ্ছে। কিন্তু আমি মজুর, আমি লোহা কেটে খাই, আমার ভেতরে কোনো পাপ নেই— আমি আপনাকে ভয় করি না! আমি জানতাম— একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। আমি তৈরি হয়েই আছি।

কান্তি : রফিক, আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সুস্থ মনের মানুষ। তুমিই বলো— কে মেরেছে বিল্টুকে—

রফিক : বলবো, সব বলবো— সব হিসেবনিকেশ হবে আজ। এই, তোমরা এগিয়ে এসো, আর কতকাল পালিয়ে বেড়াবে? [একে একে নতমস্তকে সবাই ঢোকে]

কান্তি : (বিস্ময়ে) তোমরা সবাই— তোমরা সবাই—

রফিক : না। আমরা কেউ নই। সেই সময়— সেই ভয়ঙ্কর সময়.... সেই উত্তপ্ত দিন আর অন্ধকার রাত—

কান্তি : আমি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে!

রফিক : অনির্বাণবাবুকে আমি চিনতাম। বন্ধুত্ব না থাকলেও দু'একবার কথাবার্তাও হয়েছে। সেইসব কথার মানে সেদিন বুঝিনি, ভেবেছি— ছেলেমানুষী। কিন্তু যেদিন ওদের মারের চোটে পুরো সংগঠন বেপাত্তা হয়ে গেল, কারখানায় কারখানায় লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করার মতো একজনও শ্রমিক বাকি রইলো না, জানপ্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম, তখন থেকেই কে যেন মাঝে মাঝে মনের দরজায় কড়া নেড়ে বলতো— রফিক, কমরেড রফিক—

নেপথ্যে বিল্টুর স্বর : শ্রমিকশ্রেণী সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী, দুনিয়া বদলাবার হিম্মৎ

একমাত্র তারই আছে। কিন্তু তাকে বিপ্লবী রাজনীতিতে ইস্পাতের মতো ক'রে গ'ড়ে না তুলে শুধু দু'পয়সা মাইনে বাড়াবার অর্থনীতিবাদী লড়াইয়ের চোরাবালির মধ্যে আটকে রাখলে, একদিন দেখবেন—আপনার থেকেও বেশি পয়সা বাড়ানোর লোভ দেখিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের কব্জা ক'রে ফেলবে। বিপ্লবী রাজনীতি আর বিপ্লবী সংগঠন ছাড়া ফ্যাসিবাদকে রোখা যায় না। ভোট ভিক্ষের দল গ'ড়ে, ব্যালট পেপার দিয়ে—অতীতেও কখনও ফ্যাসিবাদকে রোখা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না।

সমীরণ ঃ (চিৎকার করে) আমরা খুন করেছি সত্যকে, আমরা হত্যা করেছি আমাদের ভবিষ্যৎকে!

কান্তি ঃ কে? কারা মেরেছে?

বিদ্যুৎ ঃ আমাদের অজ্ঞানতা, আমাদের ঈর্ষা! আমারও ভীষণ রাগ হতো, তর্কে যখন হেরে যেতাম—

প্রশান্ত ঃ (ফেটে পড়ে)— আমি! আমি নিজে! আমাকে ব্যাঙ্গ করতো সে, এতবড় সাহস! আমি এলাকার পার্টির নেতা, সেই আমাকেও সে বিদ্রূপ ক'রে বলতো— সরকারী পয়সায় জিপে চ'ড়ে চ'ড়ে আমার ভুঁড়ি বেড়ে গেছে, আমি এত মোটা হয়ে গেছি— আর লড়াই করতে পারবো না, পুলিশে তাড়া করলে ছুটতে পারবো না। উত্তর দিতে না পেরে ভেতরে ভেতরে জ্বলতাম, আর সেই ভেতরের গোমরানো রাগে ফুলতে ফুলতে পার্টি মিটিঙে প্রস্তাবটা ক'রেই ফেললাম—

রফিক ঃ (চিৎকার করে) না! আমার আপত্তি আছে।

প্রশান্ত ঃ (পাল্টা চিৎকার) এটা পার্টি ম্যাণ্ডেট। মানতেই হবে।

রফিক ঃ না, মানছি না। সে ভুল পথে চলতে পারে, তবু সে আমাদের শত্রু নয়!

প্রশান্ত ঃ হ্যাঁ, শত্রু! পার্টি বলছে— উগ্রপন্থীরা আমাদের শত্রু। ওরা শাসকশ্রেণীর দালাল, পুলিশের চর।

রফিক ঃ অথচ পুলিশ ওদের গুলি ক'রে মারছে। পুলিশ দেখছি—তার বন্ধুদেরও চেনে না।

প্রশান্ত ঃ বিদ্রূপ করবেন না কমরেড রফিক। ঐ নকশাল ছোঁড়াটা আমাদের ছেলেদের ভাঙিয়ে নিচ্ছে। ওকে না সরালে পার্টির বিপদ। কমরেড সমীরণ— আপনি কী বলেন?

সমীরণ ঃ আমি কোনো মতামত দিতে পারিনি। তার মানে এই নয় যে, আমি ওকে হত্যা করার বিপক্ষে ছিলাম, তবু একটা দ্বিধা হয়েছিল, সঙ্কোচ হয়েছিল পুরোনো সম্পর্কের কথা ভেবে। তাই শুধু বললাম— সভা যা সিদ্ধান্ত নেবে, আমি তা মেনে নেবো।

প্রশান্ত ঃ কমরেড সুগত?

সুগত ঃ আমার আপত্তি নেই। তবে অ্যাক্‌শানে আমি থাকবো না। খুনোখুনি আমি দেখতে পারি না।

প্রশান্ত ঃ আপনাকে অ্যাক্‌শানে থাকতে হবে না। কমরেড বিদ্যুৎ—

বিদ্যুৎ ঃ আমারও ভীষণ রাগ ছিল ওর ওপর, তবু যেন ঠিক মানতে পারছিলাম না। তাই আমতা আমতা ক'রে বললাম— এছাড়া কি অন্য কোনো পথ নেই?

প্রশান্ত ঃ না, নেই। কমরেড রফিক, এইবার আপনার কী মত?

রফিক ঃ আমি এখনও বলছি, ভুল হচ্ছে, ভয়ানক ভুল। এই ভুলের মাশুল একদিন না একদিন দিতেই হবে।

প্রশান্ত ঃ এটা পার্টির সিদ্ধান্ত। আপনি কি পার্টির বিরোধিতা করেন?

রফিক ঃ না, আমি পার্টির সদস্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পার্টির সিদ্ধান্ত আমি মানতে বাধ্য। তবে আমার আপত্তিটা নোট্ করা হোক!

কান্তি ঃ (চিৎকার ক'রে) ও! এই তাহলে ব্যাপার! তোমরা— তোমরাই তাহলে—

বিদ্যুৎ ঃ আমরা নই— সময়। সময়টাই তখন অন্যরকম, প্রচণ্ড উত্তেজনা চারিদিকে, সবাই সবার শত্রু।

সমীরণ ঃ উগ্র অহঙ্কার আর দম্ভে আমরা সবাই মেতে উঠেছি তখন। সব চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, সব কান বধির, সমস্ত বিবেক মৃত!

রফিক ঃ পর্দার আড়ালে আসল শত্রু তখন তৈরি হচ্ছে চরম আঘাতের জন্যে!

সুগত ঃ (চিৎকার ক'রে) এ তোমার পাপ, এ আমার পাপ!

সমীরণ ঃ তবু— তবু হয়তো আমি ওকে মারতে দিতাম না। বিশ্বাস করুন, ও আমার সম্পর্কিত ভাই— আমারই কাছে রাজনীতি শিখেছে...., ছোটোবেলায় একদিন ও আর আমি মুনশিগঞ্জের বাজারে হারিয়ে গিয়েছিলাম...., আমি ওকে মারতে চাইনি, ভেবেছিলাম— কড়া ধমক দিয়ে শাসিয়ে ছেড়ে দেবো। কিন্তু এমন ভঙ্গিতে সে আমাদের বিদ্রুপ ক'রে উঠলো, সামনে জ্বলজ্যান্ত মৃত্যুকে দেখেও সে এমনভাবে হেসে উঠলো—

(বিল্টুকে যেন ক্রমশ ওরা সশস্ত্র ভঙ্গিতে ঘিরে ধরেছে)

বিল্টু ঃ (হাসতে হাসতে) বাঃ বাঃ! বেশ! এতদিনে দেখছি তোমরাও অস্ত্র ধরেছো। দেখো— এটা আবার অতিবাম-বিচ্যুতি নয় তো? আমি তো জানতাম তোমরা ব্যালট পেপার দিয়েই মানুষ খুন করো!

বিদ্যুৎ ঃ চুপ কর্ শালা! বেশি বাতেলা ঝাড়বি না!

বিল্টু ঃ ওরে বাবা, রাগও আছে দেখছি। সংসদীয় মার্ক্সবাদী বিপ্লবীদের তাহলে রাগও থাকে?

সমীরণ ঃ বিল্টু, এখনও শেষবারের মতো বলছি— যা করছিস সব ছেড়ে দে, এম.এল. পার্টি ছেড়ে দে—

বিল্টু ঃ তোমায় যদি আমি বলি— সি.পি.এম. ছেড়ে দাও, তুমি ছেড়ে দেবে?

প্রশান্ত ঃ আঃ, কথা বাড়াচ্ছো কেন? কাজটা শেষ ক'রে ফ্যালো!

বিল্টু ঃ ও, আপনিও আছেন দেখছি! নমস্কার কমরেড মোটা বাবু! তা গদিতে ব'সে কেমন লাগছে— ছারপোকা কামড়াচ্ছে না তো?

প্রশান্ত ঃ কী, আমায় ইনসাল্ট করা? দেখাচ্ছি মজা তোর!

রফিক ঃ বিল্টুবাবু— আপনাদের রাস্তা ভুল রাস্তা, গলত্ রাস্তা। ও রাস্তা ছেড়ে দিন ভাই—

বিল্টু ঃ ভুল? আমাদের ভুলের বিচার করতে এসেছো তোমরা? হাজার হাজার ছেলে আজ বুক ফুলিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শত্রুর রাইফেলের মোকাবিলা করছে, বিপ্লবের জন্যে হাসিমুখে প্রাণ দিচ্ছে, শত শত শহীদের রক্তে যখন সারা দেশ ভাসছে, তখন তার ভুল-ঠিকের বিচার করতে এসেছো মূর্খের দল? আমাদের নেতাদের মাথার দাম যখন দশ হাজার টাকা, তখন তোমাদের নেতারা সামনে-পিছনে সি.আর.পি. গার্ড নিয়ে ঘোরে। তোমরা করতে এসেছো আমাদের ভুলের বিচার?

সমীরণ ঃ বাজে বকিস না, এই যে স্কুল-কলেজ পোড়াচ্ছিস, মূর্তি ভাঙছিস— এগুলো ভুল নয়?

বিল্টু ঃ সে আলোচনা সংশোধনবাদীদের সঙ্গে করবো না।

রফিক ঃ বিল্টুবাবু আপনাদের সাহস আর আত্মত্যাগকে আমি অন্তত শ্রদ্ধা করি, তবু বলছি— ও রাস্তা ভুল। আমি মজদুর, আমি বুঝি, কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই বিপ্লব হ'তে পারে, কিন্তু সেই শ্রমিকশ্রেণীকে আপনারা বাদ দিয়েছেন, আপনাদের বিপ্লবে শুধু পাতিবুর্জোয়া ছাত্র-যুবরাই রয়েছে; শ্রমিকরা নেই।

বিল্টু ঃ বাজে কথা। আমরাও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কথাই ব'লে থাকি।

রফিক ঃ মুখেই বলেন, কাজে করেন না!

বিল্টু ঃ আপনারাই বরং ট্রেড ইউনিয়নের নামে ব্যবসা ফেঁদেছেন, শ্রমিকশ্রেণীকে ধোঁকা দিচ্ছেন!

রফিক ঃ লেনিন বলেছেন— ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে কমিউনিজম শিক্ষার স্কুল।

প্রশান্ত ঃ কী দরকার এসব আলোচনায়? শেষ ক'রে দাও শালাকে।

সমীরণ ঃ দেখি না, যদি বোঝানো যায়—

প্রশান্ত ঃ মোটেই বুঝবে না। শালারা কালকেউটের বাচ্চা!

রফিক ঃ আপনি থামুন! —বিল্টুবাবু, ব্যক্তিহত্যায় কি বিপ্লব আসে?

বিল্টু ঃ তা আসবে কেন? বিপ্লব আসে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে—তাই তো বলতে চান?

রফিক ঃ একা, একেবারে একা হয়ে গেছেন আপনারা, একা একা আর কত লড়বেন? এখনও কি স্বীকার করবেন না আপনারা ভুল করছেন?

বিল্টু ঃ যদি ভুল ক'রে থাকি, তবে সে ভুল স্বীকার করার হিম্মত কেবলমাত্র আমাদেরই আছে। কেননা, বিপ্লবের স্বার্থ ছাড়া আমাদের আর কোনো স্বার্থ নেই।

সমীরণ ঃ এই যে তোরা সমস্ত গণসংগঠন বয়কট করেছিস, সমস্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামের বিরোধিতা করছিস— এগুলো যে ভুল তা তো স্বীকার করবি!

বিল্টু ঃ হ'তে পারে, ছোটোখাটো প্রশ্নে ভুল হ'তেই পারে, কিন্তু বিচার করবে ইতিহাস। মূল প্রশ্নে আমরা কিন্তু কোনো ভুল করিনি। কৌশলগত ভুলভ্রান্তি আমাদের হ'তেই পারে। কারণ, আমরা কাজ করি, শুধু তত্ত্বের খাঁচায় ব'সে জাবর কাটি না, কিংবা পার্লামেন্টের আরাম কেদারায় ব'সে অবসর বিনোদন করি না। যে কাজ করে, সে-ই ভুল করে। কিন্তু ভুল করতে করতে ঠিককে জেনে নেবার অধিকার ইতিহাস একমাত্র আমাদেরই দিয়েছে।

সমীরণ ঃ বিল্টু— তোর এত অহঙ্কার!

বিল্টু ঃ আমাদের পার্টিই একমাত্র পার্টি যে হাতে-কলমে বিপ্লব করতে নেমেছে। তাই ভুল তো সে করতেই পারে। কিন্তু বড় মহান— সেই ভুল! এ ভুল সংশোধনবাদীদের বজ্জাতি নয়, এ হলো

চিরকালের বিপ্লবী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় সাময়িক বিভ্রান্তির ফসল। এমন ভুলই করেছিলেন প্যারী কমিউনের শ্রমিকরা, এমন ভুলই করেছিলেন রোজা লুকসেমবার্গ আর কার্ল লিবনেখ্‌ট। তাই আজ অনিচ্ছাকৃত ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে বীরের মতো রক্ত ঝরিয়ে গেল যারা, তাদেরই আপাত ব্যর্থতার শোকস্তব্ধ বেদনায় মানুষের চোখে আসে জল, কণ্ঠে আসে গান!

প্রশান্ত ঃ খতম করো! ওকে আর কথা বলতে দিও না! ও যত কথা বলবে, তত আমাদের মধ্যে সংশয়ের বীজ ছড়াবে, দুর্বলতা জন্ম নেবে, এখনি খুন করো! পার্টির আদেশ!

বিল্টু ঃ তবু আমরা মরবো না! জেনে রাখো সংশোধনবাদী দালালের দল— ইতিহাস একদিন আমাদেরই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবে, আমাদেরই শৌর্যবীর্য আর আত্মত্যাগকে স্মরণ ক'রেই প্রেরণা পাবে আগামী দিনের মানুষ—

প্রশান্ত ঃ পার্টির আদেশ! চার্জ! খতম! [রফিক ছাড়া সবাই একের পর এক ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে]

কান্তি ঃ (চিৎকার ক'রে ওঠে) আঠেরোটা ছুরির দাগ! একের পর এক, একের পর এক, আঘাতের পর আঘাত, আঘাতের পর আঘাত! (হঠাৎ কোমর থেকে রিভলবার বের করে) প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, বদলা নাও ভ্রাতৃহত্যার!

[ওরা চমকে ওঠে। বিল্টু অদৃশ্য হয়ে যায়]

বিদ্যুৎ ঃ কান্তিদা— এ কী! (সবাই বিমূঢ় হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে)

কান্তি ঃ এগিয়ে আয় শয়তানের দল। বছরের পর বছর আমি ঘুরে বেড়িয়েছি শুধু তোদের খোঁজে, এই আমার শেষ কাজ, আমি রাজনীতি বুঝি না, আমি শুধু জানি— আঠেরোটা ছুরির দাগ—

সমীরণ ঃ (হঠাৎ চিৎকার ক'রে ছুটে এসে) মারো, মারো আমাদের—

কান্তি ঃ (চমকে সরে যায়) কি!

প্রশান্ত ঃ ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার ক'রে উঠি—

বিদ্যুৎ ঃ আর কতদিন পালিয়ে বেড়াবো!

সমীরণ ঃ লজ্জায় ঘৃণায় মুখ ঢেকে—

সুগত ঃ এ তোমার পাপ, এ আমার পাপ—

রফিক ঃ আমরা তৈরি! মারুন আমাদের কান্তিবাবু!

কান্তি ঃ (বিমূঢ়) তার মানে? এটা কীরকম হলো?

সমীরণ : মারো কান্তিদা, আমাদের মেরে ফ্যালো, আমরা কেউ বাধা দেবো না।

কান্তি : না, না— এরকম তো আমি ভাবিনি। বছরের পর বছর ধ'রে বুকের গভীরে যে বিষের জ্বালা ভরা ছিল, প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে খুঁজে নির্মম বীভৎসভাবে প্রতিশোধ নেবার যত রঙিন ছবি এঁকেছিলাম কল্পনায়, তার সঙ্গে তো এর কোনো মিল নেই!

প্রশান্ত : কতদিন বাড়িঘর ছাড়া— প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আতঙ্ক, আমাদের মারুন, নিষ্কৃতি দিন এই ভয় থেকে।

কান্তি : আমি কাদের মারবো? এরা তো আগেই ম'রে আছে।

রফিক : ভুল করেছি, শুধু বিল্টুকে মেরেছি— তাই নয়, সত্যকে অস্বীকার করেছি!

বিদ্যুৎ : তাই আজ নিজের ঘরেই পরবাসী, এমনভাবে পালাতে হয় ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে—

সুগত : এ তোমার পাপ, এ আমার পাপ!

সমীরণ : দেরি করো না কান্তিদা, আমাদের রক্তস্রোতে ধুয়ে যাক সব ক্লেদাক্ত গ্লানি—

কান্তি : (মাথা নেড়ে) না, না— ঠিক নয়, ঘটনাটা যে এমনভাবে মেলোড্রামা হয়ে যাবে, তা আগে কখনও বুঝতে পারিনি! (রিভলভারটা ছুড়ে ফেলে দেয়। সবাই চমকে ওঠে)

বিদ্যুৎ : কান্তিদা—

প্রশান্ত : না, মেরে ফেলুন! আর সহ্য হচ্ছে না, এমনভাবে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা—

কান্তি : পালাবে কেন? ফিরে যাও, রুখে দাঁড়াতে শেখো। পাল্টা মার দিতে পারো না?

রফিক : ঠিক, বিলকুল ঠিক।

কান্তি : মৃত্যুর ভয়ে না কেঁপে নিজের অধিকার অর্জন করতে মৃত্যুর টুঁটি টিপে ধরো। বিল্টুর কথা ভাবো, শিক্ষা নাও ওদের সাহস ত্যাগ আর বীরত্ব থেকে—

রফিক : ঠিক, বিল্টুবাবুই আজ আমাদের পথ দেখাবে—

সুগত : "ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি, প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করবো, কেননা— মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত, সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।"

বিদ্যুৎ ঃ নতুন পথে, নতুন উপলব্ধিতে এক জোটে—

রফিক ঃ ফ্যাসিবাদ আর তার দালাল শোধনবাদের বিরুদ্ধে—

সমীরণ ঃ গ'ড়ে তোলো লৌহদৃঢ় প্রতিশোধের দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড!

কান্তি ঃ ঝড় আসছে ভায়েরা আমার, প্রলয়ঙ্কর ঝড়— যে ঝড়ে উড়ে যাবে স্বৈরতন্ত্রের আবর্জনা— আর বেইমানীর ভস্মরাশি দিকচিহ্নহীন মহাশূণ্যে; তোমরা নিজের হিম্মতে এই ঝড়ের সমুদ্র পেরিয়ে ফিরে যাও আপন দেশে, ছেড়ে আসা নিজের ঘরে—

[ওরা সবাই নৌকা বাইবার ভঙ্গি করতে থাকে। ফাদার মোমবাতি হাতে নিয়ে ঢোকে। দূর থেকে আলো দেখায়]

ফাদার ঃ লেট দেয়ার বি লাইট, মাই বয়, লেট দেয়ার বি লাইট!

পর্দা

একাঙ্ক

বদলা

[এই নাটকের সব চরিত্রে মোট ছ'জন অভিনেতা অভিনয় করবে]
[প্রথম প্রযোজনা-- অগ্নিজাতক নাট্যসংস্থা, নির্দেশনা— অনল পাইন]
[একটি ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা লোককে টানতে টানতে চারজন অভিনেতা প্রবেশ করে]

১ম : মেরে ফ্যালো, এক্ষুণি মেরে ফ্যালো শয়তানটাকে— (ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়)

২য় : রক্তচোষার দল এরা— কত লোকের সর্বনাশ করেছে—

লোকটি : (প্রচণ্ড ভয়ে) দোহাই তোমাদের, মেরো না আমায়, দয়া করো—

৩য় : (সজোরে লাথি মেরে) দয়া করবো তোদের? কক্ষণো না।

৪র্থ : আমার মাসতুতো ভাই বিকাশকে মারার সময় খেয়াল ছিল না— চাকা আবার ঘুরতে পারে? আবার আমরা ফিরে আসতে পারি?

৩য় : ভুলে যেও না কেউ— এই লোকটা এই এলাকায় অনেক হীরের টুকরো ছেলেকে খুন করেছে, ভুলে যেও না এই লম্পট বদমাইসটা চাকরির লোভ দেখিয়ে অনেক অসহায় মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে—

১ম : এক্ষুণি খতম করো একে। এই নরপিশাচটার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত হচ্ছে!

লোকটি : আমায় ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না, যত টাকা চাও, সব দেবো—

৪র্থ : এতবড় স্পর্দ্ধা! শালা আমাদের টাকা দিয়ে কিনতে এসেছে!

২য় : তোর কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী দিয়েছিস কোনো দিন? তারা না খেতে পেয়ে বস্তির শ্বাসরুদ্ধ আবহাওয়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে, তবু কোনোদিন তোর আকাশছোঁয়া মুনাফা থেকে বাড়তি দুটো পয়সা দিসনি তাদের।

লোকটি : এবার থেকে সব ওয়ার্কারের পয়সা বাড়িয়ে দেবো! মাইরি বলছি—

৪র্থ ঃ এ যে দেখি ভূতের মুখে রামনাম! মরার ভয়ে এ শালা এখন সবকিছুতেই রাজি হবে। আর ছাড়া পেলেই ভুলে যাবে।

২য় ঃ দেরি কোরো না! শেষ করো শয়তানটাকে। মারো, কুকুরের মতন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারো শালাকে। তবে মনের জ্বালা মিটবে!

১ম ঃ এতদিন ওরা আমাদের বুকের ওপর ব'সে রক্ত চুষেছে, আজ তার প্রতিশোধ নাও! রক্তাক্ত, নির্মম প্রতিশোধ!

৩য় ঃ বদলা নেবার দিন এসেছে আজ! চোখের বদলে চোখ, খুনের বদলে খুন।

৪র্থ ঃ শ্রেণীশত্রুর রক্তে রাঙিয়ে নাও শ্রেণীযুদ্ধের হাতিয়ার!

লোকটি ঃ বাঁচাও— দয়া করো— মেরো না—

সকলে ঃ আগুন! বদলা! আগুন! খতম—

(সবাই মারবার ভঙ্গিমায় স্থির। হঠাৎ একজন ফ্রিজ ভেঙে গান ধরে)

গান

মানুষ মারা পাপ নিশ্চয়ই, সাপ মারাও কি তাই?
মানুষবেশী সাপেদের কি বাঁচিয়ে রাখবে ভাই?
মানুষ বলতে বোঝায় নাকো শ্রেণীর উর্দ্ধে কিছু।
মানুষ মানেই শ্রেণীর মানুষ, উঁচু কিংবা নিচু!
হয়-সে গরিব মেহনতী, নয়-সে শোষক হবেই।
মাঝখানেতে কেউ থাকে না, শ্রেণীর চিহ্ন রবেই।
তাই মানুষ খুন হ'লে দেখতে হবে কোন্ শ্রেণীর সে লোক!
যদি সে গরিব মেহনতী হয়, বন্ধু আমার করতে পারো শোক!
সেই শোকের জ্বালায় বুকের আগুন জ্বালিয়ে নিও ভাই!
খেটে খাওয়া প্রতিটি মানুষের খুনের বদলা চাই!
যদি প্রতিশোধের খড়্গাঘাতে প্রাণ হারায় শোষক,
তখনও কি তুমি তার জন্যে করতে বসবে শোক?
না-কি শোষকশ্রেণীর রক্তে করবে তোমার মুক্তিস্নান?
শোষিত মানুষ তৈরি আজকে, শোষকেরা সাবধান!

[ছুটে ৫ম অভিনেতা ঢোকে]

৫ম ঃ থামো! মেরো না! ছেড়ে দাও! দয়া করো!

২য় ঃ কে? দয়া দেখাতে এসেছে কে?

৪র্থ ঃ আপনি এখানে কেন মেসোমশাই? চ'লে যান।

১ম ঃ লোকটা কে? চেনো না-কি?

৪র্থ ঃ বিকাশের বাবা। আমার মেসোমশাই।

৩য় : বিকাশদা? মানে যাকে এই শয়তানটা খুন করেছিল?

৫ম : তোমরা শেষপর্যন্ত মানুষ খুন করতে চলেছো? এতদূর অধঃপতন!

৪র্থ : আপনি কি জানেন মেসোমশাই— এই লোকটাই আপনার ছেলেকে খুন করেছিল?

৫ম : সব জানি। তবু বলছি— একে মেরো না। ছেড়ে দাও।

৪র্থ : মেসোমশাই— আপনার কি বিকাশের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখখানা একবারও মনে পড়ে না?

৫ম : চুপ করো! দোহাই তোমাদের। ওসব কথা তুলো না। আমি ভুলতে চাই।

৩য় : ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায়? কেন কমরেড বিকাশ খুন হয়েছিলেন, তা জানেন? তার একটাই কারণ— শহীদ বিকাশ ঐ শয়তানটার কারখানায় জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন গ'ড়ে তুলেছিলেন—

৫ম : জানি, জানি, তার জন্যে আমার বুকভরা গর্ব। সে এই দেশের দরিদ্র মেহনতী মানুষকে ভালোবেসে আত্মোৎসর্গ করেছে। তার রক্তাক্ত শরীরের প্রত্যেকটা ছুরির দাগ আমার বুকে আঁকা থাকবে।

১ম : তা-ই যদি হয়— তবে কেন এই খুনী বদমাইশটাকে করুণা করছেন?

৫ম : করুণা নয়! এটা মনুষ্যত্ব! নরহত্যা মহাপাপ! তোমরা করলেও তা পাপই থাকে।

২য় : এটা নরহত্যা নয়, ও মানুষ নয়, ও একটা জানোয়ার।

৩য় : একটা হিংস্র পশুকে হত্যা করলে পাপ হয় না, হয় পুণ্য।

৫ম : তবু মানুষ ক্ষমা করে। জঘণ্য অপরাধীকেও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেয়। আমি বলছি— একে যদি তোমরা ক্ষমা করো, তবে আমার মরা ছেলের কোনো অসম্মান হবে না, বরং তার আত্মা শান্তি পাবে।

৪র্থ : মেসোমশাই, মিথ্যে আবেগের জোয়ারে গা ভাসাবেন না। যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, অলীক ভাবালুতার চশমা চোখ থেকে খুলে ফেলুন। জেনে রাখবেন, আজ যদি একে ছেড়ে দিই, তাহলে আরও হাজারজনের সর্বনাশ হবে, আরও কত শত জোয়ান ছেলের খুন ঝরবে।

লোকটি ঃ (হঠাৎ) —না মাইরি, আর কোনোদিন ওসব কাজ করবো না। এই নাক মুলছি, কান মুলছি—

৩য় ঃ (হেসে) ব্যাটা ভীতুর ডিম। মরার ভয়ে এখন নাকে খত্ দিতেও রাজি, কিন্তু ছাড়া পেলেই তো আবার নিজের মূর্তি ধরবে।

লোকটি ঃ না, কক্ষণো না, পায়ে পড়ি তোমাদের, বিশ্বাস করো— আর করবো না—

৫ম ঃ কেন একে অবিশ্বাস করছো? ও যখন নিজে মুখে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—

১ম ঃ কেউটে সাপ যদি বলে— আমি আর ছোবল মারবো না, আমি এবার ফোঁটা-তিলক কেটে বোষ্টুম সেজে বৃন্দাবনে গিয়ে মালা জপ করবো, তখন তার কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে কি জামাই-আদরে কোলে তুলে নেবো, না লাঠির ঘায়ে তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো? কোন্‌টা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

২য় ঃ এত দেরি করার কী প্রয়োজন? মারো, মেরে ফ্যালো শয়তানটাকে— (সবাই অস্ত্র তোলে)

৫ম ঃ তোমাদের কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই? তোমাদের কি দয়ামায়াও নেই?

১ম ঃ হৃদয়? আমাদের আবার হৃদয় কী? আমরা যে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত্, আমরা যে ঢিলের বদলে পাটকেল, এতদিন যে অত্যাচার চালিয়েছে ঐ শয়তান— আমরা যে তারই প্রতিফল; আমরাই তো মূর্তিমান প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা—আমাদের কি দয়ামায়া থাকতে পারে?

৩য় ঃ শুধু যে আপনারই ছেলে মরেছে তা তো নয়, আমার নিজের ভাই বিল্টুকেও এই শয়তানেরা খুন করিয়েছে পুলিশকে টাকা খাইয়ে। কারণ, বিল্টু এই সমাজব্যবস্থাটাকে বদলে দিতে চেয়েছিল—

১ম ঃ আমি নিজে সাত-সাতটা বছর ছিলাম জেলের ভেতরে, তিন-তিনবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি— শুধু এর জন্যে, এই শয়তানটাই মিথ্যে কেসে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল—

২য় ঃ এদেরই চক্রান্তে আমাকে এতকাল ঘরবাড়ি ছেড়ে ভিনদেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল— অনাহারে আমার মা মারা গিয়েছেন, তবু আমি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসতে পারিনি—

৪র্থ ঃ আর এই জানোয়ারটা আমাদের খুন ক'রে, জেলে পাঠিয়ে, পাড়া ছাড়া ক'রে মনের সুখে বীভৎস অত্যাচার চালিয়ে গেছে, কত মায়ের কোল শূন্য করেছে, কত বোনের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে চিরতরে—

৫ম ঃ তবু বলছি— এতটা নিষ্ঠুর হোয়ো না।

১ম ঃ নিষ্ঠুরতা কোথায় দেখলেন? এর নাম ন্যায়বিচার। বুঝতে পারছেন না কথাটা? আসুন তাহলে একটা গল্প বলা যাক; ঠিক গল্প নয় অবশ্য, ইতিহাস— ইতিহাসের গল্প, মিথ্যে নয়— সত্যি।

৫ম ঃ তোমরা কি পাগল হ'লে? এমন একটা ভয়ঙ্কর সময়ে, যখন একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষের জীবন সরু সুতোয় ঝুলছে— তখন কি গান-গল্পের সময়? ইতিহাসের কচ্‌কচি এখন কার ভালো লাগবে?

২য় ঃ এটাও যে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত! তাই এখনই তো একবার পেছন ফিরে ফেলে আসা অতীতটাকে এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার, জেনে নেওয়া দরকার— আমাদের এই প্রতিহিংসা— প্রতিশোধের উদগ্র বাসনা— নতুন কিছু উপদ্রব, না-কি যুগের পর যুগ ধ'রে যখনই অত্যাচারিত মানুষ, নির্যাতীত মানুষ অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে— তখনই তাদের বুকে এমনই রক্তাক্ত প্রতিহিংসা জন্ম নিয়েছিল— যা কি-না হৃদয়ের জলাভূমি থেকে উপড়ে ফেলেছিল দয়া মায়া করুণার বিষাক্ত আগাছা—

৪র্থ ঃ আসুন শুরু করা যাক। মনে করুন— আঠারোশো বত্রিশ সাল—

১ম ঃ চব্বিশ পরগণার বারাসতে—

৩য় ঃ আগুন জ্ব'লে উঠলো একদিন—

২য় ঃ ইতিহাস যার নাম দিয়েছে—

সবাই ঃ (তীব্র স্বরে) ওয়াহাবী বিদ্রোহ!

[যে কেউ গান ধরে]

গান

শত শহীদের আত্মদানে এদেশের মাটি লাল—
হাজার বীরের রক্তে রাঙা এদেশের সকাল॥
তাই আজ ক্রান্তিকালে এসো মোরা স্মরণ করি—

মুক্তিপথের দিশারীদের নতুন সাজে বরণ করি॥
ভুলে যেও না এই দেশেই বুক কেঁপেছিল একদিন অত্যাচারীর।
লক্ষ চাষির বুকের আগুনে লেখা একটি সে নাম তিতুমীর॥
তিতুর আহ্বানে নতুন দিনের গানে এদেশ সেদিন উথালপাতাল।
হাজার চাষির রক্তস্রোতে বাঁশের কেল্লা হলো লাল॥
তাই আজ ক্রান্তিকালে....

[লোকটি বাদে অন্য অভিনেতারা গান চলার সময় সামান্য বেশ পরিবর্তন ক'রে নেয়]

১ম গ্রামবাসী : তুমি অনেক পাল্টে গেছো গো মোড়ল—

৩য় গ্রামবাসী : বলো, বলো, হজ করতে গিয়ে কেমন হালচাল দেখলে দুনিয়ার— খুলে বলো দেখি—[তিতু-বেশী ৫ম কথা বলে]

তিতু : বলবো, সব বলবো আমি। সেই জন্যেই তো এই জমায়েতে সবাইকে ডেকেছি আমি—

৪র্থ : আমাকে চিনতে পারো মোড়ল?

তিতু : কে? বংশী? বংশী না তুই? পুবকূলের বংশী? (জড়িয়ে ধরে) ইস! খুব রোগা হয়ে গেছিস রে বংশী, একেবারে চেনাই যায় না!

৪র্থ : খেতে না পেলে সবার চেহারাই শুকিয়ে যায় মোড়ল।

তিতু : বংশী রে! হজ সেরে যে তিতু গাঁয়ে ফিরে এলো, সে তোদের চেনা তিতু মিঞা নয়। এ তিতু অন্য তিতু! সব আজ বলবো তোদের। কিন্তু এই নতুন তিতুর জন্ম দিয়েছে কে জানিস? তুই নিজে।

৪র্থ : কী বলছো মোড়ল? তুমি কি পাগল হ'লে?

তিতু : হজ সেরে ফেরার পথে আমি শুধু তোর কথাই ভাবছিলাম রে বংশী! তুই আমার আঁধারঘরে প্রথম আলো জ্বেলে দিয়েছিস!

৪র্থ : কী যা-তা বলছো! আমি আবার তোমাকে কবে—

তিতু : মনে নেই তোর? হজ করতে যাবার ক'দিন আগে তোকে এই গ্রামের লোকেরা চোর ব'লে হাতেনাতে ধরেছিল; আমি যখন খেপে গিয়ে তোকে বেদম মার দিতে গিয়েছিলাম, তখন তুই কেঁদে উঠে বললি—

৪র্থ : (হাত জোড় ক'রে কেঁদে ওঠে) মেরো না মোড়ল, মেরো না। আমি কি আগে কোনোদিন চোর ছিলাম? বুকে হাত দিয়ে বলো তো সবাই— আমার সাত গুষ্টিতে কেউ কোনোদিন চুরি করতে গিয়েছিল?

তিতু : তবে কেন তুই আজ চুরি করতে গিয়েছিলিস?

৪র্থ : খিদের জ্বালায় মোড়ল, খিদের জ্বালায়। চুরি ছাড়া উপায় আছে কিছু? পেটের খিদে যে বুকটাকে ফাটিয়ে পরাণটারে বের ক'রে দিতে চায়।

তিতু : বংশী!

বংশী : তুমি যার লেঠেল ছিলে একদিন, সেই শয়তান জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মিথ্যে খত্ দেখিয়ে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছে আমায়। আদালতের হুকুমে সবকিছু কোরক ক'রে নিয়েছে। ঘরে একটা কোদালও নাই যে, জনমজুর হয়ে মাটি কেটে দিন গুজরান করি। চুরি কি এমনি এমনি করি মোড়ল, বাধ্য হয়ে করি—

তিতু : তুই জানিস না— চুরি করা আল্লার হুকুমতে মস্ত বড় পাপ, গুনাহ্। চুরি করলে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে—

বংশী : জাহান্নামের আগুন? সে কি পেটের আগুনের চেয়েও কষ্ট দেয়? চুরি কি শুধু আমরাই করি? জমিদার আমার বসতভিটে চুরি করেনি? কোম্পানির সাহেবরা গাঁ-ঘরের বৌ-ঝিদের ইজ্জত চুরি করে না? চুরির দায়ে তুমি আমায় মারতে এসেছো মোড়ল, কিন্তু কই— আমার থেকেও অনেক বড় চোর ঐ জমিদার আর তাদের সাহেববাবাদের তো তুমি শাস্তি দিতে পারো না?

তিতু : (এগিয়ে আসে) সেইদিন, হ্যাঁ সেইদিন, আমার মনটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। তোকে মারতে আর হাত উঠলো না আমার। তারপর থেকে কত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি, শুধু তোর কথাগুলো ভেবেছি। আমিও তো চাষির ঘরের ছেলে, জমিদার-মহাজনের জুলুম আমিও তো জীবনভর দেখেছি— ইংরাজ বানিয়ার অত্যাচার তো আমিও সহ্য করেছি—

২য় : ইংরাজের কয়েদ খানায় তোমাকেও তো আটক করেছিল তিতু মিঞা।

তিতু : হ্যাঁ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়! আমি ছিলাম জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের ভাড়াটে লেঠেল। দুই জমিদারে দাঙ্গা হলো, আর সেই দোষে আমি গেলাম ফাটকের ভেতর! অথচ দাঙ্গা বাঁধালো যে, সেই কৃষ্ণদেবের টিকিটিও ছুঁতে পারলো না কেউ! সেদিনই আমার চোখ খুলেছে। আমি বুঝেছি— এই জমিদার-মহাজন আর ঐ ইংরাজ বানিয়ারাই আসল দুশমন, গরিবের দুশমন, চাষির দুশমন—

৪র্থ : ঠিক বলেছো মোড়ল, ঠিক বলেছো—

তিতু : তাই আজ সারা দেশের সমস্ত গরিব মানুষের কাছে আমি ডাক পাঠাই— বদলা, বদলা নিতে হবে, এতদিন যত অত্যাচার করেছে ফিরিঙ্গি বদমাস আর তার পা-চাটা দালাল ঐ জমিদার-মহাজনেরা, আজ এসেছে তার নির্মম প্রতিশোধ নেবার দিন! আরবদেশে আবদুল ওয়াহাব এক নতুন আন্দোলন গ'ড়ে তুলেছেন— ওয়াহাবী আন্দোলন। আবদুল ওয়াহাব বলেছেন— কায়েমী স্বার্থবাজ শয়তানেরা আজ ইসলামকে অপবিত্র করেছে। ঐ বদমাইসদের চক্রান্তে ইসলাম হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার-মহাজন-সুদখোরের ধর্ম। এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদও মক্কায় গেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সৈয়দ সাহেব বলেছেন— হিন্দুস্থান হলো দার-উল হার। শত্রু কবলিত দেশ। ইংরাজ বানিয়ারা আজ আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। তাই আমাদের আজাদীর লড়াই শুরু করতে হবে, মেরে তাড়াতে হবে বিদেশী কোম্পানির ফৌজকে, নীলকর সাহেবদের, আর তাদের পা-চাটা গোলাম ঐ জমিদার-মহাজনদের—

সবাই : তিতুমীর! তিতুমীর গরিবের নেতা! তিতুমীর আল্লার নোকর! তিতুমীর জিন্দাবাদ!

তিতু : শোনো ভায়েরা আমার, হাতিয়ার তুলে ধরো আকাশে, আজ থেকে একজন দুশমনও আমাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, জমিদার-মহাজনের পিঠের চামড়ায় আমাদের জুতো তৈরি হবে।

সবাই : খতম! বদলা! বদলা! খতম!

[লোকটি ছাড়া সবাই বজ্রমুঠি তুলে স্থির, একজন গান ধরে]

গান

রক্ত নেবার রক্ত দেবার দিন যে এলো।
প'ড়ে প'ড়ে মার খাবার দিন ফুরালো॥
ঘরের কোণে বোকার মতো থাকবি কে আর?
চোখ মেলে দ্যাখ্ মরা গাঙে এসেছে জোয়ার॥
আর নয় মোহনিদ্রা, জেগে ওঠো গরিব ভাই।
অত্যাচারী ঐ হত্যাকারীর রক্তে হাত ভেজাতে চাই॥

[ফ্রিজ ভেঙে যায়]

১ম : এইভাবেই শুরু হয় বারাসতের কৃষক বিদ্রোহ, বুর্জোয়া

ঐতিহাসিকেরা যার নাম রেখেছে ওয়াহাবী বিদ্রোহ।

২য় ঃ যে বিদ্রোহের অধিনায়ক তিতুমীর আমাদের হৃদয়ে দেশ প্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আজ প্রেরণা সঞ্চার ক'রে থাকেন—

৩য় ঃ হয়তো তিতুমীরের স্বপ্ন সেদিন সফল হয়নি—

৪র্থ ঃ হয়তো সেদিন বাঁশের কেল্লা করেছিল মাথা নত—

৫ম ঃ কিন্তু তবু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাননি তিতুমীর, গণমুক্তি-সংগ্রামের রক্তপতাকায় আজ তাঁর নাম লেখা আছে আগুনের অক্ষরে—

১ম ঃ বারাসতের বিদ্রোহী কৃষক যেদিন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল—

২য় ঃ সেদিন কিন্তু তারা কোনো দয়ামায়া করুণার বিপজ্জনক চতুর ফাঁদে পা দিয়ে শোষকের হাত-শক্ত করেনি—

৩য় ঃ বরং প্রতিশোধের উন্মত্ত বাসনায় খ্যাপা ঝড়ের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অত্যাচারী জমিদার-মহাজনের ওপর—

৪র্থ ঃ কেননা তারা জেনেছিল— অত্যাচারী শোষকদের চিরতরে নির্মূল না করলে—

সবাই ঃ জনতার মুক্তি কখনোই আসতে পারে না।

[নাটক আবার আগের ঘটনায় ফিরে যায়]

৪র্থ ঃ (৫ম কে) তা-হলেই দেখুন— শুধু আজ নয়. ইতিহাসের প্রতিটি সন্ধিক্ষণেই নির্যাতিত জনতা নির্মম ক্রোধে আর শ্রেণীঘৃণায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অত্যাচারী নিপীড়কদের ওপর, সেদিন তারা কোনো দয়ামায়া দেখায়নি, আজ আমরাও দেখাবো না।

৫ম ঃ তবু আমি বলবো— হিংসা কিন্তু প্রতিহিংসাকেই ডেকে আনে।

২য় ঃ হিংসার আশ্রয় আগে কারা নিয়েছে? আমরা, না ওরা? আপনার ছেলে বিকাশকে কারা খুন করেছে? আমরা না ওরা?

৩য় ঃ ওরা আমাদের খুন করলে সেটা হয় ন্যায়? আর আমরা পাল্টা মারলেই দোষ?

১ম ঃ জোতদার যখন কৃষকের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসল কেড়ে নিয়ে গোটা পরিবারটাকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তখন সে খুনী হয় না?

৪র্থ ঃ মালিক যখন ছাঁটাই শ্রমিককে আত্মহত্যার কানাগলিতে ঢুকিয়ে দেয়, কই, তখন তো কেউ মালিককে বলে না খুনী— হত্যাকারী! এদেশের কোনো আদালতে শ্রমিক-হত্যার অভিযোগে তার তো বিচার হয় না!

৩য় ঃ আর আমরা ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই সেটা হয় অন্যায়?

৫ম ঃ আমার বয়েস হয়েছে— তোমাদের অনেক কথাই আমি বুঝি না, যেমন বুঝতাম না আমার ছেলের কথাও। যদি তোমাদের কথা ঠিকও হয়, তবু আমি চোখের সামনে নরহত্যা হ'তে দেবো না।

২য় ঃ কী করবেন? বাধা দেবেন? আমাদের ক্রোধ আর ঘৃণার সামনে আপনি খড়কুটোর মতো উড়ে যাবেন।

১ম ঃ কী যা-তা বলছিস! উনি কমরেড বিকাশের বাবা! উনি ভুল করতে পারেন, তবু আমরা কখনোই ওঁকে অসম্মান করবো না।

৫ম ঃ তা-ই যদি হয়, তবে অন্তত আমার মুখ চেয়ে একে ছেড়ে দাও। ভুল মানুষমাত্রেই করে। ও যখন নিজের ভুল স্বীকার করেছে— তখন ওকে ক্ষমা করবে না কেন?

৩য় ঃ এটা সৎ স্বীকারোক্তি নয়। এখন ও প্যাঁচে পড়েছে, তাই এসব বলছে—

লোকটি ঃ না, মাইরি না, মা কালীর দিব্যি, বাবা তারকনাথের দিব্যি, আর কখনও হারামের লাইনের পা দেবো না।

১ম ঃ চোপ্ শয়তান! তোকে আমরা চিনি না?

লোকটি ঃ মাইরি বলছি, আর করবো না। একবারটি বিশ্বাস করো, তোমাদের পায়ে পড়ি।

৫ম ঃ তোমরা এত নিচে নেমে গেছো— মৃত্যুভয়ে অস্থির একটা মানুষের অসহায় আর্তনাদেও তোমরা বিচলিত হও না?

৪র্থ ঃ মেসোমশাই, জলে পড়া কুকুরকে পিটিয়ে মারাই নিয়ম। না হ'লে তাকে যদি দয়া ক'রে একবার ডাঙায় উঠতে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু আপনিই মরবেন। সমস্ত উপকার ভুলে গিয়ে সে তখন দাঁত খিঁচিয়ে আপনাকেই কামড়াতে আসবে। এটাই ওদের স্বভাব।

১ম ঃ যেমন ঘটেছিল আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালে।

২য় ঃ বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ থেকে ছোটোনাগপুর আর সাঁওতাল পরগণায়—

৩য় ঃ যেদিন সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বাঁধভাঙা বন্যার মতো উত্তাল—

৪র্থ ঃ হাজারে হাজারে ছুটে এসেছিল তারা, শোষণের শৃঙ্খল

ভাঙতে— সাঁওতাল জনগণের দুই মহান বীর সন্তান সিধো ও কানুর অধিনায়কত্বে—

সবাই ঃ সেদিনের সেই বিক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির ক্রুদ্ধ অগ্ন্যুৎপাতের রক্তিম আভায় আলোকিত এক ঝড়ের রাতে—

[চারজন অভিনেতা গান ধরে এবং রুদ্ররসের ভয়ঙ্কর উদ্দাম নাচ নাচতে থাকে। বাকি দু'জন অন্যদিকে স'রে দাঁড়ায়]

গান

কানু রে সিধো রে
দিকুগুলায় কাঁড় মেরে
জঙ্গলেতে বাজিয়ে দে রে মাদল!
সেই মাদলেরই সুরেতে
যারা ছিল দূরেতে
তারা এসে ভরবে মোদের দল।

ভীম ঃ সিধো-কানু খপর পাঠাইছেক। হুল— হুলের ডাক দিছে বটে। হুই শালগাছের ডাল পাঠাইছেক! ইবার বল্ তুরা— কী করবি? মাথা লিচু করো্যে দিকুগুলার পাও চাটবি, লা হাতিয়ার উঠাবি?

বাকি তিনজন ঃ বল্ মাঝি, তু বল্ না কেনে— আমাদের কী করাটা উচিত হবেক? বল্ তু—

ভীম ঃ জঙ্গল কেট্যে মোরা চাষ করলম, বসত বানালম, সবই মোরা করলম— তেবু উই মহাজন-দিকুগুলান মোদের বাপ-পিতামোর মাথায় হাত বুলায়ে সব জমিন দখল করল, ভিটামাটি গরু ভঁইস— সব, আর আমরা মহাজনের নোকর বনলম, মোদের জমিনে মোরা চাষ করলম, আর ফসল উঠল মহাজনের ঘরে— মোরা ভুখা মরলম তো মহাজনের জরুর গায়ে রূপার গহনা উঠল, মোদের ঘরের জুয়ান কুড়িগুলার ইজ্জত লিয়্যা দিকুগুলান খেলা করল, লুটে লিয়া গেল— বল্ তুরা, এমন জুলুম আর সইব কেনে?

বাকিরা ঃ লা মাঝি, আর লয়। কেনে সইব, কেনে মার খাব?

ভীম ঃ সিধো-কানু ডাক দিছেক, যত জমিদার-মহাজন আছেক, সবগুলারে কাঁড় মের‍্যে সাফ করতে হবেক— বল্ তুরা, মহাজনের গুলাম হবি, না হুল করবি?

বাকিরা ঃ হুল করব, হুল করব, হুল!

ভীম ঃ তেবে তৈয়ার হ! হাতিয়ার উঠাকে বল্ তুরা— মোরা আর গুলাম লয়, মোরা আজাদ হলম!

সবাই ঃ (বজ্রমুষ্ঠি ওপরে তুলে) আজাদ হলম।

১ম সাথী ঃ ইবার? তেবে ইবার কী হবে মাঝি?

ভীম ঃ সব ফসল মোদের হল, সব জমিন মোদের হল, তামাম জঙ্গল। সব।

২য় সাথী ঃ উরা যদি হাঙ্গামা বাঁধায়?

ভীম ঃ মোরাও পাল্টা মারব বটে। হাঁসুয়ার এক কোপে গলাডা নামায়ে দিব বটে, হাঁ।

৩য় সাথী ঃ যদি কোম্পানির ফৌজ আস্যে?

ভীম ঃ তেবে আর তাদিগের ফিরো যেতে হবেক লাই।

সবাই ঃ হাঁ। কথাটা ঠিক বুলছো বটে মাঝি। হাঁ, তেবে হাতিয়ার উঠাও। হুল! হাতিয়ার বন্ধ্ লড়াই! হা আ আ আ!

[চিৎকার করতে করতে ওরা অন্যদিকে চ'লে যায়। বাকি দু'জন এগিয়ে আসে]

সীতানাথ ঃ (উইংসের দিকে তাকিয়ে) আহা হা! ছুঁড়ির কী গতর! চান ক'রে এলোচুলে কোমর দুলিয়ে ছুঁড়ি চলেছে দ্যাখো; উহুহু ভাবলেই জ্বালা ধ'রে যায় শরীরে, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে— আ-হা-হা সাঁওতাল ছুঁড়ির দুল্‌কি চালে কী সুন্দর চলন, নেশা ধ'রে যায় দেখলে—

গোবর্ধন ঃ এই যে— বলি ও সীতেবাবু— বলি খবরটা শুনেছেন!

সীতানাথ ঃ শুনছি! —আহা, ছুঁড়ি যাচ্ছে দ্যাখো, কেমন নেচে নেচে হেলেদুলে আহা, ওকে আমি খাবো, ওকে আমি চাই—

গোবর্ধন ঃ বলি ও সীতেবাবু! এদিকে যে আগুন লেগে গেছে!

সীতানাথ ঃ লাগুক আগুন! এদিকে আমি যে মদন-আগুনে পুড়ছি বাবা! আহা এমন হৃষ্টপুষ্ট মা ভগবতীর মতো চেহারা সাঁওতালদের মধ্যে বহুদিন দেখিনি। কার ঘরের মাগ খোঁজ নিতে হচ্ছে। —ভীম মাঝির নয় তো?

গোবর্ধন ঃ বলি কথাটা কানে তুলছেন? দুনিয়া যে রসাতলে গেল—

সীতানাথ ঃ যেখানে খুশি যাক! —ছুঁড়িটা না গেলেই হলো।

গোবর্ধন ঃ ধম্মকম্ম বলতে আর কিছু রইলো না দেখছি। পায়ের তলার জুতো সেও মাথায় চড়তে চায়।

সীতানাথ ঃ চড়ুক গে যাক। —কেন ফ্যাচফ্যাচ করছেন পণ্ডিতমশাই? দেখছেন আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। —আহা-হা. দেখলেই বুকটা জ্ব'লে যায়, উহুহু—

গোবর্ধন ঃ সাঁওতাল মাগীর চান করা দেখার সুযোগ পরে অনেক পাবেন সীতেবাবু— এবার একটু কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন—

সীতানাথ ঃ বলছি না ব্যস্ত আছি! টাকাপয়সার দরকার থাকলে পরে আসবেন।

গোবর্ধন ঃ টাকাপয়সা চাইতে আসিনি। শুনুন! এদিকে ভয়ানক কাণ্ড—

সীতানাথ ঃ এই যা! চ'লে গেল! এই— আপনার জন্যেই পুরোটা দেখা হলো না। কী পেয়েছেন আপনি? নিশ্চিন্তে একটু ফুর্তি করতেও দেবেন না?

গোবর্ধন ঃ নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই সীতেবাবু। এদিকে যে গণেশ ওল্টাবার জোগাড়। সাঁওতাল-হাঙ্গামা এদিকেও শুরু হবে মনে হচ্ছে।

সীতানাথ ঃ (বিস্ময়ে) তার মানে? কী বলতে চান?

গোবর্ধন ঃ সিধো-কানু না-কি এখানকার সাঁওতালদেরও হাত করেছে। ভীম মাঝি বোধহয় ওদের পাণ্ডা।

সীতানাথ ঃ কী? এতবড় আস্পর্ধা! লেঠেলদের একবার খবর পাঠান তো পণ্ডিতমশাই। পুরো সাঁওতাল-বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিন। শালারা জানে না— আমার নাম রায় বাহাদুর সীতানাথ চক্কোত্তি—

গোবর্ধন ঃ কেন বোকামী করছেন সীতেবাবু? আগুনে ঘি ঢালছেন কেন? আপনি জানেন না, শালারা এবার তলে তলে অনেক দূর এগিয়েছে— অস্ত্রশস্ত্রও জোগাড় করেছে অঢেল। হুল মানে বোঝেন? বিদ্রোহ! সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পানির ফৌজ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো গণ্ডগোল বাঁধলে গোরাসৈন্যদের কোনো সাহায্যই মিলবে না। আপনার লাঠিয়ালরা ভীম মাঝিদের কাছে শ্রেফ নস্যি! আমাদের ঝাড়েবংশে নির্মূল করতে ওদের বেশি সময় লাগবে না।

সীতানাথ ঃ তাহলে? উপায়টা কী?

গোবর্ধন ঃ হুঁ হুঁ বাবা! আমার নাম গোবর্ধন ভট্‌চাজ। এমন মতলব ফেঁদেছি যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। হে হে হে—

সীতানাথ ঃ বলুন, বলুন পণ্ডিতমশাই! কী আপনার মতলব?

[কথা বলতে বলতে ওরা দু'জন পেছনে চ'লে যায়। ভীম মাঝিরা এগিয়ে আসে]

১ম ঃ আর দেরি লয় গো মাঝি। হুলটো শুরু হোক বটে!

২য় ঃ বদলা লিবো গো মাঝি! মোর সুন্দরীরে লুট্যে লিয়্যা গেছে ঐ সীতেনাথ। আর কুনো খোঁজ মিলে নাই উয়ার। মাথার মধ্যি আগুন জ্বলি যায় বটে! কাঁড় মেরো সীতানাথের প্যাট ফাঁসায়ে দিব— হাঁ।

৩য় ঃ কিন্তুক সীতানাথের লেঠেল আছে, কুম্পানির ফৌজ আছে, উদির সাথে মোরা পারব কেনে?

১ম ঃ ই কথাটো বলিস কেনে? মরদ না তু? ডর লাগে কেনে?

২য় ঃ দেরি করিস কেনে মাঝি? চল্— হুল করি চল্—

ভীম ঃ হঁ! আজই শুরু হবেক! অমাবস্যার রাত, নিঝুম আঁধার। চল্ তেবে!

[সবাই মুখে আ আ আ শব্দ ক'রে রণহুঙ্কার দিয়ে ছুটে যায়। সীতানাথ ও গোবর্ধনকে ঘিরে ধরে]

সীতানাথ ঃ এ কী! এ কী কাণ্ড! কী করছিস মাঝি? মারবি না-কি?

গোবর্ধন ঃ তুই কি পাগল হলি মাঝি? আমরা ব্রাহ্মণ! আমাদের মারলে তোদের যে ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে বাপ, চোদ্দোপুরুষ নরকে যাবে—

ভীম ঃ ইসব মিছা কথা! মোরা আর ভুলব না ইসব কথায়।

২য় ঃ মার্ না কেনে? মোর সুন্দরীরে লুট্যেছিল হুই সীতেনাথ—আজ তুরে খুন কর্যে ফেলামু— (মারতে যায়, ভীম আটকায়)

সীতানাথ ঃ ইস! শালার ইয়ে দ্যাখো না! খুন করবে? শালা মগের মূলুক পেয়েছো?

গোবর্ধন ঃ আঃ, আজেবাজে কথা ব'লে বিপদ বাড়াবেন না সীতেবাবু। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

সীতানাথ ঃ কোম্পানির রাজত্বে ব'সে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে শুয়োরের বাচ্চারা!

ভীম ঃ ই বাবু— গাল দিবি না। গলা নামায়ে দিব— তুর।

গোবর্ধন ঃ চুপ করুন না সীতেবাবু! যা বলার আমি বলছি। —শোন্ বাছারা, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে শোন্ সব। কথায় কথায় গোলমাল করিস কেন? আপসে সব মিটমাট করলে হয় না?

ভীম ঃ উ সব বড় বড় কথা ছেড়ে দে। আসল কথাটো বল্—

গোবর্ধন ঃ এই যে তোরা সব জমি দখল করেছিস— এটা কি ভালো হয়েছে?

ভীম ঃ ই জমিন মোদের। মোদের জমি মোরা দখল নিইচি। তাতে তুদের কী?

গোবর্ধন ঃ বেশ করেছিস বাবা, ভালো করেছিস। তাহলে আমাদের মারতে এসেছিস কেন?

ভীম ঃ তুদের বাঁচায়ে রাখলে মোরা মরব।

২য় ঃ হুঁ! হুঁ! মার্ মাঝি! মেরে দে!

সীতানাথ ঃ কত বড় আস্পর্ধা শালার, আমাকে মারবে?

গোবর্ধন ঃ আঃ আবার কথা বলে! শোন্ বাবারা, মিছিমিছি আমাদের মারতে যাবি কেন? আমরা তোদের সবকিছু এমনিতেই দিয়ে দেবো, তবে আর কেন আমাদের মেরে ব্রহ্মহত্যার দায়ে পড়বি বল্!

ভীম ও অন্যেরা ঃ ইসব কী বলছিস তুরা? সব দিয়ে দিবি?

গোবর্ধন ঃ হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ! শুধু আমাদের প্রাণে মারিস না। —যান সীতেবাবু আপনি কাছারিবাড়ি থেকে দলিলগুলো নিয়ে আসুন, সবকিছু সইসাবুদ ক'রে চিরদিনের মতো দানছত্তর ক'রে যেতে হবে কি-না! হাঃ হাঃ। যান, চ'লে যান!

সীতানাথ ঃ ঠিক আছে। আমি যাবো আর আসবো, হাঃ হাঃ—[চ'লে যায়]

ভীম ঃ উ যদি ফিরো না আসে?

গোবর্ধন ঃ আমি জামিন রইলাম বাবা। আমায় মারবি।

২য় ঃ ইটা ঠিক করলি না মাঝি! উয়ারে যেতে দিলি কেনে?

১ম ঃ উরা যেখুন সব দিয়ে দিবে, তেখুন আর হাঙ্গামা করবো কেন?

গোবর্ধন ঃ শাস্তরে কী বলেছে জানিস? তোরা শুদ্দুররা হলি সমাজের পা। পা কি কখনও মাথায় চড়তে পারে? বল্ তোরা! হাঃ হাঃ—

ভীম ঃ তুই হাসিস কেনে? তুর ভাবগতিক মোর ভালো ঠেকছেক লাই।

২য় ঃ হুঁ! হুঁ! ঠিক বুলেছিস মাঝি! উয়ার কুনো মতলব আছে বটে!

ভীম ঃ তেবে আর দেরি লয়! হাতিয়ার উঠা! বেইমানটারে খতম কর্!

গোবর্ধন ঃ সে কী তোরা আমায় মারবি না-কি? সীতেবাবু, ও সীতেবাবু—

সীতানাথ ঃ [ফিরে আসে] —আর কোনো ভয় নেই পণ্ডিতমশাই। কোম্পানির ফৌজ এসে পড়েছে— দেখি কোন্ শালা আমাদের গায়ে হাত দেয়!

ভীম ঃ কোম্পানির ফৌজ! ঠকিয়েছিস! তুরা মোদের ঠকিয়েছিস বেইমান!

গোবর্ধন ঃ ছোটোলোক, চামার, সখ কত বড়— হুল করবে, গরিবের রাজত্ব বানাবে?

ভীম : আমরা তুদের বিশ্বাস করলম, আর তুরা বেইমানি করলি!

২য় : ভুল করলি মাঝি, ভুল! ইয়ারা কেউটা সাপের দল, ইয়াদের বাঁচায়ে রাখতে লাই।

সীতানাথ : এই শুয়োরের বাচ্চারা— যার যা অস্ত্র আছে, সব জমা দে। আমি খবর পাঠিয়েছি— কোম্পানির ফৌজ এখনই এসে পড়বে। কোনো চালাকি করতে গেলেই মরবি। ওরা তোদের গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবে, হাঃ হাঃ—

ভীম : বেইমান! তুদের মতো ভদ্দরলোকেরা সব বেইমান। তুরা কোম্পানির গোলাম, তুরা তুদের মাকে বেচ্যে দিয়েছিস।

গোবর্ধন : বেশ করেছি। এই দেশটাকে আমরা সাহেবদের হাতে তুলে দেবো তবু তোদের মতো ছোটলোকদের প্রভুত্ব সইবো না। হাঃ হাঃ—

ভীম : মরতে হয়, তুদের লিয়্যা মরব! হাতিয়ার উঠাও। খতম!

অন্যেরা : (আক্রমণের ভঙ্গিতে) বদলা! [সবাই স্থির। ক্ষণপরে একে একে ফ্রিজ ভেঙে সবাই বেরিয়ে আসে, ও কথা বলে]

১ম : যদিও শেষমুহূর্তে ভীম মাঝির দল নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল, শেষপর্যন্ত বেইমানদের রক্তে রাঙিয়ে নিয়েছিল হাত—

২য় : তবু কিন্তু ভীম মাঝিরা বাঁচেনি, তাদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল শাল মহুয়ার জঙ্গল।

৩য় : কেননা তারা সময়মতো বুঝতে পারেনি—বিশ্বাস করতে নেই কালসাপদের—

৪র্থ : বাঁচিয়ে রাখতে নেই হত্যাকারীদের।

[নাটক আবার আগের ঘটনায় ফেরে]

১ম : অতএব এই ঘৃণ্য শয়তানটার মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ধাপ্পায় ভুললে আমরা নিজেদেরই মৃত্যু ডেকে আনবো—

৫ম : হয়তো তোমাদের যুক্তিই ঠিক, তবু আমার এতদিনের সংস্কার আমি আজ ছাড়তে পারবো না। মন থেকে মেনে নিতে পারবো না।

৪র্থ : কিন্তু কেন মেসোমশাই? কেন এমন অদ্ভুত জেদ ধরছেন?

৫ম : চিরকাল জেনে এলাম— মানুষ মারা পাপ।

৩য় : সেই পাপে সবচেয়ে বেশি অপরাধী যদি কেউ হয়— তবে এই সেই লোক।

৫য় : হ'তে পারে। তবু একজন পাপ করেছে ব'লে আমিও সেই পাপ

করবো— এটা কোনো যুক্তিই নয়! একটা অন্যায় দিয়ে আরেকটা অন্যায়কে রোখা যায় না।

২য় : কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়, হত্যা ক'রেই মুছতে হয় হত্যার কালিমা।

৫ম : তবু আমি মানবো না। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি— ততক্ষণ এর গায়ে আঁচড় কাটতে দেবো না, কিছুতেই না।

১ম : তাহলে এ নাটকের আরেকটা দৃশ্য বাকি। শেষ দৃশ্য।

২য় : কমরেড বিকাশের হত্যার দৃশ্য।

৫ম : না! থামো! মনে করিয়ে দিও না— দোহাই তোমাদের!

৩য় : জরুরী অবস্থার সময় শ্রাবণের এক রাত্রিতে কারখানা থেকে ফেরার পথে—

৪র্থ : বিকাশকে কিডন্যাপ ক'রে নিয়ে এলো এই শয়তান।

৫ম : (চিৎকার) না!

[৫ম ছাড়া বাকি সবাই এই অংশে অভিনয় করবে]

লোকটি : হাঃ হাঃ—কেমন বিকাশবাবু! এখন কেমন লাগছে?

বিকাশ : কেন আমাকে গুণ্ডা দিয়ে জোর ক'রে তুলে এনেছেন মিস্টার সেন?

লোকটি : এখনও বুঝতে পারছেন না? একটু ভালোভাবে সেবাযত্ন করার জন্যে— হাঃ হাঃ—

বিকাশ : আমি আপনার ইয়ার্কির পাত্র নই। বলুন— মতলবটা কী?

লোকটি : মরতে চলেছিস বাঞ্চোত, তবু এত তেজ, আমাকে চোখ রাঙাস!

বিকাশ : ভদ্রভাবে কথা বলুন। গালাগাল দেবেন না।

লোকটি : শেষবারের মতো বলছি— ইউনিয়ন করা ছেড়ে দিন, আন্দোলন বন্ধ করুন।

বিকাশ : যদি না করি—

লোকটি : লাস ফেলে দেবো শালা।

বিকাশ : তাহলে লাসটাই ফেলে দে। লড়াই আমাদের বন্ধ হবে না।

লোকটি : যদি আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হন, বিশ হাজার টাকা এখনই দেবো।

বিকাশ : আমাকে ঘুষ দিয়ে বেইমান বানাতে এসেছিস? এই নে তার জবাব— থুঃ।

লোকটি : শালা থুতু দিয়েছে। খতম কর! চার্জ!

[অন্যেরা ছুরি চালাবার ভঙ্গি করে]

৫ম ঃ (দ্রুত লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে) আমার ছেলেকে মেরেছিস শয়তান! খুন ক'রে ফেলবো তোকে। বদলা! খতম! বদলা! (আক্রমণের ভঙ্গিতে ৫ম অভিনেতা ও লোকটি ফ্রিজ। অন্যেরা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে ব'লে চলে—)

১ম ঃ যদিও এমন আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এখনই ঘটছে না কোথাও—

২য় ঃ যদিও আজ শুধু প'ড়ে প'ড়ে অসহায় মার খাওয়া আর নিরুপায় রক্ত ঝরিয়ে যাওয়া—

৩য় ঃ চোখের জলের নদীতে যদিও আজও ভাসে শুধু স্বজনের রক্তাক্ত লাস—

৪র্থ ঃ যদিও এ নাটকে শুধু থিয়েটারী মারপ্যাঁচে ভরা মায়াময় বিপ্লব বিলাস।

সমস্বরে ঃ তবু হে দুনিয়াদার, এ নাটক সত্য হবেই একদিন, দিন তো আসবেই— অমারাত্রির পাহাড় ফাটিয়ে সূর্য উঠবেই কালের দিগন্তে, সেদিন হে হন্তারক দস্যু, তৈরি থেকো, সেদিন তোমার সঙ্গে হবে আমার চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

[নেপথ্যে গান]

হাজার ভুলের চোরাবালি পেরিয়ে
আমরা এসেছি আজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে
শেষ যুদ্ধের ময়দানে।
ক্রোধের আগুনে এই দুনিয়াটা পুড়বে
মুক্ত আকাশে রক্তনিশান উড়বে
অত্যাচারীর দল আতঙ্কে মরবে
নতুন পৃথিবী আজ আবার ভরবে
জীবনের জয় গানে।।

।। পর্দা ।।

একাঙ্ক

দুই চোরের গপ্পো

চরিত্র ঃ মকবুল, গণেশ, মাস্টার, সিপাই, জেলার, সূত্রধার

নিবেদন ঃ এই নাটকটির গল্প— শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য না-কি মৃণাল সেনকে বলেছিলেন; এবং ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিজে নাটকটি লিখে যেতে পারেননি। বামন হয়ে চাঁদ ধরার অসীম স্পর্ধায় আমি নিজেই নাটকটি লিখে ফেলি এবং 'অভিনয়' পত্রিকায় ছাপা হয়। অঞ্জন বিশ্বাসের নির্দেশনায় 'রম্বস' গোষ্ঠী নাটকটির অসাধারণ প্রযোজনা করে। এছাড়াও অন্য অনেক নাট্যসংস্থার সফল প্রযোজনার খবরও পাওয়া যায়। এদের মধ্যে শিলিগুড়ির 'স্ফুলিঙ্গ' অন্যতম।

[নাটক শুরু হবার আগে অডিটোরিয়াম অন্ধকার হবার সঙ্গেসঙ্গেই দর্শকদের পেছনদিক থেকে তারস্বরে চিল-চেঁচানী শোনা গেল— "ওরে বাবা রে, মেরে ফেললে রে, আর করবোনি, আর করবোনি. ও সিপাইজী আর মেরোনি" — অডিটোরিয়ামের আলো জ্ব'লে উঠলো। দেখা গেল দুই চোর— মকবুল ও গণেশকে রুলের বাড়ি বেধড়ক পিটতে পিটতে জেল-সিপাই শিউনারায়ণ মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে]

শিউনারায়ণ ঃ চল্ শালা, বদমাস কাঁহিকা, একদম হালুয়া টাইট কর্ দে-গা—

মকবুল ঃ সত্যি বলছি— আর করবোনি, আল্লার কসম— উরি বাবা— বড্ড লাগে—

গণেশ ঃ ছেড়ে দাও মাইরি— ছেড়ে দাও, আর করবোনি, ও সিপাইজী—

শিউনারায়ণ ঃ শালে চোট্টা— জেল্‌মে ভি চুরি কিয়া— (মারতে থাকে)

মকবুল ঃ আর করবোনি, আর করবোনি— তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—

শিউনারায়ণ ঃ চল্ শালা— হামি জেলারবাবুকে-পাশ রিপোর্ট করবে— গোড়-মে ডাণ্ডা-বেড়ি বাঁধকে ফান্‌সি সেল্‌মে ঘুষিয়ে দিবো— চল্—

গণেশ ঃ ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে— সেলে যাবো না, ও সিপাইজী ছেড়ে দাও— এই নাক মুলছি, কান মুলছি, আর করবোনি—

শিউনারায়ণ ঃ চোপ্ শালা চোট্টা— হাড্ডি ভাঙ দেগা একদম—

মকবুল ঃ লাগে— লাগে— ওরে বাবা রে— ওরে বাবা রে—

শিউনারায়ণ ঃ জেলারবাবুকে পাশ চল্‌ শালা— হামি সুপারিনটেন সাহাবকে ভি বলবে— এইসা ধোলাই দে গা তুম্‌কো—

গণেশ ঃ ওরে বাবা রে— মেরে ফেললে রে—

[ওরা মঞ্চের কাছে চ'লে আসে। বন্ধ পর্দা সরিয়ে এক যুবক সামনে এসে দাঁড়ায়]

যুবক ঃ কী ব্যাপার, কী হয়েছে, মারছো কেন?

শিউনারায়ণ ঃ (মারতে মারতে) চোপ্‌— একদম চোপ্‌—

যুবক ঃ কী হয়েছে? এই শিউনারায়ণ— [মঞ্চের পর্দা স'রে যায়]

শিউনারায়ণ ঃ আপলোক হট্‌ যাইয়ে বাবু, ইয়ে আপকা সওয়াল নেহি হ্যায়—

যুবক ঃ কী হয়েছে বলবে তো?

শিউনারায়ণ ঃ ইয়ে চোর-চোট্টাকা ঝুটঝামেলা— আপ হট্‌ যাইয়ে—

[মকবুল ও গণেশকে নিয়ে শিউনারায়ণ মঞ্চে ওঠে]

যুবক ঃ (মকবুল ও গণেশকে) এই, তোরা কী করেছিস? তোদের মারছে কেন?

মকবুল ঃ (কান্নার ভঙ্গিতে) কিছু করিনি বাবু— শুধু শুধু মারছে—

শিউনারায়ণ ঃ শালে চোট্টা— তুম কুছ নেই কিয়া? আভি তক্‌ ঝুট বাত বোল রহা? দেখ্‌ শালা— তেরি....(মকবুলকে রুল দিয়ে প্রচণ্ড পেটাতে থাকে)

মকবুল ঃ ওরে বাবা রে— ওরে বাবা রে— ও বাবু গো— মেরে ফেললে গো (যুবক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শিউনারায়ণের হাত দুটো ধ'রে)

যুবক ঃ শিউনারায়ণ— খবরদার!

শিউনারায়ণ ঃ ছোড় দিজিয়ে, ছোড় দিজিয়ে মুঝে— আজ শালেকো—

যুবক ঃ না। আমার সামনে তুমি মারতে পারবে না— কক্ষণো না!

শিউনারায়ণ ঃ আগর ফিন বোলতে কি, ইয়ে আপ্‌কা সওয়াল নেহি হ্যায় মাস্টারবাবু— আপ হট্‌ যাইয়ে—

যুবক ঃ শিউনারায়ণ— তোমরা আমাকে ভালো ক'রেই চেনো, তোমাদের জেলার আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও ভালো ক'রেই জানে আমাকে। যখন বাইরে ছিলাম তখনও পুলিশের খাতায় আমার এক নম্বরে নাম ছিল, আর ভেতরে এসেও তোমাদের ভাষায়— আমি এই জেলের সবচেয়ে খতরনাক আদমী, তিনবার জেল ভেঙে বেরিয়েছিলাম। আমি জানের পরোয়া করি না। আমাকে ঘাঁটিয়ো না শিউনারায়ণ, চ'লে যাও এখান থেকে।

(শিউনারায়ণের হাত দুটো ছেড়ে দেয়)

শিউনারায়ণ ঃ ঠিক হ্যায়, আভি হাম জেলার বাবুকো রিপোর্ট করে গা—

যুবক ঃ যাও, তোমার খুশিমতো রিপোর্ট করো গে যাও। তোমার ঐ জেলার ডেপুটি জেলার, আর সুপার— নিজেরাই দিনরাত আমার ভয়ে কাঁপছে! তুমি যাও, আর বাজে বকিয়ো না। আমি রেগে গেলে কিন্তু আস্ত রাখবো না কাউকে। চ'লে যাও।

শিউনারায়ণ ঃ ঠিক হ্যায়, দেখা যাবে। [গজগজ করতে করতে চ'লে যায়]

যুবক ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখে নিও, নিজে দেখতে না পারলে তোমার জেলারবাবুদেরও বোলো!

[মকবুল ও গণেশ এতক্ষণ হাঁ ক'রে যুবকের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এইবার ভয়ে ভয়ে যুবকের কাছে এগিয়ে আসে]

মকবুল ঃ (প্রচণ্ড বিস্ময়ে) বাবু— সিপাইজী তোমার ভয়ে পালিয়ে গেল!

যুবক ঃ তোদের তো আগে কখনও দেখিনি! নতুন এসেছিস?

গণেশ ঃ হ্যাঁ বাবু, কাল রাতে বহরমপুর জেল থেকে এখানে আমাদের চালান দিয়েছে—

মকবুল ঃ তুমিই বুঝি এই জেলের শের? তোমাকে বুঝি সবাই ডরায়? নইলে সিপাইজী তোমার এক ধমকানিতে পালালো কেন?

যুবক ঃ ওসব কথা বাদ দে!— তোদের কী কেস দিয়েছে?

গণেশ ঃ কী আর কেস দেবে বাবু— ঘটিবাটি চুরি করেছিলাম, শালা বোকামি ক'রে মালগুলো দু'দিন নিজেদের কাছেই রেখেছিলাম, পাচার করতে সময় পাইনি। ব্যাস, বামাল সমেত ধরা প'ড়ে গেলাম। পরশুদিন আমাদের তিন মাসের মেয়াদ হয়ে গেছে।

যুবক ঃ ও, তোরা তাহলে কনভিক্‌টেড, আণ্ডার-ট্রায়াল নস—

গণেশ ঃ অতশত বুঝি না, ধরা প'ড়ে জেলে এসেছি, তিন মাস সাজা খাটবো, তারপর শালা আবার বাইরে বেরিয়ে পুরোনো লাইনে ফিরে যাবো— এই নিয়ে আমার তিনবার হলো, ও বেটা অবশ্য আমার থেকেও এলেম্‌দার, সবসুদ্ধ সাতবার শ্বশুরবাড়িতে এসেছে—

মকবুল ঃ কিন্তু তুমি বাবু এখানে এসেছো কেন? দেখে তো মনে হয়— ভদ্দরলোক, মনে হয়— নেকাপড়াও শিখেছো— তা তুমি শ্বশুরবাড়ি এলে কেন? কী করেছিলে? তোমার কী কেস?

যুবক ঃ আমার কেস? আমার কেস— তিনশো দুই। তিনশো দুই বুঝিস?

মকবুল ঃ তিনশো দুই? তিনশো দুই বুঝবো না? সাতবার জেলে ঢুকেছি! তার মানে তুমি....

যুবক ঃ (হেসে)— খুন করেছিলাম। একটা নয়— তিনটে। আমার লাইফার সাজা হয়ে গেছে— যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

গণেশ ঃ পায়ের ধুলো দাও গুরু, পায়ের ধুলো দাও। তুমি শালা মার্ডার ক'রে জেলে এসেছো! তাও আবার একটা নয়, তিন-তিনটে! ঐজন্যেই সবাই তোমাকে এত খাতির করে! হাঁ ক'রে কী দেখছিস মকবুল, ওস্তাদের পায়ের ধুলো নে, এমন সুযোগ জীবনে আর পাবিনে! আমরা তো শালা দুই ছিঁচকে চোর, লোকের বাড়ির ঘটিবাটি চুরি ক'রে বেড়াই, কোনো শালা আমাদের ইজ্জত দেয় না, সবাই শালা ঘেন্না করে। এখন যদি কপালে থাকে তো গুরুর কাছ থেকে দু'একটা প্যাঁচ-পয়জার শিখে নেবো, তাহলে আর পায় কে, এসব ছুটকো কাজ ছেড়ে দিয়ে বড় বড় দাঁও মারবো, আমরাও শালা হীরো ব'নে যাবো— হাঃ হাঃ—

মকবুল ঃ তুমি নিজে হাতে তিন-তিনটে মার্ডার করেছো? কিন্তু তোমায় দেখে তো বাবু তেমন মনে হয় না—

গণেশ ঃ আরে বাবা— এসব কি আর ওপর থেকে বোঝা যায়, এসব হলো গিয়ে ভেতরের জিনিস। এই দ্যাখ্ না কেন— তোর চেহারাখানা দেখলেই মনে হবে, তুই যেন একটা বিরাট মস্তান, যেন বিনু মিত্তির কি শ্যাম চ্যাটার্জির চেলা, আসলে তো তুই তা নস, তুই শালা ফালতু মুরগিচোর—

মকবুল ঃ ও! শালা, আমি মুরগি চুরি করি, আর তুমি শালা ওয়াগান ভাঙো— তাই না? আমি যদি মুরগিচোর হই, তো তুই শালা ছিঁচ্কে পকেটমার—

গনেশ ঃ কী? আমি ছিঁচ্কে পকেটমার? মারবো শালা এক ঝাপ্পড়—

মকবুল ঃ কী আমার গায়ে হাত দিবি? আয় দেখি তোর কত তাগদ? লাথি মেরে মুখখানা ভেঙে দেবো— (মারামারি প্রায় শুরু)

গণেশ ঃ লাথি মারবি? দ্যাখ্ শালা তবে—

যুবক ঃ কী হচ্ছে কী? নিজেদের মধ্যে কাজিয়া থামা! বেশি চেঁচামেচি করলে সেপাইরা ছুটে এসে তোদের দুটোকেই বেধড়ক পিটবে! একবার তোদের বাঁচিয়েছি, আর পারবো না—

গণেশ ঃ দ্যাখো না গুরু, ঐ মকবুল হারামীটা আমাকে ছিঁচ্কে পকেটমার বলছে—

মকবুল ঃ আর তুই আমাকে আগে মুরগিচোর বলিসনি?

যুবক ঃ হয়েছে, হয়েছে। এখন চল্ দেখি, ও হ্যাঁ, তোদের কত নম্বর ওয়ার্ডে দিয়েছে?

গণেশ ঃ জানি না বাবু, কাল তো সবে এলাম। রাত্তিরে ঐ টিনের চালওলা বড় ঘরটায় রেখেছিল—

যুবক ঃ ওটা তো ইউ.টি.-দের জন্যে, তোদের কনভিক্‌শন হয়ে গেছে। তোদের ওখানে রাখবে না। আচ্ছা চল্‌— দেখি তোদেরকে আমাদের ওয়ার্ডে রাখা যায় কি-না, আমাদের তো দু'জন ক'রে ফালতু দেবার কথা। আগের দু'জন খালাস পেয়ে গেছে। এখনও নতুন কেউ আসেনি। দেখি জেলারকে ব'লে— তোদের পাঠায় কি-না—

গণেশ ঃ গুরু, আমাদের তুমি নিজের কাছে রাখছো? মার দিয়া কেল্লা! আর কী চাই! এবার শালা তোমার কাছে আমরা ট্রেনিং নেবো— কী ক'রে লাস গিরাতে হয়— সব শিখে নেবো—

মকবুল ঃ তুমি বাবু সত্যিই মার্ডার করেছো?

গণেশ ঃ কেন রে— তুই কি শালা গুরুর কথা বিশ্বাস করছিস না?

মকবুল ঃ না, না, তা নয়— মানে আমি জানতে চাইছিলাম— খুনটা কী ক'রে হলো? একসঙ্গে তিনজনকে মেরেছো?

যুবক ঃ ডাকাতির সময় মেরেছি। একেক বারে একেক জায়গায় ডাকাতি করতে গেছি, আর একেক জনের গলা নামিয়ে দিয়েছি!

গণেশ ঃ ডাকাতি! গুরু, তুমি ডাকাতিও জানো? দ্যাখ্‌ মকবুল, দ্যাখ্‌— কার পাল্লায় পড়েছি দ্যাখ্‌, এতদিনে ভগবান শালা মুখ তুলে চেয়েছে। ছিঁচ্‌কে চোরের বদনাম আর থাকবে না! এবার শালা গুরুর কৃপায় আমরাও ত'রে যাবো। আমরাও শালা বড় বড় কাজে হাত দেবো—

যুবক ঃ তোদের ঐ শিউনারায়ণ সেপাই পেটাচ্ছিল কেন? কী করেছিলিস— তা তো বললি না?

মকবুল ঃ কিছু করিনি বাবু। রাত্তিরে এই জেলে ঢুকেছি ব'লে আমাদের খাওয়া জোটেনি। সারা রাত খিদের জ্বালায় ছটফট করেছি বাবু। সকালবেলা তাই হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম ব'লে ঐ শালা সিপাই মিছিমিছি পেটালো।

গণেশ ঃ চোপ্‌ শালা, গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলছিস কেন? তোর মুখে কুষ্ঠ হবে। না গুরু, সত্যিসত্যিই আমরা চুরি করেছি। কী করবো বলো? সারারাত শালা না খাওয়া, আর সকাল হ'তেই নাস্তা করতে দিলো— এইটুকু শালা ছোলা আর ভেলি গুড়— তাও ছোলার আদ্ধেকই পোকায় খাওয়া। এতে কি আর পেট ভরে? জেলে এসেছি ব'লে কি আমরা মানুষ নই, জানোয়ার? কী

করবো— খিদের জ্বালায় গেলাম শালা রান্নাঘরে— দু'-একটা রুটি হাতসাফাই করতে না করতেই শালা ধরা প'ড়ে গেলাম।

যুবক : ঠিক আছে চল্, জেলারকে ব'লে তোদেরকে আমাদের সঙ্গেই থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি, আর কিছু না হোক পেট ভরা খাওয়াটা পাবি—

গণেশ : আরেকবার পায়ের ধুলো দাও গুরু! আঃ, আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছি! সত্যি গুরু, তোমার জবাব নাই, তোমার মতো দয়াধম্ম আমরা কোথাও দেখিনি!

যুবক : এর নাম তো মকবুল। তোর নাম কী?

গণেশ : আমার নাম গণেশ। তুমি আমাকে গণশা ব'লেই ডেকো গুরু। তুমি আমাদের সর্দার। আমরা তোমার দুই সাগরেদ।

মকবুল : আর— তোমাকে কী ব'লে ডাকবো বাবু?

যুবক : এখানে সবাই আমাকে মাস্টারবাবু ব'লে ডাকে। তোরাও তা-ই বলিস—[তিনজনের প্রস্থান। জোকারবেশী সূত্রধার ঢোকে]

সূত্রধার : দুই ছিঁচ্‌কে চোরের নাটক দেখুন।

বাবুরা সব, ছিঁচ্‌কে চোরের নাটক॥
চুরি ক'রে ধরা প'ড়ে ওরা যে
ভাই খাটতে এসেছে ফাটক॥
চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ো ধরা।
ধরা পড়লেই তোমার হাতে উঠবে রে হাত কড়া॥
এই দুনিয়ায় ছিঁচ্‌কে চোরেরাই ধরা পড়ে, জেল খাটে।
কিন্তু বড়দরের ওস্তাদেরা বুক ফুলিয়ে পথ হাঁটে॥
যারা চাষির জমি চুরি ক'রে হাজার হাজার টাকা জমায়।
তারাই বনে গ্রামের মাথা, মন্ত্রী— এমেলে তারাই বানায়॥
শ্রমিকের মজুরী চুরি ক'রে যারা হয়েছে পুঁজিপতি।
তারাই হলো সর্বেসর্বা— আমাদের দুর্গতি॥
বড়জাতের চোর-জোচ্চোর হয় যে দেশের নেতা।
জেলে কিন্তু যায় না তারা— মুখে বড় বড় কথা।
কিন্তু যারা পেটের দায়ে ঘটিবাটি চুরি করে খালি।
মার খেতে খেতে জেলে ঢোকে, খায় যে গালাগালি॥
আমাদের দুই ছিঁচ্‌কে চোরেরও নসীবে ঘটেছে তাই।
বামাল সমেত ধরা প'ড়ে শ্বশুরবাড়িতে যায় জামাই॥
কিন্তু জেলে এসেই তাদের জীবনে ঘটলো যে ভাই অঘটন।
আশ্চর্য এক গুরুর দেখা পেয়ে গেল ভক্তগণ॥

তাই গুরুর সঙ্গে চেলারা ভাই ওঠে বসে সবসময়।
আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে তাদের দুনিয়া পাল্টে যায়॥

[সূত্রধারের প্রস্থান। অন্যদিক থেকে মাস্টারবাবু, গণেশ, ও মকবুল ঢোকে]

গণেশ ঃ বলো গুরু, কালকে যে ডাকাতির গল্পটা বলছিলে সেটা আজকে শেষ করো—

মাস্টারবাবু ঃ তারপর তো আমরা প্রায় শ'পাঁচেক লোক— বেশির ভাগই গাঁয়ের গরিব চাষি, মহাজন সনাতন পালের বাড়ি ঘিরে ফেললুম।

মকবুল ঃ পাঁচশো লোক! তোমাদের ডাকাত দলে এত লোক আছে মাস্টারবাবু?

মাস্টারবাবু ঃ বলেছি না— এটা হলো নতুন জাতের ডাকাতি। এই ধরনের ডাকাতি দু'দশ জন মিলে করা যায় না। যত বেশি লোককে দলে টানতে পারবি, ততই ডাকাতিটা জমবে। ঐজন্যেই— যত গাঁয়ের গরিব লোক আছে, আগে তাদের আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে, দলে টানতে হবে— তবেই ডাকাতি করা যাবে।

মকবুল ঃ বাব্বা! পাঁচশো লোককে দলে টেনেছিলে!

মাস্টারবাবু ঃ ওটাও খুব একটা বেশি নয়, আরও— আরও লোক চাই।

মকবুল ঃ বলো কী গো মাস্টারবাবু? এমন কথা তো আগে কোনোদিন শুনিনি!

গণেশ ঃ তুই থাম্ তো, খালি কথার পিঠে কথা! বলো গুরু সেদিন কী হলো?

মাস্টারবাবু ঃ আমরা তো সনাতন পালের বাড়ি ঘিরে ফেললুম, তারপর ওর সিন্দুক ভেঙে যত টাকাপয়সা, সোনার গয়না, দলিল-দস্তাবেজ— সব বের ক'রে নিলুম। সনাতন পাল আস্তো শকুন! কত লোকের যে ও সর্বনাশ করেছে, মিথ্যে দেনার দায়ে কত জনের যে জমিজায়গা কেড়ে নিয়েছে, কত মা-বোনের ইজ্জত নিয়েছে তার ঠিক নেই। গাঁয়ের চাষিদের ওপর কত অত্যাচারই না করেছে— ভয়ে কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারতো না। যে ওর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে তাকেই সনাতন পাল গলা কেটে খালের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে— এত বড় বদমাইস— থানা-পুলিশ পর্যন্ত ওর হাতে-জজ-ম্যাজিস্ট্রেট সব ওর ট্যাকে গোঁজা— এত দাপট ছিল তার—

মকবুল ঃ ঠিক বলছো মাস্টারবাবু— একেবারে বর্ণে বর্ণে মিলে যাচ্ছে। আমাদের গাঁয়ের জোতদার বিষ্টু ঘোষ— সে শালাও ঠিক

এইরকম। একটা রক্তচোষা জোঁক। ঐ বিষ্টু ঘোষ শালাই তো আমার জমিজায়গা সব কেড়ে নিয়ে আমাকে পথের ভিখিরি বানিয়েছিল! পেটের জ্বালায় তখন আমি কোনো রাস্তা খুঁজে না পেয়ে এই চুরিচামারির লাইনে চ'লে এলুম। আমি কি আর জন্ম থেকেই চোর ছিলুম? আমি তো ছিলুম গাঁয়ের চাষি। ঐ বিষ্টু ঘোষ শালাই তো আমাকে চোর বানালো। তোমার ঐ সনাতন পালের কথা শুনে আমার বিষ্টু ঘোষের বজ্জাতির কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে!

মাস্টারবাবু ঃ মনে পড়বেই, কেননা এই সনাতন পাল আর তোদের ঐ বিষ্টু ঘোষ— সবশালা এক গোয়ালের গরু, সব-ক'টাই হাড়বজ্জাত!

মকবুল ঃ হক্ কথা বলেছো মাস্টারবাবু। ঐ হারামজাদা বিষ্টু ঘোষের জন্যেই আমার কোলের ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে। ওর মুখে দুটো খাবার জোগাতে গিয়েই আমি চুরি করা শুরু করি। কিন্তু প্রথমবারেই ধরা প'ড়ে জেলে ঢুকে গেলাম। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি— আমার বাচ্চাটা ম'রে গেছে, বিবিটা কোথায় পালিয়ে গেছে— আমার সুখের সংসার যেন গোরস্তান! সব ঐ শয়তান বিষ্টু ঘোষের জন্যে।

গণেশ ঃ তোমার ঐ প্যানপ্যানানি থামাও তো বাপু। গল্পটাই শুনতে দিচ্ছো না! —হ্যাঁ গুরু, তারপর কী হলো? সনাতন পালের সিন্দুক ভেঙে সব টাকাকড়ি-গয়নাগাঁটি তুমি একাই নিয়ে নিলে?

মাস্টারবাবু ঃ (হেসে) দূর পাগল, আমি নেবো কেন? আমরা কি আর নিজেদের জন্যে ডাকাতি করি? আমরা ডাকাতি করি গরিব মানুষের জন্যে। যাদের জিনিস আমরা তাদেরই দিয়ে দিই।

গণেশ ঃ তার মানে! তুমি একটা পয়সাও নিলে না? তাহলে কারা নিলো?

মাস্টার ঃ যাদের যাদের জিনিস ঐ সনাতন পাল দেনার দায়ে নিয়ে রেখেছিল, সবকিছু তাদের ফেরত দিলাম। মিছিমিছি কোর্টকাছারী ক'রে যতজনের জমি ও শালা দখল করেছিল, তাদের সবাইকে জমিজায়গা দিয়ে দিলাম, সমস্ত বদমাইসীর দলিল-দস্তাবেজ আগুনে পুড়িয়ে দিলাম—

মকবুল ঃ বাঃ, বাঃ, চমৎকার! খুব ভালো কাজ করেছো মাস্টারবাবু, খুব ভালো। আহা— আমার গ্রামেও যদি এমন হতো গো, তাহলে আর আমাকে চোর বনতে হতো না।

গণেশ ঃ তারপর? তারপর কী হলো?

মাস্টার ঃ তারপর? তারপর ঐ সনাতন পালকে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে আনা হলো গাঁয়ের লোকেদের সামনে। সারা গ্রামের সর্বনাশ করেছে ঐ শয়তান। সমস্ত গরিব মানুষ ওর বিরুদ্ধে টগবগ ক'রে ফুটছে। গাঁয়ের মানুষ বিচার করতে বসলো সনাতন পালের। একের পর এক উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো ওর বদমায়েসীর কথা। শেষে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। আমার ওপর দায়িত্ব দিলো সবাই। আমি টাঙিটা মাথার ওপর তুলে— দিলাম সনাতনের গলায় সোজাসুজি একটা কোপ—

মকবুল ঃ বাবু-বাবু-মাস্টারবাবু— আমি তোমার দলে যাবো। তোমার মতো ডাকাত হবো, তারপর.... তারপর.... আমিও একদিন ঐ বিষ্টু ঘোষের গলায়—

মাস্টার ঃ বল্— তাহলে এইসব চুরি-ছ্যাঁচড়ামি ছেড়ে দিবি?

গণেশ ঃ সেকথা বলতে! তোমার মতো অত বড় বড় ডাকাতি করার সুযোগ যদি পাই, তবে আর কোন্ শালা ঘটিবাটি চুরি করে। আঃ একটা যদি তোমার মতো বড় দাঁও মারতে পারি, তবে দেখতে হবে না— একদিনে শালা লাল হয়ে যাবো। হাঃ হাঃ—

মাস্টার ঃ আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। চল্ এবার। খাবার সময় হয়ে গেছে।
[তিনজনের প্রস্থান। সূত্রধার ঢোকে]

সূত্রধার ঃ এমনিভাবেই গুরুর কাছে শিষ্যগণের শিক্ষা চলে।
এমনিভাবেই ওরা দু'জন জড়িয়ে পড়লো ডাকাত দলে॥
গুরু শেখায় নতুন নতুন ডাকাতি করার কৌশল।
একমনে তাই শুনে চলে নতুন চেলার দল॥
গুরুর বাক্য বেদবাক্য— ধীরে ধীরে জন্মিলো প্রত্যয়।
আরেকটি দিনের শিক্ষাদান দেখুন এবার মহাশয়॥

[সূত্রধারের প্রস্থান। শিউনারায়ণ ও মকবুল প্রবেশ করে]

শিউনারায়ণ ঃ এই— এই শালা চোট্টা— শুন্, শুন্, ইধার আও—

মকবুল ঃ দ্যাখো সিপাইজী, সবসময় আমাদের চোট্টা চোট্টা ব'লে ডাকবে না—

শিউনারায়ণ ঃ আরে শালা, তেরা তো বহুত্ রঙ হুয়া—

মকবুল ঃ কেন? জেলে এসেছি ব'লে কি আমাদের ইজ্জত নাই?

শিউচরণ ঃ তাজ্জব-কি বাত্! চোট্টা-ভি ইজ্জত-কি সওয়াল করছে! মারেগা এক ঝাপ্পড়—

মকবুল ঃ খবরদার! গায়ে হাত দেবে না—

শিউনারায়ণ ঃ আরে— শালা তো বহুত্ বড়া বড়া বাত্ বোল রাহা! এয়সা মার দেগা তুম্‌কো—

মকবুল ঃ বিনা দোষে মেরে দ্যাখো না একবার— মাস্টারবাবুকে ব'লে দেবো, তখন বুঝবে মজা!

শিউনারায়ণ ঃ মাস্টারবাবু? আচ্ছা! ওহি মাস্টারবাবু তুদের খেপাচ্ছে! ঠিক হ্যায়, হাম জেলারবাবুকো রিপোর্ট করেগা—

মকবুল ঃ যাও, যাও, যা খুশি করো গে যাও। তোমার জেলারবাবুও আমাদের মাস্টারবাবুর কিচ্ছু করতে পারবে না!

শিউনারায়ণ ঃ আরে শুন্, শুন্, ওহি মাস্টারবাবু কে আছে— তা জানিস? উ শালা বহুত্ বড়া ডাকু হ্যায়— নস্‌কাল ডাকু— সমঝা?

মকবুল ঃ জানি, সব জানি, তোমার চেয়ে ভালো জানি—

শিউনারায়ণ ঃ আরে হামরা বাত্ তো শুন্, হামি তুদের ভালাইকে লিয়ে বলছি— উস্‌কো সাথ তুরা বেশি বাত্‌চিত্ করিস না—

মকবুল ঃ কেন, করলে কী হবে?

শিউনারায়ণ ঃ আরে বাবা— তুরা চোরিউরি করিস, জেল্‌মে আসিস, আউর দো দিনকা বাদ নিকলে ভি যাস। তু কেনো ঝুটঝামেলামে ফাঁসবি? নস্‌কাল পার্টি বহুত্ খতরনাক চীজ! উসব করলে জান্‌ভি যেতে পারে। উসব খতরনাক রাস্তা ছোড় দো!

মকবুল ঃ ঐ দ্যাখো— মাস্টারবাবু—

শিউনারায়ণ ঃ হাম যাতা হ্যায়, হাম যাতা হ্যায়— [দৌড়ে চ'লে যায়]

মকবুল ঃ শালা কুত্তা! মাস্টারবাবুর নাম শুনেই ভেগেছে।

[মাস্টারবাবু ও গণেশ ঢোকে]

মাস্টার ঃ বুঝলি মকবুল, বাইরে বেরিয়ে আমরা যখন আমাদের দলটাকে আবার মজবুত ক'রে গ'ড়ে তুলবো, তখন কিন্তু কারুর রেহাই নেই, যত টাকার কুমির ব'সে রয়েছে— সবার টাকার থলি ফাঁকা ক'রে দেবো। তবে হ্যাঁ— একটা কথা, আমরা কিন্তু কোনো গরিব লোকের ফুটো পয়সাও ছোঁবো না, যা নেবো— সব ঐ বড়লোকদের, ঐ বড় বড় ব্যবসায়ী আর বেনিয়াদের। —কেমন, রাজি?

গণেশ ঃ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বড়লোকদের বাড়িতেই যদি ডাকাতি করতে পারি, তবে আর কেন মিছিমিছি গরিবদের ঘটিবাটি চুরি ক'রে শুধু শুধু ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবো? মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার, তুমি শুধু গুরু— এইসব ডাকাতির কয়েকটা কায়দাকানুন বাত্‌লে দাও— ব্যাস, তাহলে আর পায় কে?

মাস্টার ঃ তার আগে একটা কথা মনে রাখিস— আমরা যে এইসব ডাকাতি করছি তা কিন্তু নিজেদের বাড়ি-গাড়ি করার জন্য নয়। আমরা যা পাবো, সব গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো।

গণেশ ঃ সে কী! আমরা কিচ্ছু পাবো না? আমরা ব'লে এত কষ্ট ক'রে জানের মায়া ছেড়ে ডাকাতি করবো— আর আমরাই বাদ?

মাস্টার ঃ না, একেবারে বাদ পড়বি কেন? অন্য সবাই যেমন ভাগ পাবে, তেমন তুইও পাবি। তাতে তুই বড়লোক না হ'তে পারিস, তোর আর কোনো অভাব থাকবে না— রাজি তো?

মকবুল ঃ রাজি মাস্টারবাবু রাজি। বড়লোক হ'তে চাই না, কিন্তু আর যেন কারুর ছেলে না খেয়ে শুকিয়ে না মরে, আর যেন কোনো চাষির জমি মহাজনের গভ্ভে না যায়— শুধু এইটুকু হ'লেই খুশি।

মাস্টার ঃ আর একটা কথা মনে রাখিস— আমরা ডাকাতি করি ব'লে আমাদের লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমরা কোনো অন্যায় করছি না। তোরা যখন লোকের ঘরে সিঁদ কাটতিস— সেটা ছিল অন্যায়, কেননা যাদের বাড়ি তোরা চুরি করতিস— তারা সবাই গরিব মানুষ, দিন আনে দিন খায়। কিন্তু এখন থেকে আমরা যাদের বাড়িতে ডাকাতি করবো, তারা সবাই বড়লোক। বড়লোকদের অত টাকা হলো কী ক'রে? —আমাদের মতো গরিবদের ঠকিয়ে। মহাজন বিষ্টু ঘোষের অত জমিজায়গা হলো কী ক'রে? —এই মকবুলদের জমি চুরি ক'রে। কলকারখানার মালিক যারা, তাদের টাকা হলো কী ক'রে —শ্রমিকদের পাওনা টাকা মেরে দিয়ে....

গণেশ ঃ ঠিক, ঠিক বলেছো গুরু। বছর পাঁচেক আগে আমিও তো এক কারখানায় কাজ করতাম, দিনরাত খাটতাম, তবু শালা হপ্তার শেষে হাতে রেশন তোলার টাকা থাকতো না। আর মালিক গাড়ি চ'ড়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো, একটা কারখানা থেকে তিনটে কারখানা করলো, তবু শালা আমাদের একটা পয়সা মজুরী বাড়াতো না। শেষকালে বাধ্য হয়ে আমরা ইস্টেরাইক করলাম। মালিক শালা দিলো কারখানা বন্ধ ক'রে। তখন আর কোথায় যাই? কোথাও কাজ নাই, সবাই বেকার। কী আর করবো গুরু— কপাল ঠুকে লাইনে নেমে পড়লাম।

মাস্টার ঃ তবেই বোঝ্— বড়লোকদের ঘরে যে টাকা রয়েছে, সে টাকা কার টাকা?

মকবুল ঃ আমার! আমাদের!

মাস্টার ঃ তবেই দ্যাখ্, আমরা যদি বড়লোকদের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাদের সব টাকা-জমিজায়গা-কলকারখানা জোর ক'রে নিয়ে নিই— তবে আমরা কার জিনিস নিলুম?

উভয়ে ঃ আমাদের, আমাদের, সব আমাদের নিজেদের জিনিস।

মাস্টার ঃ তবেই বল্— নিজেদের জিনিস নিজেরা নিলে সেটা কি কখনও চুরি হয়, সেটা কি ডাকাতি হয়?

উভয়ে ঃ না, কক্ষণো না। নিজেদের জিনিস নিজেরা নেবো। তাতে কার কী বলার থাকতে পারে?

মাস্টার ঃ তবু ওরা আমাদের বলবে ডাকাত, আমাদের বলবে চোর!

গণেশ ঃ বলতে দাও, বলতে দাও— কী আসে যায়?

মাস্টার ঃ আমরা কাদের কাদের বাড়ি ডাকাতি করবো জানিস? ঐ সনাতন পাল আর বিষ্টু ঘোষের মতো শয়তান জোতদার-মহাজনদের বাড়িতে তো বটেই, এছাড়াও শহরে যত মিল মালিক আর বড় বড় ব্যবসাদার আছে— তাদেরও আমরা ছেড়ে দেবো না। তবে পুরো দল নিয়ে ডাকাতি করবো— পঁচাত্তরটা চোরের বাড়িতে!

মকবুল ঃ পঁচাত্তরটা চোর?

মাস্টার ঃ হ্যাঁ, পঁচাত্তরটা চোর। আমাদের দেশের গরিব মানুষদের সব টাকাপয়সা ঐ পঁচাত্তরটা চোর চুরি ক'রে নিয়েছে।

গণেশ ঃ কই গুরু, এসব কথা তো আগে শুনিনি! কে তারা?

মাস্টার ঃ তাদের একজনের নাম টাটা, আরেকজনের নাম বিড়লা, আরেকজনের নাম গোয়েঙ্কা, আরেকজনের নাম ডালমিয়া—

মকবুল ঃ এরা সব চোর?

মাস্টার ঃ চোর নয়? লোকে শুধু তোদের চোর ব'লে চেনে, কিন্তু এই টাটা-বিড়লার মতো চোর এই ভূ-ভারতে আর নেই। আমাদের এইসব চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে হবে— বুঝলি!

গণেশ ঃ কী জানি, কী যে সব বলছো গুরু— মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে—

মাস্টার ঃ এরা হলো দেশের চোর, এছাড়াও আছে বিদেশের চোর, সাহেব চোর!

মকবুল ঃ সাহেব চোর কী বলছো বাবু! সাহেবরাও চোর হয়?

মাস্টার ঃ নিশ্চয়ই, ওরাই তো নাটের গুরু, সে হিসেবে এই টাটা বিড়লা আর সনাতন পাল বিষ্টু ঘোষরা হলো তোদের মতো নেহাতই ছিঁচ্‌কে চোর। তবে এসব কথা এখনই তোদের মাথায় ঢুকবে

না। আরও পরে বুঝবি।

গণেশ ঃ যতই তোমার কথা শুনছি গুরু, ততই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে ডাকাতিটা— আগে যতটা ভাবতাম সোজা, ততটা দেখছি নয়! এতগুলো লোকের বাড়িতে আমরা ডাকাতি করবো গুরু? ঐ বিষ্টু ঘোষ টাটা-বিড়লা থেকে শুরু ক'রে ঐ সাহেব চোরদেরও বাড়িতে, আমরা তো মোটে তিনজন— কী ক'রে এতগুলো দাঁও মারবো?

মাস্টার ঃ আরে বাবা— একলাফেই তো গাছে চড়ছি না, আস্তে আস্তে করবো! এক থালা ভাত কি তুই এক গ্রাসে খেতে পারিস? আমরাও তেমনি আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে একটা একটা ক'রে ডাকাতি করবো।

মকবুল ঃ কোথায় আগে করবে?

মাস্টার ঃ আগে করবো তোর ঐ বিষ্টু ঘোষের বাড়িতে। কেমন খুশি তো?

মকবুল ঃ (আনন্দে চিৎকার ক'রে) —মাস্টারবাবু!

মাস্টার ঃ কেন বিষ্টু ঘোষের বাড়িতে আগে করবো বল্ তো? বিষ্টু ঘোষ গাঁয়ে থাকে, গ্রামে পুলিশের জোর বেশি নেই, শহরে কিন্তু পুলিশ-মিলিটারীর জোর অনেক বেশি। আমরা নতুন ডাকাতি করছি, শহরের পুলিশ-মিলিটারীর সঙ্গে এক্ষুণি পেরে উঠবো না, ঐ জন্যেই আগে গ্রামে গ্রামে ঐ বিষ্টু ঘোষদের মতো শয়তানদের বাড়িতে ডাকাতি ক'রে ক'রে আমরা হাত পাকাবো, শক্তি সঞ্চয় করবো, তারপর আমরা আসবো শহরে।

গণেশ ঃ আমরা তিনজন? শুধু তিনজনে মিলে?

মাস্টার ঃ তিনজন— কে বলেছে? আগেই তো বলেছি— যত লোককে সম্ভব, তত লোককে আগে আমাদের দলে আনতে হবে, সারা দেশ জুড়ে আগে আমাদের ডাকাত দল বানাতে হবে, তারপর ডাকাতি।

মকবুল ঃ বাবু— তুমি নস্‌কাল পার্টির লোক?

মাস্টার ঃ (সচকিত) তোকে একথা কে বললো?

মকবুল ঃ ঐ শিউনারায়ণ সিপাই। বললো তোমার সঙ্গে যেন বেশি মেলামেশা না করি। তুমি খুব খতরনাক লোক। যে-কোনো দিন তোমার জান্ যেতে পারে। তোমার সঙ্গে মিশলে আমাদেরও বিপদ হবে।

মাস্টার ঃ তার মানে ওরা আবার আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে

তলে তারই প্ল্যান করছে।

মকবুল ঃ আমি অবশ্য ঐ শালার মুখের ওপর ব'লে দিয়েছি— তোমার সঙ্গে আমরা মিশবোই। এই প্রথম আমরা একটা লোক দেখলাম— যে আমাদের চোর ব'লে ঘেন্না করে না, যে আমাদের নতুন ক'রে বাঁচার রাস্তা দেখিয়েছে—

[হঠাৎ নেপথ্যে পরপর কয়েকটি বিস্ফোরণের আওয়াজ আর প্রচণ্ড হৈ-চৈ—]

মাস্টার ঃ (চমকে) কী হলো! হঠাৎ এসব কী শুরু হলো—

গণেশ ঃ মারামারি লেগেছে মনে হচ্ছে—

মকবুল ঃ ঐ দ্যাখো মাস্টারবাবু, লাঠি হাতে সিপাইরা ছুটে আসছে—

[পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে]

গণেশ ঃ পাগলী— পাগলী বাজিয়ে দিয়েছে— নির্ঘাৎ আজ একটা কিছু হবে— বেধড়ক ধোলাই হবে— [চারিদিকে আর্তনাদ]

মাস্টার ঃ তার মানে— ওরা আর একটুও সময় দিলো না! এত তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়বে— ভাবতেই পারিনি।

মকবুল ঃ ঐ দ্যাখো মাস্টারবাবু, সিপাইগুলো ওয়ার্ডে ঢুকে তোমাদের লোকেদের ধ'রে ধ'রে মারছে— ইস! কী মারটাই মারছে গো— রক্ত, কত রক্ত—

মাস্টার ঃ তোরা স'রে যা— তোরা স'রে যা— তোরা আমার সঙ্গে থাকিস না— তোদেরও মারবে—

গণেশ ঃ গুরু, ঐ যে শিউনারায়ণ আর জেলারবাবু আমাদের দিকেই ছুটে আসছে—

মাস্টার ঃ তোরা যা, তোরা যা— আমার জন্যে তোরা মার খাসনি— স'রে দাঁড়া আমার কাছ থেকে—

[ওরা একটু স'রে দাঁড়ায়। লাঠি উঁচিয়ে শিউনারায়ণ, জেলার ও অন্য আরেক সেপাই ঢোকে]

শিউনারায়ণ ঃ দেখিয়ে হুজুর— এহি তো শালা মাস্টারবাবু—

জেলার ঃ জানি— জানি, এটিই নাটের গুরু। যত নষ্টের গোড়া। জেলে এসেও পলিটিক্স করা ছাড়েনি— চোর-ডাকাতদের পার্টি করা শেখাচ্ছে— মার্— মার্— চিরদিনের মতো ওর বিপ্লবের সখ ঘুচিয়ে দে— [ওরা তিনজনে মিলে মাস্টারকে প্রচণ্ড মার মারতে থাকে। রক্তাক্ত মাস্টার প'ড়ে যায়]

শিউনারায়ণ ঃ খতম— শালে-কো খতম কর্ দেও!

জেলার ঃ নে, টানতে টানতে নিয়ে চল্— তারপর দেখাচ্ছি মজা—

জেলে এসেও পার্টি বানানো! আস্পর্ধা! [ওরা তিনজনে রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন মাস্টারকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়]

মকবুল : [এগিয়ে আসে] —কী রে গণশা, কেমন বুঝলি!

গণেশ : হুঁ! বুঝলুম!

মকবুল : এখনও মাস্টারবাবুর ডাকাত দলে ভিড়ে যাবার ইচ্ছা আছে?

গণেশ : তোর ইচ্ছা নেই?

মকবুল : এইসব দেখে আমি শুধু একটা কথাই বুঝেছি গণশা, আমরা চাইলেই বা কী, না চাইলেই-বা কী! আমাদের আর ফেরার রাস্তা নাই।

[মকবুল ও গণেশ চ'লে যায়। সূত্রধার ঢোকে]

সূত্রধার : দেখুন বাবু দেখুন— কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।
দুই ছিঁচ্‌কে চোরের জীবন হঠাৎ ক'রে বদলে যায়॥
কে জানতো জেলে এসে এক আজব লোকের দেখা পাবে।
কে জানতো সেই লোকটা তাদের এমন পাল্টে দেবে॥
এখন তারা ব'সে ব'সে চিন্তা করে আকাশ-পাতাল।
সব চিন্তার খেই থাকে না— মাথা ঘোরে টালমাটাল।।
তবুও তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে থাকে গুরুর কথা।
গুরুর গায়ে লাঠির আঘাত, তাদের বুকে ঘনায় ব্যথা।।

[সূত্রধার চ'লে যায়। একপাশ দিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাস্টারবাবু লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢোকে, অন্য পাশ দিয়ে গণেশ ও মকবুল]

মকবুল : মাস্টারবাবু।

মাস্টার : তোরা এসেছিস? আমি জানতুম— তোরা আসবি, ঠিক আসবি।

গণেশ : ওরা আমাদের চোখে চোখে রেখেছিল গুরু, যাতে তোমার কাছে না যাই, সেজন্য কম ভয় দেখায়নি আমাদের—

মকবুল : আজকে একটু সুযোগ পেতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি বাবু।

মাস্টার : তোরা কালকে ছাড়া পাচ্ছিস— তাই না?

গণেশ : হ্যাঁ গুরু, কালকেই আমরা খালাস হচ্ছি!

মাস্টার : আর আমি এখনও কম ক'রে আরও দশ বছর জেলে কাটাবো!

মকবুল : মাস্টারবাবু—

মাস্টার : না রে না, মন খারাপ করিসনে, সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি তো সব জেনেশুনেই এ পথে নেমেছিলাম, আমি তো জানতাম— হয় জেল, নয় মৃত্যু, শুধু এই দুটো পরিণতিই

আছে আমাদের জীবনে।

গণেশ : গুরু, আমাদের আর দেখা হবে না?

মাস্টার : হবে, হবে— নিশ্চয়ই দেখা হবে। যদি প্রাণে বেঁচে এই জেল থেকে কোনোদিন বেরুতে পারি, তবে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আবার আমাদের দেখা হবে।

মকবুল : (কেঁদে ফেলে) মাস্টারবাবু—

মাস্টার : ছি ছি কাঁদছিস কেন? কাঁদছিস কেন মকবুল—

মকবুল : মাস্টারবাবু— তুমি বড় ভালো, তুমি বড় ভালো! তোমার মতো আর কেউ আমাদের কোনোদিন ভালোবাসেনি। তুমি ছাড়া আমাদের তো কেউ কখনও মানুষ ব'লেই মনে করেনি। সবাই আমাদের ঘেন্না করেছে, শুধু তুমিই আমাদের বুকে টেনে নিয়েছো—

মাস্টার : থাক্, থাক্, এসব কথা থাক্। —হ্যাঁ রে গণশা— আমাদের সেই ডাকাত দলটা আর বোধহয় বানানো হলো না, তাই না?

গণেশ : কী ক'রে হবে গুরু? তুমিই তো রইলে জেলের ভেতরে—

মাস্টার : তোরা সত্যিই আমাদের ডাকাত দলে যোগ দিতে চাস?

মকবুল : চাই, চাই, সত্যিই চাই মাস্টারবাবু।

মাস্টার : চুরিচামারি ছেড়ে দিবি?

গণেশ : নিশ্চয়ই ছাড়বো। আর ওসব লাইনে নেই গুরু।

মাস্টার : আমি তোদের এতদিন বলিনি— যে ডাকাত দলটা তোদের নিয়ে বানাবো বলেছিলাম, সেটা সত্যিসত্যিই অনেকদিন আগেই তৈরি হয়ে আছে।

গণেশ : সত্যি! সত্যি বলছো গুরু!

মাস্টার : আমাকে কখনও মিথ্যে কথা বলতে শুনেছিস? সারা দেশ জুড়ে আমাদের দলের ছেলেরা ছড়িয়ে রয়েছে। বড় রকমের একটা ডাকাতির তোড়জোড় করছে। সেজন্যে অনেক লোক দরকার, অনেক! তোরা বাইরে বেরিয়ে আমাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ কর্।

মকবুল : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই করবো বাবু— কোথায় যেতে হবে বলো!

মাস্টার : দাঁড়া দাঁড়া— তার আগে তোদের একটা জিনিস দেখাই— (জামার ভেতর থেকে একটা বই বের করে)— এই বইটায় আমাদের ডাকাত দলের সবচেয়ে বড় পাঁচজন সর্দারের ছবি দেওয়া আছে। ছবিগুলো তোদের চিনিয়ে দিই। আমাদের ডাকাত দলটা শুধু এই দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে।

যেখানেই গরিব মানুষ আছে, সেখানেই আমাদের ডাকাত দলও আছে।

মকবুল ঃ এই কিতাবটা কোত্থেকে পেলে মাস্টারবাবু?

মাস্টার ঃ চোরাপথে আমাদের ছেলেরা জেলখানায় পাঠিয়েছে। এই দ্যাখ্— প্রথম ছবিটা— দাড়িওয়ালা গোল মুখ, এই হলো আমাদের পয়লা নম্বরের সর্দার— এই লোকটাই দুনিয়ার যত গরিব লোককে বড়লোকদের বাড়িতে ডাকাতি করতে প্রথম শিখিয়েছে— এর নাম— কার্ল মার্ক্স।

মকবুল ঃ মারকোস?

মাস্টারবাবু ঃ মারকোস নয়— মার্ক্স! জার্মান সাহেব। এই দ্যাখ্— মার্ক্স সাহেবের এক নম্বর চেলা ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স— লম্বাটে দাঁড়িওয়ালা মুখ— চিনে রাখ্! মার্ক্স আর এঙ্গেল্‌স— এই দুই ডাকাতসর্দার আমাদের দলটাকে প্রথম তৈরি করে—

গণেশ ঃ মারকোস আর এন্‌জেস?

মাস্টার ঃ মারকোস নয়— মার্ক্স; আর এন্‌জেস নয়— এঙ্গেল্‌স! নাম দুটো মনে রাখ্— এই দ্যাখ্— তিন নম্বর ছবি—

মকবুল ঃ উরিস শালা— এই টেকো লোকটা কে গো! থুতনিতে দাড়ি— চোখ দুটো দ্যাখ্ গণশা— কীরকম জ্বলজ্বল করছে, তাই না? কী গাঁট্টাগোট্টা চেহারা— এমন না হ'লে সর্দার হয়!

মাস্টার ঃ এই আমাদের তিন নম্বর সর্দার— ভি. আই. লেনিন!

মকবুল ঃ এই নামটা সহজ— ল্যালিন।

মাস্টার ঃ আর এই আমাদের চার নম্বর সর্দার— স্তালিন!

গণেশ ঃ দ্যাখ্ দ্যাখ্ মকবুল— গোঁফখানা দ্যাখ্—

মকবুল ঃ আর কী লম্বা-চওড়া চেহারা দেখেছিস? হাতের কব্জিটা দ্যাখ্— ঐ হাতে কাউকে ধরলে আর রক্ষে থাকবে না। আঃ ঠিক যেন সর্দারের মতোই চেহারা। যেন ডাকাত সর্দার হয়েই জন্মেছে।

গণেশ ঃ কী যেন নামটা বললে গুরু? ইস্টালিন, তাই না?

মাস্টার ঃ ইস্টালিন নয়— স্তালিন।

মকবুল ঃ আরে! এ ছবিটা আবার কার? এ যে চীনেম্যানের মতো দেখতে গো— নাকটা খ্যাঁদা, চোখগুলো ছোটো ছোটো, এই চীনেম্যানটাও আমাদের সর্দার বুঝি?

মাস্টার ঃ হ্যাঁ, ইনি মাও সে-তুঙ। আজকের দিনে যত গরিব লোক আছে সারা পৃথিবী জুড়ে, তাদের সবার ইনি সর্দার। চীন দেশে ইনি বিরাট বিরাট ডাকাতি ক'রে সমস্ত বড়লোকদের টাকাপয়সা

কেড়ে নিয়ে গরিবদের বিলিয়ে দিয়েছেন। চীনে আজ আর কোনো বড়লোক নেই, সবাই সমান। নামটা মনে রাখবি— মাও সে-তুঙ।

মকবুল ঃ তাই না-কি? আমাদের দেশেও কি একটা মাও সে-তুঙ আসবে না? বিষ্টু ঘোষদের গলা কাটবে না?

গণেশ ঃ আসবে, আসবে, ঠিক আসবে। একদিন আমরাই মাও সে-তুঙ হবো। [নেপথ্যে কার যেন কণ্ঠস্বর— এক লম্বর সাতান্ন, জেনানা ফাটক বাইশ, তিন্ লম্বর তেত্তিরিস, জেল হাজতী একশো তেরো— ইত্যাদি]

মাস্টার ঃ ঐ দ্যাখ্— গিনতি শুরু হয়ে গেছে, তোরা শিগ্গির চ'লে যা, নয়তো এক্ষুণি পাগলী ঘণ্টি বাজিয়ে দেবে— ও হ্যাঁ— সতেরোর তিন পাঁচু স্যাকরা লেন্, ঠিকানাটা রাখ্—

মকবুল ঃ সতেরোর তিন পাঁচু স্যাকরা লেন্—

মাস্টার ঃ ওখানে আমাদের দলের একটা আখড়া আছে। তোরা ওখানে গিয়ে আমার নাম করিস। তবে চারিদিক দেখেশুনে সাবধানে যাস। দিনকাল তো ভালো নয়।

গণেশ ঃ আমরা তাহলে চলি গুরু!

মাস্টার ঃ ঠিকানা মনে আছে?

মকবুল ঃ (ধরা গলায়) সতেরোর তিন পাঁচু স্যাকরা লেন্—

মাস্টার ঃ না, না, কান্না নয়। আবার দেখা হবে, নিশ্চয়ই দেখা হবে।

মকবুল ঃ তুমি বড় ভালো, তুমি বড় ভালো—

মাস্টার ঃ বিদায় কমরেডস। জয় আমাদের হবেই।

[একদিকে মাস্টার ও অন্যদিকে ওরা দু'জনে চ'লে যায়। সূত্রধার ঢোকে]

সূত্রধার ঃ নতুন মানুষ হয়ে দু'জনে বেরোয় জেল থেকে।
তিনটে মাসে তারা যে ভাই অনেককিছুই শেখে।।
বুঝতে শেখে তারা এখন কোন্ পথে ঠিক চলতে হবে।
কোথায় গেলে স্বপ্ন তাদের আগুন হয়ে জ্বলতে রবে।।
কোথায় পাবে নতুন ক'রে জীবন গড়ার নিশানা।
কোথায় মেলে চলার পথের সঠিক কোনো ঠিকানা।।
তাই খুঁজতেই ওরা দু'জন পেরিয়ে চলে অনেক পথ।
ঘুরতে ঘুরতে কোন্ আঘাটায় পৌঁছাবে হায় জীবনরথ।।
[বগলে পুঁটলি নিয়ে মকবুল ও গণেশ ঢোকে]

মকবুল ঃ (সূত্রধারকে) বাবু— ও বাবু, সতেরোর তিন পাঁচু স্যাকরা

লেন্ কোথায় বলতে পারো?

সূত্রধার ঃ সতেরোর তিন? কেন কী দরকার তোমাদের সেখানে?

গণেশ ঃ আমরা গুরুর ডাকাতের—

মকবুল ঃ (থামিয়ে) চুপ! —বলো না বাবু, কোথায় সতেরোর তিন? সারাদিন ধ'রে আমরা খুঁজছি। কেউ ঠিকমতো বলতে পারছে না। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের শির ছিঁড়ে গেল, তবু খুঁজে পেলাম না। বলো না বাবু— কোথায় সতেরোর তিন?

গণেশ ঃ ওঃ বাবা, একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। বুকটা আমার কামারশালার হাপরের মতো উঠছে আর নামছে! আর কত দূর যেতে হবে— কে জানে—

মকবুল ঃ লোকে বললো— এটাই না-কি পাঁচু স্যাকরা লেন্। তা সতেরোর তিন যে কোথায় কেউ বলতে পারছে না। এ রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলো সব উল্টোপাল্টা। পাঁচের পরেই দেখি পঁচানব্বই! বলো না বাবু— সতেরোর তিনটা কোথায় হবে?

সূত্রধার ঃ সতেরোর তিনে তোমরা কী করতে যাবে? ওখানে তো কেউ থাকে না। ওটা তো একটা ইউনিয়নের অফিস—

গণেশ ঃ না, না, ইউনাইনে আমাদের কী দরকার? আমরা ডা—

মকবুল ঃ তুই থাম্ গোবরগণেশ! বাজে বকিস কেন? —হ্যাঁ বাবু, ঐ ইউনাইনেই যাবো— কোথায় সেটা?

সূত্রধার ঃ যেখানে তোমরা দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই।

মকবুল ঃ অ্যাঁ! কী বলছো গো!

সূত্রধার ঃ (মঞ্চের একটা উইংসের দিকে তাকিয়ে) —এই হচ্ছে অফিস ঘর। দেখছি তালাবন্ধ।

গণেশ ঃ পেয়েছি! পেয়েছি! এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছি!

মকবুল ঃ তালাবন্ধ কেন বাবু! লোকজন গেল কোথায়?

সূত্রধার ঃ কোথায় গেছে— কে জানে! আমি জানি না।

গণেশ ঃ আয় মকবুল, এখানে একটু বসি, জিরিয়ে নিই। আর দাঁড়াতে পারছি না।

মকবুল ঃ হ্যাঁ, তা-ই ভালো। একটু বসি। তালা দিয়ে গেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই কাছেপিঠেই আছে। এখনই এসে পড়বে!

[ওরা দু'জন ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে।

সূত্রধার ঃ এ তো মোটেই ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়।
উট্‌কো দু'জন মানুষ এসে খোঁজে ঘরের পরিচয়॥
পরশু রাতে পুলিশ এসে তালা মেরেছে এই ঘরে।

ঘরের মধ্যে ছিল যারা পাঠিয়েছে জেলের ভেতরে॥
রাস্তাঘাটও ছেয়ে আছে আই. বি. এবং খোঁচড়ে।
এমন সময় কারা এলো বিপজ্জনক এই ঘরে॥
এ তো মোটেই ভালো কথা নয়, ভালো কথা নয়।
যেচে এসে হাঁড়িকাঠে কোন্ পাগলে গলা দেয়॥ [প্রস্থান]

গণেশ ঃ যাক বাবা, শেষপর্যন্ত তো এসে পৌঁছেছি। আমি তো ভাবছিলুম খুঁজেই পাবো না। শেষপর্যন্ত আবার সেই পুরোনো লাইনেই ফিরে যেতে হবে—

মকবুল ঃ না, না, কক্ষণো না। যদি খোঁজ না-ও পেতাম, তবু আর ওদিকে যেতাম না। আমি বরং অপেক্ষা করতাম, আর চারদিকে পাত্তা লাগাতাম। মাস্টারবাবু তো ব'লেই দিয়েছে সারা দেশে তাদের লোক ছড়ানো। একদিন না একদিন ঠিকই খুঁজে পেতাম।

গণেশ ঃ এসে যখন পৌঁছেছি— আর এখান থেকে নড়ছি না বাবা—

মকবুল ঃ হ্যাঁ— কেউ না কেউ এসে এই ঘরের তালা তো খুলবে, কেউ না কেউ আমাদের ঠিক এই ঘরে ঢুকিয়ে নেবে— একদিন বাদেই আসুক, কী দশদিন বাদেই আসুক— কেউ না কেউ আসবেই, এক বছরই লাগুক, কী দশ বছরই লাগুক— এই ঘরের তালা তো খুলবেই— ততদিন এখানেই ব'সে থাকবো, এই ঘরের সামনে, এই রাস্তার ওপরে—

গণেশ ঃ দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরটায় একবার উঁকি মারবি?

মকবুল ঃ কেন?

গণেশ ঃ না মানে ঠিক জায়গায় এলাম কি-না বুঝতাম— ঐ লোকটা আমাদের তাপ্পি দিয়ে গেল কি-না—

মকবুল ঃ দেখতে চাস দ্যাখ্। তবে আমার মন বলছে— এতদিনে আমরা ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি।

গণেশ ঃ (উঁকি মেরে) মকবুল মকবুল, দেখবি আয়—

মকবুল ঃ কী রে কী?

গণেশ ঃ সেই চীনেম্যানের ছবি। গুরু আমাদের দেখিয়েছিল। — কী, সে-তুঙ যেন?

মকবুল ঃ মাও সে-তুঙ! —দেখি, দেখি, হ্যাঁ রে, তাই তো— তবে তো আমরা আসল জায়গাতেই এসেছি—

গণেশ ঃ দ্যাখ্ দ্যাখ্ গুরুর বইটার ছবির থেকেও কী সুন্দর লাগছে এখানে— আঃ—এমন না হ'লে সর্দার—কী চমৎকার চেহারা—

মকবুল ঃ কী লম্বা দেখেছিস, মাথাটা যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে! বুকটা

যেন লোহার মতো শক্ত, তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে—হাসি হাসি মুখে যেন মনের মধ্যে ডাক দিয়ে যাচ্ছে— আয় আয়, আর ভুল পথে ঘুরিসনে, এইবার খুঁজে নে তোর বাঁচার পথ! আমাদের কী ভাগ্য, আমাদের কী ভাগ্য রে গণশা— আমরা এমন একটা মানুষের দলে নাম লেখাতে চলেছি—

[পুলিশ অফিসার ও দুই পুলিশ ঢোকে। অভিনেতাদের সংখ্যা কম হ'লে জেলার, শিউনারায়ণদের দিয়েও এই চরিত্রগুলি করানো যাবে]

পুলিশ ১ ঃ স্যার, স্যার— এই সেই দুই মক্কেল!

পু. অফিসার ঃ সতেরোর তিনের খোঁজ করছিল শালারা— ধর্ ধর্ ব্যাটাদের— [হতভম্ব মকবুল ও গণেশকে ধ'রে পিটতে থাকে]

পু. অফিসার ঃ শালা পাক্কা নকশাল, নিয়ে চল্ থানায়, তারপর ওদের হবে—

গণেশ ঃ মকবুল, আমরা ধরা প'ড়ে গেলাম, কিছু করার আগেই ধরা প'ড়ে গেলাম— আবার জেলে ঢুকিয়ে দেবে আমাদের—

মকবুল ঃ দুঃখ করিস না গণেশ! এ বরং ভালোই হলো। জেলে তো মাস্টারবাবুরা আছে, এখনও আমরা অনেককিছুই জানি না। এইবার সব জেনে নেওয়া যাবে।

পু. অফিসার ঃ নিয়ে চল্, মারতে মারতে নিয়ে চল্—

[ওদের মারতে মারতে নিয়ে যেতে থাকে]

মকবুল ঃ (দর্শকদের) চললাম বাবুরা। দুই চোরের গপ্পো এখানেই খতম। কেননা এখন আর আমরা চোর ব'লে জেলে ঢুকছি না। এখন আমরা অন্য মানুষ। জেনে রেখো বাবুরা— এখন চললাম বটে, কিন্তু আবার একদিন বেরুবো, নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসবো— তোমাদের সামনে, তৈরি থেকো, সেদিনের জন্যে তৈরি থেকো সবাই— সেদিন সবকিছুরই হিসেবনিকেশ হবে। সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের দিনে দেখা যাবে—কে কত শক্তি ধরে। সেদিনের আর বেশি দেরি নাই। তৈরি থেকো বাবুরা সব— তৈরি থেকো!

॥ পর্দা ॥

[দুম্‌কা জেলে ১৯৭০/৭১ সালে আমার সহবন্দী কমরেড দীনদয়াল পারিয়াল ওরফে সরযূপ্রসাদ আজ কোথায় জানি না, বেঁচে আছেন কি-না তা-ও জানি না। কিন্তু এই নাটকের মাস্টারবাবুর চরিত্রচিত্রণে তাঁর প্রভাব আমার অজান্তেই পড়েছে। তাই আমি এই নাটক তাঁকেই উৎসর্গ করলাম।]

বিরতিহীন ছোটো পূর্ণাঙ্গ

ঝড় উঠুক

চরিত্র ঃ থানার অফিসার-ইন-চার্জ, এ.এস.আই., দু'জন কনস্টেবল, সুব্রত, কৌশিক, গোপাল

[অমানুষিক আর্তনাদের মধ্যে পর্দা খোলে। আবছা আঁধারে বোঝা যায়— চেয়ারে কোনো একজন ব'সে, তার পাশে দু'জন, একজনের হাতে লাল টকটকে গরম লোহার শিক]

অফিসার ঃ এখনও বল্ শালা কোথায় আছে সে?

ছেলেটি ঃ (অবরুদ্ধ যন্ত্রণায়) —জানি না! কিচ্ছু জানি না!

অফিসার ঃ কোথায় আছে? কোন্ অঞ্চলে? কাদের বাড়িতে?

ছেলেটি ঃ (উদ্ধত স্বরে) আর কতবার বলবো? বলছি তো জানি না!

অফিসার ঃ এখনও তেজ আছে দেখছি! হারাধন— শিকটা চেপে ধর্ তো! বলবি না!

[অন্ধকারে বোঝা যায় শিকটি যথাস্থানে চেপে বসে]

ছেলেটি ঃ (প্রচণ্ড চিৎকারে) —বলবো না, বলবো না তোদের।

অফিসার ঃ এখনও বলবি না! হারাধন— শিকটা গলায় ঠেকিয়ে চাপ দে। কুইক্! বল্ কোথায় সে?

ছেলেটি ঃ জানি না, কিচ্ছু জানি না, জানি না (স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়)

হারাধন ঃ স্যার—

অফিসার ঃ কী?

হারাধন ঃ মনে হচ্ছে—

অফিসার ঃ খতম হয়েছে—

হারাধন ঃ নাঃ! নিশ্বাস পড়ছে দেখছি। জ্ঞান হারিয়েছে।

অফিসার ঃ মরবে না, মরবে না, অত সহজে শালারা মরে না!

[হঠাৎ স্টেজে আলো জ্ব'লে ওঠে]

—দ্যাখো, এই এক গ্যাঁড়াকল। লোডশেডিং। কথা নেই বার্তা নেই দুম ক'রে আলো নিভে গেল। আবার জ্ব'লে উঠলো।

[এবার আলোকিত মঞ্চ— একটি থানার অফিসঘরের চেহারা নিয়েছে। মঞ্চে অফিসার-ইন-চার্জ, হারাধন নামক কনস্টেবল এবং

বিধ্বস্তদেহ রক্তাক্ত মুখ সংজ্ঞাহীন একটি কিশোরের উপস্থিতি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ]

হারাধন : আলোটা না জ্বললেই ভালো ছিল স্যার!

অফিসার : কেন?

হারাধন : কেমন কচি কচি সুন্দর মুখ!

অফিসার : এক-একটা জাত সাপের বাচ্চা!

হারাধন : মানে— আলোতে এইরকম এত রক্ত দেখলে, মানে— যন্ত্রণা দেখলে কেমন একটা কষ্ট হয়, দয়া হয়—

অফিসার : এক চড় মারবো! বলেছি না— পুলিশলাইনে ওসব দয়ামায়া চলে না। পিরিত দেখাতে হয়, ঘরে বৌয়ের কাছে গিয়ে দেখা গে যা। এক্ষুণি জল নিয়ে আয়, মুখে-চোখে ছিটিয়ে দে, জ্ঞান ফেরা। আরেকবার মেরামত ক'রে দেখি। (হারাধন জল এনে ছেলেটিকে মুখে-চোখে ছিটোতে থাকে) দয়া দেখাতে নেই বুঝলি? মেরে মেরে তক্তা বানিয়ে ছেড়েছি, শালা— তবু ছারপোকার বংশ শেষ হয় না! কয়েকশো ছেলে গুলি খেয়ে মরেছে, থানার লক-আপে ঝাড়ের চোটে ফিনিশ হয়েছে, কয়েক হাজারকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে, তবু রাত্তিরে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়! —দয়া!

হারাধন : কাল গলির মোড়ে আবার পোস্টার পড়েছে স্যার— মাও সেতুং লাল সেলাম।

অফিসার : এখানেও ব্যাটারা আবার তলে তলে জোট বাঁধছে! ঐ শালা একজনের জন্যে। কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

হারাধন : হ্যাঁ স্যার, কোনো ইনফরমেশনই ঠিক ঠিক মিলছে না।

অফিসার : দয়া দেখাবি ওদের? দয়া! শালা! চাকরি চ'লে যাবে! দেশদ্রোহী।

হারাধন : (চমকে) কে স্যার? আমি?

অফিসার : তুই হবি কেন? তুই তো আসলি দেশপ্রেমিক বাবা, নিজের হাতে চার-চারটে নকশাল মেরেছো, তোমায় তো ভারতরত্ন দেওয়া হবে।

হারাধন : অত ক'রেও প্রমোশন হলো না স্যার!

অফিসার : চুপ, চুপ! প্রমোশন চাস! আমিই ব'লে তেরোটা বছর একই পোস্টে রগড়াচ্ছি। ওসবে শুধু হয় না বাছাধন, তেল চাই— তেল। তৈলমর্দন। যাকগে ওসব কথা.... দেওয়ালেরও কান আছে। এ.এস.আই সান্যাল আবার আমাকে বাঁশ দেবার চেষ্টা করছে। ওর কানে গেলেই চিত্তির।

হারাধন : সান্যালবাবু হেভি চুকলিখোর স্যার।

অফিসার ঃ বলছি না— আস্তে! কেউ শুনতে পেলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। নামেই আমার সাবঅর্ডিনেট। কাজে আমারই মাথা কাটেন বাবু। ওর খুঁটির জোর আছে রে। ওর শালা এখন নাম করা যুবনেতা, জানিস?

হারাধন ঃ জানি স্যার। এইজন্যেই তো অত ফুটুনি!

ছেলেটি ঃ জল— একটু জল—

হারাধন ঃ জ্ঞান ফিরেছে স্যার—

ছেলেটি ঃ মা— মাগো— একটু জল মাগো—

হারাধন ঃ জল দেবো স্যার?

অফিসার ঃ দাও। এখন একটু দয়া দেখাতে পারো। তোমার তো আবার ওদের জন্যে দারুণ কষ্ট হয়। এমন মেয়েদের মতন তুলতুলে হৃদয় নিয়ে পুলিশে ঢুকলে কেন বাপ?

হারাধন ঃ চার-চারটেকে মেরেছি— তবু বলেন স্যার মেয়েদের মতো!

অফিসার ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলি। আরে বাবা আমিও তো তাই। মাল না টানলে শালা টর্চারই করতে পারি না!

হারাধন ঃ তার মানে এখনও খেয়েছেন বুঝি?

অফিসার ঃ সামান্য, সামান্য একটু। তবে এমন অনেকেই এ লাইনে আছে হে, নাম বলবো না, হাসতে হাসতে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। আসলে বড় দরের গুণ্ডা-বদমাস-খুনী না হ'লে, পুলিশলাইনে উন্নতি করা যায় না!

ছেলেটি ঃ জল— একটু জল—

অফিসার ঃ এখনও দিসনি? দে শিগগির! (হারাধন কিশোরটিকে উঠে বসিয়ে জল খাওয়াতে যায়)

ছেলেটি ঃ খাবো না। তোদের দেওয়া জল খাবো না শয়তানের দল। (থুতু দেয়)

হারাধন ঃ স্যার— থুতু দিয়েছে ছোঁড়া!

অফিসার ঃ কী! এতবড় সাহস, আস্পর্ধা! (ছুটে যায়) —দেশপ্রেমিক পুলিশের গায়ে থুতু দিলি শালা বেজন্মা চীনের দালাল! (এলোপাথারি মারে কিশোরটি নেতিয়ে পড়ে)

হারাধন ঃ এবার ছাড়ুন স্যার— ম'রে যাবে যে!

অফিসার ঃ মেরে তো ফেলাই হবে, হয় এখন, নয়তো ঘণ্টা-দুই বাদে। থানায় ঢুকে ক'জন আর জান্ নিয়ে ফিরতে পারে! যা— লক-আপে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আয়। পরে ওর 'হবে'। থুতু দেওয়া! আইন ও শৃঙ্খলার একনিষ্ঠ প্রহরীর গায়ে থুতু। [হারাধন

কিশোরটিকে হিঁচড়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়। ফোন বাজে]
—ইয়েস, ও.সি. স্পিকিং।

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ খোঁজ পেলেন?

অফিসার ঃ (সন্ত্রস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়) আজ্ঞে না স্যার! হেভি ঝাড় দেওয়া সত্ত্বেও বাঞ্চোতের মুখে রা নেই!

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ আঃ! ভদ্রভাবে কথা বলুন। এটা একটা পুলিশস্টেশন—বেশ্যাবাড়ি নয়।

অফিসার ঃ সরি স্যার, ভুল হয়ে গেছে। মানে— যত পাজি-বদমাস ক্রিমিন্যালগুলোর সঙ্গে কথা ব'লে ব'লে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, সেদিন ছেলেকেও ব'লে বসেছিলুম— শুয়োরের বাচ্চা।

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ ননসেন্স! যত বাজে কথা। শুনুন, ওর খোঁজ চাই আমাদের। এই অঞ্চলের পালের গোদাদের মধ্যে একমাত্র ও-ই বেঁচে আছে এবং জেলের বাইরে। সুতরাং বুঝতেই পারেন— আইন শৃঙ্খলার অবস্থা কত ভয়াবহ। যেখান থেকে হোক, যেমনভাবে হোক ওর প্রেজেন্ট এ্যাড্রেস খুঁজে বার করুন।

অফিসার ঃ করছি স্যার, দারুণ চেষ্টা করছি। আসলে হয়েছে কী জানেন— বাঞ্চোতগুলো এত হারামী যে— (মুখটা চেপে ধ'রে) দুঃখিত স্যার, আবার মুখ খারাপ করেছি।

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ আবার টেনেছেন?

অফিসার ঃ অ্যাঁ!

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ মদ। আবার ডিউটি আওয়ার্সে খেয়েছেন?

অফিসার ঃ (বিব্রত) হ্যাঁ-মানে-ইয়ে হলো— স্যার কি ফোনেই গন্ধ পেলেন? আপনার তো স্যার দারুণ নাক— হাঃ হাঃ—

নেপথ্য কণ্ঠ ঃ চুপ করুন— আগের কেসটা মনে আছে? থানার মধ্যে চোলাই মালের কারবার ফেঁদেছিলেন ব'লে চার মাস সাসপেণ্ড হ'তে হয়েছিল?

অফিসার ঃ মনে আছে স্যার। তবে বুঝতেই তো পারেন— কত ঝক্কি পোয়াতে হয়, তার ওপর এই উৎপাত। একটু-আধটু স্যার না টানলে নার্ভ ঠিক থাকে না— তাই—

নেপথ্য ঃ যা-ই হোক, তাড়াতাড়ি খবর বার করুন, রাখছি!

অফিসার ঃ ও হ্যাঁ, শুনুন স্যার, বলতে ভুলে গেছি। একদম মনে ছিল না— এ.এস.আই. সান্যাল একটা খবর পেয়ে একটা জায়গা রেড করতে গেছে ফোর্স নিয়ে, বলা যায় না, ওখানেও ওকে পাওয়া যেতে পারে।

নেপথ্য কণ্ঠ : পাওয়া গেলেই ভালো। কতকগুলো খুনে-ডাকাত একেবারে জ্বালিয়ে মারলে।

অফিসার : ঠিক বলেছেন স্যার। আসলে— স্যার,— রেখে দিলেন? ধুস শালা! (ফোনটা রেখে দেয়) বেশ ছিলাম ক'টা দিন। আবার আগের মতন টু পাইস হচ্ছিল, আরে শালা ঘুষের পয়সায় ভুঁড়িতে যদি চর্বিই না জমাবি তবে আর জীবনের মায়া ছেড়ে পুলিশ হলি কেন? তা নয়, আবার ঝামেলা শুরু হলো! গণ্ডগোল! ঝড়ের সংকেত! বাঞ্চোতরা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে, গতকাল পোস্টার মেরেছে, আগামীকাল মারবে—[হারাধন প্রবেশ করে]

হারাধন : আমাদের!

অফিসার : কোথায় ছিলে এতক্ষণ, শুনি? বলেছি না রাত বাড়ছে— কী বিশ্রি থমথমে রাত! সান্যালটাও শালা এইসময়েই সব ক'টাকে নিয়ে রেড করতে বেরুলো। আরও আগে যেতে কী হয়েছিল! এইসব রাতে একা একা বড় ভয় করে।

হারাধন : ভূতের ভয় স্যার? (হাসে, বিশ্রি হাসি)

অফিসার : অমন শিয়ালের মতো হাসবে না। পেটের পিলে চমকে যায়। ভূতটুত নয়, আসল কথা— ওরা— ওদের ভয়!

হারাধন : ওরা? কারা স্যার?

অফিসার : কারা? জানো না কারা? যাদের মেরেছো নিজের হাতে, তারা—

হারাধন : তারা তো ম'রে ভূত হয়ে গেছে— ভূতদের কথা বলছেন? (কুৎসিত হাসি হাসে)

অফিসার : বুঝেসুঝেও ন্যাকা সেজো না তো। এত টর্চার ক'রেও কিছু করা গেল? ঠিক শালারা আবার তৈরি হচ্ছে! ভূতের কান কাটে ওরা। কখন যে কোত্থেকে উদয় হয়ে এই থানাটানা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আবার কী ক'রে কোথায় উধাও হবে কে জানে—

হারাধন : হ্যাঁ স্যার, আমাদের এদিকটাতেও আবার গোলমাল হবে ব'লে মনে হচ্ছে— পোস্টার পড়েছে—

অফিসার : সব ঐ একটা লোকের জন্যে— শালা শয়তান পাজি!

হারাধন : মানে?

অফিসার : একাত্তর বাহাত্তরে এই এলাকার প্রায় সব-ক'টা মরলো, শুধু ঐ ছোঁড়াই হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে। ওঃ তখন যদি একবার হাতে পেতাম—

হারাধন : কার কথা বলছেন স্যার— কৌশিক! কৌশিক সেন?

অফিসার : হ্যাঁ— হ্যাঁ— ঐ কৌশিক ছাড়া আর কার কথা বলবো?

হারাধন : মাঝে শুনেছিলাম একবার অ্যারেস্ট হয়েছিল?

অফিসার : পালিয়েছে। জেল ভেঙে পালিয়েছে। এতদিন সব নানা জায়গায় ঘাপটি মেরে লুকিয়েছিল, আবার শুনোছি— এই অঞ্চলেই ঢুকেছে কৌশিক সেন। ওফ্! লাইফটা একদম হেইল্ হয়ে গেল। আবার এ পাড়ায় ঝামেলা শুরু হবে। হারাধন, ড্রয়ার থেকে বোতলটা দে।

হারাধন : এই যে বললেন খেয়েছেন? আবার খাবেন? এক্ষুণি?

অফিসার : ক'দিন থেকেই কৌশিকের কথা শুনে বুকটা ধরফড় করছে। দে, আরেকটু টেনে জমিয়ে বসি। ওঃ, রাতটাও কী গোলমেলে, শালা শেষ হ'তেই চায় না। (হারাধন বোতল এনে দেয়) — এদিকে আবার ওপর থেকে শাসিয়ে গেল, এক্ষুণি কৌশিকের খবর চাই, আমি যে কী করি? (মদ খেতে থাকে)

হারাধন : অত ভাবছেন কেন স্যার? দেখুন না— সান্যালবাবু যে ইনফরমেশনটা পেয়ে রেড করতে গেছেন, তাতেও কৌশিক ধরা পড়তে পারে।

অফিসার : তাহলে তো আরও কেলেঙ্কারীরে মাথামোটা। আমার নাকের ওপর জুতো মেরে সান্যাল যদি কৌশিককে ধ'রে ফ্যালে, তখন ও-ই নিজে ড্যাঙডেঙিয়ে প্রমোশন নিয়ে ওপরে উঠে যাবে, আমার জুটবে কচু। এমনিতেই ওর মস্ত খুঁটির জোর। (আরেক ঢোক মদ খায়)

হারাধন : সত্যি স্যার, এখনই সান্যালবাবু এমন গরম দেখান যেন স্বয়ং আই.জি. ওঁর শ্বশুর।

অফিসার : ভাগ্য! একেই বলে ভাগ্য! তাও আবার যে-সে ভাগ্য নয়, শালা-ভাগ্য। বিয়ে তো আমিও করেছিলাম কিন্তু অমন একটা যুবনেতা-শালা জুটলো কই?

হারাধন : যুবনেতা! হ্যা হ্যা! আগে তো ছিল পাড়ার একটা লোচ্চা মাস্তান, হ্যা হ্যা!

অফিসার : বলছি না এভাবে হাসবে না, কী বিদ্‌ঘুটে হাসি রে বাবা!

হারাধন : কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছিল ওই ছোঁড়া! এখন যুবনেতা!

অফিসার : চুপ, চুপ! চাকরি যাবে। এখন তো তা-ই হয়েছে রে! যত গুণ্ডা, বদমায়েশ, ওয়াগান ব্রেকার— এখন সব শালা নেতা। আগে যাদের হাতের সামনে পেলে পোঁদিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিতাম, এখন তাদেরই চেয়ার এগিয়ে দিয়ে স্যার স্যার করতে হয়! —এ কী বলছি! মাল টেনে কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছি?

সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছি। আমার যে নরকেও জায়গা হবে না!

হারাধন ঃ তবু তো স্যার ওদের দয়াতেই আবার দুটো ক'রে খেতে পারছি।

অফিসার ঃ ঠিক ঠিক। কিন্তু এত সুখ বোধহয় আর ভাগ্যে সইলো না। কৌশিক, শালা হারামী, আবার সব কেঁচিয়ে দিলো, আবার আগের মতন চলবে। থানার বাইরে বেরুনো যাবে না। ওঃ কী দিনই যে গেছে!

হারাধন ঃ ভাবছেন কেন স্যার? সান্যালবাবু নিশ্চয়ই.... (অফিসার ক্রুদ্ধ চোখে তাকাতেই) —না না, আপনিই ধরবেন স্যার, আপনি—

অফিসার ঃ আমি আর ধরেছি! পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে ঘেঁটে ঐ ছোঁড়াটার খোঁজ পেয়ে যা-ও-বা তুলে আনলাম— ভাবলাম কিছু খবর হয়তো পাওয়া যাবে, সান্যালটার ওপর কিস্তি মাত্ করা যাবে, তা নয়— শালা জাত সাপের বাচ্চা, মেরে মেরে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে দিয়েছি, তবু ব্যাটার মুখে রা নেই!

হারাধন ঃ কোত্থেকে যে এত শক্তি পায়—

অফিসার ঃ সেটা তুমি বুঝবে না, ওটা চীনা যাদু। ভাঙলেও মচকায় না। কী-সব ছেলেমেয়েই-যে গর্ভে ধরেছিল মা! (মদ খায়)

হারাধন ঃ এখনও ছেলেটার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরুনো বন্ধ হয়নি।

অফিসার ঃ বেরোক, বেরোক শালা, ভেসে যাক সব, সারা দেশ ঘেয়ো চামড়ার মতো দগদগে হয়ে যাক ওদের চোঁয়ানো রক্তে— তবে না শালা গণতন্ত্র, তবে না শালা দেশপ্রেম! (আবার মদ খায়)

হারাধন ঃ এত মদ খাচ্ছেন স্যার?

অফিসার ঃ তুই বুঝবি না। এই রাতটা যেন খ্যাপা জানোয়ারের মতো তাড়া করছে আমায়। মাল না টানলে নার্ভই পাবো না। [বাইরে জীপের আওয়াজ]

হারাধন ঃ (উঁকি মেরে দেখে) —এসে গেছে স্যার, সান্যালবাবু!

অফিসার ঃ (উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে) —ধ'রে আনছে?

হারাধন ঃ বুঝতে পারছি না। নামছে সবাই গাড়ি থেকে।

অফিসার ঃ (স্বস্তিতে) যাক পারেনি! পাখি শালা ফুরুৎ। ভাগ্যে পারেনি।

হারাধন ঃ কী একটা নামাচ্ছে স্যার!

অফিসার ঃ ধরেছে না-কি! এ-ই খেয়েছে! সান্যালেরই শিকে ছিঁড়লো!

হারাধন ঃ না, বন্দী নয়— মানে—

অফিসার : তুই যা দেখে আয়। আমি নড়তে পারছি না। (হাই তোলে)

হারাধন : যেতে আর হবে না।

[দ্রুত এ.এস.আই. সান্যাল ঢোকে, ক্ষিপ্রগতি, সমর্থদেহ আর চোখ দুটো অসম্ভব ক্লেদাক্ত]

অফিসার : (ব্যাঙ্গের সুরে) কী, ধরতে পারলেন?

সান্যাল : ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!

অফিসার : ঠিক বোঝা যাচ্ছে না মানে? এটা কীরকম উত্তর? হয় ধরেছেন, নয়তো ধরতে পারেননি। বোঝা যাচ্ছে না মানে?

সান্যাল : ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, একটু গোলমেলে।

অফিসার : গোলমেলে? এখানে আবার গোলমালটা কোথায়? ধরতে পেরেছেন কি-না বলুন না!

সান্যাল : সেইখানেই তো গণ্ডগোল বেঁধেছে।

অফিসার : আহ্। গণ্ডগোলটা কীসের? খবরটা ঠিক ছিল?

সান্যাল : ঠিকই ছিল। ঠিক সময়েই স্পটে পৌঁছে ঘিরে ফেলেছিলাম, কিন্তু—

অফিসার : কিন্তু সব পালিয়ে গেল, এই তো?

সান্যাল : ঠিক তা নয়—

অফিসার : আবার— ঠিক তা নয়! স্পষ্ট উত্তর দেবেন তো!

সান্যাল : একটা clash হয়েছে।

অফিসার : ক্ল্যা—শ্! আবার ক্ল্যাশ! শালারা কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি।

সান্যাল : ওরা প্রিপেয়ার্ড ছিল, বোমাটোমা ছুড়লো বেশ কিছুক্ষণ—

অফিসার : বোমা? আবার বোমাও বানাচ্ছে আজকাল! কী যে হবে!

হারাধন : আমাদের কারুর কিছু হয়নি তো সান্যালবাবু?

সান্যাল : না। আমরাও পাল্টা গুলি চালিয়েছি—

অফিসার : বেশ করেছেন, তারপর—

সান্যাল : তারপরে বোমা ছোড়া বন্ধ হ'লে বাড়িটায় ঢুকলাম, কিন্তু ততক্ষণে—

অফিসার : সব শালা কেটে পড়েছে— তাই না?

সান্যাল : প্রায়—

অফিসার : প্রায়! এখানেও শালা প্রায়! আপনি কি ঠিক করেছেন, কোনো কিছুরই স্পষ্ট উত্তর দেবেন না?

সান্যাল : মানে যারা পালাবার, সবাই পালিয়েছে শুধু একটা ডেড বডি পড়েছিল, তুলে এনেছি!

অফিসার ঃ ডেডবডি! ডেডবডি নিয়ে এলেন মানে? কৌশিক সেনকে ধরার চেষ্টা নেই— নিয়ে এলেন একটা ডেডবডি— কেন, এটা কি একটা লাশকাটা ঘর? এখন এই মড়া নিয়েই সারারাত শব সাধনা করুন গে যান, পুলিশের চাকরি ছেড়ে তান্ত্রিক ব'নে যান।

সান্যাল ঃ না— ব্যাপারটা হলো গিয়ে—

অফিসার ঃ মড়াটাকে এখানে আনতে গেলেন কেন? কোনো নির্জন রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে পারলেন না? এমন তো আগে কত করেছেন— ওসব থানায় আনা মানেই ঝামেলা, নানা কৈফিয়ৎ দিতে হয়— ও পাপ চুকিয়ে এলেই তো পারতেন—

সান্যাল ঃ তা পারতাম! কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই করিনি। কারণ আমার মনে হয়— এই সে-ই।

অফিসার ঃ মানে! (উঠে দাঁড়ায়, কয়েক মুহূর্ত বাক্যস্ফূর্তি হয় না) কী বলতে চান আপনি?

সান্যাল ঃ আমার সন্দেহ হয়— বডিটা কৌশিক সেনের।

হারাধন ঃ (উল্লাসে) কৌশিক সেন? ওটা কৌশিক সেনের মড়া!

অফিসার ঃ (বিমূঢ়) কী বলছেন? যাঃ! অসম্ভব!

সান্যাল ঃ অসম্ভব নয় স্যার, হ'লেও হ'তে পারে।

অফিসার ঃ আপনি তো ওকে জন্মেও দেখেননি, আপনি চিনলেন কী ক'রে?

সান্যাল ঃ আপনি দেখলেও চিনতে পারবেন না স্যার। চারটে গুলি মুখে লেগেছে, নাক-কান-চোখ বলতে কিছু নেই, মাথাটা প্রায় গুঁড়িয়ে গেছে—

অফিসার ঃ কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! অমন চেহারা দেখলে তিনদিন আর ভাত খেতে হবে না!

সান্যাল ঃ (হাসে) আপনি স্যার এখনও খুব দুর্বল আছেন—

অফিসার ঃ অর্থাৎ মানুষ আছি এখনও।

হারাধন ঃ যাক বাবা, ভাবনা চুকলো। কৌশিক সেন তাহলে শেষ হলো!

অফিসার ঃ না, না, কোথায় ভাবনা চুকলো? মানে ঐ বিকৃত— কী বলে— কদাকার মুখটিকে দেখে কী ক'রে বুঝলেন যে সে-ই কৌশিক সেন!

সান্যাল ঃ মানে সন্দেহ হচ্ছে।

অফিসার ঃ সন্দেহ? তা-ই বলুন! তা অমন সন্দেহ মনেও আনবেন না সান্যালবাবু! কৌশিক সেনেরা এত সহজে ম'রে আমাদের

নিশ্চিন্ত করবে ভেবেছেন? ওরা সে বান্দাই নয়। অর্থাৎ আমাকে ডিঙিয়ে যে ঘাসটি খেতে গিয়েছিলেন, সে গুড়ে বালি।

সান্যাল ঃ সে কী স্যার! আপনাকে ডিঙিয়ে কখন আবার—

অফিসার ঃ ওসব বুঝি, বুঝি সান্যালবাবু। আমি একটু পেটপাতলা মদন গোছের লোক ব'লে, ভাববেন না— একেবারে মাথা মোটা। বডিটা কোথায় রেখেছেন?

সান্যাল ঃ পাশের ঘরে।

হারাধন ঃ বডিটা আপনি একবার দেখবেন না-কি স্যার?

অফিসার ঃ আমি আর দেখে কী করবো! যত্তো উট্‌কো ঝামেলা (ফোন বাজে) হ্যালো, ইয়েস ও.সি. স্পিকিং— হ্যাঁ স্যার, সান্যাল ফিরেছে— ব্যাপারটা হলো— (একটু থেমে) আচ্ছা আপনি ধরুন, সান্যালকেই দিচ্ছি। (সান্যালকে) —বড়সাহেব ফোন করছেন, আপনিই ঠেলা সামলান—

[সান্যাল ফোন ধ'রে নিচু স্বরে কী সব বলতে থাকে]

হারাধন ঃ তবে আর কী করবেন স্যার?

অফিসার ঃ কী যে করবো— মাথাটাই গুলিয়ে গেছে, একটু না টানলে— (বোতল নিয়ে) ধুস্‌ শালা, ফুরিয়ে গেছে। বড়সাহেব মিছিমিছি এমন কড়কে দিলো— যেন সব দোষ আমার, যেন আমার অপদার্থতার জন্যেই কৌশিক ধরা পড়ছে না এখনও। নাঃ আর পোষায় না মাইরি! —উঃ কী বীভৎস গরম পড়েছে এই রাতে, একটুও হাওয়া নেই! যেন একটা জ্বলন্ত ফার্ণেসে ব'সে আছি!

হারাধন ঃ মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। যা ভ্যাপসা গরম!

অফিসার ঃ বাবুরা সব ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে হুকুম চালাবে, আর এই জঘণ্য রাতে গুঁতো খেয়ে মরুক এই হরিদাস পাল। চাকরিই ছেড়ে দেবো, শালা!

হারাধন ঃ অত দুশ্চিন্তা নাই-বা করলেন, দেখবেন ঠিক ধরা পড়বে।

অফিসার ঃ আর পড়েছে! আর, একটা ধরা পড়লেই-বা কী! আরও হাজারটা মাঠে নামবে, মাঝের থেকে বড়সাহেবের কড়া কড়া বাক্যিগুলো আমাকেই হজম করতে হলো।

হারাধন ঃ শুধু আপনি কেন, ঐ দেখুন সান্যালবাবুকেও নিশ্চয়ই বকাবকি করছে।

অফিসার ঃ হ্যাঁঃ! তুমিও যেমন, ওকে করবে বকাবকি! ওর যে খুঁটির জোর আছে! যাকগে, ভেবে আর কী হবে। এই গা-ছমছম করা

রাতে কত কাণ্ডই যে ঘটবে, এ তো সবে শুরু! যাও, ঐ ছোকরাটাকেই আবার আনো দেখি! আরেক দফা পিটিয়ে কৌশিকের কোনো খবর বার করা যায় কি-না। (অপাঙ্গে সান্যালের দিকে তাকিয়ে) কীসব মাল নিয়েই যে কাজ করছি! আসল লোকের বদলে টেনে নিয়ে এলো একটা জলজ্যান্ত মড়া। যাও, ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসো!

হারাধন ঃ ঐ ছেলেটাকে পিটিয়ে আর কী করবেন স্যার, এখনই যা অবস্থা, শ্বাস টানছে প্রায়, আর বেশি ঝাড়লে— না টেকারই সম্ভাবনা।

অফিসার ঃ তাতে তোমার কী শালা? খুব যে দরদ! চারটে নকশাল মারার সময় অত দরদ কোথায় ছিল? বাচ্চা বাচ্চা ছেলে সব, ইস্কুল-কলেজে পড়া, তাদের গুলি করতে হাত কেঁপেছিল সেদিন? তোর কোনো ক্ষতি করেছিল তারা? বরং ওরা যে কথা বলতো, তাতে তোর সুবিধেই হতো, ওদের রাজত্ব হ'লে দুটো খেয়ে-প'রে বাঁচতিস! তবু শালা ওদের বুকে বন্দুক ঠেকাতে ছাড়িসনি, প্রমোশনের লোভে শুয়োরের বাচ্চা অফিসারদের হুকুম তামিল করেছিস গাধার মতো, শালা।

হারাধন ঃ সে কী স্যার! এসব কী বলছেন?

অফিসার ঃ স্যরি, দুঃখিত। মালের ঝোঁকে খেয়ালই ছিল না, কোথায় কোন্ চেয়ারে ব'সে রয়েছি কোন্ রঙের জামা চাপিয়ে। আরে বাবা, আমাদের মন বস্তুটি নেই— আমরা হলাম সরকারের গোলাম বুঝলি? দালাল। যা— ছোঁড়াটাকে নিয়ে আয়, একটু দেশসেবা করি, দেশপ্রেম দেখাই।

[সান্যাল ফোন রেখে এগিয়ে আসে]

সান্যাল ঃ বড়সাহেবকে সব খুলে বললাম স্যার—

অফিসার ঃ তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে পুলিশ পদক দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সান্যাল ঃ চটছেন কেন? তিনি বললেন, এখনই মৃতদেহটাকে সনাক্ত করতে, মৃতের সঠিক পরিচয় বার করতে।

অফিসার ঃ হুঁ। টুপিটি ভালোই পরিয়েছেন। তা আইডেণ্টিফাই করবে কে?

সান্যাল ঃ আমি বড়সাহেবকে জানালাম— আপনি অনেকদিন ধ'রে এই থানায় পোস্টেড; সুতরাং আপনিও করতে পারেন।

অফিসার ঃ আমি? আমি সনাক্ত করবো কী ক'রে? এই যে বললেন বীভৎস হয়ে গেছে মুখটা। তার ওপর আমি তাকে মাত্র একবারই দেখেছি। আমি কিছু করতে পারবো না।

সান্যাল : (জনান্তিকে) তা আর করবেন কেন? আমার কেস যে— (প্রকাশ্যে) আমিও তাই বড়সাহেবকে বললাম— বড়বাবু বডিটা দেখতে রাজি হচ্ছেন না।

অফিসার : (রেগে উঠে) কী? আমি রাজি হচ্ছি না! তুমি— তুমি একথা বললে তাঁকে?

সান্যাল : তুমি নয়, আপনি। বড্ড বেশি টেনেছেন।

অফিসার : দারুণ মতলববাজ লোক তো! বেমালুম এই কথা ব'লে দিলো— আমি দেখতে রাজি নই? সারাক্ষণ পেটের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ— খালি আমার পজিশন ঢিলে করার ফন্দী।

হারাধন : রাগছেন কেন স্যার? বিপদের সময় কি ঝগড়া করা উচিত?

অফিসার : তুমি থামো। জ্ঞান দিতে এসো না! (সান্যালকে) তুমি—তুমি-একটা—

সান্যাল : আবার ভুল করছেন। আমি আপনার বাড়ির চাকর নই যে তুই-তোকারি করবেন।

অফিসার : বটে! আমার ঘাট হয়েছে হুজুর, আমার মোটেই ভোলা উচিত হয়নি— আপনি আমার বস্, ওপরওয়ালা, অমন যুবনেতা শালা তো আমার নেই— কাজেই আপনাকেও আপনি আজ্ঞে করতে হবে বৈ-কি!

সান্যাল : খবরদার! আমার পার্সোনাল ব্যাপারে কথা বলবেন না বলছি।

অফিসার : দেখেছো, আমার সাবঅর্ডিনেট— সে-ও আমাকে চোখ রাঙায়। এরই নাম আইনশৃঙ্খলার উন্নতি!

হারাধন : কী হচ্ছে স্যার! এইভাবে নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল বাঁধালে—

অফিসার : না, না— এ আর সহ্য হয় না। একই সঙ্গে চাকরি ক'রেও যদি সবাই সবার ইয়েতে বাঁশ দিতে চায়— বড়সাহেব নিশ্চয়ই এবার আমাকে পানিশমেণ্ট ট্রান্সফার দেবেন এমন এক ধ্যাদ্ধেরে গোবিন্দপুরে, যেখানে টু পাইস একদম বন্ধ— আচ্ছা লোক তো আপনি!

সান্যাল : মিছিমিছি রাগারাগি করছেন, বড়সাহেবকে শুধু ওকথাই বলিনি, বলেছি— বড়বাবু বডিটা দেখলেও চিনতে পারবেন না। এক— খুব ঘনিষ্ঠ পরিচিতজন ছাড়া কেউ চিনতেই পারবে না।

অফিসার : অ! বলেছেন একথা? বাঁচলাম। তা, বড়সাহেব কী বললেন?

সান্যাল : উনি বললেন— তেমন লোক এনে আইডেন্টিফাই করাতে।

অফিসার : বেশ তো! বাড়ির লোককে খবর দেওয়া যাক!

সান্যাল : অমন কাজটিও করবেন না। কেস কেঁচে যাবে। মানে ব্যাপারটা গোপন থাকা চাই। কৌশিক সেন যদি সত্যিই ম'রে থাকে, তবে শুধু আমরাই জানবো, মানে জেনে নিশ্চিন্ত হবো, বাইরে জানাজানি হ'লে নানা প্রশ্ন উঠবে, কারণ হাওয়া আবার পাল্টাচ্ছে।

অফিসার : তবে আর কী করবেন?

সান্যাল : একটা ব্যবস্থা অবশ্য করেছি। ফেরার সময় একবার শ্বশুরবাড়ি হয়ে এলাম, মনোজের সঙ্গে একটু আলোচনা ক'রে এলাম।

অফিসার : মনোজ! মানে আপনার শালা? সেই যুবনেতা? সে কী করবে?

সান্যাল : সে যদি কারুর খোঁজ দিতে পারে, এমন কারুর— কৌশিককে যে ভালোভাবে জানে, অথচ ব্যাপারটা সে সম্পূর্ণ গোপন রাখবে—

অফিসার : না, না, ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড। পুলিশের ভেতরকার ব্যাপার নিয়ে, বিশেষত এমন একটা গোপনীয় ব্যাপার— আপনি বাইরের লোকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন— এটা মোটেই উচিত হয়নি।

সান্যাল : মনোজ আবার বাইরের লোক কোথায়, ওরাই তো সব।

অফিসার : রাখুন সব। মাথা কিনেছে ওরা। ওদের জন্যেই তো আবার এইসব ঝামেলা শুরু হচ্ছে—

সান্যাল : কী বলছেন স্যার? ওদের জন্যে?

অফিসার : নয়তো কি আমার জন্যে? গদি পেয়ে এমন সব কাণ্ড শুরু করেছে, যে যেদিকে পারে এমনভাবে লুটছে, তাতেই তো আবার লোকে বিগড়োতে শুরু করেছে। জিনিসপত্রের যে হারে দাম বাড়ছে তাতে লোকে নকশাল হবে না তো কি রামধুন গাইবে?

সান্যাল : বটে! আপনি আজকাল এইসব ভাবছেন জানা ছিল না তো! ওদের জানাতে হবে দেখছি।

অফিসার : (শিউরে) এই মাইরি, না— না প্লিজ, অমন কম্মটিও করবেন না। মালের ঝোঁকে কী বলতে কী বলেছি, সব কথা অমন বেঁকিয়ে ধরেন কেন? দোহাই সান্যালবাবু— (হাত জড়িয়ে ধরে) সরকার আমার পিতার তুল্য, আমি তার অধম সন্তান— তার বিরোধিতা কি আমি সজ্ঞানে করতে পারি?

সান্যাল : (হাত ছাড়িয়ে) একটা হস্তিমূর্খ! সারাক্ষণ চুর হয়ে ব'সে আছে।

অফিসার : তা, কী বললো আপনার যুবনেতা শালা?

সান্যাল : (রাগ চেপে) ও বললো, গোপাল হালদার নামে কৌশিকের এক পুরোনো বন্ধু আছে, রাজনীতিটীতি করে না, কী আগে টুকটাক করলেও এখন ছেড়েছুড়ে দিয়েছে— তাকে দিয়ে আইডেন্টিফাই করানো যায়—

অফিসার : গোপাল হালদার! পুরোনো বন্ধু! —তা, সে ফাঁস করবে না তো?

সান্যাল : না বোধহয়, নিরীহ গোবেচারা লোক, ধমক দিলেই চুপ থাকবে মনে হয়।

অফিসার : হুম। তাকেই আনান। আর চলুন আমিও একবার বডিটা দেখে আসি।

সান্যাল : আপনার যাবার দরকার কী? বডি দেখে আর কী করবেন? আর এদিকে আমিও মনোজের কাছ থেকে গোপালের খবর জেনে ফেরার পথেই ভীম সিংকে পাঠিয়ে দিয়েছি তাকে বাড়ি থেকে তুলে আনার জন্যে—

অফিসার : ও! সব কাজই তাহলে সেরেই রেখেছেন, তাহলে আর আমায় বলা কেন? করুন, যা মন চায় করুন।

হারাধন : আমি কি— আমি কি স্যার তাহলে ছেলেটাকে নিয়ে আসবো?

অফিসার : নিয়ে আসবে? আচ্ছা নিয়ে এসো, দেখি এও কিছু বলতে পারে কি-না।

সান্যাল : ছেলেটা! কোন্ ছেলেটা? কার কথা বলছেন স্যার?

হারাধন : আপনি ফোর্স নিয়ে বেরুনোর একটু পরেই বড়বাবু ঘোষপাড়ায় গিয়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে এসেছেন।

সান্যাল : কাকে তুলে আনলেন স্যার? কেন?

অফিসার : সুব্রত— সুব্রত মিত্র। পুরোনো রেকর্ড খুলে দেখলাম, ওই ছোকরা আগে ওসব নকশালী হুজ্জোতে ছিল, একবার অ্যারেস্টও হয়েছিল, ভাবলাম এ যদি কৌশিকের কোনো খবর দিতে পারে—

সান্যাল : (জনান্তিকে) হুঁ! আমার ওপর টেক্কা মারার মতলব!

হারাধন : ছেলেটাকে আনবো কি? [ফোন বাজে]

অফিসার : আমি ধরবো না। কাঁহাতক গালমন্দ শোনা যায়।

সান্যাল : আমি ধরছি। তা, ছেলেটা কোনো খবর দিলো?

হারাধন : কই আর দিলো! অত মার খেয়েও মুখে তালা এঁটে রইলো।

সান্যাল : নিয়ে এসো। আমার চাবিতে তালা খোলে কি-না দেখি। (ফোনটা তোলে) —হ্যালো, সান্যাল স্পিকিং, হ্যাঁ স্যার— (নিচু গলায় কথাবার্তা বলে)

অফিসার : তুমি একটি রামছাগল। সান্যালের সামনে ছোঁড়াটার কথা তুললে—

হারাধন : কেন স্যার? কী হয়েছে?

অফিসার : কী হয়েছে? দেখবে— কী হয়। আমি সান্যালের কাছে শিশু। ওর টর্চার চোখে দেখা যায় না— বুঝলে? পুরোদস্তুর একটা ব্লাডহাউণ্ড!

হারাধন : কী আর করা যাবে বলুন! ছেলেটার ভাগ্যই খারাপ।

অফিসার : যাও, নিয়ে এসো। [হারাধনের প্রস্থান]

সান্যাল : আচ্ছা রাখছি স্যার, ভাববেন না, যা বললেন করবো। (ফোন রাখে)

অফিসার : কী বললো?

সান্যাল : বড়সাহেব খুব চিন্তিত। বললেন— কৌশিককে ধরা না গেলে এ অঞ্চলের ল-অ্যাণ্ড-অর্ডার একেবারে ভেঙে পড়বে। ও আবার এখানে অর্গানাইজ করছে।

অফিসার : সে তো আমিও জানি। নতুন কী বললেন?

সান্যাল : বললেন— গোপাল হালদার এলেই খবর দিতে।

[আরেকজন কনস্টেবল ঢোকে]

অফিসার : কেয়া ভীম সিং? কেয়া সমাচার?

ভীম সিং : গোপাল হালদার আ-গয়া হুজৌর।

সান্যাল : এসে গেছে? আচ্ছা বাইরে বসিয়ে রাখো। ডাকলেই নিয়ে আসবে।

ভীম সিং : ঠিক হ্যায় সাহাব। [ভীম সিংয়ের প্রস্থান]

সান্যাল : শুনুন স্যার, আপনিই গোপালকে আগে জেরা করবেন, মানে কায়দা ক'রে জেনে নেবেন— কৌশিককে সে কতটা চিনতো, অর্থাৎ এতদূর ঘনিষ্ঠতা ছিল কি-না— যাতে কৌশিকের ঐ চেহারাতেও চিনতে পারে। যদি বোঝা যায়, এ-ই যোগ্য লোক, তবেই বডি দেখাবো, নয়তো নয়, আর হ্যাঁ বডি দেখানোর আগে যেন সে না জানতে পারে যে, কৌশিক মরেছে।

অফিসার : বড় গোলমেলে কাজ। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন? আপনিই করুন না।

সান্যাল : আঃ, আমি করলে ঐ ছোঁড়াকে সামলাবে কে, মানে সুব্রত মিত্রকে?

অফিসার : ঐ ছেলেটাকে নাড়াচাড়া ক'রে কী হবে? ও বোধহয় কিছুই জানে না।

সান্যাল : জানুক, না জানুক, দেখতে দোষ কী? (কুৎসিত হেসে—) আর আপনারা এতক্ষণ হাতের সুখ করলেন, আমিই-বা বাদ যাই কেন? আমিও একটু ক'রে নিই।

অফিসার : (এক দৃষ্টিতে দেখে) লোক ঠেঙাতে আপনার দারুণ ভালো লাগে, তাই না?

সান্যাল : (হাসতে হাসতে) যা বলেছেন! অত আনন্দ আর কিছুতে নেই।

অফিসার : (একইভাবে) আপনার হবে।

সান্যাল : কী?

অফিসার : উন্নতি। অদূর ভবিষ্যতে নির্ঘাৎ আই.জি. হবেন।

[সুব্রতকে টানতে টানতে হারাধনের প্রবেশ]

হারাধন : এনেছি স্যার। দাঁড়াতে পারছে না এখনও।

অফিসার : ঐ চেয়ারটায় বসতে দাও।

সান্যাল : না, না, বসবে কেন? অল্পবয়সী ছেলে, শরীরে কত জোর, মনে কত সাহস! এত অল্পবয়সে ব'সে পড়লে চলে?— হারাধন দাঁড় করিয়ে রাখো।

অফিসার : যা ইচ্ছে করুন।

সান্যাল : তোমার নাম সুব্রত মিত্র?

সুব্রত : কতবার বলবো?

সান্যাল : তুমি কৌশিক সেনকে চেনো?

সুব্রত : আগেই বলেছি— উনি আমার মাস্টারমশাই ছিলেন। আবার বলতে হবে?

সান্যাল : (হঠাৎ ঘুষি মেরে) হ্যাঁ, বলতে হবে রে শালা! যতবার জিগ্যেস করবো, ততবারই বলতে হবে।

অফিসার : কী! কী হচ্ছে কী এসব?

সান্যাল : কোথায় থাকে কৌশিক সেন?

সুব্রত : বাড়িতে থাকতে পারে, খুঁজে দেখুন।

সান্যাল : (আবার মারে) ঠিক, ঠিক উত্তর দিবি বেজন্মার বাচ্চা। কৌশিক সেন এখন কোথায়?

সুব্রত : (দৃঢ় স্বরে) জানি না, আগেই বলেছি— কিচ্ছু জানি না।

সান্যাল : হারাধন! ঠিক ক'রে চেপে ধর্‌ তো, যেন না নড়তে পারে! (হঠাৎ পকেট থেকে একটা ছুরি বের ক'রে) —এটা কী দেখছিস? একটু একটু ক'রে তোর পেটের ভেতর ঢোকানো হবে, বল্‌— কোথায় সে?

সুব্রত : যা খুশি তা-ই করতে পারেন।

সান্যাল : (ছুরি হাতে এগোয়) ভিয়েৎনাম— বুঝলেন স্যার— ভিয়েৎনামে এইভাবে কমিউনিস্ট বাঞ্চোৎদের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে (হঠাৎ ছুরিটা ঢুকিয়ে দেয়) —পেট চিরে দেওয়া হয়— (ছুরিটা বের ক'রে নেয়। সুব্রতর আর্তনাদ, রক্তাক্ত ছুরিটা শুঁকে হাসতে থাকে সান্যাল—) বড় আনন্দ, বড় আনন্দ পাই এতে— ফোঁটা ফোঁটা রক্ত— নকশালী রক্ত— (বিকৃত উল্লাসে) বল্‌ শালা— কোথায় থাকে কৌশিক সেন—বল্‌ শালা (আবার ঢোকায়—)

সুব্রত : (যন্ত্রণায় আকাশ কাঁপিয়ে) ইনকিলাব জিন্দাবাদ, চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ।

সান্যাল : খুন ক'রে ফেলবো! মরতে চলেছিস তবু মাওয়ের নাম! একদম খুন ক'রে ফেলবো (আবার মারতে যায়— অফিসার চেঁচিয়ে ওঠে)

অফিসার : স্টপ ইট, স্টপ ইট! —আই সে স্টপ ইট!

সান্যাল : (বিস্মিত ও বিরক্ত) কী হলো স্যার? কর্তব্যপালনে বাধা দিচ্ছেন?

অফিসার : কর্তব্য! শাল্‌লা! কর্তব্যের ইয়ে মারি— এখান থেকে নিয়ে যান অন্য ঘরে। সেখানে যা খুশি করুন, আমার সামনে নয়। —পিশাচ একটি!

সান্যাল : (হেসে) স্যার, বড়ই কোমল হৃদয়। এমন দুর্বল মন নিয়ে কী ক'রে পুলিশে ঢুকলেন? চল্‌ হারাধন, পাশের ঘরে।

[সুব্রতকে নিয়ে ওদের প্রস্থান]

অফিসার : স্যাডিস্ট, পুরোদস্তুর স্যাডিস্ট! —ভীম সিং!

[ভীম সিং ঢোকে]

ভীম সিং : জী হুজৌর! ভেজ দে গা উন্‌কো?

অফিসার : হাঁ! গোপাল হালদারকো ভেজ দো। [ভীম সিংয়ের প্রস্থান] দূর-দূর! ঘেন্না ধ'রে গেল! যত সব ঝামেলা। কখন যে ছুটি পাবো। মালের বোতলটাও খালি। কী যে করি। কী বিশ্রি

রাত— কী বিদ্‌ঘুটে গরম, একটা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। [গোপাল হালদারের প্রবেশ। ভীত, সন্ত্রস্ত, নিরীহ, গোবেচারা]

গোপাল : (আর্তস্বরে) আমায় অ্যারেস্ট করলেন স্যার?

অফিসার : অ্যাঁ? আপনিই গোপাল হালদার?

গোপাল : হ্যাঁ স্যার! —আমি কোনো পার্টি করি না, বিশ্বাস করুন স্যার, আমায় কেন—

অফিসার : বসুন, বসুন। সিগারেট খাবেন?

গোপাল : না স্যার, ধন্যবাদ। তা, আমায় কেন মিছিমিছি রাত্তিরবেলা—

অফিসার : ভয় পাচ্ছেন? বসুন, আগে স্থির হয়ে বসুন।

গোপাল : (বসতে বসতে) ভয় পাবো না কেন স্যার— কথায় বলে পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা!

অফিসার : আপনারা মশাই এই পাবলিকরা সবসময় পুলিশ সম্পর্কে এমন একটা বিরূপ ধারণা মনে মনে পোষণ করেন, পুলিশের নাম শুনলেই ভয়ে সিঁটিয়ে যান—

গোপাল : ভয় পাবো না কেন বলুন? আপনাদের চাকরিই তো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয় দেখানোর। দিনরাত ভয় দেখাবেন, আর ভয় পেলেই দোষ!

অফিসার : মন্দ বলেননি। দিন রাত একটা ভয়ের রাজ্য গ'ড়ে তুলে আমরা তার মধ্যে বাস করছি! সেদিন আমার বাচ্চা ছেলেটা কী একটা দুষ্টুমি করছিল, শুনলাম— ওর মা চেঁচিয়ে বলছে— চুপ, ঐ পুলিশ আসছে, ধ'রে নিয়ে যাবে। ছেলে শান্ত হলো। বুঝুন অবস্থাটা।

গোপাল : তা আপনার ছেলেই যখন ভয় পায়, তখন আর আমাদের দোষ কী বলুন! এখন সবার কাছে পুলিশ এমন একটা জুজু, সেটা আসলে কী— কেউ জানে না, কিন্তু সেটা যে ভয়ের তাতে সন্দেহ নেই। ঐ জন্যেই পুলিশ আর পক্স দুটো থেকেই সাবধানে থাকা ভালো, দুটোই ছোঁয়াচে।

অফিসার : হাঃ হাঃ, বেশ বলেছেন তো! নাঃ কথাবার্তা আপনি ভালোই বলেন, বেশ রসিক। আরে মশাই এই লাইনে ঢুকে হাসি ঠাট্টা করতেই ভুলে গেছি।

গোপাল : তা, স্যার— আমায় কেন ধ'রে আনলেন, তা তো বললেন না!

অফিসার : ধরুন— একটু গল্পগুজব করতে।

গোপাল : (চমকে) গল্পগুজব? এই মাঝরাত্তিরে গল্পগুজব?

অফিসার : আপনাদের কাছে মাঝরাত্তির আমাদের কাছে সন্ধে মশাই। দিনরাত গাধার মতো খাটুনী খেটে যাই, হায় তবু আপনাদের ভালোবাসা পেলাম না।

গোপাল : এইবার কিন্তু সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছি স্যার—

অফিসার : কেন? কীসের ভয়?

গোপাল : ভালোবাসার কথা বলছেন কি-না— আসলে স্যার আপনারা মারুন, ধরুন, গালাগাল দিন— ভয় হয় না তত, ওগুলো বড় চেনা কি-না! আর ভালোবাসা! কী বলবো স্যার— পুলিশদের ভালোবাসা আর মুসলমানের মুরগি পোষা— দুটোই এক।

অফিসার : দারুণ বলেছেন, হাঃ হাঃ, না মশাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছি—

গোপাল : সেটাই আরও ভয়ের স্যার, আমার সম্পর্কে যত কম ইন্টারেস্ট নেন, ততই মঙ্গল—

অফিসার : ভয় পাচ্ছেন কেন? চা খাবেন?

গোপাল : (চাপা আর্তনাদ) আবার চা-ও খাওয়াবেন স্যার? এই রাতে?

অফিসার : আমাদের সব রেডি থাকে। ভীম সিং! [ভীম সিং ঢোকে]

ভীম সিং : বোলিয়ে সাহাব—

অফিসার : দো পেয়ালা চা কর্ না— আচ্ছা কর্কে—

ভীম সিং : ঠিক হ্যায় সাহাব— [প্রস্থান]

গোপাল : স্যার, আমি তো কোনো চুরি ডাকাতি করি না, কোনো পার্টি করি না, আমায় মেরে ফেলবেন স্যার— বিশ্বাস করুন— আমি কিচ্ছু করি না— (কেঁদে পায়ে পড়তে যায়)

অফিসার : (বিরক্ত) কী আশ্চর্য! আপনাকে মারতে যাবো কেন? মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন।

গোপাল : স্যার, মাঝরাত্তিরে বিছানা থেকে তুলে এনে চা খাওয়াচ্ছেন যখন আদর ক'রে, তখন নিশ্চয়ই খারাপ কোনো মতলব আছে আপনার, স্যার পায়ে পড়ি আপনার, মারবেন না আমায়, বাড়িতে আমার বিরাট বড় সংসার—

অফিসার : কী আশ্চর্য! আপনাদের সঙ্গে দেখছি ভালো ব্যবহার করাই চলে না। [ভীম সিং চা দিয়ে চ'লে যায়] নিন, খেয়ে নিন।

গোপাল : স্যার, আমায় কেন ধ'রে আনলেন তা তো বললেন না?

অফিসার : (ঝাঁঝিয়ে) আঃ, কথাটা দেখছি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না!

বলছি তো আড্ডা— স্রেফ আড্ডা মারার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

[নেপথ্যে অমানুষিক আর্তনাদ]

গোপাল ঃ (চমকে) ওটা কী স্যার?

অফিসার ঃ (চাপা দিয়ে) কিছু না, কিছু না, চোর-গুণ্ডাদের ব্যাপার, কান দেবেন না, চা-টা খান।

গোপাল ঃ এমন অমানুষিক আর্তনাদ যখন, তখন নিশ্চয়ই—

অফিসার ঃ ভয় পাবেন না। ওসব ক্রিমিনালদের ব্যাপার, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে--

গোপাল ঃ (হঠাৎ) ক্রিমিনাল— না নকশাল?

অফিসার ঃ (চমকে) অ্যাঁ?

গোপাল ঃ আর এই যদি জিজ্ঞাসাবাদ হয়, তবে টর্চার কাকে বলে— কে জানে!

অফিসার ঃ পুলিশলাইনে ওসব একটু-আধটু হয়। [আবার চিৎকার]

গোপাল ঃ (আর্তস্বরে) আহা, মেরে ফেলবে যে! মনে হচ্ছে একেবারে বাচ্চা ছেলে—

অফিসার ঃ (ধমকে) বলছি না— ওসব দিকে কান দেবেন না!

গোপাল ঃ (ভয়ে) স্যার— আমাকেও ঐভাবে টর্চার করবেন? দয়া করুন, প্লিজ—

অফিসার ঃ এ তো দেখছি দারুণ ভীতু! আপনাকে খামোকা মারতে যাবো কেন?

[আবার আর্তনাদ]

গোপাল ঃ (একটু থেমে) তা হলে এতদিন যা শুনেছি— সব সত্যি?

অফিসার ঃ কী শুনেছেন? কী সত্যি?

গোপাল ঃ এই বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেদের আপনারা ধ'রে এনে থানার মধ্যে দারুণ অত্যাচার করেন, অনেককে মেরেও ফেলেন—

অফিসার ঃ চুপ, চুপ, এসব ব'লে নিজের বিপদ বাড়াবেন না—

গোপাল ঃ আর বিপদ! রাত্তিরে যখন বাড়ি থেকে তুলে এনেছেন—

অফিসার ঃ সকালেই গাড়ি ক'রে বাড়িতে পৌঁছে দেব'খন।

গোপাল ঃ তা হয়তো দেবেন, তবে জ্যান্ত নয়, মরা।

অফিসার ঃ কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন মশাই? আপনার সঙ্গে তো ভদ্র ব্যবহারই করছি।

গোপাল ঃ সেই জন্যেই তো আরও ভয়! স্যার, আমায় কেন অ্যারেস্ট করলেন?

অফিসার ঃ আঃ, কতবার বলবো— একটু গল্প করার জন্যে—
[আবার আর্তনাদ]

গোপাল ঃ স্যার!— সত্যিই যদি গল্পগুজব করতে চান, তবে থানায় কেন? ঐ উর্দি খুলে ফেলুন স্যার, থানা ছেড়ে আমার বাড়িতে চলুন, প্রাণ খুলে গল্প করবো।
[আবার চিৎকার]
স্যার— আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো— এইভাবে একটা ছেলে যে চেঁচাতে পারে—

অফিসার ঃ সান্যালের বড় বাড়াবাড়ি। ভীম সিং। [ভীম সিং ঢোকে]

ভীম সিং ঃ কুছ চাহিয়ে হুজৌর?

অফিসার ঃ হারাধনকো ভেজ দো! [ভীম সিংয়ের প্রস্থান]

গোপাল ঃ স্যার, বাড়িতে আমার নিশ্চয়ই এতক্ষণে কান্নাকাটি প'ড়ে গেছে স্যার— আমার কিছু হ'লে পুরো সংসারটা একেবারে ভেসে যাবে, আমিই একমাত্র আর্নিং-মেম্বার।

অফিসার ঃ বিয়ে করেছেন?

গোপাল ঃ করেছি। দুটো ছেলেমেয়ে আছে। এছাড়া বুড়ো মা-বাবা, দুটো বোন, একটা ভাই রয়েছে। সবাই না খেয়ে মরবে স্যার—

অফিসার ঃ বলছি তো আমায় বিশ্বাস করুন, কিচ্ছু হবে না আপনার।

গোপাল ঃ কিন্তু আমায় ধ'রে আনলেন কেন স্যার?

অফিসার ঃ (হাসতে হাসতে) যদি বলি কিছু খবর জানার জন্যে—

গোপাল ঃ (ভয়ে, বিস্ময়ে) আমার কাছ থেকে? কী খবর?

অফিসার ঃ ধরুন— পাড়ার কোনো ছেলে কী রাজনীতি করে— এইসব।

গোপাল ঃ আমি জানি না স্যার কিচ্ছু জানি না— বিশ্বাস করুন—

অফিসার ঃ এই তো! পুলিশকে সাহায্য করতে চান না!

গোপাল ঃ (শিউরে উঠে) পায়ে পড়ি স্যার, বিশ্বাস করুন— আমি রাজনীতি করি না, দিন আনি দিন খাই— সকালে বেরুই, রাতে ফিরি, কোনো সাতে-পাঁচে নেই, কী ক'রে জানবো—কে কী করে— [হারাধনের প্রবেশ]

হারাধন ঃ আমায় ডাকছেন স্যার?

অফিসার ঃ কী পেয়েছো তোমরা? ছেলেটার চিৎকারে যে থানার পাঁচিল ভাঙতে বসলো। এই ভদ্রলোকও দারুণ ভয় পেয়েছেন!

হারাধন ঃ আর চিৎকার শুনবেন না স্যার, শক্তি ক'মে এসেছে, হয়ে এলো প্রায়।

অফিসার ঃ সান্যালটা একটা দানব।

গোপাল ঃ জ্বলজ্যান্ত একটা ছেলেকে মেরে ফেললেন স্যার?

অফিসার ঃ চুপ করুন, বাজে বকবেন না, যাও হারাধন, সান্যালকে বলো একটু যেন সামলে চলে! অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

[হারাধনের প্রস্থান]

গোপাল ঃ স্যার আমি কিচ্ছু জানি না, আমায় ছেড়ে দিন স্যার—

অফিসার ঃ এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? [ফোন বাজে] —ইয়েস, ও.সি. স্পিকিং। হ্যাঁ স্যার, এসেছে— জেরা ক'রে জানবার চেষ্টা করছি। না স্যার, এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মানে মুশকিল হলো— ওকে জানতেও দেওয়া যাবে না কিছু, অথচ কাজ উদ্ধার করতে হবে, তাই একটু অসুবিধে হচ্ছে। যা-ই হোক, চেষ্টা চালাচ্ছি— হ্যাঁ স্যার, ঠিক বার করবো, ভাববেন না। সান্যাল? ও এখানে কোথায়? সে তো অনেকক্ষণ বাড়ি চ'লে গেছে। হ্যাঁ স্যার— নাইট ডিউটি, অথচ বাড়ি চ'লে গেছে। আমি আর কী বলবো বলুন, অত বড় যুবনেতা যার শালা— হ্যাঁ স্যার, একলাই আমাকে সব সামলাতে হচ্ছে, সান্যালটা ফাঁকিবাজ ব'লে তো আমি ফাঁকি দিতে পারি না— আচ্ছা, রাখছি।

গোপাল ঃ স্যার— আর কী জানতে চান বললেন না তো?

অফিসার ঃ কী-ই-বা জানবো! কী ক'রে যে শুরু করি— এই এক ঝামেলা! সান্যাল শালাও ওদিক মজাসে হাতের সুখ করছে, দিলাম মিথ্যে ক'রে ঠেকিয়ে। বুঝুক এবার।

গোপাল ঃ স্যার আমাকে কেন মিছিমিছি—

অফিসার ঃ (ঝাঁঝিয়ে) —আহ্! তখন থেকে এক কথা ঘ্যানরঘ্যানর করবেন না বলছি! শালা কিছুতেই চিঁড়ে ভেজে না! ধ'রে আনা হয়েছে— চুপচাপ ব'সে থাকুন, সময় হ'লেই ছেড়ে দেওয়া হবে। —আমি শালা মরছি নিজের জ্বালায়, কীভাবে কথাটা পাড়বো, অথচ ও কিছুই বুঝবে না— ধুস শালা, এ চাকরির ষষ্ঠি পুজো করি। রাতে সবাই ঘুমোচ্ছে মজা ক'রে, আর আমার যত ঝামেলা! এ রাতটা যেন গিলে খেতে আসছে আমায়!

গোপাল ঃ (ম্লান হেসে) — পুলিশের চাকরিতেও কষ্ট স্যার!

অফিসার ঃ সে আপনি কী বুঝবেন মশাই? খাটতে খাটতে নাভিশ্বাস

উঠছে, অথচ কর্তাদের মন পাওয়া ভার! তেরো বছর একই পোস্টে রগড়াচ্ছি— কত্তারা শুধু তেল চেনেন আর খুঁটি চেনেন, কাজ নয়! যা বাজারের হাল পড়েছে— ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না!

গোপাল ঃ এটা আপনার অন্যায় হচ্ছে স্যার, আপনি সরকারের নুন খেয়ে সরকারকেই—

অফিসার ঃ (চেঁচিয়ে) সরকারের মুখে আমি মুতি! যত চোর-জোচ্চর-গুণ্ডা-বদমাসেরাই এখন সরকার বনেছে, ওদেরই হুকুমে কাউকে জেলে পুরছি কাউকে ছাড়ছি! আমাকে সরকার চেনাবেন না মশাই, সরকারের আমি— (হঠাৎ গলা নামিয়ে) এই মশাই — আপনি আবার ওদের লোক নন তো?

গোপাল ঃ (হেসে) —ওদের মানে মন্ত্রীদের তো? আপনারও ভয়!

অফিসার ঃ হ্যাঁ মশাই, বেফাঁস কথাগুলো বাবুদের কানে উঠলেই গেছি! মন খুলে কথা বলার পর্যন্ত উপায় নেই এ রাজ্যে!

গোপাল ঃ সে কী! পুলিশও যদি বলে, বাক্‌স্বাধীনতা নেই— তবে আমরা কোথায় যাই।

অফিসার ঃ রাখুন মশাই পুলিশ! দিনরাত ওপরওয়ালার দাঁতখিঁচুনি.... আর বাড়িতেও যদি শান্তি পেতাম! বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই— বৌ আমার সঙ্গে ভালো ক'রে কথা পর্যন্ত বলে না। পাড়ার কোন্‌ ছেলে না-কি তাকে খুব বৌদি বৌদি করতো, কে জানে অন্যকিছুও ছিল কি-না। তা, সেই ছেলে এখন রাজনৈতিক কারণে মিসায় আটক, সুতরাং বৌয়ের মুখ হাঁড়ি, যেন তাকে আমিই ধরেছি। [ফোন বাজে] —ইয়েস্‌ ও.সি. স্পিকিং। হ্যাঁ স্যার— জেরা চলছে। আর একটু, আর একটু বাকি! হ্যাঁ, হ'লেই জানাবো। রাখছি। উঃ, শালার আর তর সয় না! আর জেরা যে কী করছি সে আমিই জানি! দূর মশাই, কিস্যু ভালো লাগে না। বাড়িতে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত ভয় পায়, এড়িয়ে চলে। আদর করতে যাই, ভয়ে গলা ফাটিয়ে কান্না জোড়ে। আমিও তখন রাগ সামলাতে না পেরে দিই দু'ঘা। ওদের মা এসে কিছু বলতে গেলে তাকেও লাগাই মার, খেস্তাখিস্তি, চেঁচামিচি— এই তো শালা সংসার। অতএব মাল টানি, মদে চুর হই, এরই নাম পুলিশের সুখ, পুলিশের জীবন।

[বীভৎসতম আর্তনাদ] —যাঃ! খতম হলো বোধহয়!

গোপাল : মেরে ফেললেন? খুন করলেন ঠাণ্ডা মাথায়?

অফিসার : চেঁচাবেন না! থামুন! ডিউটি, পুলিশের ডিউটি!

গোপাল : (ফেটে পড়ে ক্ষোভে) আপনারা কি মানুষ? আপনাদের ঘরে কি বৌ-ছেলেমেয়ে নেই? ঘরে ফিরে যখন ছেলেমেয়েদের আদর করবেন, তখন একবারও ভাববেন না একজন খুনীর অশুচি স্পর্শ তাদের কলঙ্কিত করছে? ঐ নিহত ছেলেটার রক্ত আপনার হাত থেকে চুঁইয়ে প'ড়ে আপনার ছেলেমেয়েদের সারা শরীরে পড়ছে— একটা জঘণ্য খুনীর সন্তান তারা—

অফিসার : (ছুটে মারতে যায়) আর একটা কথা বলবি তো বাস্কোৎ, জিভ ছিঁড়ে দেবো!

গোপাল : এই তো! এই তো চাইছিলাম, এতক্ষণে স্ব-মূর্তি ধরেছেন, এতক্ষণে বেশ পুলিশ পুলিশ লাগছে! নয়তো, আগে এত ভালো ভালো কথা বলছিলেন— আমি তো ভাবছিলাম এ কোথায় এলাম রে বাবা, এটা কি থানা, না নীতিশিক্ষার কোনো মিশনারী ইস্কুল!

অফিসার : (দ'মে যায়) বাজে বকবেন না। একেই আমার মেজাজ খারাপ!

[সান্যাল প্রবেশ করে]

সান্যাল : কী? কাজ মিটলো?

অফিসার : আপনার মিটেছে? চিৎকারের চোটে তো টেকা যাচ্ছিল না!

সান্যাল : আর চেঁচাবে না। তা এদিকে কোনো খবর বেরুলো?

অফিসার : কী ক'রে বেরুবে? যা গ্যাঁড়াকলে ফেলেছেন আমায়, এর কাছ থেকে জানতে হবে তাকে কতটুকু চেনে, অথচ কাকে চেনে তা জানানো চলবে না! কী ক'রে হয় এটা?

সান্যাল : আপনার দ্বারা কিস্যু হবে না। সরুন, আমি দেখছি।

অফিসার : মস্ত এলেমদার লোক এলেন!

সান্যাল : এই যে গোপালবাবু— আপনি ওদের চেনেন?

গোপাল : কাদের?

সান্যাল : কাদের আবার— ওই যারা হিংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে?

গোপাল : সে তো আপনারাও করেন।

সান্যাল : মানে?

গোপাল : একটা জ্বলজ্যান্ত ছেলেকে পিটিয়ে মারলেন, এরপরও বলতে হবে আপনারা অহিংস?

সান্যাল ঃ বাজে বকবেন না।

অফিসার ঃ বোল ফুটেছে দেখছি! এতক্ষণ তো ভয়ে কেঁচো ছিল!

গোপাল ঃ না ফুটে আর উপায় কী বলুন, নিজের পরিণতিটা তো জানতে পেরে গেছি!

সান্যাল ঃ যা বলি, তার জবাব দিন। নকশালদের কাকে কাকে চেনেন?

গোপাল ঃ কাউকে না! সত্যি বলছি— আমি রাজনীতি করি না। কী ক'রে চিনবো?

সান্যাল ঃ (গলা তুলে) কেন মিথ্যে কথা বলছেন? কৌশিক সেনকে আপনি চেনেন না?

গোপাল ঃ (ভীষণভাবে চমকে) কে? কৌশিক— কৌশিক সেন?

সান্যাল ঃ (প্রচণ্ড ধমক) বলুন— তাকেও চেনেন না?

গোপাল ঃ (সন্ত্রাসে) সত্যি বলছি— আমি পার্টি করি না, আমি কিচ্ছু জানি না— বিশ্বাস করুন—

সান্যাল ঃ এই জানি না জানি না বলার জন্যেই পাশের ঘরে একটা ছেলে ম'রে প'ড়ে আছে—

গোপাল ঃ আমায় মারবেন না স্যার— দয়া করুন— আমার অত বড় সংসার—

সান্যাল ঃ বলুন— বলুন— কৌশিক সেন আপনার চেনা নয়?

গোপাল ঃ না মানে— হ্যাঁ চিনি— কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাইরি বলছি— আমি রাজনীতি করি না—

সান্যাল ঃ যা বলছি তার ঠিক ঠিক জবাব দিন! বলুন, কৌশিক সেন আপনার পুরোনো বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনেকদিনের বন্ধু— (চেঁচিয়ে) স্পিক আউট ননসেন্স—

গোপাল ঃ না— মানে ঠিক তা নয়— ছেলেবেলায় একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, দিব্যি গেলে বলছি, আমি রাজনীতি করি না, এমনি বন্ধুত্ব, এমনি ছোটোবেলা থেকেই— মাইরি বলছি কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না—

অফিসার ঃ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল কি না ছিল— সেটা আমরা বিচার করবো।

গোপাল ঃ বিশ্বাস করুন, দোহাই— পায়ে পড়ি আমি কোনো পার্টি করি না— মানুষের সঙ্গে কি মানুষের বন্ধুত্ব থাকে না? সেই রকম বন্ধুত্ব— চেনাজানা মাত্র। —কী করেছে কৌশিক?

অফিসার ঃ কী করেনি? ঐ শালাই তো আবার এখানে ঝামেলা বাঁধাবার তালে আছে!

সান্যাল : চুপ করুন। কেস কাঁচিয়ে দেবেন না। তাহলে গোপালবাবু— কৌশিকের সঙ্গে যখন সে-ই ছোটোবেলা থেকেই চেনা-পরিচয়, তখন নিশ্চয়ই সেও আপনাদের বাড়িতে আসতো, যেতো—

গোপাল : অ্যাঁ? হ্যাঁ! তা তো হবেই। আমিও যেতাম। মানে বন্ধুত্ব থাকলেই যাতায়াত চলে।

সান্যাল : বেশ, বেশ। অনেকদিন ধ'রেই নিশ্চয়ই এই যাওয়া-আসা চলতো, তাই না?

গোপাল : অনেকদিন? হবে বোধহয়। ছেলেবেলা থেকেই— কিন্তু বিশ্বাস করুন— কোনো রাজনীতি ছিল না।

সান্যাল : [হঠাৎ চেঁচিয়ে] এখনও আপনাদের বাড়িতে যায় সে?

গোপাল : [ভয়ে চমকে] অ্যাঁ— না, না, বিশ্বাস করুন— ও কোথায় আছে, আমি কিচ্ছু জানি না—

সান্যাল : শেষ কবে আপনাদের বাড়ি গিয়েছিল সে?

গোপাল : কী জানি! মানে ঠিক খেয়াল নেই। বছর আড়াই, কি বছর দুয়েক হবে, হ্যাঁ বছর দুয়েকই।

সান্যাল : আচ্ছা, এই যে আপনাদের এতদিনের বন্ধুত্ব, যাতায়াত, চেনাজানা, আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই নানা বিষয়ে আলোচনা হতো?

গোপাল : আলোচনা? না, না, একদম হতো না—

সান্যাল : সে কী? এতদিনের বন্ধুত্ব! কোনো আলোচনাই হতো না? কথাবার্তাও নয়?

গোপাল : সত্যি বলছি— বিশ্বাস করুন— কোনো আলোচনা নয়—

সান্যাল : তার মানে আমাকে কি একথা বিশ্বাস করতে বলছেন যে আপনাদের দু'জনের এত বন্ধুত্ব, অথচ আপনারা কোনো কথা বলতেন না, শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকতেন— (হঠাৎ চেঁচায়) আপনারা কি বোবা?

গোপাল : (ঘাবড়ে গিয়ে) না— ইয়ে, কথাবার্তা তো হতোই, মানে রাজনৈতিক কিছু নয়—

সান্যাল : কী কী বিষয়ে কথাবার্তা হতো—

গোপাল : নানা বিষয়ে— কত বিষয়— মানে বিশ্বাস করুন— কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা নয়—

সান্যাল : অন্তত একটা বিষয়ের নাম করুন—

গোপাল : মানে, কী বলবো, কত কথা হতো, সব কি মনে থাকে! যেমন ধরুন ইয়ে— মানে— ধরুন— প্রেম—

অফিসার ঃ প্রেম? ফাজলামি করছেন? বুড়ো বয়েসে প্রেম?

গোপাল ঃ না, ইয়ে, তখন— মানে বয়েস কম ছিল, কলেজে পড়তাম—

সান্যাল ঃ বেশ, বলুন। তারপর?

গোপাল ঃ মানে একদিন কলেজ কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে আছি, বিকেলবেলা— (কথাগুলো বলতে বলতে গোপাল সামনে এগিয়ে আসে, পেছনের ওরা অন্ধকারে চ'লে যায়) দূরে দেখলাম কৌশিক যাচ্ছে— এই, এই কৌশিক— এই যে আমি—

[কৌশিকের প্রবেশ]

কৌশিক ঃ আরে তুই! তোকেই খুঁজছিলাম ক'দিন থেকে, কথা আছে তোর সঙ্গে।

গোপাল ঃ আমার সঙ্গে? কী কথা?

কৌশিক ঃ আর বোধহয় পারলাম না রে। মেয়েটা বড় জ্বালাচ্ছে!

গোপাল ঃ মেয়েটা? কোন্ মেয়েটা?

কৌশিক ঃ ছন্দা।

গোপাল ঃ ছন্দা— মানে সেকেণ্ড ইয়ারের ঐ রোগা মতন—

কৌশিক ঃ হ্যাঁ। কী করবো বল্ তো?

গোপাল ঃ কী আর করবি? চাকরি জুটিয়ে বিয়ে ক'রে ফ্যাল্!

কৌশিক ঃ দূর! এখনও একটা দিনও ওর সঙ্গে কথাই বলতে পারিনি।

গোপাল ঃ তার মানে? এখনও কথাই বলিসনি? (হেসে ফেলে)

কৌশিক ঃ না— মানে— বড় ভয় করছে! যদি রিফিউজ করে—

গোপাল ঃ ডোণ্ট ঘাবড়াও। ব্যবস্থা করছি। আগে চল্ বসন্ত কেবিনে, চা-টোস্ট খাওয়া। তারপর—

কৌশিক ঃ তা খাওয়াচ্ছি। প্ল্যানটা বাত্লে দে। আমি ঘুমোতে পারছি না ওর জন্যে। [প্রস্থান]

সান্যাল ঃ (হো হো ক'রে হেসে) তা এই ছন্দা সংক্রান্ত ব্যাপারটিই এতদিন আলোচনা করেছেন!

গোপাল ঃ না— মানে— বিশ্বাস করুন—

সান্যাল ঃ ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? বলুন— আর কী কী বিষয়ে কথা হতো?

গোপাল ঃ না, ইয়ে, সত্যি বলছি রাজনীতি নয়— মানে যেমন ধরুন— একদিন— [কৌশিক ঢোকে]

কৌশিক ঃ কী রে আজ ক'টা এ্যাপ্লিকেশন করলি?

গোপাল : তিনটে। তুই?

কৌশিক : আমি দুটো। শুধু এ্যাপ্লিকেশন ক'রে যাচ্ছি, চাকরি আর হচ্ছে না!

গোপাল : পোস্ট অফিসের খরচ জোগাতে জোগাতে জেরবার হয়ে গেলাম।

কৌশিক : আমিও তাই। নাঃ। আর চাকরিবাকরির চেষ্টা না ক'রে মাথা মুড়িয়ে বৃন্দাবনে চ'লে যাবো। চলি রে। বাবার হার্টের ট্রাব্‌ল্‌টা বেড়েছে— ডাক্তারের কাছে যাবো। [প্রস্থান]

সান্যাল : এ কী ক'রে হয়? অ্যাঁ? দু'জন বেকার ছেলে একসঙ্গে মিলেছে, তবু সরকারকে দু'দশটা খিস্তিখেউড়ও করলো না? আপনি মিথ্যে বলছেন—

গোপাল : সত্যি বলছি— বিশ্বাস করুন, আমি রাজনীতি করি না, সরকারকে গালাগালি দেবো কেন?

সান্যাল : না, না, এ তো ঠিক কৌশিক সেনের ছবি হয়ে উঠছে না। আপনি চেপে যাচ্ছেন—

গোপাল : না স্যার— বিশ্বাস করুন—

সান্যাল : আপনারা কী রকম বন্ধু মশাই, শুধু মেয়ে নিয়ে আর চাকরি নিয়েই হাল্কা গল্প করেন— এতদিন মেলামেশা করছেন, অথচ কোনোদিনই সিরিয়াস কিছু নিয়ে—

গোপাল : ঠিক তা নয়। গুরুগম্ভীর আলোচনাও হতো বৈ-কি! যেমন একদিন— (কৌশিক ঢোকে)

কৌশিক : তুই যা-ই বল্— জীবনানন্দের কবিতায় এমন একটা অন্তর্লীন অনুভূতি আছে, এমন একটা আত্মসমাহিত অতৃপ্তি, এমনই যন্ত্রণাদগ্ধ প্রশান্তি— যা আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়! জীবনানন্দের কবিতা হচ্ছে আমার আত্মা— আমার অস্তিত্ব!

গোপাল : যা-ই বলিস বাপু, আমি মাথামোটা সহজ বুদ্ধির লোক। ওসব আঁতলামি আমার ঠিক ভালো লাগে না!

কৌশিক : কী! তুই জীবনানন্দের কবিতাকে আঁতলামি বললি? কতটুকু জানিস তুই? না জেনে না শুনে এমন উল্টোপাল্টা মন্তব্য করার অধিকার কোত্থেকে পেলি? জানিস— জীবনানন্দের প্রতিটা শব্দ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরে— কোথায় পাবি— এমন চিত্রকল্প, রূপরচনা, শব্দচয়নে এমন অনায়াস উদাসীন সতর্কতা—

গোপাল : ক্ষ্যামা দে ভাই, ঘাট হয়েছে—

কৌশিক : বল্ তো এই কবিতাটার ভেতরের রহস্যটা কী? "হায় চিল,

সোনালী ডানার চিল, তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে, তোমার কান্নার সুরে, বেতের ফলের মতো তার ম্লান....”

সান্যাল ঃ (হঠাৎ চেঁচায়!) থামুন! চুপ করুন! [গোপাল চমকে ওঠে, কৌশিক চ'লে যায়] একটার পর একটা বেমালুম মিথ্যে কথা ব'লে যাচ্ছেন আপনি—

গোপাল ঃ না স্যার, না— সত্যি বলছি—

সান্যাল ঃ এই কি কৌশিক সেন— অ্যাঁ! একটা জেল পালানো দুর্দ্ধর্ষ নকশাল, সে কি-না এমন মেনীমুখো মাদীর মতো কফিহাউসে কবতে আওড়ায়? আপনি কিন্তু তখন থেকে বেশ পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন! এসব চালাকি আমরা বুঝি না ভেবেছেন?

গোপাল ঃ বিশ্বাস করুন স্যার— একটাও মিথ্যে কথা বলিনি। দোহাই!

অফিসার ঃ কৌশিক সেন আপনার কী রকম বন্ধু গোপালবাবু? শুধু মুখের বন্ধু, না— বিপদে আপদেও দাঁড়াতো?

গোপাল ঃ সত্যিকারের বন্ধু ছিল সে আমার। একবার আমার খুব অসুখ হয়েছিল, প্রায় হুঁশ ছিল না দিন সাতেক। আধো ঘুমে আধো জাগরণে কতবার দেখেছি— কৌশিক আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে— আঃ, ওর সেই হাতের ছোঁয়া এখনও যেন পাচ্ছি। পরে শুনেছি একনাগাড়ে বিরামহীন সেবা ক'রে সে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল।

সান্যাল ঃ (হঠাৎ) আর সেই সেবারই প্রতিদানে আপনি নিশ্চয়ই কৌশিকের যখন বোমা ফেটে হাত উড়ে গিয়েছিল, তখন তাকে সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাই না?

গোপাল ঃ (চমকে) সে কী! ওর আবার বোমায় হাত উড়লো কবে? কী যা-তা বলছেন?

সান্যাল ঃ অ! ওড়েনি বুঝি! তা আমি ভাবলাম— অত বড় নকশাল যখন, একবার না একবার নিশ্চয়ই হাতে বোমা ফেটেছে। তা আপনি দেখছি ওর সম্বন্ধে সব কিছুই জানেন—

গোপাল ঃ তা জানবো না কেন বলুন! পাড়ার সবাই আমাদের দু'জনকে বলতো হরিহরাত্মা— ওর মা যখন মারা গেলেন, তখন ও তো আমার এই বুকেই মুখ লুকিয়ে কত কান্না কেঁদেছে, মাকে ও দারুণ ভালবাসতো কি-না, তখনই একদিন—

[কৌশিক ঢোকে]

কৌশিক ঃ গোপাল, তোর কাছে কুড়িটা টাকা হবে?

গোপাল : কী করবি?

কৌশিক : মা'র একটা ছবি খুঁজে পেলাম। এনলার্জ ক'রে বাঁধাবো। বাবার অবস্থা তো জানিস। মা মারা যেতে অর্দ্ধেক দিন কাজেই যায় না। বাড়িতে প্রায় হাঁড়িই চড়ে না। ছবি বাঁধাবার টাকা কোথায় পাবো?

গোপাল : আজকেই টিউশনির টাকাটা পেলাম। কুড়ি টাকাই। নিয়ে যা।

কৌশিক : তোর সারা মাসের হাতখরচ চলবে কী ক'রে?

গোপাল : সে চালিয়ে নেব'খন টেনেটুনে। একটা মাস তো!

কৌশিক : তোকে যে কী বলবো! কবে যে শোধ দিতে পারবো— (প্রস্থানোদ্যত)

গোপাল : শোন্! তোকে শোধ দিতে হবে না। মাসিমার শুধু তুই একটাই ছেলে ন'স— তিনি আমারও মা ছিলেন।

কৌশিক : (হাত জড়িয়ে ধ'রে) গোপাল!
[আস্তে আস্তে চ'লে যায়]

সান্যাল : এক চড় মারবো বাঞ্চোৎ। খালি সেণ্টিমেণ্টাল ন্যাকামি। কাজের কাজ নেই!

গোপাল : বিশ্বাস করুন স্যার— বানিয়ে বলছি না। এইসবই ঘটেছিল!

অফিসার : কেন ঝোলাচ্ছেন মশাই— যা জানতে চায় ব'লে দিন না।

সান্যাল : ফাজলামির জায়গা পাওনি শালা! আমাদের কালঘাম ছুটিয়ে দিচ্ছে যে শয়তান, এই কি-না তার চেহারা— চালচলন— হাবভাব? এ তো একটা পুরোদস্তুর ফালতু। [ফোন বাজে] হ্যালো— সান্যাল স্পিকিং। হ্যাঁ স্যার, গোপাল হালদার এসেছে। অ্যাঁ? আমি আবার কখন বাড়ি গেলাম? বড়বাবু বলেছেন? অ! তা উনি তো বলবেনই— মাল টেনে এই থানার মধ্যেই বেহুঁশ হয়ে আছেন— উনি আর কী ক'রে জানবেন— আমি আছি কি নেই।

অফিসার : কী! আমি বেহুঁশ হয়ে আছি— পাজি, ছুঁচো, শয়তান!

সান্যাল : হ্যাঁ স্যার— বড়বাবু একদম আউট। কী বলবো স্যার— আমার সিনিয়ার। হ্যাঁ আমিই গোপালকে জেরা করছি। হ্যাঁ হয়ে এসেছে। রাখছি—

অফিসার : মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর, আমার নামে আজেবাজে লাগানো—

সান্যাল : আপনি যেমন চুক্‌লি খেয়েছিলেন, আমিও তেমনি বাঁশটি ঠেলে দিলাম। স'রে যান। কাজ করতে দিন। —হ্যাঁ

গোপালবাবু— এ তো বড় আশ্চর্যের বিষয়! এত বন্ধুত্ব যার সঙ্গে, এত দীর্ঘদিনের জানাশোনা— সে কোনোদিন আপনার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে কথা বলেনি, এ কী ক'রে হয়? সে নিজে এ্যাক্‌টিভলি পলিটিক্স করতো, দুনিয়া সুদ্ধ লোককে রাজনীতি দিতো, আর আপনাকেই কোনোদিন দলে টানতে চেষ্টা করেনি? আপনি মিথ্যে কথা বলছেন—

গোপাল ঃ না না, স্যার— বিশ্বাস করুন, আমি রাজনীতি করিনি কোনো দিন, আমার ওসব পার্টি, পলিটিক্স, মিছিলটিছিল ভালো লাগে না— মাইরি বলছি—

সান্যাল ঃ কিন্তু কৌশিক? কৌশিক কি কোনোদিন আপনাকে ওসব করতে বলেনি?

গোপাল ঃ তা যে একেবারেই বলতো না তা নয়। বলতো বৈ-কি! কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার ওসব ভালো লাগতো না। আমিই বরং ওকে রাজনীতি ছেড়ে দিতে বলতাম। বলতাম— কী হবে ওসব ভূতের বেগার খেটে, নিজের আখের গোছা কৌশিক, আখের গোছা।

[কৌশিক ঢোকে]

কৌশিক ঃ তোর সেই এক কথা! আখের গোছা! আরে বাবা, দিন এমন পড়েছে— একা একা স্বার্থপরের মতো কেউ বাঁচতে পারবে না। শোষকশ্রেণীর আজ কন্‌সেশান দেবারও ক্ষমতা নেই।

গোপাল ঃ তা ব'লে তুই দিনরাত এইভাবে উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরবি? বাড়ির দিকে তাকাবি না?

কৌশিক ঃ আরে বাবা— বাড়ির কথা ভাবলেই কি বাড়ির অভাব ঘুচে যাবে? আজকে তো শুধু আমার বাড়ির সমস্যা নয়— সারা দেশ, সারা দেশের মানুষই না খেয়ে মরছে। গ্রামের অবস্থা জানিস— দুর্ভিক্ষ নেমেছে। শ্রমিক-বস্তিতে কোনোদিন গেছিস! জানিস তারা কীভাবে থাকে?

গোপাল ঃ অন্যের কথা ভাবার মতো আমার সময় নেই। আমি মরছি নিজের জ্বালায়!

কৌশিক ঃ ভাবতে তোকে হবেই। সময় আসছে, কেউ দূরে থাকতে পারবে না। যুদ্ধ এখন শুরু হয়ে গেছে গ্রামে-শহরে— শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ কখনও একা একা লড়া যায় না। যে দৈত্যদানবেরা আমাদের ওপর

অত্যাচার করছে, যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, ও মুতসুদ্ধি পুঁজিপতি আমাদের শোষণ করতে তাদের বিরুদ্ধে সঙ্গে একজোটে আমাদের—

গোপাল ঃ থাক্ থাক্। ওসব রাজনীতির কচ্‌কচানি আমার ভালো লাগে না, বুঝিও না।

কৌশিক ঃ বুঝবি বুঝবি— দিন আসুক, ঠিক বুঝবি। [প্রস্থান]

অফিসার ঃ আপনি তো মহা গেঁড়ে। এতক্ষণ বেশ তাপ্পি দিচ্ছিলেন— একদম রাজনীতির কথা আলোচনাই হতো না—

গোপাল ঃ পায়ে পড়ছি, বিশ্বাস করুন, সত্যিই কোনো রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না।

সান্যাল ঃ হুঁ! তা এইরকম আলোচনা নিশ্চয়ই মাত্র একদিনই হয়নি, প্রায়ই হতো?

গোপাল ঃ ইয়ে, মানে— তা একটু-আধটু হতো, মানে এসব আলোচনা তো সবাই ক'রে থাকে— ট্রামে-বাসে-ট্রেনে— এর চেয়ে বেশি কিছু নয়, বিশ্বাস করুন— যেমন আরেক দিন—

সান্যাল ঃ বলুন। ব'লে যান। [কৌশিক ঢোকে]

গোপাল ঃ কী রে! শুনলাম তুই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিস? কোথায় আছিস?

কৌশিক ঃ মেটিয়াবুরুজে। শ্রমিক-বস্তিতে।

গোপাল ঃ শেষপর্যন্ত তুই বাড়ি ছেড়ে দিলি?

কৌশিক ঃ কী করবো বল্? পার্টির নির্দেশ। এখন শ্রমিকদের মধ্যে প'ড়ে আছি। সংগঠন করছি। ডিক্লাশড হবার চেষ্টা করছি।

গোপাল ঃ বাড়িতে থেকে কি রাজনীতি করা যেতো না?

কৌশিক ঃ না। ঘরে ব'সে বিপ্লব হয় না। ভোটবাজির দল করা যায় হয়তো, বিপ্লবী পার্টি নয়। বিপ্লব ভোজসভা নয় গোপাল, বিপ্লব শুধু সন্ধ্যার অবসরটুকুই চায় না, তাকে দিতে হয় সমস্ত জীবন।

গোপাল ঃ পাগলামি! ভয়ঙ্কর পাগলামিতে ভুলে নিজের কেরিয়ার নষ্ট করিস না কৌশিক!

কৌশিক ঃ কেরিয়ার? বিপ্লবীর কেরিয়ার তো একটিই— আজীবন বিপ্লব ক'রে যাওয়া, স্বপ্ন শুধু একটাই— চিরদিন বিপ্লবী থাকা। বিপ্লব আমার বুক জুড়ে আছে রে গোপাল, যুদ্ধের বাতাসে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে সারারাত জেগে আছি শত্রুর প্রতীক্ষায়—

গোপাল : বুঝিও না সব। সারা দেশ জুড়ে কেমন একটা যেন তোলপাড় চলছে! কত কী যে ঘটছে, পুরোনো চিন্তাগুলো বারবার হোঁচট খায়—

কৌশিক : কতদিন আর পালিয়ে থাকবি? তোকেও আসতেই হবে।

গোপাল : না রে! আমি পারবো না! বিরাট বড় সংসার আমার কাঁধে।

কৌশিক : যেটুকু পারিস সেটুকু কর্। আমার মতো ঘর ছাড়তে বলছি না।

গোপাল : অবশ্য তুই বাড়িতে না থেকে ভালোই করেছিস। পুলিশ কয়েকবার খুঁজে গেছে।

কৌশিক : শহরে শোষকশ্রেণীর ঘাঁটি বড় শক্ত, পুলিশ-মিলিটারির দাপটও বেশি। কিন্তু গ্রাম? ভারতবর্ষের হাজার হাজার গ্রাম— ওদের কবরস্থান। আমি তাই গ্রামে যাবো, চাষিদের নিয়ে ফৌজ তৈরি করতে; ঐজন্যেই শ্রমিক-বস্তিতে প'ড়ে আছি, নিজেকে তৈরি করছি, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হ'তে শিখছি। চলি, অনেক কাজ আমার— [প্রস্থান]

গোপাল : উল্কা! উল্কার মতো ছুটে চলেছে! কোন্‌দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন পাল্টে গেছে। আমি পারবো না কৌশিক তোদের পথে যেতে—

সান্যাল : (চেঁচিয়ে) মিথ্যে কথা!

গোপাল : (চমকে) অ্যাঁ? কী বললেন?

সান্যাল : ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন।

গোপাল : না। বিশ্বাস করুন—

সান্যাল : এরপর থেকে আপনি— আপনিও কৌশিকদের কাজে জড়িয়ে পড়েন, ঠিক?

গোপাল : (ভয়ে চিৎকার ক'রে) না! আমি পার্টি করিনি।

সান্যাল : হ্যাঁ! পার্টি করা শুরু করেন। আপনার চোখ-মুখ বলছে—মনের সহানুভূতিটা চোখে-মুখে উপচে পড়েছে। বলুন—জবাব দিন! কৌশিক আপনার কাছে মডেল হিরো ব'নে যায়, আপনিও ছোটোখাটো রাজনৈতিক কাজ শুরু করেন, তবে গোপনে, সবার চোখে ধুলো দিয়ে— বলুন কথাগুলো মিথ্যে?

গোপাল : (মাথা নিচু ক'রে) হ্যাঁ— আমিও কিছুটা— মানে বিশ্বাস করুন— ইচ্ছে না থাকলেও— মানে সেই সময়টাই এমন ছিল— চতুর্দিকে এত ছেলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল— আমিও, মানে আমিও ঠিক নিজেকে সামলাতে পারলাম না—

তার ওপর কৌশিক— ওর টানেই কিছুটা হয়তো— [কৌশিক ঢোকে]

কৌশিক ঃ এই নে লিফলেটগুলো। আজ রাতেই গোপনে গোপনে ডিস্ট্রিবিউট করবি প্রত্যেকটা বাড়িতে।

গোপাল ঃ কালকে পুবপাড়ায় ওয়ালিং করেছি। আজ করবো তেঁতুল তলায়।

কৌশিক ঃ দারুণ কাজ করছিস তুই। দেখে আমারই হিংসে হচ্ছে—

গোপাল ঃ কী যে বলিস! তোদের আত্মত্যাগের তুলনায় আমি কতটুকু? আমি তো একটা ঘরকুনো সংসারী জীব। তোদের দেখেই কিছুটা বুকে ভরসা পাই।

কৌশিক ঃ যাক গে, শোন্— আসছে বুধবার তোদের ইউনিটের মিটিং হবে, আমি থাকবো। আমার গ্রামের অভিজ্ঞতা বলবো, আর পার্টির নতুন ডকুমেন্টটা পড়া হবে।

গোপাল ঃ গ্রামে অবস্থা এখন কেমন?

কৌশিক ঃ দারুণ— ফ্যান্টাস্টিক! আমাদের অঞ্চল প্রায় লিবারেটেড। যত পাজি-বদমাস জোতদার-মহাজন— সব শালা শহরে পালিয়েছে— সেদিন একটা অ্যাক্শানে তিনটে দালাল খতম হয়েছে।

গোপাল ঃ তোর চেহারা কিন্তু দারুণ ভেঙে গেছে— খাওয়াদাওয়া জোটে?

কৌশিক ঃ তা জুটবে না কেন? কৃষক কমরেডদের বাড়িতে থাকি, ওরা যা খায়, আমিও তাই খাই।

গোপাল ঃ তুই ফিরে যাবি কবে? এখানে তোর বেশিদিন থাকা ঠিক না। তোর নামে বডিওয়ারেন্ট বেরিয়েছে— দেখতে পেলেই গুলি করবে—

কৌশিক ঃ শনিবার ফিরবো। তবে— বুধবার মিটিঙ, খেয়াল রাখিস। চলি কমরেড। [প্রস্থান]

অফিসার ঃ কমরেড! এ কী! এ শালাও তলে তলে নকশাল ছিল—একদম জানতাম না—

গোপাল ঃ সত্যি বলছি— বিশ্বাস করুন, খুব বেশিদিনের জন্যে নয়, তখন একটা জোয়ার এসেছিল— ঘরে ঘরে তখন কৌশিকদের ছেলে— মাইরি বলছি— সেই সময়ে মাত্র ক'টা দিনের জন্যে আমি একটু - আধটু—

অফিসার ঃ একটু-আধটু! এর নাম একটু-আধটু! বেআইনী লিফলেট বিলি করেছিলে, ওয়ালিঙ করেছিলে— শাল্লা— তখন যদি তোমায়

একবার ধরতে পারতাম—

সান্যাল : ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। আমায় কাজ করতে দিন। গোপালবাবু— তাহলে আপনিও নকশাল ছিলেন?

গোপাল : বিশ্বাস করুন স্যার— পায়ে পড়ি— আপনাদের জেরার চোটে কী বলতে কী ব'লে ফেলেছি মাথার ঠিক নেই, আমায় মারবেন না স্যার—

সান্যাল : কতদিন আপনি ঐসব হাঙ্গামায় ছিলেন—

গোপাল : সামান্য ক'টা দিন— ঐ শুধু যে সময়টা চতুর্দিকে নকশালদের নিয়ে হৈ-চৈ হচ্ছে, সেই সময়টায়— তারপর যখন সব থিতিয়ে এলো, যখন—

সান্যাল : পাল্টা প্যাঁদানির চোটে ওদের শিরদাঁড়া ভেঙে গেল—

গোপাল : অ্যাঁ? হ্যাঁ, তখনই আস্তে আস্তে স'রে এসেছিলাম, বিশ্বাস করুন স্যার, আমি এখন কিচ্ছু করি না, মাইরি বলছি—কোনো পার্টি করি না— দোহাই আমায় ছেড়ে দিন—

সান্যাল : তা আপনি যখন পার্টি ছেড়ে দিলেন তখন কৌশিক কিছু বলেনি? [কৌশিকের প্রবেশ]

কৌশিক : শেষ পর্যন্ত, তাহলে তুইও—

গোপাল : আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। বিয়ে করেছি, ছেলেপুলে হয়েছে। এখন কী ক'রে আর—

কৌশিক : চমৎকার! বিপ্লবটা তাহলে একটা মরশুমী ব্যাপার, যখন ইচ্ছে ধরবো, যখন ইচ্ছে ছাড়বো।

গোপাল : যা-ই বল্ ভাই, এখন আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। একবার যদি কোনো কারণে চাকরিটা যায়, পুরো সংসারটাই ভেসে যাবে—

কৌশিক : ভালো! যা ভালো বুঝবি, তা-ই কর্, আমি আর ব'লে কী করবো! আর কতজনকেই-বা বলবো! তোর মতো অনেকেই আজ ব'সে পড়তে চাইছে। কিন্তু তুইও হেরে গেলি কমরেড, তুই হেরে গেলি— [প্রস্থান]

সান্যাল : (গোপালের কলার ধ'রে) বল্ শালা, শেষ কবে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

গোপাল : বিশ্বাস করুন— আমি আর কিচ্ছু জানি না— কিচ্ছু না—

সান্যাল : ইউ আর এ ড্যাম লায়ার। জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে।

বলুন— জেল ভেঙে কৌশিক পালানোর পরও আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়? বলুন— (সজোরে চড় মারে)

গোপাল : হ্যাঁ— মানে বছরখানেক আগে, ইয়ে বোধহয় কলেজ স্ট্রিটে বাস ধরতে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি— কৌশিক না!

[কৌশিক ঢোকে]

কৌশিক : (জড়িয়ে ধ'রে) তুই! আমি ভাবলাম কে না কে! কেমন আছিস? বাড়ির সবাই ভালো?

গোপাল : দিনরাত রুটিরুজির ভাবনা ভাবতে ভাবতেই ক্ষ'য়ে যাচ্ছি। কোথায় চললি?

কৌশিক : এই এদিকে। চলি রে। পেছনে আবার ফেউ লেগেছে।

[দ্রুত প্রস্থান]

সান্যাল : ব্যাস্! এইটুকু? আর কিছু নয়?

গোপাল : বিশ্বাস করুন স্যার— আর কোনোদিন দেখা হয়নি।

সান্যাল : বিশ্বাস করি না। জানি না জানি না ব'লেও অনেককিছুই যে জানেন তা বলেছেন, বলুন আর কী জানেন—

গোপাল : সত্যি বলছি— পায়ে পড়ি— বিশ্বাস করুন—

অফিসার : ব'লে ফেলুন না মশাই, যা জানেন সব ব'লে দিন, কেন নিজের বিপদ বাড়াচ্ছেন?

সান্যাল : ঐ এক বছর আগেই আপনাদের শেষ দেখা? আর দেখা হয়নি?

গোপাল : না স্যার, ঐ শেষ দেখা, তারপর আর—

সান্যাল : (সজোরে ঘুষি মেরে) ঠিক ঠিক উত্তর দিবি শালা, কৌশিক সেন এখন এই অঞ্চলে ঢুকেছে, যায়নি সে তোর বাড়ি?

গোপাল : (চিৎকার ক'রে) —না।

সান্যাল : ভীম সিং, হারাধন— সুব্রতর বডিটা নিয়ে আয়। [ফোন বাজে] —হ্যালো, সান্যাল স্পিকিং, হ্যাঁ স্যার হয়ে এসেছে। গোপাল আইডেন্টিফাই করবে।

[সুব্রতর মৃতদেহ নিয়ে আসে হারাধন]

গোপাল : এ কী! এ যে বুলু, সুব্রত! এমন ফুটফুটে ছেলেটাকেও মারলেন?

সান্যাল : কীভাবে মেরেছি দেখুন, গলায় ফাঁস লাগিয়ে, একটু-একটু ক'রে পেটের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে— ঠিক এই অবস্থা আপনার তো হ'তে পারে, ঐ জন্যেই বডিটা দেখালাম—

গোলাম : বলছি— সব বলছি— আমার মারবেন না— হ্যাঁ, তিনদিন আগে হঠাৎ রাত্তিরে দরজায় ধাক্কা—

নেপথ্যে : গোপাল— গোপাল— বাড়ি আছিস—

গোপাল : কে? [কৌশিক ঢোকে] এ কী রে! এত রাতে তুই!

কৌশিক : আজ রাতটা থাকতে দিবি?

গোপাল : কী হলো তোর?

কৌশিক : পুলিশ দারুণ খুঁজছে আমায়। কাল ভোরেই চ'লে যাবো। থাকতে দিবি?

গোপাল : তোকে— না বলবো, এমন সাধ্য আছে? কিন্তু এখনও এইভাবে উড়নচণ্ডী হয়ে—

কৌশিক : আর বলিস না ভাই। দিন আবার আসছে, চাকা আবার ঘুরছে। এবার আর কোনো ভুল করবো না, ঠিক জিতবো আমরা দেখে নিস।

গোপাল : যা, ঐ ছোটো ঘরটায় গিয়ে বোস্, আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। [কৌশিক চ'লে যায়]

সান্যাল : তারপর?

গোপাল : ভোরে আমরা ওঠবার আগেই ও চ'লে যায়। বিশ্বাস করুন, ও কোথায় থাকে, কী করে, আমি কিচ্ছু জানি না, আমায় মারবেন না, দোহাই। (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

সান্যাল : তিনদিন আগেও দেখেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই এ-ই পারবে। কী বলেন স্যার?

অফিসার : মনে তো হয়। বডিটা নিয়ে আসুন!

সান্যাল : হারাধন— ভীম সিং। স্ট্রেচারটা নিয়ে এসো। [ওরা বেরিয়ে যায়]

গোপাল : (সন্ত্রাসে)— কী করেছে কৌশিক? কী হয়েছে ওর?

সান্যাল : কিছু না, কিছু না— একটু পরেই দেখবেন।

অফিসার : আঃ! এখন আর চেপে রেখে কী হবে! শুনুন গোপালবাবু, কৌশিক সেন এখানে আবার ঝামেলা পাকাবার তাল করছে, বুঝতেই তো পারেন চারিদিকে পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ, এখন ওর মতো একটা পাকা মাথা বেঁচে থাকলে আমাদের বিপদ অনিবার্য, ওপর মহল পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছে। এখন একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে, কিন্তু কেউ সনাক্ত করতে পারছে না, তবে আমাদের মনে হয় ওটাই কৌশিক সেনের বডি।

গোপাল : (বিমূঢ়) কৌশিক মারা গেছে!

অফিসার ঃ এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। মানে, আপনি যদি একবার ওটা দেখে বলেন— ওটা কৌশিক কি না, তবে মাইরি বলছি— আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, ওর ভয়ে বুকটা কাঁপছে সবার।

গোপাল ঃ (ক্লান্ত স্বরে) তার মানে— ঐ মৃতদেহটি সনাক্ত ক'রে আপনাদের নিশ্চিন্ত করতে হবে তাই তো?

অফিসার ঃ আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। সত্যি বলছি ওর ভয়ে রাতে ঘুমোনো যায় না!

সান্যাল ঃ এবং আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারটা আপনি চেপে যাবেন, কাউকে বলবেন না।

গোপাল ঃ বললে সুব্রতর অবস্থা ঘটবে, তাই না?

সান্যাল ঃ আপনি বুদ্ধিমান লোক। [ফোন বাজে] —হ্যালো! কী ব্যাপার? অ্যাঁ? (চোয়াল ঝুলে পড়ে বিস্ময়ে) —সর্বনাশ হয়েছে স্যার, এই রাতেই ঘোষপাড়ায় বিরাট মিছিল বেরিয়েছে, সুব্রতর জন্যে—

অফিসার ঃ (আঁতকে) তুমি ওকে মেরে ফেললে সান্যাল, কী জবাবদিহি করবো এখন?

গোপাল ঃ মিছিল! মিছিল বেরিয়েছে!

সান্যাল ঃ ঘোষপাড়ার ফাঁড়ি ঘেরাও। ফোর্স চাই—

অফিসার ঃ দেখেছো— তলে তলে কৌশিক কীভাবে অর্গানাইজ করেছে? আর রেহাই নাই!

গোপাল ঃ কৌশিক! কৌশিক করেছে সব।

[হারাধন ও ভীম স্ট্রেচারটি নিয়ে আসে]

অফিসার ঃ [ছুটে গিয়ে মৃতদেহের কাপড় সরিয়ে] গোপালবাবু, এই দেখুন, মাইরি বলুন— এ কৌশিক কি-না! উঃ! ভয়ে সারা শরীর কাঁপছে আমার, প্রেসারটা বাড়ছে। তবু যদি সত্যি সত্যি কৌশিক ম'রে থাকে, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো, বলুন!

গোপাল ঃ (একদৃষ্টিতে মৃতদেহটি দেখছিল, এবার মাথা নাড়ে) না!

সান্যাল ঃ (চমকে) —না! কী বলছেন আপনি?

অফিসার ঃ আর একটু দেখুন। গোপালবাবু— পায়ে পড়ি আপনার—

গোপাল ঃ নাঃ! দেখার আর কী আছে! এ কৌশিক নয়।

অফিসার ঃ কৌশিক নয়! সর্বনাশ! এ তবে কে?

গোপাল ঃ কাকে মারতে কাকে মেরে ফেলেছেন আপনারা! একে আমি চিনিই না। [ফোন বাজে]

সান্যাল ঃ হ্যালো! কী? মাই গড!— স্যার, ঘোষপাড়া ফাঁড়িতে আগুন দিয়েছে, তাণ্ডব চলছে!

অফিসার ঃ কী করেছো, কী করেছো সান্যাল! কৌশিক সেন বেঁচে আছে। সুব্রতকে এইভাবে মেরেছো, সে আমাদের ছেড়ে দেবে ভেবেছো?

সান্যাল ঃ স্যার, আমি ছুটির দরখাস্ত দেবো।

অফিসার ঃ আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো। মঞ্জুর হবে না। আমাদের বিপদে ফেলে কেটে পড়তে দেবো না। কৌশিক সেনের চোখ অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলে, কোথায় পালিয়ে বাঁচবে?

হারাধন ঃ স্যার— থানাও আক্রান্ত হ'তে পারে!

অফিসার ঃ সব— সান্যালের জন্যে; কাকে মারতে কাকে মারলি বাঞ্চোৎ! কৌশিক সেনের প্রতিশোধ অজগরের বাঁধনের মতো। কেউ বাঁচবো না ওর হাত থেকে!

হারাধন ঃ চলুন স্যার— আমরাও না হয় তৈরি হয়ে থাকি!

অফিসার ঃ আর তৈরি! এই সামান্য ফোর্স নিয়ে কী ক'রে আর সামলাবো। ঝড় উঠেছে শালা, সব উড়ে যাবো, পুরো রাতটা এখন ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে—

সান্যাল ঃ আমি বাড়ি যাচ্ছি স্যার— শরীরটা খারাপ লাগছে।

অফিসার ঃ না! থানা ছেড়ে কোথাও গেলে গুলি ক'রে মারবো—শুয়োরের বাচ্চা! আমাদের সবাইকে ডুবিয়েছিস তুই। খুঁচিয়ে আগুন জ্বেলেছিস, কই এখন তোর যুবনেতা শালা বাঁচাক আমাদের, কী সংগঠনই না বানিয়েছে কৌশিক, এত লোক বেরিয়েছে রাস্তায়—

হারাধন ঃ আমি একটু আসছি স্যার— [প্রস্থান]

অফিসার ঃ পালাচ্ছে— সব শালা পালাচ্ছে আমাকে এই রাতে একা ফেলে, ধর্ ধর্— পালাচ্ছে [ওরা কোলাহল করতে করতে বেরিয়ে যায়। স্টেজে শুধু গোপাল ও দু'টি মৃতদেহ। গোপাল আস্তে আস্তে দ্বিতীয় মৃতদেহটির কাছে গিয়ে হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ে]

গোপাল ঃ আমি কাউকে বলিনি কৌশিক, আমি কাউকে বলবো না— তুই ম'রে গেছিস, তোকে ওরা খুন করেছে। কিছুতেই আমি ওদের নিশ্চিন্ত হ'তে দেবো না। ওদের রাতের ঘুম আমি কেড়ে নেবো। আজ তোর ভয়ে ওরা রাতের দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠুক, ভয়ে কাঁপুক ওদের সমস্ত অস্তিত্ব। তুই তো মরতে

পারিস না কৌশিক, তুই যে রূপকথার সেই রাজকুমার, তলোয়ার হাতে চিরদিন হেঁটে যাবি মানুষের স্বপ্নের গভীরে, প্রতিটি সন্ত্রস্ত বুকে তুই বেঁচে থাকবি অমলিন ভালোবাসায়। এই তো— সুব্রত তোর নাম নিয়ে হাসতে হাসতে মরেছে, আরও হাজার সুব্রত প্রস্তুত হচ্ছে; সময়ের অন্তহীন গর্ভে, নিভৃত গোপনে শান দিচ্ছে ক্রোধের বেয়নেটে, এরাই তো কৌশিক সেন, হাজার হাজার কৌশিক সেন। তাই আমি কাউকে বলবো না তোকে ওরা মেরে ফেলেছে, কাউকে বলবো না। আজও কৌশিক সেন অত্যাচারীর বুকে আতঙ্কের ঝড় তুলুক, আজও কৌশিক সেন মানুষের বুকে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখুক উজ্জ্বল! আমি তাই কাউকে বলবো না— তুই খুন হয়ে গেছিস। এই একটা জায়গায় আমি জিতে গেলাম কমরেড, সারা জীবন ধ'রে হারতে হারতেও শেষ মুহূর্তে এসে আমি জিতে গেলাম, তুই দ্যাখ্ কৌশিক— শেষপর্যন্ত আমি জিতেছি, আমি বলিনি, আমি হারিনি কমরেড, হারিনি।

(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

।। পর্দা নামতে থাকে ।।

কাশীপুর-বরানগর গণহত্যার পটভূমিতে রচিত

একাঙ্ক

যেখানেই অত্যাচার

চরিত্র।। হরনাথ, বিমলা, কেয়া, সুকুমার, অমিয়, বাবলু, তাহের, অঘোর, ১ম সহচর, ২য় সহচর,

---

[পর পর কতকগুলো বোমা ফাটাব শব্দ, কোলাহল, আর্তনাদ, স্লোগান—বন্দে মাতরম্, সমাজতন্ত্র আসছে— আসবে; এক দল— এক দেশ— এক নেতা— দেশদ্রোহীদের খতম করা চলছে— চলবে; ইত্যাদি। এই নেপথ্য আবহের মধ্যে মঞ্চের পর্দা খুলে গেল, সবুজ আলোর ঝরণায় এক যুবতী ঘুরে ঘুরে গান গাইছে, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল....' বা অন্য কোনো পেলব রবীন্দ্র সঙ্গীত। হলের মধ্যেই এবার একটা বোমা ফাটে— আর আর্তচিৎকার করতে করতে এক যুবক হল থেকে স্টেজে ছুটে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যায়। স্বাভাবিক আলো। একটি মধ্যবিত্ত ঘরের রুচিসম্মত পরিবেশের আভাস— সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতবহ মঞ্চসজ্জায়। তরুণী সন্ত্রাসে তাকিয়ে আছে আগন্তুক যুবকটির বিধ্বস্ত চেহারার দিকে; যুবকটি উঠে বসতে চেষ্টা করছে]

তরুণী : (ভয়ে) কে— কে আপনি? (যুবক নিশ্চুপ) এভাবে ঢুকে পড়লেন যে! আমি লোক ডাকবো, কী চাই আপনার.... আমি চেঁচাবো কিন্তু—

যুবক : প্লিজ— চুপ করুন— চেঁচাবেন না!

তরুণী : কী চান আপনি? এমন অভদ্রের মতো—

যুবক : পায়ে পড়ছি, কথা বাড়াবেন না। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিন কাইণ্ডলি।

তরুণী : আপনি বেরিয়ে যাবেন কি-না—

যুবক : একটু.... সামান্য একটু সময়—

তরুণী : কী?

যুবক : শেলটার!.... কিছুক্ষণের জন্যে—

তরুণী : না। আপনি বেরিয়ে যান। আমরা কোনো ঝামেলায় নেই। অন্য কোথাও যান— যা খুশি করুন, এখানে নয়।

যুবক : (চাপা স্বরে) আপনি কি বুঝতে পারছেন না বাইরে বেরুলে আমি খুন হবো?

তরুণী ঃ আপনি এখানে থাকলে আমরাও খুন হবো। চ'লে যান।

যুবক ঃ না।

তরুণী ঃ আমি চেঁচাবো। ....আমাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে। আর নয়। আপনি যান।

যুবক ঃ আপনি কী? আপনার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি— প্লিজ!

তরুণী ঃ আমি চেঁচাবো— বাবা—(চকিতে যুবকটি একটি রিভলবার বের ক'রে উঁচিয়ে ধরে)

যুবক ঃ খবরদার! একটা কথা নয়!

তরুণী ঃ (প্রচণ্ড ভয়ে) আপনি.... আপনি....

যুবক ঃ মাপ করবেন। উপায় ছিল না। ধরা পড়তে রাজি নই!

তরুণী ঃ (কান্না ভেজা স্বরে) খুনী— গুণ্ডা— জোর ক'রে এভাবে—

যুবক ঃ গালাগালটা আস্তে দিন। বসুন। চুপটি ক'রে বসুন। ভয়ে কাঁপছেন আপনি।

তরুণী ঃ নিজে তো মরবেনই, আমাদেরও সর্বনাশ করবেন। অনেক মাশুল দিয়েছি আমরা। আর পারি না!

যুবক ঃ ভয় নেই। (কোমল স্বরে) একটু বাদেই.... মানে চারপাশটা একটু ইয়ে হ'লেই চ'লে যাবো। বসুন— কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? এটা পকেটে পুরছি আমি। (রিভলবারটা পকেটে রাখে)

তরুণী ঃ বেশ, আপনি যখন.... কী আর করা যাবে, আমাদের আবার বিপদের মধ্যে.... আপনি এ ঘরে বসুন তাহলে, আমি অন্য ঘরে—

যুবক ঃ (দৃঢ় স্বরে) না।

তরুণী ঃ (বিস্মিত) কী না?

যুবক ঃ এ ঘর ছেড়ে যেতে পারবেন না।

তরুণী ঃ কী বলছেন?

যুবক ঃ এ ঘরেই থাকতে হবে আপনাকে।

তরুণী ঃ (ক্রোধে) আপনার সাহস তো—

যুবক ঃ যতক্ষণ আমি এ ঘরে আছি, অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না।

তরুণী ঃ আপনি.... আপনি আমার বাড়িতে ব'সে আমাকেই—

যুবক ঃ বাধ্য হচ্ছি, ক্ষমা করবেন।

তরুণী ঃ অভদ্র, ইতর! কী চান আপনি? কী উদ্দেশ্য আপনার?

যুবক ঃ খারাপ কিছু নয়। ভয় নেই। শুধু নিজের প্রাণটুকু বাঁচাতে—
(নেপথ্যে— 'ঘরে কে কথা বলছে কেয়া মা!')

কেয়া ঃ বাবা! (যুবকটি প্যান্টের পকেটে হাত দেয়)

নেপথ্যে : এই গণ্ডগোলের মধ্যে কে আবার এলো বাড়িতে?

কেয়া : (ভেঙে পড়ে) আপনি চ'লে যান, প্লিজ, পায়ে ধরছি আপনার—

যুবক : কী হলো?

কেয়া : চ'লে যান। আমাকে.... মানে কোনো অসম্মানের মধ্যে ফেলবেন না!

যুবক : কেন? অসম্মান কীসের?

কেয়া : আপনি বুঝবেন না। আমার ঘরে অপরিচিত একজনকে দেখলে—

যুবক : (ম্লান হেসে) সংস্কার! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও—

নেপথ্যে : কী হলো? খোকার বন্ধু বুঝি কেউ—

কেয়া : বেরিয়ে যান, এক্ষুণি।

[এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ : (যুবকটিকে দেখে স্তম্ভিত) আপনি!

কেয়া : (তাড়াতাড়ি ছুটে যায়) এ কেউ নয় বাবা, আমি একে চিনি না। বিশ্বাস করুন, এ লোকটা জোর ক'রে—

বৃদ্ধ : (স্থির দৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকিয়ে) —কে আপনি?

কেয়া : একে আপনি বের ক'রে দিন বাবা। আমি বারণ করলাম কত, শুনলো না। আমাদের বিপদে পড়তে হবে। লোকটা একটা—

বৃদ্ধ : (আস্তে আস্তে যুবকটির দিকে এগুতে এগুতে) এ পাড়ায় আপনাকে তো কোনোদিন দেখিনি? কে আপনি? এখানে কী মনে ক'রে? (যুবকটি সন্ত্রাসে পেছোয়)

কেয়া : গুণ্ডা, গুণ্ডা একটা! চারদিকে গণ্ডগোল— এখানে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে—

বৃদ্ধ : কী মতলব আপনার? বাইরে গুলি চলছে, আগুন জ্বলছে, আমাদের বাড়িতে কে আসতে বললো আপনাকে? (যুবকটি নির্বাক, স্তব্ধ)

কেয়া : লোকটার কাছে একটা রিভলবার আছে বাবা, আমি ওকে ঢুকতে দিতে চাইনি, ভয় দেখিয়ে—

বৃদ্ধ : রিভলবারও আছে আপনার কাছে? চমৎকার! কেউ বুঝি এ বাড়িটা চিনিয়ে দিয়েছে আপনাকে? বলেছে বুঝি— যাও, ঐ বাড়িটায় ঢোকো গিয়ে।

যুবক : (এতক্ষণে কথা বলে) কী বলছেন— বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধ : (তীব্র শ্লেষে) তা বুঝবেন কেন? জীবনের অনেক কিছু আপনাদের দয়াতে হারিয়েছি কি-না!— এ্যাদ্দিন তবু কোনো ঝামেলা ছিল না। আজ আবার নতুন ক'রে খুঁচিয়ে ঘা করতে ঢুকেছেন—

যুবক : (আরও ঘাবড়ে গিয়ে) মানে, আপনি কী বলতে চাইছেন—

বৃদ্ধ ঃ আপনি রিভলবারটা এই ঘরে রেখে গিয়ে পুলিশকে খবর দিয়ে আসুন।

যুবক ঃ এ্যাঁ!

বৃদ্ধ ঃ হ্যাঁ। কিংবা নতুন প্রভুদের বলুন— হরনাথ বিশ্বাস বেআইনী অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে ঘরে।

যুবক ঃ (বিস্ময়ে) কী যা-তা বলছেন!

বৃদ্ধ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটুকুই তো বাকি আছে, আর কেন?

কেয়া ঃ বাবা, এই লোকটাকে বাইরে বের ক'রে দিন। আমরা কেন বিপদে পড়বো?

যুবক ঃ (ভয়ে) না, না, দয়া করুন— আমায় মেরে ফেলবে ওরা!

বৃদ্ধ ঃ (আরও বিদ্রূপ) তাই না-কি! সত্যি! বড়ই বিপদের কথা! চিন্তার বিষয়! আপনাকে তাহলে যখন এখান থেকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তখন আমাদের সবাইকে কিচ্ছু বলবে না কেউ? কী বলুন, অ্যাঁ? আমাদের কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না, তাই না?

যুবক ঃ (ইতস্তত করে) না, মানে— আপনাদের হয়তো— তবু আমাকে যদি দয়া ক'রে—

বৃদ্ধ ঃ (খেঁকিয়ে ওঠে) কী? কী পেয়েছেন আপনারা? আমার সব কেড়ে নিয়েছেন, বুড়ো বয়সে লুকিয়ে কাঁদবার অবসরটুকু, আর— আর কত চাই? মেরে ফেলতে চান, জেলে পুরতে চান— যা খুশি করতে চান করুন, তার জন্যে আবার ছল-চাতুরী কেন? সোজাসুজি করলেই তো হয়!

যুবক ঃ (ছিট্‌কে ওঠে) কী বলতে চান আপনি?

বৃদ্ধ ঃ (তীব্র ঘৃণায়) পুলিশের স্পাই!

যুবক ঃ (চমকে) কে? আমি?

বৃদ্ধ ঃ নয়তো কে? আমায় ফাঁসাবার মতলব!

যুবক ঃ (চিৎকার করে) না। বিশ্বাস করুন।

বৃদ্ধ ঃ চুপ করুন। চেঁচিয়ে ইশারা করা হচ্ছে বুঝি!

কেয়া ঃ বের ক'রে দিন বাবা, এখুনি।

[এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার প্রবেশ]

প্রৌঢ়া ঃ ডাকাত পড়েছে না-কি, চেঁচামেচি কীসের? ....ওমা, এ আবার কে?

কেয়া ঃ কেউ নয় মা, জোর ক'রে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে, আমি কিচ্ছু জানি না!

প্রৌঢ়া ঃ (কেয়ার দিকে তাকিয়ে দেখেন) তাই বুঝি?

কেয়া ঃ হ্যাঁ মা, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো— লোকটা এমন অভদ্র!
প্রৌঢ়া ঃ থু থু থু! কী ঘেন্না, কী ঘেন্না!
কেয়া ঃ মা!
প্রৌঢ়া ঃ ঘরে আজকাল লোকও বসাতে শুরু করেছিস হতচ্ছাড়ী!
কেয়া ঃ (ভয়ে) কী বলছো!
প্রৌঢ়া ঃ কিছুই বুঝি না আমি ভেবেছিস? তোর চালচলন হাবভাবে কি কিছুই ধরা পড়ে না ভাবিস না? ভেবেছিস দুই বুড়ো-বুড়ির চোখে ধুলো দিয়ে—
কেয়া ঃ (চাপা বেদনায় আর্তনাদ) মা!
প্রৌঢ়া ঃ ছেলেকে খেয়েছিস মুখপুড়ি! এখন পুরো বংশের মুখে চুনকালি মাখাতে শুরু করলি, এ্যাদ্দিন তাও ছিল আড়ালে-আবডালে, আজ আবার চোখের সামনেই, এতদূর সাহস!
হরনাথ ঃ (ধমক দেয়) বিমলা!
বিমলা ঃ থামো তুমি! তোমার চোখে তো কিছুই পড়ে না। মাগীর রূপে আর মিষ্টি মিষ্টি কথায় সব ভুলে আছো! ....অনেকদিন থেকেই ঐ অনাচার দেখে আসছি, কিচ্ছুটি বলিনি। ছি ছি আজ একেবারে এতই বেহায়া হয়ে উঠেছে যে, একেবারে ঘরের মধ্যেই—
হরনাথ ঃ চুপ করবে তুমি!
বিমলা ঃ আদরযত্ন ক'রে দুধ-কলা দিয়ে ঘরে একটা বেশ্যা পুষেছি!
কেয়া ঃ মা!
হরনাথ ঃ বিমলা, আর একটা কথা বললে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে!
বিমলা ঃ তুমি তো বলবেই— মাসের প্রথমে ছুঁড়ির কাছ থেকে গোটা কয়েক নোট হাত পেতে নাও যে! তাই তো ওর এত গুমোর! কোত্থেকে কী ক'রে টাকাগুলো রোজগার ক'রে আনে খোঁজ নিয়েছো কোনোদিন?
হরনাথ ঃ বিমলা, খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু!
বিমলা ঃ খোকার কথা তোমার কি একবারও মনে পড়ে না গো?
যুবক ঃ (এতক্ষণে সব ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে) দেখুন— ইয়ে, মানে— আপনারা কিন্তু ভুল করছেন! মানে, ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে— সত্যি বলছি—
বিমলা ঃ (এবার যুবকটিকে ভালো ক'রে দেখে) বাঃ, বাঃ, তুমিও নেমে পড়েছো ছোকরা! বলো, বলো, এক ঝুড়ি মিথ্যে কথা ব'লে তোমার ধর্মবোনটিকে বাঁচাও।
যুবক ঃ না, না, বিশ্বাস করুন—

বিমলা ঃ বিশ্বাস তো সবই করছি বাবা, সব.... বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি আছে আমাদের? আমার ছেলে যে থানার মধ্যে আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে.... একথাও তো বিশ্বাস করতে বাধেনি!

যুবক ঃ (চমকে) আপনার ছেলে? কী নাম?

হরনাথ ঃ চুপ, চুপ! বেশি কৌতূহল দেখাবেন না আপনি!

যুবক ঃ ও! আপনি তাহলে এখনও আমায় সন্দেহ করছেন?

হরনাথ ঃ হ্যাঁ, করছি— ব্যাস!

যুবক ঃ (বিভ্রান্ত) আমি, মানে— কীভাবে যে আপনাদের— এ তো মহা গেরো! আপনারা দু'জনেই আমাকে— ছি ছি ছি উনি যে কুৎসিত ইঙ্গিত করলেন, আপনি তা না বললেও যা বলছেন—

হরনাথ ঃ চেঁচিয়ে কথা ব'লে লোক জানাজানি করবেন না! চুপ!

যুবক ঃ আপনি আমাকে পুলিশের স্পাই মনে করছেন!

হরনাথ ঃ হ্যাঁ। ঠিক তাই।

যুবক ঃ হঠাৎ এ সন্দেহ?

হরনাথ ঃ কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না ব'লে।

যুবক ঃ বিশ্বাস করুন— দোহাই আপনাদের— আপনি আমার বাবার মতো।

হরনাথ ঃ আমি কারোর বাবা নই, কোনোকালে ছিলাম না। আমার নাম হরনাথ বিশ্বাস।

যুবক ঃ ও! দেখুন হরনাথবাবু, আমি সত্যি বলছি— আপনারা দু'জনে যা ভাবছেন তার কোনোটাই সত্যি নয়! আমি কোনো ক্ষতি করতে আসিনি, প্ল্যান ক'রে এই ঘরে ঢুকিনি। বিশ্বাস করুন, পুরো ব্যাপারটা একটা এ্যাকসিডেন্ট—

হরনাথ ঃ বিশ্বাস করি না।

যুবক ঃ (চেঁচিয়ে) বিশ্বাস করতেই হবে! আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী। কোন্ পার্টির তা আপনারা বুঝতেই পারছেন। আমার নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে। বিশ্বাস হলো?

হরনাথ ঃ না!

যুবক ঃ শুনুন, শুনুন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন। আমি জানি, এভাবে আমার কনফেস করায় বিপদ আছে, তবু আপনারা যে কুৎসিত সন্দেহ করছেন, —বিশেষত এই ভদ্রমহিলার মাথায় যেভাবে অন্যায় কলঙ্কের বোঝা চাপাচ্ছেন— মানে, তাতে আমার— কী বলবো, একটা দারুণ অস্বস্তি, একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খাচ্ছে—

বিমলা ঃ থাক্, থাক্, ওই ছুঁড়ির হয়ে আর সাফাই গাইতে হবে না।

যুবক ঃ মা, আমি আপনার ছেলের মতো। শুনলাম, আপনার ছেলে মারা গেছেন, কোথায় কীভাবে মরেছেন জানি না। তবু বলছি— আপনার ছেলের নামে দিব্যি কেটে বলছি—

হরনাথ ঃ যথেষ্ট হয়েছে! তাকে আর টেনে না-ই-বা আনলেন—

যুবক ঃ বিশ্বাস করুন, আমি হায়ার কমিটির নির্দেশে আপনাদের পাড়ায় এসেছিলাম। কী ক'রে কে জানে খবরটা বোধহয় লিক্ হয়ে যায়। তার ওপর এলাকাকে জীবাণুমুক্ত করার অভিযান শুরু হয়ে গেছে। একটি বারের মতো বিশ্বাস করুন— ওদের হাত থেকে পালাতে গিয়ে— মানে এই ঘরে ঢুকে পড়েছি, ব্যাপারটা সম্পূর্ণতই— মানে— ঐ ভদ্রমহিলাকে একটু আগেও আমি চিনতাম না, সত্যি বলছি, আর বুঝতেই পারেন— পুলিশের সঙ্গেও আমার এমন কোনো যোগাযোগ নেই, যাতে আপনাদের বিপদে ফেলতে পারি— বরং পুলিশই আমাকে পেলে—

হরনাথ ঃ গল্পটা ভালোই ফেঁদেছেন!

যুবক ঃ এখনও অবিশ্বাস! (চেঁচিয়ে) এই দেখুন— এই দেখুন— এই দেখুন— পার্টির গোপন সার্কুলার আমার কাছে— নতুন ডকুমেণ্ট— এগুলোও কি বলছে আমি পুলিশের লোক কিংবা এই মহিলার গোপন প্রেমিক?

[বাইরে একটা প্রচণ্ড বোমা ফাটার আওয়াজ। কোলাহল। মঞ্চে স্তব্ধতা]

হরনাথ ঃ আবার কার বাড়িতে বোমা মারলো কে জানে!

বিমলা ঃ ও বাড়ির সমরটাকে যে কী মার মেরেছে— চোখে দেখা যায় না।

হরনাথ ঃ আপনি একদম চেঁচামেচি করবেন না। বাইরে যেন আওয়াজ না যায়।

বিমলা ঃ পেছনের ঘরটাতে থাকলেই ভালো।

হরনাথ ঃ বেশিক্ষণ থাকবে না এই তাণ্ডব। গোলমালটা একটু থামলেই না হয় যাবেন।

বিমলা ঃ সেরকম বেশি কিছু হ'লে রাত্তিরটা থাকতেও পারেন।

যুবক ঃ না, না, তার দরকার হবে না বোধহয়।

হরনাথ ঃ যদিও জিগ্যেস করা উচিত নয়— মাপ করবেন, কৌতূহলটা বড় বিপজ্জনক! আপনার নাম?

যুবক ঃ সুকুমার— সুকুমার চৌধুরী—

হরনাথ ঃ (চমকে) আপনি— আপনিই সেই?

যুবক : (হেসে) আমায় চেনেন না-কি?

হরনাথ : আপনার— আপনার মাথার দাম এখন আড়াই হাজার!

বিমলা : তুমি চেনো একে?

হরনাথ : আপনিই একমাত্র বাইরে আছেন এখন, না?

সুকুমার : (হেসে) হ্যাঁ— একমাত্র জীবিত এবং মুক্ত অতি বিপ্লবী!

[হঠাৎ 'মাসিমা মাসিমা' ব'লে ডাকতে ডাকতে একটি ছেলের প্রবেশ]

ছেলে : দিন টাকাটা দিন, কতয় খেলবেন আজ। ....আরে, আপনি—

বিমলা : (তাড়াতাড়ি) চলো— ওঘরে চলো বাবা, তোমার সঙ্গে একটু—

ছেলে : (সুকুমারকে) আপনি— আপনাকেই না ঐ মোড়ে ওরা ধরেছিল—

বিমলা : (ধমকে) আঃ অমিয়— বলছি না দরকার আছে— (চাপা গলায়) এ ঘরে এরা সব রয়েছে, ওদিকে চলো টাকা দিচ্ছি—

অমিয় : যাচ্ছি! —আপনাকে তো দারুণ পিটিয়েছে! আপনি এ বাড়িতে কী মনে ক'রে? কী ক'রে এলেন এখানে?

হরনাথ : আঃ! তুমি এখানে কী করছো অমিয়? মাসিমার সঙ্গে দরকার থাকে মিটিয়ে চ'লে যাও।

অমিয় : আজকে যা ঝাড় শুরু হয়েছে না! আর প্যাঁদানির চোটে—

বিমলা : অমিয়— আমার তাড়া আছে—

অমিয় : চলুন যাই। [দু'জনের প্রস্থান]

সুকুমার : আমার বোধহয় এখন স'রে যাওয়াই ভালো।

হরনাথ : (কেয়াকে) ঐ লোফারটার সঙ্গে তোমার মা'র কীসের দরকার কেয়া?

কেয়া : (সন্ত্রাসে) আমি কিছু জানি না বাবা।

হরনাথ : (আপন মনে) ভেবেছে— আমি কিছুই বুঝি না, ভালো— খুব ভালো ব্যাপার।

সুকুমার : আমি তাহলে এখন যাই। মিছিমিছি আপনাদের বিপদে— [প্রস্থানোদ্যত]

হরনাথ : কোথায় চললেন?

সুকুমার : দেখি, রাস্তা খোলা পাই কি না!

হরনাথ : না। আপনি বসুন এ ঘরে।

সুকুমার : ছেলেটা কি বিশ্বস্ত?

হরনাথ : তা হয়তো নয়। তবু আপনার বেরুনো চলে না!

সুকুমার : কেন?

হরনাথ : গোলমাল এখনও থামেনি। সারা পাড়া নিশ্চয়ই ওরা ঘিরে রেখেছে। বেরুলেই মরবেন।

সুকুমার : এখানেও তো ওরা আসতে পারে।

হরনাথ : তা পারে। তবে না-ও আসতে পারে। ধরা না-ও পড়তে পারেন।

সুকুমার : কিন্তু এখানে এলে আপনাদেরও যে—

হরনাথ : (রুক্ষস্বরে) আমাদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না। (অন্যদিকে তাকিয়ে) ভাববেন না আপনার প্রতি আমাদের সমর্থন বা সহানুভূতি আছে। মোটেই নয়।

সুকুমার : কী বলছেন?

হরনাথ : শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থেই বলছি। এখান থেকে বেরুলেই ওরা দেখতে পাবে, এ বাড়িতে হামলা হবেই। তার চেয়ে এখানেই থাকা ভালো। তবু আমরা তা'তে বাঁচতে পারি।

[বিমলা ও অমিয় ঢোকে]

বিমলা : তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না বাবা।

অমিয় : কী?

বিমলা : এই যে, মানে এই ভদ্রলোক যে— মানে বোঝোই তো বাবা, গণ্ডগোলের মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে আমাদের বাড়িতে ছুটে ঢুকে পড়েছেন— কাউকে বোলো না।

অমিয় : না। না। আমার কী দরকার বলার!

বিমলা : মানে— জানতে পারলে আবার— তুমি তো জানোই, খোকা মারা যাবার পর থেকে আমরা কেউই কোনো দলেটলে নেই, দেখো বাবা আমাদের ওপর যেন না কোনো—

অমিয় : সে আপনি ভাববেন না। [প্রস্থান]

বিমলা : (হরনাথকে) তুমি খেয়ে নেবে এখন?

হরনাথ : (তীব্র ঝাঁঝালো স্বরে) না!

বিমলা : (সচকিত) কী হলো তোমার?

হরনাথ : (পূর্ববৎ) কিছু না।

বিমলা : (কেয়াকে) তুই কিছু লাগিয়েছিস আমার নামে?

কেয়া : (চমকে ওঠে ভয়ে) না, না, সত্যি বলছি— আমি কিচ্ছু বলিনি!

বিমলা : হতচ্ছাড়ী— ঘর ভাঙানোর জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিস। হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরছিস। আমি কিছু বুঝি না— না? নিজের কপাল তো ভেঙেছিস, এখন আমার কপালে আগুন জ্বালানোর জন্যে—

কেয়া : কী বলছো তুমি মা?

বিমলা : আমি খুব বোকা না? ভেবেছিস তোর ঐ ঘরজ্বালানী রূপ আর নেকু নেকু কথা শুনেই গ'লে যাবো—

হরনাথ ঃ (চাপা ক্রোধে) বিমলা— তুমি থামবে?

বিমলা ঃ ছি-ছি-ছি-ছি কী ঘেন্নার কথা— সব গুণই হচ্ছে আজকাল।

কেয়া ঃ মা!

বিমলা ঃ থাক্, আর ঢং দেখাতে হবে না। মরণ আর কী! একটা বেবুশ্যের মুখে—

হরনাথ ঃ (ক্রোধে উন্মত্ত) চোপ!

বিমলা ঃ তোমাকে তো তুক্ করেছে ঐ মাগী— তাই কিছুই দেখতে পাও না, কিছুই কানে আসে না— অফিসের নাম ক'রে অত রাত্তির পর্যন্ত কী করে সে খবর নিয়েছো কোনোদিন?

কেয়া ঃ (কেঁদে ফেলে) মিথ্যে— একদম মিথ্যে—

বিমলা ঃ (গ'র্জে ওঠেন যেন) মিথ্যে? গলায় পা তুলে দেবো তোর। পরশু রাত্তিরে কার গাড়ি থেকে নামলি— সে কি আমি দেখিনি? ঐ কোট-প্যান্ট পরা বাবু তো তোর সাতপুরুষের ভাতার কি-না— আমায় ঘাঁটাবি না একদম—

হরনাথ ঃ (অসহ্য যন্ত্রণায়) তুমি এখান থেকে যাবে?

বিমলা ঃ আর এদিকে আমার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে কত্তার কান ভারী করা হচ্ছে!

[বিমলার প্রস্থান। কেয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে]

হরনাথ ঃ (নিজের মনে) তুমি খুব চালাক বড় বৌ, মস্ত বড় ডিপ্লোম্যাট! পুরো হাওয়াটাকেই কেমন কায়দা ক'রে ঘুরিয়ে দিলে—

['পিসি' 'পিসি' করতে করতে একটা ছ'সাত বছরের বাচ্চা ছেলে ঢোকে]

বাচ্চা ছেলেটি ঃ পিসি কই? ও পিসি তোমায় ডাকছে—

হরনাথ ঃ কে ডাকছে রে বাবলু? তোর মা বুঝি?

বাবলু ঃ হ্যাঁ দাদু— ও পিসি তুমি অমন করছো কেন? কাঁদছো?

কেয়া ঃ (চোখের জল মুছে) কিছু না। চল্। (হরনাথকে) যাবো বাবা?

হরনাথ ঃ যা মা! একটু ঘুরে আয়। এ বাড়ির বাতাস বড় বিষাক্ত, বড় ভারী, যতটা পারিস, বাইরে বাইরেই থাকিস।

বাবলু ঃ চলো শিগগির, মা বললো— ছুটে তোমায় ডেকে আনতে।

কেয়া ঃ কী করছে তোর মা?

বাবলু ঃ রান্না করছে। ....চলো না তাড়াতাড়ি।

হরনাথ ঃ পারলে একটু বাইরের খবরটবরও— অবস্থা আরও ঘোরালো হলো কি না—

কেয়া ঃ আচ্ছা বাবা! [দু'জনের প্রস্থান]

সুকুমার ঃ কোথায় গেলেন উনি?

হরনাথ ঃ আপনার ভয় নেই। পাশের বাড়িতে। বাবলুর মা ওর বন্ধু।

সুকুমার ঃ ও....

[একটু নিস্তব্ধতা! হঠাৎ নেপথ্যে একটি আর্ত চিৎকার ও উল্লাসধ্বনি]

হরনাথ ঃ আর একটা গেল মনে হচ্ছে।

সুকুমার ঃ আপনাদের এদিকটায় কি এখনও রোজ গোলমাল হয়?

হরনাথ ঃ না— মানে—ঠিক তা নয়। বেশ কিছুদিন গণ্ডগোল তো বন্ধই ছিল। প্রভুরা গদিতে বসার পর অন্য সবাইকে গণতান্ত্রিক উপায়ে পাড়া ছাড়া করেছিলেন— তা'তে অবশ্য বেশ কিছুদিন চুপচাপই ছিল। ইদানীং আবার--

সুকুমার ঃ কেন?

হরনাথ ঃ (ম্লান হেসে) কেন আবার? নিজেদের ভেতর খেয়োখেয়ি। যে ছেলেগুলোকে চাকরির লোভ দেখিয়ে হাতে বোমা-পাইপগান তুলে দিয়েছিল, এখন তারাই বেঁকে বসেছে।

সুকুমার ঃ (হাসে) অবস্থা তাহলে ভালোই কী বলেন?

হরনাথ ঃ মানে?

সুকুমার ঃ ফাটল ধরেছে দেখছি— আবার নামা যেতে পারে— কী বলেন?

হরনাথ ঃ (থেমে থেমে) বুঝলাম না। কী বলতে চান আপনি?

সুকুমার ঃ মানে একবার ঘা খেয়েছি, পিছিয়ে পড়েছি হয়তো, তবু আবার—

হরনাথ ঃ রাস্তায় গুলি খেয়ে প'ড়ে থাকবে জোয়ান বয়েসী ছেলেরা— জেলে জেলে খুন শুরু হবে—- আবার বারাসাত-বেলেঘাটা-জোড়াবাগান-বরানগর-কাশীপুর— সারা রাস্তা লালে লাল হয়ে যাবে— অথচ আকাশের গায়ে লাগবে না একটুও লালচে আভা— একটুও রক্তের ছিটে— নিজেরই যৌবনের রক্তে গোড়ালী ডুবিয়ে আমরা আবার হরিনাম করবো—

সুকুমার ঃ (বিস্ময়ে) কী বলছেন আপনি?

হরনাথ ঃ আমরা বেশ আছি, বেশ আছি সুকুমারবাবু— কেন, কেন আমাদের নিয়ে মাথা ঘামান আপনারা, কেন আমাদের ভালো করার জন্যে আপনাদের চোখে ঘুম নেই বুঝি না। আমরা তো ভালোই আছি, বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটছে আমাদের। দ্যাখেননি পুজোর সময় কোলকাতার রাস্তায় আলোর ফোয়ারা— যৌবনোচ্ছল তরুণ-তরুণীর ঘনিষ্ঠ প্রেমালাপ—

সুকুমার ঃ হরনাথবাবু—

হরনাথ ঃ আমার ছেলে মারা গেছে, সেজন্যে বলছি না— মনেও তো পড়ে না ওকে কখনও, থানার ভেতরে পিটিয়ে পিটিয়ে আমার ছেলেকে যখন খুন করলো, তখনও তো আমি পাগল হইনি, বাজার-হাট করেছি, বৌয়ের সঙ্গে খেস্তা খিস্তি করেছি, আর পাড়ার লোককে বলেছি, আমার ছেলে গলায় দড়ি দিয়েছিল— একটুও আটকায়নি আমাদের গড়িয়ে গড়িয়ে চলা জীবনে— বিশ্বাস করুন আপনি— তবে কেন— কেন আমাদের ভালো করতে নিজের জীবনটাকে বাজী ধরছেন—

সুকুমার ঃ এসব কী বলছেন?

হরনাথ ঃ আবার— আবার আপনারা সেই দিনগুলোকে আনতে চাইছেন? আবার হাজার হাজার মায়ের বুক খালি ক'রে রাজনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চাল চালা শুরু হবে? আমি— আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিই, আপনাকে মেরে ফেলা উচিত— এখুনি— এই মুহূর্তে—

সুকুমার ঃ (মুচ্‌কি হেসে) উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন বড়—

হরনাথ ঃ আমরা শান্তি চাই সুকুমারবাবু— রুটির থেকেও শান্তি আমাদের কাছে বড় । দোহাই আপনাদের— এখন তবু একটু নিশ্চিন্তে থাকতে পারছি— কাল হাঁড়ি চড়বে কি-না এই চিন্তা পিষে মারে বটে, তবে ছেলে হারাবার ভয়টা নেই। (ম্লান হেসে) আমার অবশ্য সে ভয় আর কোনোদিন হবে না।

সুকুমার ঃ (প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়) এখন আপনারা ক'জন সংসারে? মানে আপনার স্ত্রীকে তো দেখলাম, আর ঐ একটাই মেয়ে?

হরনাথ ঃ মেয়ে কোথায়? ও তো ছেলের বৌ আমার। একটাই ছেলে— মানে একটাই সন্তান— অবশ্য একটা পাস্ট টেন্স বসাতে হবে।

[ক্রমশ নিরেট স্তব্ধতা গ্রাস করে। হঠাৎ খুব কাছেই যেন বোমার আওয়াজে ওরা চমকে ন'ড়ে ওঠে]

সুকুমার ঃ এটা কেন ফাটলো?

হরনাথ ঃ কী?

সুকুমার ঃ এখন তো আমরা প্রায় শেষ— তবে এই বোমাটা কেন?

হরনাথ ঃ কী বলছেন?

সুকুমার ঃ আপনার পাড়ার গণ্ডগোলটা কেন? আমরা তো নেই। (হরনাথ মাথা নিচু করেন) শান্তি কি এত সহজে আসে হরনাথবাবু? রুটি ছাড়া শান্তি কি আসে?

[বিমলার প্রবেশ]

বিমলা ঃ রাত তো বাড়ছে, খেয়ে নিলেই হয়। আমি ছুটি পাই।
হরনাথ ঃ চলুন সুকুমারবাবু গরীবদের ঘরে যা জোটে—
সুকুমার ঃ আমি? আমি আবার কেন?
হরনাথ ঃ ফর্মালিটি তো মধ্যবিত্তের একচেটিয়া সম্পত্তি জানতাম। আপনারাও তার শিকার কবে থেকে হলেন?
সুকুমার ঃ না— মানে— সেজন্যে নয়— এই বাজারে একজনকে মিছিমিছি খাওয়ানো—
হরনাথ ঃ মিছিমিছি কোথায়— খাওয়া যে আপনাদের কেমন জোটে তা কি জানি না?
বিমলা ঃ আর আপনার জন্যে তো নতুন রান্না হয়নি। তিনজনের খাবার চারজনে ভাগ ক'রে খাওয়া হবে।
সুকুমার ঃ সে কী! আমার জন্যে আপনারা কষ্ট করবেন কেন? এ হয় না।
হরনাথ ঃ খুব ভদ্রতা দেখিয়েছেন— আর নয়। যাও— জোগাড় করো গিয়ে— ভাববেন না আপনাদের প্রতি ভালোবাসায় খাওয়াচ্ছি, কিচ্ছু না— শুধু মধ্যবিত্তের মানবতা!
বিমলা ঃ (যেতে যেতে) সে ছুঁড়ি গেল কোথায়?
হরনাথ ঃ (গম্ভীর) বাবলুর মা ডেকেছে।
[বিমলা 'হুঁ'ঃ ব'লে চলে যায়]
সুকুমার ঃ আপনার ছেলে কবে মারা যান? কী নাম যেন?
হরনাথ ঃ (উদাস) প্রায় বছর দেড়েক হ'তে চললো। রমেন। রমেন বিশ্বাস।
সুকুমার ঃ বৌ বাপের বাড়ি যেতে চায়নি?
হরনাথ ঃ (একইভাবে) কে আছে আর আমরা ছাড়া?
সুকুমার ঃ (হাসার চেষ্টা) আপনাদেরও অবশ্য উনি ছাড়া—
[বেগে কেয়ার প্রবেশ]
কেয়া ঃ সর্বনাশ হয়েছে বাবা!
হরনাথ ঃ (আতঙ্কে) কী? কী?
কেয়া ঃ বাবলুর মা বললো— মানে ও শুনতে পেয়েছে— কারা সব যেন বলাবলি করছিল— আমাদের বাড়িতে কে একটা অপরিচিত লোক না-কি ঢুকেছে—
হরনাথ ঃ বলিস কী রে?
কেয়া ঃ ওরা বোধহয় সার্চ করতে আসবে। ঐজন্যেই ডেকেছিল বাবলুর মা।
সুকুমার ঃ আমি বেরিয়ে যাই তাহলে—
কেয়া ঃ উপায় নেই। উপায় নেই। অনেক আগে থেকেই পাড়াটা ঘিরে ফেলেছে।

হরনাথ : না, না, এভাবে বাইরে বেরিয়ে আমাদের বিপন্ন করবেন না। নিজেও ধরা পড়বেন— আমাদেরও বাঁচার উপায় থাকবে না।

কেয়া : কী হবে বাবা?

হরনাথ : ভাবছি, ভাবছি—

সুকুমার : (ম্লান হেসে) আমার জন্যেই আপনাদের— আমি তো মৃত্যু জেনেই বেরিয়েছি, তবু মিছিমিছি আপনাদের—

হরনাথ : ঠিক আছে, ঠিক আছে, এসব না বললেও আমরা বুঝবো আপনি কত ভদ্র-সভ্য— ভাবতে দিন, ভাবতে দিন।

[বিমলার প্রবেশ]

বিমলা : ভাত বেড়েছি, চলো। (সবাই নির্বাক, নিস্পন্দ) কী হলো?

কেয়া : ওরা খবর পেয়ে গেছে, সার্চ হবে।

বিমলা : কী? (হঠাৎ উত্তেজিত) তোর জন্যে, সব তোর জন্যে—

কেয়া : মা!

হরনাথ : বিমলা! আবার?

বিমলা : কেন নয়? ঐ ছুঁড়ির জন্যেই তো এই ঝামেলা।

হরনাথ : কী বলছো?

বিমলা : ও ছিল ব'লেই তো লোকটা ঢুকতে পেলো।

হরনাথ : কী যা-তা বলছো?

বিমলা : ঝামেলা যখন পাকালিই তখন শেষটা তুই-ই সামলা। তোর জন্যে আমরা সবাই ভুগবো কেন?

কেয়া : আমি কী করবো?

বিমলা : কেন? আমি কিছু জানি না ভেবেছিস? ঐ গুণ্ডাদের সঙ্গে তোর তো আজকাল দারুণ দহরম মহরম।

হরনাথ : তোমার কী মাথা খারাপ হলো? কী বলছো আজেবাজে।

বিমলা : থামো। তুমি কী জানো, কতটা খবর রাখো পাড়ার? ঐ ওকেই জিগ্যেস করো না— অঘোরবাবুর সঙ্গে ওর কীসের এত গলাগলি।

হরনাথ : অঘোরবাবু!

বিমলা : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এ পাড়ার এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যিনি।

[প্রস্থানোদ্যত। অমিয় ছুটে ঢোকে]

অমিয় : মাসিমা— ওপনিংয়ে নাইন ফাইভে খেলেছি, ক্লোজিংয়ে—

হরনাথ : অমিয়— তুমি কাউকে কিছু বলেছো?

অমিয় : কীসের?

বিমলা : আমাদের বাড়িতে যে এই ভদ্রলোক এসেছেন— এ কথা কাউকে বলোনি তো? কেউ জানে না তো?

অমিয় : না না— মাথাখারাপ!

হরনাথ : তবে খবরটা ছড়ালো কেন?

অমিয় : কীসের খবর? না না— আমি কিছু জানি না।

হরনাথ : তুমি ছাড়া আর তো কেউ দ্যাখেনি ওকে অমিয়।

অমিয় : মাসিমা, আপনি আর ক্রোজিংয়ে খেলবেন না তো? আচ্ছা— আমি চলি। [প্রস্থান]

হরনাথ : এবার যদি আমি বলি বিমলা, ঝামেলাটা তুমিই পাকালে?

বিমলা : কী বলছো কী?

হরনাথ : খবরটা তো অমিয়ই দিয়েছে দেখছি।

বিমলা : না, না, যাঃ, সে কী ক'রে হয়!

হরনাথ : হয়— হয়, অঙ্কের নিয়মেই হয়— দুয়ে দুয়ে চার।

বিমলা : (ঝাঁঝে) যদি তা-ই হয়, তাতে আমার কী দোষ? আমি কি ওকে বলতে বলেছি?

হরনাথ : (চিবিয়ে চিবিয়ে) অমিয়র মতো একটা লোফার ছেলে এ বাড়িতে যখন তখন ঢোকার সাহস কোত্থেকে পায় বিমলা?

বিমলা : বটে? তা তো বলবেই— কোথাও কিছু নেই— এখন বৌ শালাকে ধর্। আমি যদি এতই চক্ষুশূল তোমার— বললেই হয়— পথ দ্যাখো। ছেলে তো গেছে— এখন ছেলের মাকে তাড়িয়ে ছেলের বৌকে নিয়ে সুখে থাকো! [প্রস্থান]

হরনাথ : (ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে ধরতে যান—) বিমলা— এতদূর নোংরামি—

কেয়া : বাবা— বাবা— কী করছেন?

[বাইরে গাড়ির আওয়াজ]

সুকুমার : একটা গাড়ি বোধহয় থামলো।

কেয়া : (উঁকি মেরে) একটা জীপ। ওরা এসে পড়েছে!

হরনাথ : কী করা যায়— কী করা যায় এখন?

কেয়া : (দেখতে দেখতে) অঘোরবাবু!

সুকুমার : কে? কে বললেন?

হরনাথ : আপনি যান— পাশের ঘরটায় ঢুকুন। আঃ— তাড়াতাড়ি যান, বিপদে ফেলবেন না আমাদের। আমি দেখি, কী করা যায়।

কেয়া : আপনিও চ'লে যান বাবা।

হরনাথ : কে? আমি?

কেয়া : হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি যান। যা সামলাবার, আমিই সামলাচ্ছি!

হরনাথ : (স্তম্ভিত) তুমি!

কেয়া ঃ হ্যাঁ! আমাকেই তো সামলাতে হবে। ঝামেলাটা আমিই তৈরি করেছি কি-না।

হরনাথ ঃ কেয়া, পাগলামি কোরো না। এখন মান-অভিমানের সময় নয়।

কেয়া ঃ কিছু পাগলামি নয় বাবা। অঘোরবাবু আসছেন যে!

হরনাথ ঃ অঘোরবাবু!

কেয়া ঃ হ্যাঁ— ওঁকে আমি বুঝিয়েসুজিয়ে ফেরৎ পাঠাতে পারবো বোধহয়।

হরনাথ ঃ অঘোরবাবু!

কেয়া ঃ যান— ও ঘরে ঢুকে পড়ুন দু'জনে।

[দু'জনের প্রস্থান। ক্ষণ পরে তিন সহচর সহ অঘোরবাবুর প্রবেশ]

অঘোরবাবু ঃ আরে কেয়া যে— কী কাণ্ড দ্যাখো, অ্যাঁ?

১ম সহচর ঃ কোন্ বাঞ্চোৎ লুকিয়ে আছে, বের ক'রে দিন।

কেয়া ঃ (উচ্ছল হেসে) কী ব্যাপার— হঠাৎ এমন আবির্ভাব? আজকাল তো আপনার দেখাই পাওয়া যায় না। (ঠোঁট ফুলিয়ে) আর আমাদের কাছে আসবেন কেন, বলুন?

অঘোরবাবু ঃ না, না, সেজন্যে নয়— দ্যাখো— এই দ্যাখো— আবার মুখ ভার করছো—

কেয়া ঃ আমরা তো গরীব, রূপ গুণ বিদ্যে কিছুই নেই আমাদের। আমাদের দিকে আর তাকাবেন কেন আপনি— বলুন?

অঘোর ঃ এই দ্যাখো— এভাবে বললে যে আমি মনে বড় কষ্ট পাই কেয়া—

১ম সহচর ঃ (দ্বিতীয়কে) শালা দারুণ পটিয়েছে তো!

২য় সহচর ঃ মাগীটাও খানদানী!

কেয়া ঃ তা হঠাৎ এমনভাবে এসে হাজির হলেন যে? এমন অসময়ে?

অঘোর ঃ তোমার কাছে আসবো তাতে আবার সময়-অসময় কী?

কেয়া ঃ আহা হা! কতই যেন আসেন! দেখা হ'লেই আপনার শুধু মিষ্টি মিষ্টি মন ভুলোনো কথা— অন্য সময় তো মনেও থাকে না।

অঘোর ঃ দ্যাখোদিকি— কী আশ্চর্য— তুমি কি বোঝো না কেয়া— এভাবে কথা বললে আমার দারুণ মন খারাপ হয়।

কেয়া ঃ (খিলখিলিয়ে হেসে) থাক্, তাহলে আর মন খারাপ করতে হবে না। তা হঠাৎ এলেন যে? চারদিকে এত গণ্ডগোল— আপনারা কী বলুন তো— বেশ ছিলাম, কোনো গণ্ডগোল ছিল না এতদিন— আবার ঝামেলা শুরু হলো— আপনারা এখনও ঠাণ্ডা করতে পারছেন না ওদের? —আমার ভীষণ বিশ্রি লাগে রোজ রোজ এই উৎপাত—

অঘোর : দেবো— একেবারে টিট্ ক'রে ছেড়ে দেবো এবার— কোনো ভয় নেই তোমাদের— শালা চীনের দালালদের পিণ্ডি চট্‌কে....

১ম সহচর : লাস ফেলে দেবো শালা খান্‌কির বাচ্চাদের—

২য় সহচর : (তৃতীয়কে) কী রে, তুই যে চুপ মেরে রইলি, পুরোনো পীরিত মনে সুড়সুড়ি দিচ্ছে— না?

১ম সহচর : কার বে?

২য় সহচর : এই যে শালা তাহেরের। ও তো আগে আবার—

১ম সহচর : ওসব পুরোনো কথা ভুলে যা গুরু, এখন লয়া যুগ— লয়া হালচাল।

কেয়া : তা হঠাৎ কী ভেবে? আমাকে খবর দিলেই তো আমি—

অঘোর : না, মানে— এই এলাম একটু—

কেয়া : এইসব সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে? না-না, ব্যাপারটা আমার ভালো মনে হচ্ছে না।

অঘোর : না— মানে— ব্যাপারটা হলো উড়ো খবর একটা—

কেয়া : উড়ো খবর!

অঘোর : হ্যাঁ— মানে আমি অবশ্য ঠিক বিশ্বাস করিনি— তোমরা তো এখন আর কোনো ঝামেলাতেই থাকো না— তবু মানে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে—

কেয়া : কী ব্যাপার বলুন তো? শুনেই আমার ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সিঁটিয়ে যাচ্ছে— কী ঘটলো আবার?

অঘোর : একটা লোক না-কি তোমাদের বাড়িতে সেণ্টার নিয়েছে?

কেয়া : (আকাশ থেকে পড়ে) আমাদের বাড়িতে! একটা লোক!

অঘোর : হ্যাঁ— মানে কে যেন বললো— ও হ্যাঁ— থাক্, ওটা সিক্রেট ইনফরমেশন—

কেয়া : আপনার যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয়— তবে আর কী করা— বাড়িটা সার্চ ক'রে দেখুন!

১ম সহচর : চল্ শালা— একটু ঘুরেঘারে দেখি— মাল ক্যাচ হয় কি-না!

অঘোর : দাঁড়াও! ....তুমি সত্যি বলছো কেউ আসেনি?

কেয়া : বললাম তো— বাড়িটা খুঁজে দেখুন—

অঘোর : না, না, তোমার কথায় অবিশ্বাস— তোমার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা? তাই ভাবছিলাম কিছু হ'লে কি আর তুমি আমায়..... (চিন্তিত) কিন্তু কথাটা উঠলো কেন? সত্যিই কি কেউ আসেনি— মানে ঐ গণ্ডগোলের সময়—

কেয়া : গণ্ডগোলের সময়? (ভেবে) হ্যাঁ, একটা লোক এসেছিল বটে—

অঘোর : এসেছিল!

কেয়া : হ্যাঁ— কোথায় যেন মারধোর খেয়েছে— বলছিল— একটু থাকতে দিন—

অঘোর : কীরকম দেখতে বলো তো?

কেয়া : অতটা দেখিনি— তবে পাঞ্জাবী-পায়জামা পরা, পাতলা মতন—

অঘোর : সেই লোক! তুমি কী করলে—

কেয়া : আমি আবার কী করবো— দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম মুখের ওপর, আমি কোনো গোলমালে নেই বাবা— আমার দরকার কী?

অঘোর : ঠিক করেছো! কোন্ দিকে গেল বলো তো?

কেয়া : তা দেখিনি। ....কে লোকটা? আপনারাই-বা হঠাৎ—

অঘোর : এখনও জানা যায়নি— তবে সন্দেহ হচ্ছে— বড় একটা চাঁই কেউ হবে—

কেয়া : বাবাকে ডাকবো?

অঘোর : কেন?

কেয়া : বাবাকে কিছু জিগ্যেস করবেন?

অঘোর : দরকার নেই। —আচ্ছা ডাকো তো!

কেয়া : বাবা—

১ম সহচর : যাস্ শালা— চিড়িয়া ভাগল্বা!

৩য় সহচর (তাহের) : শুধু শুধু এলাম।

২য় সহচর : তাতে তো তোর খুশি হবারই কথা রে।

তাহের : কী?

২য় সহচর : এখনও তো মনে মনে তোর—

১ম সহচর : এ্যাই চুপ! ওকে শালা ফাঁসাচ্ছিস কোন? অঘোর শালা শুনতে পেলে—

[হরনাথের প্রবেশ]

হরনাথ : কী ব্যাপার কেয়া মা? ....আরে অঘোরবাবু যে— নমস্কার, নমস্কার।

অঘোর : নমস্কার। একটা বিশেষ প্রয়োজনে—

কেয়া : বাবা— এঁরা বলছেন আমাদের বাড়িতে না-কি একটা গুণ্ডা লুকিয়ে আছে।

হরনাথ : আমার বাড়িতে? অসম্ভব।

কেয়া : আমি এঁদের বললাম— বাড়িটা সার্চ ক'রে দেখতে।

হরনাথ : বেশ তো দেখুন না! আপত্তির কী?

অঘোর ঃ না, না, ঠিক আছে। আপনার কথাই যথেষ্ট।

হরনাথ ঃ আপনার সন্দেহ থাকলে অবশ্য—

অঘোর ঃ দরকার নেই।

হরনাথ ঃ (তাহেরকে) তুমি আমাদের বাড়ি আগে আসতে না? খোকার কাছে?

অঘোর ঃ (হেসে) হ্যাঁ— আগে ও আপনার ছেলের খপ্পরে পড়েছিল। এখন অবশ্য ভুল বুঝতে পেরেছে। আচ্ছা চলি। কেয়া— তুমি কাল.... না, কাল ব্যস্ত আছি. পরশু সন্ধেবেলায় দেখা কোরো। হরনাথবাবু— যদি বুঝি— আপনারা মিথ্যে কথা বলেছেন— অবশ্য সে সন্দেহ করি না, তবু যদি— মানে worseটাই — বুঝতেই তো পারেন— আমার খুব একটা সুনাম নেই— আচ্ছা কেয়া, চলি কেমন? (তাহেরকে দেখিয়ে) মজুররা আজকে ভুল বুঝতে পেরে আমাদের সঙ্গে এসেছে— জয় আমাদের হবেই— কী বলেন?

[অঘোরবাবুর সাঙ্গোপাঙ্গোসহ প্রস্থান]

কেয়া ঃ শয়তান— মূর্তিমান শয়তান সব!

হরনাথ ঃ ভুল বুঝতে পেরেছে, হুঁ। শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে—

কেয়া ঃ সুকুমারবাবু ও ঘরেই তো?

হরনাথ ঃ খাচ্ছে। ....দেখে মনে হলো রেগুলার খাওয়াদাওয়াও জোটে না! মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা কেমন.... না, না, ওদের প্রতি সিম্প্যাথী দেখানোও অন্যায়— আবার কোন্ ঘরের ছেলেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে সংসারটাকে ভাসিয়ে দেবে।.... নেহাৎ এসে পড়েছে ব'লেই একটু ভদ্রতা করা! তবু বুঝলি কেয়া— মাঝে মাঝে না এমন হয়— ঠিক তোকে, এতগুলো ছেলে মরলো—

কেয়া ঃ বাবা!

হরনাথ ঃ খোকার কথা তোর মনে পড়ে না একদম? অমন একটা জলজ্যান্ত জোয়ান ছেলে— কত আশা ছিল আমার— থাক্ থাক্, না ভাবাই ভালো, না ভাবাই মঙ্গল, ভুলে যাওয়াই উচিত— ভুলে না গেলেই সর্বনাশ— বুকের ফোকরে ফোকরে আগুনের হল্কা— কিছু করতেও পারি না—

কেয়া ঃ আপনি খেয়েছেন বাবা?

হরনাথ ঃ না। পরে খাবো। ....কেন এমন হলো বল্ তো? কেন? ....খোকাকে যখন বাড়িতে নিয়ে আসে কালো ভ্যানে ক'রে— মনে আছে

তোর? ....ঐ মুখটা মনে পড়লেই মাথার ভেতরটায় কেমন—

কেয়া ঃ (যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে ওঠে) বাবা— আপানি খেয়ে আসুন, যান!

হরনাথ ঃ যাই। মাঝে মাঝে এমন বিশ্রি লাগে—

[প্রস্থান। কেয়া চিত্রার্পিতের মতো ব'সে থাকে। সুকুমার ঢোকে]

সুকুমার ঃ আপনার সঙ্গে তো ওদের দারুণ খাতির!

কেয়া ঃ (ছিটকে ওঠে) কী? কী বললেন?

সুকুমার ঃ কিছু না! পাশের ঘর থেকে কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম কি না!

কেয়া ঃ (তীব্র শ্লেষে) বটে! বুকটা একদম ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল বুঝি?

সুকুমার ঃ কী বললেন?

কেয়া ঃ আহা একটা বিধবা মেয়ে থান কাপড় প'রে চুল ছেঁটে হাতে গোবরজলের বালতি নিয়ে হরিনাম ক'রে ঘুরে না বেড়িয়ে চোখের সামনে একদল পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে— এ কী প্রাণে সয়!

সুকুমার ঃ (ধমকে) কী যা-তা বলছেন— সেকথা বলিনি।

কেয়া ঃ সংস্কার! জন্মজন্মান্তরের সংস্কারগুলো এত সহজে কি উপড়ে ফেলা যায় সুকুমারবাবু?

সুকুমার ঃ কেন আজেবাজে বকছেন— এসব কথা ওঠে কী ক'রে?

কেয়া ঃ কেন উঠবে না বলুন, আপনি ওঠালেই ওঠে। আমার পরমারাধ্যা শাশুড়ি যেমন—

সুকুমার ঃ (চেঁচিয়ে) থামুন। আপনার শাশুড়ি যে দৃষ্টি থেকে—

কেয়া ঃ দৃষ্টিটা না হয় আলাদা, মানলাম। কিন্তু বক্তব্য? ইঙ্গিত?

সুকুমার ঃ সেটাও আলাদা। ওদের সঙ্গে আপনার এই প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতাই আমাকে অবাক করেছে। জানি— ব্যাপারটা আপনার নিজস্ব, ব্যক্তিগত, কিন্তু তবু অন্য কারুর সঙ্গে আপনার যা খুশি থাক্, যদিও বলাটা অশোভন—

কেয়া ঃ তবে বলছেন কেন?

সুকুমার ঃ কৌতূহলটা দাবিয়ে রাখা যাচ্ছে না যে, ওদের মতো ঘৃণ্য জীবগুলোর সঙ্গে—

কেয়া ঃ আমার যে খাতির— তা না থাকলে— যে, মহাশয় বিপ্লবী— এতক্ষণে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে প'ড়ে থাকতেন প্রকাশ্য রাজপথে—

সুকুমার : সেটাই তো আমার লজ্জা! একজন বীর শহীদের স্ত্রী আপনি— আপনি যদি ঐ খুনীদের সঙ্গে—

কেয়া : থামুন, থামুন। যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছেন। চিরটাকাল শুধু জ্ঞানই শুনে এলাম। সেই একজনও তো কত বড় বড় কথা বলতো— আদর্শ! আদর্শের জন্য না-কি সবকিছু ছাড়া যায়, সব। হুঁ! সেদিন না-কি আর বেশি দূরে নয়— যেদিন ....যত্তসব বুজরুক! নীতি! আদর্শ! ঐ খুনীদের কৃপাদৃষ্টি না পেলে অতবড় একটা চীনের চরের মা-বাপ-বৌ একদিনও থাকতে পারতো এই পাড়ায়—

সুকুমার : সেজন্যে আপনি একবারও ভাবলেন না— কার স্ত্রী আপনি—

কেয়া : বাঁচাটা বড় দরকার যে সুকুমারবাবু। আমাদের যে খেয়ে-প'রে বাঁচতে হয়। এই চাকরিটা যদি ওরা না জুটিয়ে দিতো তবে কোথায় দাঁড়াতে হতো জানেন? বাবা তো অনেকদিন রিটায়ার করেছেন। একা ওর আয়ে সংসার চলতো! এখন কী হতো? বুড়ো-বুড়ি কার দরজায় দাঁড়াতো? উত্তর দিন। অবশ্য ওরা বিনা প্রতিদানে কোনো উপকারই করেনি। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিয়েছে। এখনও নেয়। আমরা প'চে গেছি— ধ্ব'সে গেছি সুকুমারবাবু। আদর্শ ধুয়ে জল খেলে আমাদের চলে না; প্রতিমুহূর্তে বাঁচবার জন্যে— শুধু খেয়ে-প'রে বাঁচবার জন্যেই যাদের লড়তে হচ্ছে....

[বিমলার প্রবেশ]

বিমলা : এবার তুমি খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করো।

সুকুমার : হরনাথবাবুর খাওয়া হয়েছে?

বিমলা : প্রায়। ....যাও তুমি, আমাকে দয়া করো একটু। দিন রাত তোমাদের ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে আমার—

কেয়া : আমাকেও খাটতে হয় মা। পরের বেগার খেটেই এ সংসার চালাতে হয় আমাকে।

বিমলা : সে খাটা যে কী— সে আর আমি বুঝিনে বাছা? কার চোখে ধুলো দিবি তুই— পাড়াশুদ্ধু যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে—

কেয়া : মা, এবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, আমার সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে— একটা বাইরের লোকের সামনে—

বিমলা : কী? কী করবি তুই? তোর এতবড় সাহস মুখে মুখে আবার চোপা করিস— ভেবেছিস কী, ভেবেছিস কী তুই— হতচ্ছাড়ী মাগী শয়তানী—

কেয়া : মা! জ্ব'লে-পুড়ে আমিও খাক্ হয়ে যাচ্ছি। নিজের সাধ-আহ্লাদ সব কিছু ঘুচিয়ে তোমাদের জন্যেই দুটো পয়সার ধান্দায় ঘুরি—

বিমলা ঃ থু-থু-থু। তোর পয়সার মুখে আগুন.... কী বেচে পয়সা আনিস তা আর বড় মুখ ক'রে বলিস না— বেশ্যাবৃত্তির টাকায় অত গুমোর—

কেয়া ঃ সেই বেশ্যার টাকাগুলো হাত পেতে নিতে তো লজ্জা হয় না, বেশ্যার রোজগারে ভাত মুখে তুলতে তো বিবেকে আটকায় না—

বিমলা ঃ (ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গিয়ে চড় মারে) তোর এত গুমোর বেড়েছে যে ভাতের খোঁটা দিস—

[হরনাথ ছুটে প্রবেশ করেন]

হরনাথ ঃ (তীব্র যন্ত্রণায়) বিমলা!

বিমলা ঃ দ্যাখো— তোমার আহ্লাদীর কথা শোনো— দুটো পয়সা রোজগার করে ব'লে আমাদের খাওয়ার খোঁটা দেয়!

হরনাথ ঃ সব শুনেছি আমি। সব। সবকিছুর মূলে তুমি— তোমার জন্যেই—

বিমলা ঃ তাই তো— তাই তো বলবে এখন— নিজের পেটের ছেলের অসম্মানটা মা'র বুকে কোথায় লাগে— তা তো তুমি বুঝবে না। নিজে মৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নাড়ি ছিঁড়ে যাকে পৃথিবীতে এনেছিলাম— সে আমার আগেই দুনিয়া ছেড়ে চ'লে গেল— আর তারই বৌ, আমারই চোখের সামনে, যখন তার কথা ভুলে অন্যের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করে, তখন আমার মনের ভেতরটায় কী আগুন জ্বলে সে তুমি বুঝবে কেমন ক'রে—

হরনাথ ঃ বিমলা!

বিমলা ঃ জানি— জানি, সেই মেয়ে রোজগার ক'রে আনছে ব'লেই হাঁড়ি চড়ছে আজ— সেইজন্যেই ছেলের রোজগেরে বৌয়ের ওপর তোমার এত দরদ— আর সেইটাই আমার অপমান— আমার লজ্জা—

[কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্য]

সুকুমার ঃ মাসিমা— আমার বলা ঠিক নয়— মানে একটা অপরিচিত লোক আমি— তবু না ব'লে পারছি না— যদি একটু সহ্য ক'রে চলেন পরস্পরকে, একটু যদি মানিয়ে নেন— আপনাদের সবারই তো দারুণ কষ্ট, যন্ত্রণা জ'মে জ'মে পাহাড়— একটু যদি সহ্য ক'রে চলেন—

বিমলা ঃ সহ্য? আর কত সহ্য করবো আমি? ও যদি অন্য কারুর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করতো, দুঃখ হতো আমার— কিন্তু তবু জানতাম, এটা স্বাভাবিক— কী-ই-বা বয়েস ওর— ভরা যৌবন এখন—

এত কম বয়সে কপাল পুড়লো— একটা ছেলেপিলেও নেই। কী নিয়ে কাটাবে ও এইসব দিনগুলো—

কেয়া ঃ (বিস্মিত আনন্দে) মা!

বিমলা ঃ কিন্তু এটা কী? ও অঘোরদের সঙ্গে কেন মেলামেশা করবে? ঐ অঘোরই তো খোকাকে ধরিয়ে দিয়েছে— ও-ই তো পুলিশ-ভ্যানে ব'সে আমাদের বাড়ি এসেছিল— এ পাড়ার জোয়ান ছেলেগুলোকে ও-ই তো খুন করিয়েছে, জেলে পুরিয়েছে— ঐ নোংরা কুকুরটার সঙ্গে আমার ছেলের বৌ ঘুরে বেড়াবে— আর তাই দেখে মহানন্দে নেচে বেড়াবো আমি? আমি না মা! আমার মরা ছেলের গায়ে কালি ছিটোলে সহ্য করবো আমি?

কেয়া ঃ (কেঁদে ফেলে) তোমাদের জন্যে মা গো— শুধু তোমাদের জন্যে— বাবা যখন এই বুড়ো বয়সেও লোকের দোরে দোরে ঘুরছেন চাকরির জন্যে, তুমি যখন লোকের বাড়ির মুড়ি ভেজে দিয়ে পয়সা রোজগার করছো— কী করবো আমি তখন— শুধু তোমাদের জন্যেই— যৌবন ছাড়া আর কী আছে আমার—

বিমলা ঃ (হরনাথকে) তোমাকেও আমি ঘেন্না করি আজ মনে-প্রাণে! একটা ভীরু, কাপুরুষ জন্তু! ওরা যখন বললো— তোমার ছেলে থানায় গলায় দড়ি দিয়েছে— তুমি তার কোনো প্রতিবাদ করেছিলে? চাকরির ধান্দায় ওদেরই পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়োনি? থানায় গিয়ে ব'লে আসোনি— ছেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল না অনেকদিন? এই বাপ তুমি!

হরনাথ ঃ ঠিক, সব ঠিক, বিমলা। সবকিছু এই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আমরা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি সব জেনে নেওয়া দরকার। লুকিয়েচুরিয়ে আড়াল দিতে দিতেই জেরবার হয়ে গেলাম আমরা। আর কত জোড়াতালি দিয়ে চলবো? ফাটল ধরেছে পুরো বাড়িটায়— আর কি পলেস্তারায় কাজ হয়? তুমিও কম যাও না বিমলা!

বিমলা ঃ আমি?

হরনাথ ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি! ছেলের শোকে তো একদম উন্মাদ তুমি, তাই বোধহয় ভদ্রঘরের বৌ হয়ে জুয়ো খেলতে শুরু করেছো— সাট্টা!

বিমলা ঃ (কেয়াকে) তুই— তুই লাগিয়েছিস একথা!

হরনাথ ঃ ও কেন লাগাবে? আমি কি বোকা— অন্ধ? কিচ্ছুই বুঝি না? অমিয় কেন ঘন ঘন আসে— কীসের টানে, কিচ্ছুই বুঝি না?

বিষ! বিষিয়ে গেছে সব! এর মধ্যে কী ক'রে আর লড়বেন সুকুমারবাবু—

বিমলা : হ্যাঁ হ্যাঁ— খেলি, বেশ করি। কেন বোঝো না? টাকার দরকার নেই আমাদের? যে টাকার জন্যে ঐ হতচ্ছাড়ী মেয়ে আমার ছেলের মান-মর্যাদাকে বিক্রি ক'রে আসছে— আর তুমিও শুধু ক'টা টাকার লোভে দেখেও দেখছো না কিছু— দরকার নেই সেই টাকার? ....রোজই স্বপ্ন দেখি— আজকে নিশ্চয়ই একটা মোটা দাঁও মারতে পারবো, আর সব অভাব ঘুচে যাবে, আমার ছেলে বীরের সম্মানে আমার বুকে বাসা বাঁধবে— সব কলঙ্ক মুছে যাবে! হয় না— হয় না— শুধু হেরে যেতে হয়।

হরনাথ : বিমলা!

বিমলা : সব নষ্ট হয়ে গেছে— সব। মানুষ যা কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়— সব। ভেতরে ভেতরে সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে— কী নিয়ে আমরা আর বেঁচে থাকবো— কীসের জন্যে?

[তাহেরের দ্রুতবেগে প্রবেশ]

তাহের : ওরা আবার আসছে— পালান এক্ষুণি!

হরনাথ : (চমকে) কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ?

তাহের : সময় নেই একদম। (সুকুমারকে) আপনিই তো সেই লোক?

হরনাথ : তুমি ওদের দলেই তো ভিড়ে পড়েছো, আবার এখানে কী মনে ক'রে?

কেয়া : বেইমান!

তাহের : আমার কথা পরে হবে— আপনারা কি বুঝতে পারছেন না, বিপদ একেবারে মুখোমুখি—

বিমলা : আমার ছেলেকে তোরা খুন করেছিস— আবার কী মতলব ফেঁদে আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছিস— (আবার কয়েকটি বোমার আওয়াজ)

তাহের : দোহাই আপনাদের— এভাবে সময় নষ্ট করবেন না! ঐ দেখুন এসে পড়লো ব'লে।

সুকুমার : বলো তাড়াতাড়ি— তোমার কী বক্তব্য?

তাহের : আপনার নাম তো সুকুমার চৌধুরী?

সুকুমার : (রিভলবার বের ক'রে) কী ক'রে জানলে?

তাহের : ওটা নামিয়ে নিন। বলছি সব। আপনাদের দলের একটা ছেলেকে ধরেছে ওরা। সে-ই বলেছে আপনি এখানে মিটিং করতে এসেছেন। তার ওপর সেই অমিয়টা না কে যেন বেজন্মার বাচ্চা— এখান

থেকে ফিরে অঘোরদা ওকে ধরেছিল— ও বলেছে— আপনি নিশ্চয়ই এ বাড়িতেই আছেন।

সুকুমার : (স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখে) আমায় কী করতে বলো এখন?

তাহের : আমার সঙ্গে যেতে হবে।

হরনাথ : তোমার সঙ্গে? একটা দালাল! অসম্ভব।

তাহের : আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে আপনাদের। নয়তো মরতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সারা পাড়া ওরা ঘিরে ফেলেছে— ছুঁচ পর্যন্ত গলতে পারবে না। কিছুতেই বাঁচবেন না— যদি আমার সঙ্গে না আসেন।

সুকুমার : তোমার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে?

তাহের : এ বাড়ির পেছনের পাঁচিলটা টপকালেই মেথরদের যাওয়া-আসার একটা গলি পড়বে— সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবো দু'জনে। একটি বারের মতো বিশ্বাস করুন আমায়, ঠকবেন না। আপনাকে ঠিক এলাকার বাইরে বের ক'রে দেবো।

হরনাথ : যাবেন? •

সুকুমার : নিরুপায়। এখানে থাকলে বাঁচার তো কোনো আশাই নেই। তবু যদি ওর সঙ্গে বেরিয়ে—

কেয়া : তোমার অন্য কোনো মতলব নেই তো?

তাহের : আমি মজুর বৌদি, খোকাদার নামে দিব্যি কেটে বলছি—

বিমলা : থাক্, থাক্, আমার ছেলের নাম নিতে হবে না। কত দরদ আমার ছেলের ওপর জানাই আছে— ওর বিশ্বাসকে ধুলোয় লুটিয়ে যখন গুণ্ডাদের দলে ঢুকেছো—

তাহের : উপায় ছিল না মা। উপায় ছিল না। সবকিছু তো ভেঙেচুরে গেল, কেন হলো এমন জানি না। কী করবো আমি— ওরা হুমকি দিলো, ওদের সঙ্গে না ভিড়লে চাকরি থাকবে না— আমার অতবড় সংসার— সব না-খেয়ে মরতো— কী করবো? তখন আমি—

হরনাথ : এখন তাহলে হঠাৎ এঁকে বাঁচাতে এলে?

তাহের : মানুষের বিশ্বাসটা কি এতই ঠুনকো যে পাইপগানের ভয়ে ভেঙে যায়? খোকাদা বলেছিল— নতুন দিন আসছে— বদমাসের রক্তে হোলি খেলার দিন। —ভেবেছিলাম, সে আর আসবে না এ জীবনে, এভাবেই কেটে চলবে দিনগুলো— কিন্তু কী যে হলো আজ— ওরা যখন বলাবলি করলো— আপনার কথা, আপনি না-কি আবার চেষ্টা-চরিত্র করছেন— আবার গ'ড়ে উঠবে সব—

মাথার মধ্যে কী সব যেন হয়ে গেল— আপনাকে ওরা ধ'রে ফেলবে— আর কোনো আশা থাকবে না— ঠিক করলাম— কভি নেহি! —তাড়াতাড়ি চলুন, একদম হাতে সময় নেই!

সুকুমার : আমি চলি তাহলে?

বিমলা : এসো বাবা, দেখেশুনে যেও, সাবধানে থেকো।

হরনাথ : আমরা সব শেষ হয়ে গেছি সুকুমারবাবু— পারেন যদি আবার নতুন কিছুর জন্ম দিন— নতুন মানুষ—

সুকুমার : নতুন মানুষ তো আপনারাই— কমরেড! দুঃখে, শোকে, যন্ত্রণায় যে মানুষ ভেঙে পড়ে না, জিতবে তো সে-ই। সব আঘাত আর বিপর্যয় পেরিয়ে অন্ধকার চোরাগলি দিয়ে আজ যারা হেঁটে যাচ্ছে স্বপ্নের দেশের সন্ধানে, ভবিষ্যৎ তো তাদেরই। কয়েকটা মুহূর্ত— কয়েকটা মুহূর্ত আপনাদের সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়ে জীবনের এই সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা পেলাম কমরেড— মানুষ কখনও হারে না— কোনোদিন না।

তাহের : চ'লে আসুন শিগগির! দেরি করবেন না!

কেয়া : আমার সম্পর্কে কিছু বলবেন না? আমার সম্পর্কে একরাশ ঘৃণা বুকে নিয়ে ফিরে চললেন তো?

সুকুমার : না, কেয়া, না। পৃথিবীতে পবিত্রতার অন্য নাম যদি হয় আত্মত্যাগ, তবে তার তুমি উজ্জ্বলতম অগ্নিশিখা। যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই, তোমাকে মনে পড়বে অমলিন দূর নক্ষত্রের মতো। ঠিক এই মুহূর্তে তোমার স্বামী কমরেড রমেনের ওপর হিংসে হচ্ছে আমার।

[জীপের শব্দ]

তাহের : সর্বনাশ! ঐ এসে পড়লো। এত দেরি করেন আপনারা! চলুন কমরেড, আর এক মুহূর্ত নয়। আপনারা পারেন যদি— যতটা খুশি ওদের দেরি করিয়ে দিন!

[দু'জনের ছুটে প্রস্থান]

বিমলা : খোকা বলতো— মা গো, এত হতাশ হও কেন, দিন আসবেই দেখো! আজ নয় কাল। এত রক্ত, এত জীবন সে কি মিথ্যে হবে?

কেয়া : তোমার কথা তো আজকাল ভাবতে ভয় করে— মনটা একদম প'চে গেছে তো। কী ক'রে বেঁচে আছি— তুমি তো জানতেই পেলে না আর। মনে করতেও চাই না আর তোমায়, তবু কেন সুকুমার চৌধুরীরা হঠাৎ হাজির হয় নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের অন্ধ জীবনযাত্রায়, মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়

চারদিক— যদি আরেকটা জীবন পাওয়া যেতো, আরেকটা মন— নতুন, টাট্‌কা, সতেজ— তবে না হয়....

হরনাথ ঃ (দর্শকদের) দেখলেন তো সব,— না, না, বিশ্বাস করুন, এটা নেহাতই একটা পারিবারিক গল্পের নাটক— মোটেই রাজনৈতিক নয়, একটা প'চে যাওয়া খ'সে পড়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পরিবারের গল্প, যেখানে না-কি আজ দিনরাতের জোয়ার-ভাঁটায় কৃমিকীটের মতো মানুষ বেঁচে আছে। অন্ধকার, দারুণ অন্ধকার চারদিকে, আমরা কী করবো বলুন? কোন্‌দিকে যাবো? কোন্‌ পথে? তবু নাকি হঠাৎই এইসব অন্ধকার অরণ্যের গভীরে মাঝে মাঝে ছিট্‌কে পড়ে আগুনের গোলা— সুকুমার চৌধুরী কিংবা আমার ছেলে রমেন হঠাৎই আলোর ঝলকানিতে স্মৃতির কোন গোপন প্রদেশ থেকে অজ্ঞাত স্বপ্নের পাখিরা বেরিয়ে এসে ডানা মেলে দেয় আমাদের বিধ্বস্ত আকাশে— আমরা তখন কী করবো বলুন? আমাদের নিয়ম-মাফিক ধুঁকে ধুঁকে চলা জীবন কী ক'রে নিজের বৃত্তে ঘুরে মরবে আবার?— বলুন!

[বাইরে পদশব্দ]

ঐ দেখুন— ওরা আসছে। আমি এখন কী করবো বলুন? ওদের বাধা দেবো? আটকে রাখবো? তাই কি পারি আমি? আমার সে জোর কোথায়? কিন্তু ওদের না আটকালে আমাদের সবার স্বপ্নগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ হয়ে যাবে— আমরা তখন কী নিয়ে বাঁচবো? জানি, আমি জানি, ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে যখন রক্তাক্ত শরীরে প'ড়ে থাকবো এই স্টেজে, আপনাদের তখনও কোনো আলোড়নই আসবে না, কেননা এসব এখন গা-সহা নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যেস হয়ে গেছে! আমি কী করবো তবে? ওরা যে এসে পড়লো! সুকুমার চৌধুরী কি তবে ধরা প'ড়ে যাবে? শেষ আশাও নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে? —কী করি যে আমি? ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়বো! স্বপ্নের সেই নীল পাখিটার ডানা দুটোকে মুচড়ে টেনে ছিঁড়ে দেবো? আঃ— ওরা যে এসে পড়লো— বলুন আপনারা কিছু! কিন্তু উত্তরকাল? ভবিষ্যৎ? সে যখন কলার চেপে ধ'রে কৈফিয়ৎ চাইবে? কোথায় পালাবো তখন? কোন্‌ আস্তাকুঁড়ে? —ঐ যে আসছে ওরা! একটু, একটু সাহস দিতে পারেন আমায়? মৃত্যুর দিগন্তহীন শূন্য প্রান্তরের নৈরাশ্যের হলুদ ঘাসে ঘাসে একটু সাহসের শিশির ছিটিয়ে দেবেন? —একটু সাহস দেবেন? মনের জোর? যাতে জীবনে

একবার, একটিবার অন্তত বুক টান টান ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারে মধ্যবিত্ত— সারা আকাশটাকে তোলপাড় ক'রে, একটিবারের জন্যে সূর্যকে মুঠিতে ধরতে পারে যে সাহসে, দেবেন সে সাহস?

[দ্রুত অঘোরবাবু ও দুই স্যাঙাতের প্রবেশ]

অঘোরবাবুরা ঃ বার কর্ সে বাঞ্চোৎকে!

হরনাথ ঃ কাকে? কেউ নেই এখানে!

অঘোর ঃ (কেয়াকে) তুই— খান্‌কি মাগী, রূপ দেখিয়ে কাজ উদ্ধারে নেমেছিস, সব গণ্ডগোলের মূলে তুই—

১ম সহচর ঃ আরে আপনিই তো একেবারে মজেছিলেন, সেজন্যেই এত ঝুট-ঝামেলা। মাগী দেখলেই আপনার—

২য় সহচর ঃ চুপ শালা, লীডারের সমালোচনা করলে—

অঘোর ঃ ঠিক আছে ঠিক আছে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ নয় এখন, চীনের চরেরা আবার মাথা তুলছে, ঐক্য চাই। (কেয়াকে) আমাদের সব খবর ওদের দিতিস তুই, আমাদের ভেতরে ঢুকে বেইমানী—

বিমলা ঃ (পরম বিস্ময়ে) কে? বৌমা?

অঘোর ঃ হ্যাঁ, আপনার গুণধর ছেলের বৌ! ভেবেছিলাম স্বামী মরতে মতিগতি বদলেছে, এখন দেখছি তলে তলে.... এমন-কি ওদের টাকা-পয়সাও দেয়।

বিমলা ঃ (অধিক বিস্ময়ে) কোত্থেকে জানলেন?

অঘোর ঃ ওদের যারা ধরা পড়েছে, তাদের ঝাড় দিতেই খবর বেরুলো!

বিমলা ঃ (বিস্মিত আনন্দে) বৌমা!— আমার কেয়া!

কেয়া ঃ কী করবো মা, ওকে যে ভোলা যায় না কিছুতেই, এত চেষ্টা করি, তবু. . সারাটাক্ষণ ওর রক্তাক্ত শরীরটা আমাকে যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়—

অঘোর ঃ ভোলাচ্ছি এবার! সুকুমার চৌধুরী কোথায় বল্ শালী— নয়তো, নয়তো তোকে একেবারে— (ওরা তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় কেয়ার ওপর)

বিমলা ঃ (বাধা দিয়ে) না, কিছুতেই না। (বিমলাকেও আঘাত করে ওরা)

হরনাথ ঃ (দর্শকদের) দেখুন, নাটক দেখুন,— এতেও তো আপনাদের কিছু এসে যায় না, তাই না?

অঘোরবাবুরা ঃ বল্ খান্‌কি মাগী, কোথায় সুকুমার চৌধুরী— (কেয়াকে চড় মারে)

ওরা তিনজন ঃ খবরদার!

—ঃ পর্দা ঃ—

একাঙ্ক

পণ্ডিত মূর্খ ক্রীতদাস কথা

[ল্যু সুনের 'The Wise The Fool and The Slave' অবলম্বনে]

চরিত্র ঃ চার ক্রীতদাস, মালিক, জ্ঞানী, বোকা, এবং সূত্রধার

[চার ক্রীতদাস বোঝা বইতে বইতে গান গাইছে]

গান ঃ গলায় বাঁধা লোহার শেকল আমরা দাসের দল

আমরা বানাই দেশজুড়ে ভাই মজবুত ইমারত,

মরুর বুকে শস্য ফলাই, পাহাড় কেটে তৈরি করি সুন্দর রাজপথ—

আমাদেরই ঘামে চোখের জলে

রাজার প্রাসাদে আলোক জ্বলে।

তবু আমাদের পেটে ভাত জোটে না, তেষ্টায় মেলে না জল।

আমরা দাসের দল....

প্রভুর আদেশে সৈন্যের বেশে আমরা লড়াই করি,

প্রভুর ভাঁড়ারে সোনাদানা ভ'রে যুদ্ধে আমরা মরি।

কে-বা বোঝে ভাই, দাসের বেদনা, জানিয়েই কী-বা ফল॥

আমরা দাসের দল....

[সূত্রধার ঢোকে। তার পরনে সার্কাসের জোকারের মতো পোশাক]

সূত্রধার ঃ শুনুন বাবু বিবিগণ—

দাসের মাহাত্ম্য আজি করিবো বর্ণন॥

কে বানালো এ জগত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর গ্রহনক্ষত্ররাজি?

ভগবান বানায়েছে— এ উত্তরে সংশয় ওঠে আজি॥

কেননা— বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে ভাই—

দেব-দেবী আর অলৌকিকে কারো বিশ্বাস নাই॥

কিন্তু কে বানালো রোমনগরী? কে বানালো তাজমহল?

চার ক্রীত ঃ জবাব তাহার অতি স্পষ্ট— বানিয়েছে সব দাসের দল॥

সূত্রধার ঃ এ পৃথিবীতে চিরকাল ভাই একদল খেটে মরে—

আরেক দল বিনা পরিশ্রমে শুধুই আরাম করে॥

চাষি ফলায় খাদ্যশস্য, তাহার জোটে না ভাত—

শ্রমিক বানায় জিনিসপত্র, তাহার মাথায় হাত॥

জমির মালিক কলের মালিক একজোট হয়ে ভাই—
চাষি-মজুর মধ্যবিত্তের রক্ত চোষে তাই॥

চার ক্রীত : ক্রীতদাস কারা?

সূত্রধার : অনেক আগে ইতিহাসের সেই আদিমকালে—
শিকল বাঁধা পশুর মতো খেটে মরতো মানুষগুলো—

চার ক্রীত : গোলাম তাদের বলে।

সূত্রধার : হাতের শেকল খসেছে জানি, তবু বন্ধ হয়নি শোষণ—
অদৃশ্য এক নাগপাশে বাঁধা আমাদের দেহ মন॥

চার ক্রীত : আজকের যুগে ক্রীতদাস কারা?

সূত্রধার : হাতের শেকল খ'সে গেলেও যারা
ছিঁড়তে পারেনি মনের শেকল—

চার ক্রীত : তারাই হলো নতুন যুগের নতুন দাসের দল॥

সূত্রধার : মেহনতী যে মানুষেরা লড়াই থেকে দূরে থাকে,
ভয়ভীতি সংস্কারে চায় না পাল্টাতে ভাগ্যটাকে,—
মনটা যাদের বাঁধা থাকে দাসত্বেরই বন্ধনে—

চার ক্রীত : তারাই হলো গোলাম, নোকর— এই কথাটা জেনো মনে॥

সূত্রধার : 'চীনের গোর্কি' ল্যু সুনের গল্প থেকে ধার নিয়ে—
এই কথাটা বলার জন্যে নাটক করবো বানিয়ে॥
গোলাম-নোকর-দাসেদের এতক্ষণ দেখলেন সবাই—
এবার দেখুন দাসের মালিক— জগতে যার জুড়ি নাই॥

[সূত্রধারের প্রস্থান। দাস-মালিক চাবুক হাতে প্রবেশ করে।
দাসেরা নতজানু হয়ে জয়ধ্বনি দেয়।]

দাসেরা : জয় হোক হুজুরের!

মালিক : এই গোলামের বাচ্চারা— খুব কাজে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে—
কেমন?

প্রথম দাস : আজ্ঞে না হুজুর!

মালিক : আজ্ঞে না হুজুর, মারবো শালা এক লাথি! মিথ্যে কথা বলা বের
ক'রে দেবো।

প্রথম দাস : সত্যি হুজুর, একটুও মিথ্যে বলছি না। সত্যি বলছি— আমরা
একদম কাজে ফাঁকি দিই না। এই দেখুন না কেন— ভোরবেলা
সূর্য ওঠার সময় কুয়ো থেকে দুশো বালতি জল তুলেছি, তারপর
গিন্নীমার ফাইফরমাস খেটেছি, তারপর বেলা হ'লে মাঠে কাজ
করতে গিয়েছি, তারপর—

মালিক : (সজোরে লাথি মেরে) চুপ কর্ শালা। তোর কাজের ফিরিস্তি

আমার শোনার দরকার নেই। গোলাম হয়ে জন্মেছিস যখন, তখন কাজকর্ম তো করতেই হবে। এটাই গোলামের ভাগ্য।

বাকি তিনজন ঃ তা যা বলেছেন হুজুর— একেবারে লাখ কথার সেরা কথা।

মালিক ঃ আমি বলছি— তোরা ফাঁকি দিস, ফাঁকি দেওয়া তোদের স্বভাব।

প্রথম ঃ না হুজুর— সত্যি বলছি হুজুর, ফাঁকি দিই না।

মালিক ঃ (আবার লাথি মারে) আবার আমার মুখের ওপর কথা! আলবাৎ ফাঁকি দিস! সব কটা গোলামের বাচ্চারাই ফাঁকিবাজ, একেকটা কুঁড়ের বাদশা। যেদিকে আমি নজর না দেবো, সেখানেই শালারা ফাঁকি দেবে— সেখানেই আমার ইয়েতে বাঁশ দেবে—

প্রথম ঃ সত্যি বলছি হুজুর— বাপ-মা'র দিব্যি, আমরা একদম কাজে ফাঁকি দিই না। প্রত্যেকদিন আমরা ঠিকমতো নিজেদের কাজ করি হুজুর, একটু বিশ্রাম পর্যন্ত নিই না।

মালিক ঃ (প্রচণ্ড রাগে চাবুক মারতে থাকে) এতবড় স্পর্ধা শয়তানের বাচ্চার— খালি আমার মুখের ওপর কথা বলে—শালা গোলাম— শালা চাকর— সেও শালা আমার কথার প্রতিবাদ করে আজ! আজ তোকে মেরেই ফেলবো শালা!

[প্রথম দাস উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকে। আর তার পিঠে পা দিয়ে বিজয়গর্বে দাঁড়ায় মালিক। সূত্রধার প্রবেশ করে।]

সূত্রধার ঃ দেখুন বাবু দেখুন— দেখে সার্থক করুন নয়ন।
দাস-মালিকের রীতিনীতি, দেখুন তার ধরন॥

মালিক ঃ হাঃ হাঃ— সারা দুনিয়া আমার হাতের মুঠোয়। আমি যা বলবো, তা-ই হবে। ক্রীতদাসের বাচ্চাদের যেভাবে চালাবো, সেইভাবে তারা চলবে। গোলামের দল মানুষ নয়, তারা আমার পোষা কুকুর। হাঃ হাঃ—

সূত্রধার ঃ এমনিভাবেই মালিকের দল দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরায়, এমনিভাবেই গোলামের দল মালিকের জুলুম সয়ে যায়— দূরে দাঁড়িয়ে সবাই দ্যাখে, তাদের সাথী মার খেয়ে মরে— বাঁচাতে যায় না সাথীটিরে; তারা মালিককেই সমর্থন করে।

অন্যেরা ঃ হ্যাঁ হুজুর— ও ভয়ানক অন্যায় করেছে হুজুর— ছিঃ ছিঃ, আপনার কথার প্রতিবাদ কি কখনও কেউ করতে পারে? আপনার মুখের ওপর কারুর কি কথা বলা উচিত? কক্ষণো নয়।

মালিক ঃ ঠিক বলেছিস— একেবারে সত্যি কথা। চাবুক না খেলে তোদের মত কুত্তাদের চেতনা হয় না। একজনের অবস্থা দেখে এতক্ষণে

তোরা আসল কথা বুঝতে পেরেছিস— আমার বিরুদ্ধে গেলে মেরে ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবো, শালা—

অন্যেরা : আমরা কক্ষণো আপনার বিরুদ্ধে যাবো না হুজুর, কক্ষণো না—

মালিক : (প্রথম দাসকে লাথি মেরে) যা শালা— ওঠ্। এবারের মতো তোকে ছেড়ে দিলাম। কাজে যা শালা— আর একদম কাজে ফাঁকি দিবি না। বুঝলি! (আবার লাথি মেরে) —কী রে হারামজাদা— এবার বল্— তোরা কাজে ফাঁকি দিস না?

প্রথম : (ক্ষীণস্বরে) আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর— ফাঁকি দিই, খুব ফাঁকি দিই— আমরা সবাই এককেটা কুঁড়ের বাদশা— আমরা প্রত্যেকে হাড় হারামজাদা—

মালিক : গুঁতোর চোটে এতক্ষণে সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। লাথি না মারলে তোদের শায়েস্তা করা যায় না। যা— সবাই কাজে যা— আর কক্ষণো আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবি না ব'লে দিলুম। শালা গোলামের দল। [প্রস্থান]

চার ক্রীত : জয় হুজুরের জয়।

সূত্রধার : এরাই হলো নতুন যুগের নতুন দাসের দল—
হাতে পায়ে নেইকো শেকল, তবু মনটা যে দুর্বল—
নতুন যুগের নতুন দাস, মালিকের জয় গায়—
দেখুন বাবু দেখুন, নাটক কোথায় যায়।

[সূত্রধারের প্রস্থান অন্য ক্রীতদাসেরা প'ড়ে থাকা প্রথম দাসটিকে তুলে ধ'রে ধুলো-বালি ঝেড়ে দেয়]

প্রথম : দেখলে তো ভাই, দেখলে— কেমন বিনা দোষে মার খেলাম—

দ্বিতীয় : দোষ করোনি বটে, তবে বোকামি করেছো—

প্রথম : বোকামি করেছি?

দ্বিতীয় : তা নয় তো কী? হুজুরের মুখের ওপর কথা বলার কী দরকার?

তৃতীয় : তুমি বাপু বড্ড বেশি কথা বলো— ঐ জন্যেই তো মার খেয়ে মরলে—

চতুর্থ : মালিকের সঙ্গে তর্ক করতে গেছো? তোমার সাহস তো দেখি কম নয়?

প্রথম : তর্ক করলাম কোথায়? যা সত্যি, তাই তো বলেছি— সত্যিই তো আমরা কাজে ফাঁকি দিই না—

তৃতীয় : আলবাৎ কাজে ফাঁকি দিই। হুজুর বলেছেন— আমরা কাজে ফাঁকি দিই— সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা কাজে ফাঁকি দিই।

দ্বিতীয় : কেননা— হুজুর কখনও মিথ্যে কথা বলেন না, বলতে পারেন

না। মিথ্যেবাদী আমরা দাসেরাই। তুমি দেখছি হুজুরেরই বিরোধিতা করছো।

প্রথম ঃ এটা কি বিরোধিতা হলো? সত্যি ক'রে বলো দেখি— বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি ভাই— সত্যিই কি আমরা কাজে ফাঁকি দিই?

চতুর্থ ঃ না, তা অবশ্যই দিই না। কেননা ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। দিনরাত এই ছোট মালিকের মা আসল মালিক গিন্নীমা কড়া নজর রেখেছে, তার চোখ এড়িয়ে কাজে ফাঁকি দেবে এমন সাধ্য কার? অবশ্য ফাঁকি দিতে পারলে ভালো হতো— ফাঁকি দিতে চাই তো নিশ্চয়ই। কারণ চাবুকের ভয় দেখিয়ে আমাদের দিয়ে প্রতিদিন যত কাজ করিয়ে নেয়, তত কাজ কোনো মানুষ করতে পারে না, এক আমাদের মতো গাধারাই পারে—

দ্বিতীয় ঃ ঐ জন্যেই আমাদের জীবনীশক্তিও ক'মে যাচ্ছে! কোনো গোলামই তিরিশ বছরের বেশি বাঁচে না, মরণ আমাদের নিত্য সঙ্গী!

তৃতীয় ঃ যক্ষ্মার কীট আমাদের বুকের ভেতরে বাসা বেঁধে আছে, ফুসফুস দুটোকে কুরে কুরে খায়। রোজ রাতে আমার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে—

প্রথম ঃ বলো দেখি ভাই, বলো তো— তবে আমি কি অন্যায় কথাটা বলেছি—

দ্বিতীয় ঃ অন্যায় নয়, তবে বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি—

তৃতীয় ঃ মালিকের মুখের ওপর কথা! ধড়ে মুণ্ডু থাকবে কার?

প্রথম ঃ কুকুরের মতো বেঁচে আছি ভাই— একেবারে কুকুরের মতো। সারাদিনেও একবার খাওয়া জোটে কি-না ঠিক নেই— এদিকে কাজের চাপে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছি। সকাল নেই, বিকেল নেই, দিন নেই, রাত নেই— শুধু কাজ আর কাজ। বলো দেখি ভাই, এত খাটলে কি আর শরীর থাকে? তা'ও যদি ঠিকমতো খাওয়া জুটতো! যেদিন জোটে, সেদিন পাই দু'টুকরো বাসি রুটি আর এক ভাঁড় জল! যা কি-না গাধাও ছোঁবে না, গরুতেও মুখ দেবে না! আর বাসস্থান? শুয়োরের খোঁয়াড়ও এর থেকে ভালো।

দ্বিতীয় ঃ আরে চাপো, চাপো! মালিকের কানে এসব কথা গেলে আর রক্ষে নেই! পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছাড়বে সবাইকে।

তৃতীয় ঃ (প্রথমকে) তোমার বাপু বড্ড বেশি কথা বলার অভ্যেস! এসব কি না-বললে নয়?

দ্বিতীয় ঃ শুধু ছোট মালিক নয়, মালিকের মা আমাদের গিন্নীমা— আমাদের দণ্ডমুণ্ডের আসল মালিক যদি এসব কথা একবার শোনে, তবে

যে কী হবে— ভাবতেই ভয় করে! এসব দেশদ্রোহী কথা বলার ফল একেবারে হাতে হাতে পাবে।

প্রথম : তোমাদের ছাড়া আর কাকে বলবো বলো? কেই-বা বুঝবে মনের ব্যথা—

চতুর্থ : মনের ব্যথা নয়, মারের চোটে গায়ে গতরে ব্যথা হয়ে যাবে! গিন্নীমার দারোয়ানদের পিটুনি তো কখনও খাওনি! একবার পিঠে পড়ুক না-- দেখবে ওসব মনের ব্যথা নিয়ে কাব্যি করা কোথায় বেরিয়ে যাবে—

তৃতীয় : ক্রীতদাসদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্যটা ভুলে গেলে? এ বছর থেকে গিন্নীমা নতুন হুকুমনামায় যে কথাটা ব'লে দিয়েছেন—

দ্বিতীয় : কী যেন সেটা?

তৃতীয় : দাসের দেশে একটি নিয়ম,
খাটবে বেশি, চাইবে কম।

দ্বিতীয় : হ্যাঁ, হ্যাঁ— আমাদের ছোট মালিকও তো নতুন ক'রে ফতোয়া দিয়েছে—

চতুর্থ : কথা বলবে কম, কাজ করবে বেশি।

প্রথম : হ্যাঁ— খাবে কম, কিন্তু নাদবে বেশি।— এই তো নিয়ম ভাই, এই তো নিয়ম!

[নেপথ্যে মালিকের কণ্ঠস্বর]

মালিক : এই গাধার বাচ্চারা— এখনও ব'সে রয়েছিস? মনে খুব ফুর্তি হয়েছে— না? গল্প করা ছুটিয়ে দেবো। শিগ্‌গির আয়। এদিকে আয় বলছি শালা। চাবকে পিঠ ভেঙে দেবো। চ'লে আয়। প্রচুর কাজ জ'মে গেছে।

দ্বিতীয় : চলো, চলো— ডাক পড়েছে।

তৃতীয় : দেরি হ'লেই চাবুক চলবে।

সবাই : চলো, চলো। জয় হুজুরের জয়।

[সবার প্রস্থান। সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার : দাসের দলের ইতিকথা শুনলেন বাবুমশাই—
ভাগ্যটাকে বদলে দেবার সাহস তাদের নাই॥
এমন সময় দাস-মালিকের বন্ধু সে এক জ্ঞানীগুণীজন—
ক্রীতদাসদের দুঃখ দৈন্য দেখতে চাইলো তাঁহার মন॥
মহাপণ্ডিত ব্যক্তি তিনি— মহাজ্ঞানী। পুঁথি পড়েছেন শত শত,
তাঁহার জ্ঞানের সীমানা নাই— দেশ বিদেশে ঘুরেছেন কত॥

দাস-মালিক বন্ধু তাঁরে নিয়ে এলো দাসেদের আস্তানায়—
এর পরের কাণ্ডখানা দেখুন এবার বাবুমশায়॥

[সূত্রাধারের প্রস্থান। দাস-মালিক ও জ্ঞানী-ব্যক্তি প্রবেশ করে]

মালিক ঃ আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। মহাজ্ঞানীবাবু, আপনার আগমনে ইয়ে মানে আপনার পদধূলি পেয়ে এই গরিবের বাড়ি ধন্য হয়ে গেল।

জ্ঞানী ঃ না, না,— সে কী কথা! আমি যে আপনার মতো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত মানুষের বাড়িতে আসার সুযোগ পেয়েছি— এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য— তা ব'লে বোঝানো যাবে না।

মালিক ঃ হেঁ হেঁ— কী যে বলেন— আপনি হলেন গিয়ে মহাপণ্ডিত মহাজ্ঞানী— সারা দেশ জুড়ে আপনার কত নাম! সত্যি বলতে কী— আপনার তুলনায় আমি তো নেহাতই চুনোপুঁটি—

জ্ঞানী ঃ ছি ছি— একথা শোনাও পাপ। আপনি হলেন আমাদের অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, সমস্ত জমিজায়গা ধনসম্পত্তি সবই প্রায় আপনাদের— সে হিসেবে আমি তো একটা কীটস্য কীট— ঘরে ব'সে ক'টা বই মুখস্থ করেছি মাত্র— আপনি চুনোপুঁটি হবেন কেন? চুনোপুঁটি তো আমিই— আপনি বরং রাঘব বোয়াল— হাঃ হাঃ—

মালিক ঃ আপনি না— ভীষণ— ইয়ে! আমি আর এমন কী পয়সা করেছি— সামান্য— অতি সামান্য—

জ্ঞানী ঃ মহৎ লোকদের স্বভাবই হচ্ছে নিজেকে সবসময় ছোট দেখানো— সামান্য কী বলছেন মশাই— আমি শুনেছি— আপনার খামারে তিন হাজার ক্রীতদাস কাজ করে—

মালিক ঃ তিন হাজার নয়— তিন হাজার তিনশো তেত্রিশজন ক্রীতদাস আমার আছে—

জ্ঞানী ঃ হাঃ হাঃ— এই তো সামান্য লোকের নমুনা। মালিকমশাই— আপনি প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ।

মালিক ঃ না-না— এমনভাবে আমায় লজ্জা দেবেন না মহাজ্ঞানীবাবু—

জ্ঞানী ঃ আমার বহুদিনের ইচ্ছা— ক্রীতদাসদের জীবনযাত্রা একেবারে নিজের চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবো। কেননা— ক্রীতদাসদের নিয়ে বড় একটা বই লেখার ইচ্ছে আছে আমার—

মালিক ঃ ওমা! তাই না-কি? ক্রীতদাসদের নিয়ে বই লিখবেন আপনি? ব্যাটারা ধন্য হয়ে গেল মহাজ্ঞানীবাবু— এ যে শালাদের কত বড় সৌভাগ্য!

জ্ঞানী : আমার বইয়ের নাম দেবো আমি 'ক্রীতদাসদের আত্মোন্নতির উপায়'—

মালিক : কী বললেন কথাটা? উন্নতি?

জ্ঞানী : উন্নতি নয়— আত্মোন্নতি— মানে আত্মা যুক্ত উন্নতি— অর্থাৎ আত্মার মানে এখানে নিজের উন্নতি।

মালিক : ঐ একই হলো। উন্নতি। আমি তো আপনার মতো পণ্ডিত নই যে অত বড় দাঁতভাঙা কথাটা বলতে পারবো। তা মশাই— ক্রীতদাসদের আবার উন্নতি কী? ওরা কি মানুষ? গরু-ভেড়া-ছাগলের কি কোনো উন্নতি হয়, না তা নিয়ে কেউ বই লেখে?

জ্ঞানী : কেন লেখা হবে না? আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-পালন, মুরগী-পালন প্রভৃতি বিষয়েও বিস্তর বই লেখা হচ্ছে— মনে করুন এই বইটা ক্রীতদাস-পালনের ওপর লেখা।

মালিক : ক্রীতদাস-পালন! বড় ভালো বলেছেন কথাটা। শালারা গরু! ছাগলেরও অধম। গরু পুষতে যে মেহনত হয় না, তার চেয়ে অনেক বেশি মেহনত লাগে ক্রীতদাস পুষতে। একেবারে নাজেহাল হচ্ছি মশায়— একেবারে নাজেহাল হচ্ছি।

জ্ঞানী : সে-সব দেখবো ব'লেই তো এসেছি। ভাগ্যি আপনি আমায় আমন্ত্রণ জানালেন আপনার দাসেদের দেখবার জন্যে, ঐ জন্যেই তো আসতে পারলাম। আপনি না থাকলে আমার বহুদিনের সাধ অপূর্ণ থেকে যেতো মালিকমশাই—

মালিক : এমন ক'রে আমায় লজ্জা দেবেন না মহাজ্ঞানীবাবু— আপনার সেবায় যে আমি লাগতে পেরেছি— এ যে আমার কত বড় ইয়ে মানে— যাকে বলে আর কী—মানে ইয়ে— তা ব'লে বোঝানো যাবে না—

জ্ঞানী : না, না, এতটা বাড়িয়ে বলবেন না—

মালিক : বাড়িয়ে বলছি কী— বরং বলুন, কমিয়ে বলছি। আপনি আমার প্রতিবেশী, বন্ধু মানুষ। আপনার সামান্য অনুরোধ আমি রাখবো না? কী যে বলেন! আপনি আমাদের দেশের গর্ভ।

জ্ঞানী : গর্ভ? কী বলছেন? দেশের গর্ভ—?

মালিক : হ্যাঁ, গর্ভ। গর্ভই তো— আপনার জন্যে আমারও গর্ভ হয়।

জ্ঞানী : যাঃ— কী যা-তা বলছেন— আমার জন্যে আপনার গর্ভ হয়েছে?

মালিক : হয়েছেই তো— আমার গর্ভ হয়েছে বৈকি—

জ্ঞানী : হাঃ হাঃ— আপনি কি পাগল হয়েছেন? আপনার কেন গর্ভ

হবে? গর্ভ কি পুরুষদের হয়? মেয়েরাই তো শুধু গর্ভবতী হয়— গর্ভ তো মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার—

মালিক : অ্যাঁ? তবে?

জ্ঞানী : কথাটা গর্ভ নয়, গর্ব। ভ নয়, ব। হাঃ হাঃ—

মালিক : আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কী বলতে কী ব'লে ফেলেছি। আপনি পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনার কথাই আলাদা। আমার কাছে গর্ভও যা, গর্বও তাই।

জ্ঞানী : আচ্ছা আচ্ছা, চলুন— দাসেদের ঘরবাড়ি দেখে আসি।

মালিক : সেখানে কি যেতে পারবেন? মানে আপনার মতো ভদ্রলোকেরা সেখানে এক মুহূর্তও টিকতে পারবেন না।

জ্ঞানী : কেন, কেন? একথা বলছেন কেন?

মালিক : আরে মশাই— ক্রীতদাসরা তো আর মানুষ নয়, তারা হলো গিয়ে জানোয়ার, দেখতেই শুধু মানুষের মতো। আমি তাদের জন্যে অত সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি তৈরি ক'রে দিলুম, আর সেগুলোতে একেবারে হেগে-মুতে একসা করেছে— গন্ধের চোটে দাঁড়াতেই পারবেন না—

জ্ঞানী : না, না, তাহলে গিয়ে লাভ নেই। আমার আবার ওসব গন্ধ মোটেই সহ্য হয় না—

মালিক : আমি বলি কী— দাসেদের দেখবার দরকারই-বা কী? আপনি বরং যা জানবার, তা আমাকে প্রশ্ন ক'রেই জেনে নিন না! আরে মশাই— কুত্তার বাচ্চাদের আমি রাজার হালে রেখেছি। তবু ব্যাটাদের একটুও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই— শালারা ভীষণ ফাঁকিবাজ!

জ্ঞানী : তা অবশ্য ঠিক। তবে কি-না ওদের সঙ্গে কথা বললেই ভালো ছিল।

মালিক : আরে মশাই— আপনি ওদের সঙ্গে কথাই বলতে পারবেন না— ওরা এক আজব চীজ! তার ওপর ভালোভাবে কথাও বলতে পারে না। আপনার মতো মানী লোককে কী বলতে কী ব'লে বসবে কে জানে— আপনি যা জানবার তা আমাকেই জিগ্যেস করুন না!

জ্ঞানী : মানে, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না— আমার একটু প্রত্যক্ষ পরিচয় দরকার। আপনি ওদের কাউকে ডেকে পাঠান না! বেশ বুদ্ধিমান গোছের কাউকে— আর হ্যাঁ— দেখবেন যেন বেশ

সভ্যভব্য হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে— মানে আমার আবার দাসেদের গায়ের বোট্‌কা গন্ধ একদম সহ্য হয় না—

মালিক ঃ বললে তো আর আপনি শুনবেন না— বেশ, তাহলে ওদেরই একজনকে ডেকে দিচ্ছি— তবে সভ্যভব্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক্রীতদাস এ দুনিয়াতে পাবেন না। ওদের গায়ে তো গন্ধ হবেই—

জ্ঞানী ঃ তাহলে আর কী করা যাবে— গন্ধওলা কাউকেই না হয় পাঠিয়ে দিন— আমি বরং কথা বলার সময় নাকে রুমাল চেপে রাখবো—

মালিক ঃ (নেপথ্যে তাকিয়ে) এই শুয়োরের বাচ্চারা— তোদের মধ্যে যে কেউ এক্ষুণি এখানে ছুটে আয়— দেরি করলে মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াবো শালা— এই— এই— তুই আয়— তোকেই বেশ বোকা-বোকা মনে হচ্ছে— আয় এদিকে।

[প্রথম দাস ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে]

প্রথম ঃ আমায় স্মরণ করেছেন প্রভু—

[মালিক সজোরে লাথি মারে, দাস ছিট্‌কে প'ড়ে যায়]

মালিক ঃ হ্যাঁ রে কুত্তার বাচ্চা, হ্যাঁ! শোন্— এই মহাজ্ঞানীবাবু তোকে কিছু প্রশ্ন করবেন— তুই তার ঠিক ঠিক জবাব দিবি— বুঝলি? একটাও বাজে কথা বলবি না। আর আমার বিরুদ্ধে যদি একটা বেফাঁস কথা বলেছিস তো তোর একদিন কি আমার একদিন—

প্রথম ঃ (ক্ষীণস্বরে) না হুজুর— একটাও বাজে কথা বলবো না।

মালিক ঃ হ্যাঁ, খেয়াল রাখিস— বাজে কথা বললেই (আবার লাথি) খুন ক'রে নদীতে ভাসিয়ে দেবো কিন্তু। চলি মহাজ্ঞানীবাবু— আমি বরং ওদিকে আপনার জন্যে সামান্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করিগে—

জ্ঞানী ঃ না, না, সে কী— আমি খেয়েই এসেছি— আপনি আর কেন মিছি-মিছি কষ্ট করবেন?

মালিক ঃ কীসের কষ্ট? আপনি আমার অতিথি ব'লে কথা, শুধু মুখে কি ফিরিয়ে দিতে পারি? আপনি বরং কুকুরটার সঙ্গে ততক্ষণ কথা বলুন— আমি আসছি। [প্রস্থান]

জ্ঞানী ঃ (নাকে রুমাল চেপে, দূর থেকে) ওঠো ভাই, উঠে বসো।

প্রথম ঃ (চমকে ওঠে) হুজুর— আপনি আমায় ভাই বললেন?

জ্ঞানী ঃ খুব লাগেনি তো? উঠে বসো।

প্রথম ঃ আজ্ঞে না হুজুর, লাগেনি। আমাদের লাগে না।

জ্ঞানী ঃ আমি তোমাদের অবস্থা দেখতে এসেছি ভাই—

প্রথম : এই তো দেখলেন হুজুর আমাদের অবস্থা— শুধুই লাথি ঝাঁটা খাওয়া।

জ্ঞানী : হ্যাঁ, তা ঠিকই। তবে ধৈর্য ধরো ভাই— ধৈর্য ধরো।

প্রথম : হুজুর— আপনি আবার আমাকে ভাই বলছেন? আপনি খুব ভালো লোক হুজুর, খুব দয়ালু।

জ্ঞানী : আমি তোমাদের কথা জানতে এসেছি ভাই— বলো ভাই— তোমাদের কথা।

প্রথম : আমাদের দুঃখের কথা আর কী বলবো হুজুর— কেউই সেকথা শুনতে চায় না। আমি তো সবসময় তেমন লোকই খুঁজি হুজুর— যার কাছে নিজের যত দুঃখের কথা সব খুলে বলতে পারবো— বুকটা একটু হাল্কা হবে। কিন্তু তেমন লোক পাই কোথায়? এমন-কি নিজেদের লোকেরা, মানে— অন্য দাসেরাও সেকথা শুনতে চায় না হুজুর! বলে— আমি না-কি খুব বাজে কথা বলি—

জ্ঞানী : আমি শুনবো ভাই— শুনতেই তো আমি এসেছি—

প্রথম : আপনি খুব ভালো হুজুর, এই প্রথম আমি একজন লোক পেলুম— যার কাছে মনের সব ব্যথা অকপটে উজাড় ক'রে প্রকাশ করতে পারি—

জ্ঞানী : দেরি করছো কেন ভাই? আমার প্রচুর কাজ জ'মে আছে, তবু তার মধ্যেও সময় ক'রে তোমাদের কথা শুনতে এসেছি ভাই— বলো— আমি তো তোমাদেরই লোক—

প্রথম : হুজুরের কি নাকে কিছু হয়েছে? কাপড় দিয়ে নাক চেপে রেখেছেন?

জ্ঞানী : ও কিছু না;— ভীষণ সর্দি হয়েছে কি-না— হ্যাঁচ্চো— বড্ড ঠাণ্ডা লেগেছে— হ্যাঁচ্চো—

প্রথম : আমাদেরও বুকে বারোমেসে সর্দি জ'মে থাকে হুজুর—আমাদেরও খুব ঠাণ্ডা লাগে— এমন স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকি যে, শীতকালে প্রতি বছর আমাদের মধ্যে দু'একজন ঠাণ্ডায় জ'মে ম'রে যায়—

জ্ঞানী : এই তো মুখ খুলেছো! বলো, আরও বলো ভাই— আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে—

প্রথম : কী আর শুনবেন হুজুর? আমাদের জীবনটা কুকুরের জীবন হুজুর, কুকুরের জীবন! দিনরাত মালিকের চাবুক খাচ্ছি তবু পেটে কিছু পড়ে না, বেশির ভাগ দিন একবারও খেতে দেয় না— আর যেদিন দেয়, সেদিনও শুধু এঁটোকাঁটা পাত-কুড়োনোই খাই— যা কুকুরেও খেতে চাইবে না কিছুতে—

জ্ঞানী : তাই না-কি? খুব মজার ব্যাপার তো!
প্রথম : মজা আর কোথায় হুজুর? চোখ ফেটে জল আসে ভাবলে—
জ্ঞানী : হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো— খুবই দুঃখের ব্যাপার—
প্রথম : তা'ও আবার খেতে দেয় এই এ্যাত্তোটুকু ছোট্ট একটা বাটিতে— বাচ্চা ছেলেরও তাতে পেট ভরে না।
জ্ঞানী : শুনে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে— ভীষণ বাজে ব্যাপার।
প্রথম : আপনার দুঃখ হচ্ছে হুজুর? সত্যি? আহা, আপনার মতো মানুষ হয় না। আপনার দুঃখ হচ্ছে শুনে আমার সব দুঃখ ঘুচে গেল হুজুর।
জ্ঞানী : থেমো না ভাই, ব'লে যাও— আমার বেশ লাগছে শুনতে—
প্রথম : আহা— হুজুরের কত দয়া! কেউ তো আমাদের কথা শোনে না, তবু তো আপনি শুনছেন, এ যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য হুজুর—
জ্ঞানী : বলছি না আমার কাজ আছে। যা বলার তাড়াতাড়ি বলো ভাই—
প্রথম : বলছি হুজুর, বলছি।— একদিকে তো খেতে পাই না— তার ওপর খাটুনীর কথা তো আপনি ভাবতেও পারবেন না হুজুর। সারাদিন সারারাত কাজ করতে হয়, একটু বিশ্রাম নেবারও সময় পাই না। ধরুন গিয়ে— যদি ভোরবেলায় জল তুলতে হয়, তো বিকেলবেলায় রান্না করতে হবে; সকালবেলায় যদি বাবুর ফাইফরমাস খাটতে হয়, তো সন্ধেবেলা যাঁতা ঘুরিয়ে গম পেষাইয়ের কাজ করতে হবে; আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে জামাকাপড় কাচতে হবে, আবার যদি বৃষ্টি হয় তো বাবুর মাথায় ছাতা ধরতে হবে।
জ্ঞানী : একটু সংক্ষেপে বললে হয় না?
প্রথম : কী বললেন হুজুর? আরও ভালো ক'রে বলবো?
জ্ঞানী : সংক্ষেপে— সংক্ষেপে— মানে ছোট ক'রে! মানেও বোঝে না, গাড়োল!
প্রথম : হ্যাঁ হুজুর— ছোট ক'রেই বলি— শীতকালে ঘর গরম করার জন্যে চুল্লি জ্বালাতে হবে, আর গরমকালে বাবুর মা গিন্নীমাকে পাখা দিয়ে বাতাস করতে হবে! দুপুরবেলা বাবুর বৌ বৌরাণীর জন্যে পান সাজতে হবে, আবার মাঝরাতে মনিবের জুয়া খেলার আসরে হাজির থাকতে হবে— কখন কী দরকার পড়ে, সেজন্যে!
জ্ঞানী : ওঃ! এই ঘ্যানঘ্যানে লোকটা তো মাথা ধরিয়ে দিলো দেখছি!

প্রথম ঃ হুজুর কি কিছু বললেন?

জ্ঞানী ঃ বললাম, খুব ভালো লাগছে শুনতে— তাড়াতাড়ি শেষ করো—

প্রথম ঃ হ্যাঁ— তো, এই তো জীবন হুজুর— শুধু কাজ আর কাজ! তবু মালিকের মন পাই না— তিনি বলেন— আমি না-কি কথা বেশি বলি আর কাজ কম করি। কী বলবো হুজুর, এত কাজ করি— তবু কোনোদিন বকশিশ পর্যন্ত দেননি— বরং পান থেকে চুন খসলেই বেধড়ক জুতো পেটা করেন—

জ্ঞানী ঃ আহা কী দুর্ভাগ্যজনক— উহু— চোখে জল এসে গেল ভাই তোমার দুঃখের কথা শুনতে শুনতে— (চোখ মোছে)

প্রথম ঃ হুজুরের আমার দয়ার শরীর! হুজুর আমার দুঃখে কাঁদছেন! আমি ধন্য হয়ে গেলাম প্রভু!

জ্ঞানী ঃ সত্যি তোমাদের অবস্থা খুবই খারাপ ভাই— আহা-হা— আবার আমার চোখে জল এলো।

প্রথম ঃ কাঁদবেন না হুজুর, কাঁদবেন না। আপনার কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়ে যাচ্ছে হুজুর— আপনার মতো দয়ালু লোক যে পৃথিবীতে এখনও আছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে— এখনও কোথাও কোথাও সুবিচার মেলে।

জ্ঞানী ঃ সবই শুনলাম। এবার আমি চলি ভাই— (স্বগত) গায়ের গন্ধের চোটে টেকাই যাচ্ছে না। শালা চানও করে না বোধহয়— ভূত কোথাকার!

প্রথম ঃ হুজুর কি কিছু বললেন?

জ্ঞানী ঃ না ভাই, কিছু না। বলছিলাম— আমি এখন চলি। আমার অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

প্রথম ঃ চ'লে যাবেন হুজুর? এক্ষুণি?

জ্ঞানী ঃ হ্যাঁ ভাই সবই তো জানা হলো। তোমার সঙ্গে কথা ব'লে খুবই ভালো লাগলো ভাই। অবশ্য গায়ের গন্ধটা নাকে খুবই লাগছে।

প্রথম ঃ কীসের গন্ধ বললেন হুজুর?

জ্ঞানী ঃ কিছু না, কিছু না। এবার তাহলে আসি ভাই?

প্রথম ঃ আরেকটু শুনবেন না হুজুর?

জ্ঞানী ঃ না ভাই আজ থাক্। অন্যদিন শুনবো। ওঃ, নাকটা চেপে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে এলো— মানে— খুবই সর্দি হয়েছে তো ভাই— হ্যাঁচ্চো। —চলি! [প্রস্থানোদ্যত]

প্রথম ঃ একটু দাঁড়ান হুজুর। একটা কথা।

জ্ঞানী ঃ জ্বালালে দেখছি! আবার কী চাই?

প্রথম : আপনি তো সবই শুনলেন— এখন আমাদের কী করতে বলেন হুজুর?

জ্ঞানী : তার মানে?

প্রথম : চিরদিন কি এইভাবে কাটাতে হবে হুজুর? আমাদের অবস্থার কি কোনোদিন উন্নতি হবে না হুজুর?

জ্ঞানী : হবে ভাই— নিশ্চয়ই উন্নতি হবে! শুধু আরেকটু ধৈর্য ধরো, কেমন?

প্রথম : সত্যি বলছেন হুজুর উন্নতি হবে?

জ্ঞানী : নিশ্চয়ই। উন্নতি হবে বৈকি।

প্রথম : কীভাবে হুজুর? কীভাবে?

জ্ঞানী : ভগবানকে একমনে ডাকো— নিশ্চয়ই তোমার দুরবস্থা ঘুচবে।

প্রথম : আমি রোজ পুজো করি হুজুর, রোজ! ভগবান নিশ্চয়ই আমার প্রার্থনা শুনবেন— তাই না হুজুর?

জ্ঞানী : সে আর বলতে? না শুনে ভগবান যাবেন কোথায়? দাঁড়াও, একটা ছোট্ট ক'রে বক্তৃতা দিয়ে ব্যাপারটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। আরে ভাই। ভগবানই তো কাউকে আমীর, আর কাউকে গরিব করেছেন, তাঁরই ইচ্ছেয় কেউ হয় রাজা, কেউ হয় গোলাম। — এসব বড় বড় কথা অবশ্য তুমি বুঝবে না। এসব বড় বড় বইয়ে লেখা আছে, সেইসব বই প'ড়েই আমি বলছি রে ভাই— নিরাশ হোয়ো না কখনও, তুমি যদি এই জন্মে মুখ বুজে সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে যেতে পারো, তবে আর তোমায় পায় কে? পরজন্মে নিশ্চয়ই তুমি কোনো বিরাট বড়লোকের ঘরে জন্মাবে, এমন-কি, এই তোমার মতোই হাজারটা দাসের মালিকও হবে তুমি--- কী গন্ধ রে বাবা!

প্রথম : আমিও তাই ভাবি হুজুর— নিশ্চয়ই ভগবান আমাদের দুঃখ মোচন করবেন। একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থার উন্নতি করবেন তিনি।

জ্ঞানী : এখন শুধু কথা কম ব'লে কাজ বেশি ক'রে যাও— শাল্‌লা গন্ধ বটে!

প্রথম : আপনার সহানুভূতি আর উৎসাহ পেয়ে বুকটা আমার গর্বে ফুলে উঠছে হুজুর!— আপনি যে এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললেন, এতেই আমি কৃতার্থ হুজুর— আপনি যে আমাদের মতন গরিব ক্রীতদাসদের এত ভালোবাসেন—

জ্ঞানী : হ্যাঁচ্চো। সর্দি লাগার ভান ক'রে নাকটা চেপে ধরতে ধরতে

সত্যিই সর্দি লেগে গেল দেখছি— হ্যাঁচ্চো, চললাম ভাই—
হ্যাঁচ্চো— কী গন্ধই না ছেড়েছে শালা— হ্যাঁচ্চো—

প্রথম : আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে হুজুর? বাতাস করবো?

জ্ঞানী : কাছে আসিসনি, কাছে আসিসনি। হ্যাঁচ্চো। কী বিদ্‌ঘুটে গন্ধ রে বাবা— হ্যাঁচ্চো— [মালিকের দ্রুত প্রবেশ]

মালিক : কী ব্যাপার মহাজ্ঞানীবাবু? এত দেরি করছেন কেন?

জ্ঞানী : হ্যাঁচ্চো।

মালিক : হাঁচছেন কেন? কী হয়েছে?

প্রথম : আজ্ঞে বোধহয়— সর্দি।

জ্ঞানী : সর্দি নয়— গন্ধ, হ্যাঁচ্চো।

মালিক : সর্দি। গন্ধ। যাচ্চলে। সর্দির আবার গন্ধ হয় না-কি? না-কি গন্ধের সর্দি হয়? কী যে বলেন তার ঠিক নেই। চলুন চলুন— কত ক'রে বললাম— এই কুত্তাগুলোর সঙ্গে কথা বলবেন না তা নয়— বুঝুন এবার অবস্থাটা—

জ্ঞানী : চলুন— যাওয়া যাক।

মালিক : আপনার জন্যে প্রচুর খাবার আনিয়েছি— খাবেন চলুন— মদও আনিয়েছি তিন রকম।

জ্ঞানী : সত্যি? শুনেই জিভ দিয়ে জল— হ্যাঁচ্চো!

মালিক : এই কুত্তা— তোদের— একটুকরো রুটি আর এক ভাঁড় জল দিচ্ছি— খেয়ে নিগে যা শালা— (লাথি মারে)

জ্ঞানী : সত্যি, আপনার মতন— দাসেদের আদর-যত্ন আর কেউ করে না— হ্যাঁচ্চো।

মালিক : শিগ্‌গির চলুন— খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানী : চলুন যাই— হ্যাঁচ্চো।

[জ্ঞানী ও মালিকের প্রস্থান]

প্রথম : (উঠে দাঁড়িয়ে) জয়! দুই হুজুরের জয়! জয় মালিকমশাইয়ের জয়! জয় মহাজ্ঞানীবাবুর জয়!

[সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার : মহাজ্ঞানীর উপদেশে দাসবাবাজীর মাথা ঠাণ্ডা হলো!
এমন সময় সেখানেতে এক বোকা হাঁদা এলো!
তাকে দেখেই দাসবাবাজীর মনটা আবার হলো উচাটন!
ভাবলো পরে— একেই না হয় দুঃখের কথা আবার শোনাই
সাতকাহন!

[সূত্রধারের প্রস্থান। বোকা লোকটির প্রবেশ। হেঁটে যেতে থাকে। প্রথম দাস চিৎকার ক'রে ডাকে—]

প্রথম ঃ হুজুর— ও হুজুর— শুনছেন— (লোকটি না শুনেই চ'লে যেতে থাকে দেখে প্রথম দাস ছুটে গিয়ে হাত জোড় ক'রে পথ আটকায়) হুজুর— ও হুজুর—

বোকা ঃ আমায় ডাকছো?

প্রথম ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

বোকা ঃ আমাকে হুজুর বলছো কেন? কার হুজুর আমি?

প্রথম ঃ আমার হুজুর। আমি ক্রীতদাস হুজুর। সামান্য ক্রীতদাস।

বোকা ঃ তুমি ক্রীতদাস হও আর যা-ই হও, আমাকে হুজুর বলবে কেন? আমি কি তোমার মালিক? আমি ক্রীতদাসও নই— কোনো ক্রীতদাসের মালিকও নই। আমিও তোমার মতোই খুবই গরিব লোক।

প্রথম ঃ তবু হুজুর—

বোকা ঃ আবার হুজুর? তুমি তো আচ্ছা বোকা হে! গাঁয়ের লোকে এতকাল আমাকে গোঁয়ার-গোবিন্দ ব'লে এসেছে— তুমি দেখছি— আমার চেয়েও এককাঠি সরেস! খামোকা আমাকে হুজুর হুজুর করছো কেন? আর আমাকে আপনি আজ্ঞে ক'রেই-বা কথা বলছো কেন? কী চাও তুমি— সোজাসুজি বলো।

প্রথম ঃ না— মানে আপনাকে দেখে মনে হলো যে আপনি—

বোকা ঃ আবার আপনি বলছো? আরে বাবা আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ, বোকাহাঁদা ব'লে আমাকে আমার পাড়া-প্রতিবেশীরা ডাকে। আমি তোমার চেয়ে এমন কিছু উঁচু দরের কেউকেটা লোক নই যে আমাকে আপনি আপনি ক'রে বলবে। আমি ক্রীতদাস না হ'তে পারি— তবে আমি খুবই গরিব লোক, আমিও তোমার মতো খেটে খাই— বুঝলে?

প্রথম ঃ ইয়ে মানে— আপনার সঙ্গে এই প্রথম দেখা কি-না—

বোকা ঃ বলছি তো 'তুমি' বলো, আমি কিচ্ছু মনে করবো না। আর যদি বন্ধুত্ব হয়ে যায়, তখন দু'জনেই দু'জনকে তুই-তোকারি করবো। তা, এখন বলো দেখি— হঠাৎ ডাকলে কেন?

প্রথম ঃ না মানে— আপনার— ইয়ে তোমার কি হাতে একটু সময় আছে?

বোকা ঃ কেন বলো তো?

প্রথম : তাহলে একটু মনের কথা বলতাম, কাউকে বলতে না পেরে পেট ফুলে আছে।

বোকা : বেশ তো, বলো না! আমার হাতে অনেক সময় আছে—

প্রথম : জানেন হুজুর, আমার না—

বোকা : আবার হুজুর বলছো? তুমি আমাকে বন্ধু ব'লে ভাবতে পারছো না কেন? হুজুর হুজুর করলে আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না।

প্রথম : আচ্ছা আচ্ছা— আর বলবো না! জানো ভাই, আমার না ভারী দুঃখ!

বোকা : দুঃখ! কীসের দুঃখ?

প্রথম : আমরা কুকুরেরও অধম! মালিক আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে, তা আপনি— মানে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। কাজে একটু ভুলচুক দেখলেই বেধড়ক পেটায়। আমাকে না গত পরশুদিন বিনা কারণে গাছের সঙ্গে বেঁধে পিটিয়েছিল।

বোকা : (চিৎকার ক'রে) তোমরা পাল্টা পেটাতে পারো না?

প্রথম : (হতভম্ব) অ্যাঁ— কী বললে! যাকগে, যাকগে— ব্যাপারটা কী জানো ভাই— মালিক আমাদের মানুষ ব'লেই মনে করে না। এমন-কি নিজের পোষা কুকুরটাকেও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খাতির করে—

বোকা : শয়তান একটা!

প্রথম : অ্যাঁ! কী বললে? কে শয়তান?

বোকা : কে আবার? তোমার মালিক!

প্রথম : ছিঃ ভাই, মালিককে অমন কথা বোলো না। কেউ শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। যাকগে, তারপর শোনো, আমাদের নাকে দড়ি বেঁধে কাজ করিয়ে মারে— একটু জিরোবার ফুরসতও পাই না— শুধু কাজ আর কাজ— সকাল নেই, বিকেল নেই, দুপুর নেই, সন্ধে নেই— শুধু কাজ আর কাজ! বলো দেখি ভাই— এত খাটুনিতে কারও শরীর টেকে?

বোকা : মালিককে এক্ষুণি ব'লে দাও— তোমরা এত বেশি কাজ করতে পারবে না— সবাই মিলে কাজ করা বন্ধ ক'রে দাও, ধর্মঘট করো—

প্রথম : কী যে বলো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝি না— যাকগে শোনো, তাও যদি দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পেতাম। বললে বিশ্বাস করবে না

ভাই, সারাদিনে মাত্র একবার খাই, তা-ও রোজ নয়, না খেয়ে খেয়ে শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে!

বোকা : বদমাইস একটা! তোমাদের না খাইয়ে রেখে নিজে পেট ভ'রে খাবে? পাজি, হতচ্ছাড়া, নচ্ছার!

প্রথম : তুমি দেখছি ভাই, অল্পতেই মাথা গরম করো— আরে শোনোই না সবটা—

বোকা : যত শুনছি ততই আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। শালা বজ্জাত।

প্রথম : আর যা খেতে দেয়, তোমায় কী বলবো ভাই— শুয়োরেও তা ছোঁবে না।

বোকা : মারো— শয়তানটাকে পাল্টা মার দিয়ে টিট করো—

প্রথম : যাঃ! কী সব আজেবাজে বকছো! কাকে মারবো—

বোকা : কেন? তোমাদের মালিককে?

প্রথম : না, না, একথা শোনাও পাপ—

বোকা : মারের বদলে মার দিতে হবে— খুনের বদলে খুন—

প্রথম : তুমি দেখছি আমার কোনো কথাই শুনতে চাও না— আমাকে বলতে দাও—

বোকা : আর কী বলবে তুমি? মালিক তোমাদের ওপর অত্যাচার করছে, তোমরা প্রতিশোধ নিতে পারো না?

প্রথম : কী যা তা বলছো তুমি! তুমি দেখছি ভীষণ হঠকারী! এই তো কিছুক্ষণ আগে এক বিরাট পণ্ডিতের সঙ্গে কথা হলো— এত এত বই পড়েছেন। আমার দুঃখের কথা শুনে তিনি বললেন— ধৈর্য ধরো— তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে! মানে এখনও অবস্থার উন্নতি ঘটার সময় হয়নি।

বোকা : তবে আর কবে সময় হবে? চিতায় ওঠার পর?

প্রথম : কী যে সব বলো— যতই বলো না কেন— মহাজ্ঞানীবাবুর মতন ভালো লোক আর হয় না। আমার দুঃখে কত কেঁদেছেন জানো?

বোকা : ঐ পণ্ডিতটাও একটা হাড়-হারামজাদা! মালিকের দালাল।

প্রথম : অত বড় পণ্ডিতকেও তুমি অমন কথা বললে? জানো তিনি কত শাস্ত্র পড়েছেন? কত মোটা মোটা বই পড়েছেন?

বোকা : ছাই পড়েছেন? ব্যাটা আসলে মহা ধড়িবাজ? পাণ্ডিত্য ফলিয়ে সবাইকে বোকা বানিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল করতে চায়।

প্রথম : না, না, ভাই। এমন ক'রে বোলো না— তুমি দেখছি আমার কোনো কথাই শুনতে চাও না, আগেই লাফাচ্ছো— শোনো না,

আমি যেখানে বাস করি, আমার সেই ঘরটা একেবারে ভাঙাচোরা স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা। শুয়োরের খোঁয়াড়ও এর থেকে ভালো— ঘরে একটা জানালা পর্যন্ত নেই।

বোকা : মনিবকে বলতে পারো না ঘরে একটা জানালা বসিয়ে দিতে?

প্রথম : আমি বললেই কি তিনি শুনবেন? আর ব'লেই-বা কী হবে?

বোকা : ঠিক বলেছো! ব'লে কিছু হবে না। পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে শালাকে!

প্রথম : আমি কি ভাই তাই বলেছি? আরে শোনোই না— এখনও শেষ হয়নি সবটা। মনিব আমাদের না খাইয়ে রেখেছে, তবু খাটা-খাটুনির বিরাম নেই— এত খেটেও তাঁর মন পাই না— তিনি আমাদের সবসময় বলেন ফাঁকিবাজ— আমরা না-কি কথা বেশি বলি, কাজ কম করি।

বোকা : শালাকে ধ'রে আগাপাস্তলা পেটাও, শালার বদমায়েসী চিরতরে ঘুচিয়ে দাও—

প্রথম : এত উত্তেজিত হচ্ছো কেন ভাই? কই, আমরা তো ধৈর্য ধ'রে আছি—

বোকা : কেন ধৈর্য? কীসের ধৈর্য? আর কত সইবে তোমরা? কেন রুখে দাঁড়াচ্ছো না?

প্রথম : আরে চুপ, চুপ! কে কোথায় শুনতে পাবে!

বোকা : এত ভয় কেন তোমাদের? মালিকের থেকে সংখ্যায় তোমরা অনেক বেশি! তবু কেন এমনভাবে ওদের জুলুম, ওদের অত্যাচার সহ্য করবে?

প্রথম : গাঁয়ের লোক দেখছি তোমাকে ঠিকই বলে— তুমি সত্যিই বোকা, একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ কোথাকার!

বোকা : চলো— সবাই মিলে চলো— এক্ষুণি চলো— শালা মালিকের মুণ্ডুখানা নামিয়ে দিই!

প্রথম : কী বলছো তুমি? পাগল হ'লে না-কি?

বোকা : আর ব'সে ব'সে মার খাওয়ার সময় নেই, চলো আজ প্রতিশোধ নেবো অত্যাচারের—

প্রথম : শোনো— কোথায় যাচ্ছো?

বোকা : তোমাদের মালিককে পেটাতে— তোমরা সবাই এসো—

প্রথম : কী আশ্চর্য! বিপদ বাঁধাবে দেখছি!

বোকা : পেটাও, দুনিয়ার সব অত্যাচারীদের আগাপাস্তলা পেটাও— খতম করো—

প্রথম ঃ কে কোথায় আছো? বাড়িতে একটা ডাকাত ঢুকেছে, শিগ্‌গির এসো—

[অন্য তিন দাস লাঠিসোটা নিয়ে ঢোকে]

অন্যেরা ঃ কই? কোথায় ডাকাত?

প্রথম ঃ ঐ যে— আমাদের মালিককে মারতে এসেছে—

অন্যেরা ঃ তবে রে শালা!

(ঝাঁপিয়ে পড়ে বোকার ওপর, বোকা প'ড়ে যায়)

প্রথম ঃ (চেঁচিয়ে ওঠে) মারো, মারো, ব্যাটাকে, একদম শেষ ক'রে দাও, শালা খুনী, গুণ্ডা, ডাকাত, দেশদ্রোহী, উগ্রপন্থী, হঠকারী, সমাজবিরোধী,— মারো, মারো শালাকে—

[মালিক ও জ্ঞানীর দ্রুত প্রবেশ]

মালিক ঃ কী ব্যাপার? কী হয়েছে? এত চেঁচামেচি কীসের?

প্রথম ঃ একটা ডাকাত বাড়িতে ঢুকেছে হুজুর— আপনাকে মারতে এসেছিল।

মালিক ঃ ডাকাত! কী সর্বনাশ! কই? কোথায়?

প্রথম ঃ আমিই তাকে প্রথম ধরেছি হুজুর। তারপর চিৎকার ক'রে সবাইকে ডেকে সবাই মিলে ব্যাটাকে পিটিয়ে মেরেছি। ঐ যে—

মালিক ঃ চমৎকার কাজ করেছিস। আমি খুব খুশি হলুম। (বোকার মৃতদেহে লাথি মেরে) শাল্‌লা!

প্রথম ঃ আপনি খুশি হয়েছেন হুজুর? এ যে আমার কত বড় সৌভাগ্য! শুনছো সবাই, শোনো— হুজুর আমার প্রশংসা করেছেন—

মালিক ঃ তোর বরাদ্দ এবার থেকে বাড়িয়ে দিলুম। এক টুকরোর বদলে তোকে দু'টুকরো ক'রে রুটি দেওয়া হবে।

প্রথম ঃ হুজুরের কত দয়া! জয় হুজুরের জয়!

অন্যেরা ঃ জয় হুজুরের জয়!

প্রথম ঃ (মহাজ্ঞানীকে) দেখেছেন হুজুর, আপনার কথাও কেমন ফ'লে গেল। আপনি বলেছিলেন ধৈর্য ধরো, ভগবান মুখ তুলে চাইবেন, অবস্থার উন্নতি হবেই—

জ্ঞানী ঃ হ্যাঁ, ঠিক তাই, ধৈর্য ধরো, অপেক্ষা করো, মাথা গরম ক'রে হঠাৎ কিছু ক'রে বসতে যেও না। আর ঐ সব খুনী বদমাস উগ্রপন্থী সমাজবিরোধীদের বেধড়ক পেটাও—

চার ক্রীতদাস ঃ মারো, খুন করো, খতম করো! জয়, হুজুরের জয়!

(সবাই ফ্রিজ)

[সাধারণ বেশভূষা ও রূপসজ্জায় সূত্রধারের প্রবেশ]

সূত্রধার ঃ না মহাশয়গণ, এখন আর ছড়া কেটে আপনাদের ফুর্তির খোরাক

জোগাতে আসিনি আমি। ল্যু-সুন কথিত রূপকথার এই অপরূপ নাটকে আনন্দ-উৎসবের জোয়ারের মাঝখানে ভয়ঙ্কর ব্যতিক্রমের মতো একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ প'ড়ে আছে। ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাওয়া ঐ ক্ষত-বিক্ষত শরীরটিকে দেখে আপনাদের কারুর কি পাশের বাড়ির অল্পবয়েসী ছেলেটার কথা মনে পড়ছে না? যে না-কি আপনারই দুঃখ-দুর্দশা দেখে ক্রোধে-ঘৃণায় উন্মাদ হয়ে ছুটে নেমে পড়েছিল লড়াইয়ের রাস্তায়, স্বর্গ-দখলের দুঃসাহসী সংকল্পে আক্রমণ করেছিল আপনারই শত্রুদের, আপনারই সুখ-শান্তি আর নিরাপত্তার জন্যে! তারপর যখন জিঘাংসু দানবেরা বীভৎসভাবে তাকে হত্যা ক'রে তার রক্তমাখা লাশ ছুড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল আপনারই দরজায়— তখন এই আপনিই হয়তো বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ঐ প্রাণহীন দেহটাকে ধিক্কার দিয়ে ব'লে উঠেছেন— হঠকারী, পাগল, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন ক'রে তুলেছে। কিংবা কে জানে, হয়তো এই আপনিই গোপনে মদত দিয়েছেন হত্যাকারীকে, গোপনে তার হাতে তুলে দিয়েছেন হত্যার অস্ত্র! আসলে কী জানেন— দাস মনোভাব হাজার হাজার বছর ধ'রে এখনও বাসা বেঁধে আছে বুকের ভেতর! সেইজন্যেই তো লেনিন বলেছেন ঃ

সবাই ঃ যে শোষিতশ্রেণী অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে না, হাতে অস্ত্র তুলে নেয় না, সে হলো গোলামের শ্রেণী, নোকরের শ্রেণী!

[শেষ কথাটি বারবার উচ্চারিত হয়। পর্দা পড়ে]

একাঙ্ক

ললাট লিখন

চরিত্র ঃ ১ম কন্‌স্টেবল, ২য় কন্‌স্টেবল, পুলিশ অফিসার, গাড়ু হাতে লোক, ১ম নাগরিক, ২য় নাগরিক, ৩য় নাগরিক, জননেতা, পুলিশের বড়কর্তা, বিপ্লবী যুবক।

[পর্দা খোলার আগে নেপথ্যে ঘোষণা ঃ "আঞ্চলিক থানা থেকে এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীদের জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে উগ্রপন্থীদের আবার তৎপরতার খবর পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং জনগণ সতর্ক হোন, উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপের সামান্যতম আভাস পেলেই নিকটবর্তী থানায় জানিয়ে দিয়ে আসবেন, যিনি সঠিক সংবাদ দিতে পারবেন, তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে, নামধাম গোপন রাখা হবে এবং সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। আজ থেকে এই অঞ্চলে উগ্রপন্থী-রাজনীতির কোনো প্রচার করা চলবে না, দেওয়ালে উগ্রপন্থী পোস্টার লাগানো চলবে না, কিংবা কোনো ধরনের ওয়ালিং করা চলবে না। কাউকে পোস্টার মারতে বা ওয়ালিং করতে দেখলেই বিনা বাক্যব্যয়ে গুলি ক'রে মারা হবে।"

ঘোষণাটি শেষ হ'তে না হ'তেই পর্দা খুলে যায়। আবছা অন্ধকার মঞ্চে কয়েকজনকে দেখা গেল। স্টেজের পেছনের পর্দায় তারা কী যেন আটকে দিয়ে দ্রুত চ'লে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ টর্চের আলো পর্দায় আঁটা কাগজটার ওপর পড়ে; সেখানে দেখা যায়— লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা— "নির্বাচনে মন্ত্রীবদল হয়, কিন্তু শোষণ বন্ধ হয় না।" —সঙ্গে সঙ্গে কলরব করতে করতে দু'জন পুলিশ কন্‌স্টেবল ও একজন অফিসার ছুটে আসে। মঞ্চ আলোকিত হয়]

১ম পুলিশ ঃ এই যে স্যার, এই যে— এখানে একটা।

অফিসার ঃ অ্যাঁ! এখানেও! কই?

২য় পুলিশ ঃ ঐ যে— নির্বাচনে মন্ত্রীবদল হয়! —ঐ তো।

অফিসার ঃ উরিস্‌ শালা! আবার এখানেও মেরে গেছে!

২য় পুলিশ ঃ এই একটু আগেই এখান দিয়ে গেলাম। —চোখে পড়লো না তো!

১ম পুলিশ ঃ তখন ছিল না। আমি সব-ক'টা দেওয়াল দেখতে দেখতে গেছি।

অফিসার ঃ তার মানে! এখুনি মেরে গেছে?

২য় পুলিশ ঃ হ্যাঁ স্যার। ঐ দেখুন— এখনও আঠা শুকোয়নি।

অফিসার ঃ ছেঁড়, ছেঁড়! ছিঁড়ে ফেল!

১ম পুলিশ ঃ আর কত ছিঁড়বো স্যার?

অফিসার ঃ কী?

১ম পুলিশ ঃ আমি একাই বোধহয় আজ এই দু'ঘণ্টায় ষাট-সত্তরখানা ছিঁড়েছি! আর কত ছিঁড়বো?

অফিসার ঃ (ক্রুদ্ধ) পোস্টার ছিঁড়বে না তো কী তোমাকে মুখ দেখে মাইনে দেওয়া হবে? ছেঁড়, বলছি।

১ম পুলিশ ঃ হুকুম করছেন যখন, ছিঁড়ছি। কিন্তু ছিঁড়ে কূল পাবেন না— ব'লে রাখলুম স্যার! (পোস্টার ছিঁড়তে এগিয়ে যায়। অফিসার রুমাল বের ক'রে ঘাম মোছে)

অফিসার ঃ উঃ, একদম আম-রক্ত বের ক'রে দিলে আজকে! নাঃ, এ খাটুনি আর পোষাচ্ছে না!

২য় পুলিশ ঃ হ্যাঁ স্যার! হাত একেবারে ছিঁড়ে পড়ছে। ওঃ, এই দু'ঘণ্টায় কম ছোটাছুটি হলো! তার ওপর পোস্টার ছেঁড়ো, ওয়ালিং দেখলেই আলকাত্‌রা দিয়ে লেপে দাও। দেখুন স্যার— জামাপ্যান্টে কত আলকাত্‌রার দাগ লেগেছে।

অফিসার ঃ পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছো যখন, তখন শুধু জামাপ্যাণ্ট কেন, চরিত্রেও দাগ লাগবে বাছাধন।
(১ম পুলিশ পোস্টারের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে) এ কী! এ যে একটা পোস্টার ছিঁড়তেই রাত কাবার করবে। —এই তোর হলো?

১ম পুলিশ ঃ না, স্যার!

অফিসার ঃ না স্যার? একটা পোস্টার ছিঁড়তে পারলি না এখনও? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করলি?

১ম পুলিশ ঃ ভাবছি স্যার। চিন্তা করছি।

অফিসার ঃ (প্রায় বিষম খায়) ভাবছে! পুলিশের লোক চিন্তা করছে!— আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো! ওরে শালা, যদি ভাবতেই শিখেছিস তো পুলিশের চাকরিতে না ঢুকে কবিঠাকুরের মতো রবি হ'তে পারতিস বাপ!

২য় পুলিশ ঃ কবিঠাকুর নয় স্যার রবিঠাকুর-– রবিঠাকুরের মতো কবি—

অফিসার ঃ ঐ একই হলো— রবিগুরু কবিঠাকুর—

২য় পুলিশ ঃ না স্যার— কবিগুরু—

অফিসার ঃ চোপ! ওপরওয়ালার মুখের ওপর কথা! বলছি— রবিগুরু কবিঠাকুর—

২য় পুলিশ ঃ ঠিক আছে স্যার! ঘাট হয়েছে স্যার— রবিগুরুই সই।

অফিসার ঃ কতবার শেখাবো রে তোদের— পুলিশের চাকরিতে ভাবতে নেই।

২য় পুলিশ ঃ কেন! ভাবতে নেই কেন?

অফিসার ঃ কেন? এ আবার জিগ্যেস করছে— কেন! ওরে হতভাগা এখানে কিছু জিগ্যেস করতেও নেই। যা বলবে, তা-ই করতে হবে— শুধুই হুকুম পালন!

২য় পুলিশ ঃ কেন স্যার?

অফিসার ঃ আবার বলে— কেন! ওরে, এই একটা বিরাট 'কেন'ই সবকিছু ভেঙে দিতে পারে। যেমন ধর, আজকে আমাদের ব'লে দিয়েছে— যেখানে যত নকশালী পোস্টার পাবে, সব ছিঁড়ে ফেলবে। এখন তুই যদি ভাবতে থাকিস— কেন ছিঁড়বো, পোস্টারগুলো কী দোষ করলো— তবে আর চাকরি থাকবে না। বুঝলি— এর নাম গণতন্ত্র। (১ম পুলিশকে) এ কী! এ যে এখনও ধ্যানস্থ হয়ে আছে! কী রে, নতুন প্রেমেট্রেমে পড়লি না-কি? —এখনও ভাবছিস?

১ম পুলিশ ঃ হ্যাঁ স্যার!

অফিসার ঃ কী এত ভাবছিস রে মাথামোটা?

১ম পুলিশ ঃ কোন্ দিক দিয়ে ছিঁড়বো, তা' বুঝতে পারছি না!

অফিসার ঃ (চমকে ওঠে) অ্যাঁ! —এইবার আমি শুধু অজ্ঞান নয়, একেবারে হার্টফেল করবো! —পোস্টারটা ও কোন্দিক দিয়ে ছিঁড়বে বুঝতে পারছে না। এরা কি পুলিশ, না— টুপি পরা জাম্বুবান! কোন্দিক দিয়ে ছিঁড়বি কী রে শালা?

১ম পুলিশ ঃ পেরেছি, এইবার বুঝতে পেরেছি। ছিঁড়ে ফেলি! (একটানে ছিঁড়ে ফেলে)

অফিসার ঃ বাঁচিয়েছো বাপ! এবার চলো!

১ম পুলিশ ঃ ইস্, হাতে আঠা লেগে গেছে! কী বিশ্রী গন্ধ!

অফিসার ঃ পুলিশের হাতে বিশ্রী গন্ধ হবে না তো কি গোলাপ ফুলের খুশবু বেরুবে?

২য় পুলিশ ঃ (১ম পুলিশকে) এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলে কেন?

১ম পুলিশ ঃ রেস্ট্ নিচ্ছিলাম।

২য় পুলিশ ঃ রেস্ট্?

১ম পুলিশ ঃ হ্যাঁ, একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি ছিঁড়লে শালা সঙ্গে সঙ্গেই দৌড় করাতো।

অফিসার ঃ (হঠাৎ) ঐ দ্যাখ্— শালারা বেশি দূর যেতে পারেনি।

১ম পুলিশ ঃ মানে?

অফিসার ঃ এইমাত্র পোস্টার মেরেছে বললি না? ঐ দ্যাখ্ একজন রাস্তার ধারে ব'সে রয়েছে। শিগ্গির আয়।

২য় পুলিশ ঃ স্যার—

অফিসার ঃ কী হলো?

২য় পুলিশ ঃ খালি হাতে যাবো স্যার?

অফিসার ঃ খালি হাতে কী রে শালা? তিনজনের হাতেই বন্দুক আছে।

১ম পুলিশ ঃ মাত্র তিনজন স্যার? থানা থেকে আরও কিছু লোক নিয়ে এলে হয় না?

অফিসার ঃ ততক্ষণে পাখি উড়ে যাবে। শিগ্গির চল্। অ্যারেস্ট করবো।

২য় পুলিশ ঃ কাজটা কি ঠিক হচ্ছে স্যার? ওদের কাছে যদি বোমা থাকে—

১ম পুলিশ ঃ এত কাছে ব'সে আছে যখন, তখন নিশ্চয়ই দেখেছে স্যার— আমিই পোস্টার ছিঁড়েছি। আমাকেই যদি প্রথমে ঝেড়ে দেয়—

অফিসার ঃ তোদের এত ভয় কেন রে? পুলিশে চাকরি করতে এসেছিস, দেশ ও জাতির স্বার্থে নকশাল ঠেঙাচ্ছিস, তবু একটু দেশপ্রেম নেই? চল্, চল্, ধরতে পারলে প্রমোশন হবে—

২য় পুলিশ ঃ সে তো আপনার হবে, আমাদের কী!

অফিসার ঃ ঠিক আছে— তোদের পুলিশপদক দেওয়া হবে— এখন চল্।

১ম পুলিশ ঃ ওসব পদকটদক অফিসাররাই পায়। আমরা জান দেবো, আর প্রাইজ পাবেন আপনি।

অফিসার ঃ আঃ, চাপো, চাপো! দেশ ও জাতির সঙ্কটকালে পুলিশের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্য অত্যাবশ্যক! মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনিসনি? তাড়াতাড়ি চল্ বাপ, ভাগ্য ভালো এখনও ব'সে আছে। চল্।

২য় পুলিশ ঃ না গেলে তো চাকরি যাবে। চলুন।

১ম পুলিশ ঃ কি গুখুরি ক'রেই যে পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছি!

অফিসার ঃ তোরা এত ভয় পাস কেন রে? ভয় কীসের? এই তো আমি তোদের পেছনেই আছি—

১ম পুলিশ ঃ (২য় পুলিশকে) শালা মহা ধড়িবাজ! সামনে আমাদের এগিয়ে দিয়ে, নিজে রইলো পেছনে!

২য় পুলিশ ঃ আর কী বলবো! অফিসার মাত্রই তাই!

অফিসার ঃ যতই হোক পুলিশের কাজ মানেই দেশের কাজ। দেশের কাজে কি ভয় পেলে চলে? চল্‌।

[আগে দু'জন কন্‌স্টেবল ও পরে অফিসার সন্তর্পণে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হ'তে আবারও কারা যেন ভেতরে ঢুকে পেছনের পর্দায় কী একটা লাগিয়ে দিয়ে যায়। মঞ্চ আলোকিত হ'লে দেখা যায় আরেকটি পোস্টার— "সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া শোষিত শ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব— লেনিন"। ক্ষণপরে দুই কন্‌স্টেবল ও অফিসার— গাড়ু হাতে লুঙ্গি-পরা এক মাঝবয়েসী লোককে বন্দুক উঁচিয়ে উর্দ্ধবাহু অবস্থায় তাড়িয়ে নিয়ে ঢোকে]

অফিসার ঃ হ্যাণ্ডস্‌ আপ! হাত নামালেই একদম গুলি ক'রে দেবো!

লোকটা ঃ (প্রচণ্ড ক্রোধে) কী! কী পেয়েছো তোমরা? ইয়ার্কি হচ্ছে? এটা কি জুলুমবাজি? জুলুমের রাজত্ব?

২য় পুলিশ ঃ কী রকম খেপে রয়েছে লোকটা! একটু ভয়ডরও নেই?

১ম পুলিশ ঃ শালা পাক্কা নকশাল। না হ'লে এত সাহস হয় না!

লোকটা ঃ এ কী রাজত্বে বাস করছি রে বাবা! নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ইয়েও করতে পারবো না?

অফিসার ঃ এত রাত্তিরে রাস্তার ধারে ব'সে কী করা হচ্ছিল চাঁদ?

লোকটা ঃ কী আবার করবো! ভগবানের নাম করছিলাম, গীতা পড়ছিলাম,— ব্যাস্‌!

অফিসার ঃ ভগবানের নাম করছিলে? রাত্তির বেলা? শালা মাম্‌দোবাজি! ঠিক ক'রে বল্‌— কী করছিলিস, না হ'লে এক্ষুণি ঝেড়ে দেবো—

লোকটা ঃ আবার বলে— কী করছিলিস! গাড়ু হাতে নিয়ে রাস্তার ধারে ব'সে লোকে কি করে জানো না? —এই বুদ্ধি নিয়ে পুলিশে ঢুকেছো?

অফিসার ঃ (বিস্ময়ে) অ্যাঁ! গাড়ু হাতে নিয়ে—

২য় পুলিশ ঃ ও, তার মানে আপনি—

১ম পুলিশ ঃ রাস্তার ধারে ব'সে ইয়ে করছিলেন! তাই বলুন!

লোকটা ঃ এতক্ষণে বুঝেছো বাবারা! বলিহারি তোমাদের বুদ্ধি! এই না হ'লে পুলিশের মাথা! —তা তোমাদের জ্বালায় কি এবার ইয়ে করার পাটও তুলে দিতে হবে না-কি?

২য় পুলিশ ঃ ইস্‌! বড্ড ভুল হয়ে গেছে স্যার— বড় বাজে জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি—

লোকটা : তোমাদের জমানায় জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে, তা'তে খাওয়াদাওয়াই ঘুচে গেছে— এখন দেখছি ইয়ে করাও ছেড়ে দিতে হবে—

অফিসার : বাজে বকবেন না!

লোকটা : বাপের জম্মে শুনিনি— পুলিশ এসে ইয়ে করায় বাধা দেয়! কেন— ইয়ে করা নিষিদ্ধ ক'রে কোনো আইন পাশ হয়েছে না-কি? না-কি সংবিধান সংশোধন ক'রে 'ইয়ে' করাকে দেশদ্রোহিতা বলা হয়েছে?

অফিসার : জানেন— এই রাস্তার মাঝখানে ব'সে— মানে লোকালয়ে ব'সে ঐ অশ্লীল অপকম্মোটি করার জন্যে আপনাকে পাঁচ আইনে গ্রেপ্তার করতে পারি?

লোকটা : ইস্, বললেই হলো! রাস্তায় করবো না তো কি তোমার বাড়িতে যাবো?

অফিসার : জানেন, এইসব কাজের জন্যে কোলকাতার সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে—

লোকটা : কথার ছিরি দ্যাখো না— সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে! কেন হবে না শুনি? ঐ তো বস্তিবাড়িটায় থাকি, তেইশ ঘরে একটা বাথরুম! রাস্তায় আসবো না তো কি লাটভবনে যাবো?

অফিসার : চার আনা পয়সা দিন।

লোকটা : কী?

অফিসার : ফাইন। চার আনা দিন। নয়তো গ্রেপ্তার করবো।

লোকটা : পয়সা! পয়সা কোত্থেকে পাবো?

অফিসার : যেখান থেকে পারেন দিন। নয়তো সোজা চালান ক'রে দেবো।

লোকটা : 'ইয়ে' করার অপরাধে?

অফিসার : মোটেই না। স্রেফ উগ্রপন্থী ব'লে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো! মিসায় থাকুন পাঁচ বছর!

লোকটা : ওরে বাবা, না, না!— এই নাও। পনেরো পয়সা ট্যাঁকে আছে, বিড়ি কেনার জন্যে রেখেছিলাম। —এবার আমায় ছাড়ো দেখি। ছি ছি—কোন্ দেশে বাস করছি রে বাবা. ইয়ে করার জন্যেও ঘুষ দিতে হয়?

অফিসার : ঘুষ নয়, ঘুষ নয়— এর নাম সমাজতন্ত্রের ট্যাক্সো! (পকেটে পয়সা পোরে)

লোকটা : খুব বুঝেছি! এবার আমার যেতে দাও দেখি!

অফিসার : পয়সা যখন দিয়েছেন, তখন ইচ্ছে করলে আগের জায়গায় আবার বসতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই।

লোকটি ঃ রক্ষে করো বাবা! আবার? ইয়ে করা আমার মাথায় উঠে গেছে! ছি ছি ছি— এ কী রাজত্বে বাস করছি রে বাবা— ইয়ে করতেও ট্যাক্সো লাগে— ছিঃ! [প্রস্থান]

২য় পুলিশ ঃ (১ম পুলিশকে) কেমন মুফতে পনেরো পয়সা পকেটে পুরলো দেখলে?

১ম পুলিশ ঃ হ্যাঁ— একটা সিগারেটের খরচ তুলে নিলো।

২য় পুলিশ ঃ শকুন, একেবারে শকুন! পয়সা দেখলে হয়! পনেরো তো পনেরোই সই!

অফিসার ঃ ছি ছি ছি! উগ্রপন্থীদের ধরতে এসে এ কী কাণ্ড! শেষকালে কি-না— পুলিশবাহিনীর মানসম্মান, সব গেল দেখছি! চল্ চল্ অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

২য় পুলিশ ঃ (হঠাৎ পেছনের লেখাটা দেখতে পেয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে)— স্যার!

অফিসার ঃ বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠলো! কী? কী হয়েছে? ষাঁড়ের মতো চেঁচাস কেন?

২য় পুলিশ ঃ ঐ দেখুন স্যার— আবার মেরে গেছে!

অফিসার ঃ (কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্তি হয় না) কী ক'রে হলো?

২য় পুলিশ ঃ অ্যাঁ!

অফিসার ঃ কী ক'রে মারলো এটা? আগের পোস্টারটা নিশ্চয়ই ছিঁড়িসনি।

১ম পুলিশ ঃ না স্যার, সত্যি ছিঁড়েছি। ঐ দেখুন, ছেঁড়া পোস্টার প'ড়ে রয়েছে।

অফিসার ঃ তাই তো! তবে এটা মারলো কখন?

১ম পুলিশ ঃ ঐ যে— যে সময়টায় ঐ লোকটাকে ধরতে গেলাম, তখনই বোধহয়—

অফিসার ঃ সে তো দু'এক মিনিটের ব্যাপার! ....তার মানে নিশ্চয়ই ওরা কাছাকাছিই রয়েছে—

২য় পুলিশ ঃ (চমকে) স্যার— ফিরে চলুন স্যার!

অফিসার ঃ উঃ! আবার বুকটা কেমন ক'রে উঠলো। কেন, ফিরে যাবো কেন?

২য় পুলিশ ঃ কাছাকাছি রয়েছে বললেন যে! যদি কিছু করে— আমরা তো মোটে তিনজন—

অফিসার ঃ তোরা তো দারুণ ভীতু রে! (১ম পুলিশকে) এই, পোস্টারটা ছিঁড়ে ফ্যাল্!

১ম পুলিশ : এতগুলো তো আমিই ছিঁড়লাম স্যার।
অফিসার : এটাও যে তোমাকেই ছিঁড়তে হবে বাপ!
১ম পুলিশ : আমার ঘরে বালবাচ্চা আছে স্যার! সব না খেয়ে মরবে, আমি পারবো না!
অফিসার : কী? পুলিশবাহিনীর শৃঙ্খলাভঙ্গ! তোমার নামে রিপোর্ট করবো শালা!
১ম পুলিশ : করুন গে রিপোর্ট! এখন মিছিমিছি বেঘোরে প্রাণ দেবো কেন? ওরা নিশ্চয়ই খুব কাছেই লুকিয়ে আছে। আমাকে পোস্টার ছিঁড়তে দেখলে কি ছেড়ে কথা বলবে?
অফিসার : সব ক'টা ভীরু কাপুরুষ! একটু দেশপ্রেম নেই! (২য় পুলিশকে) যাও, তুমি ছিঁড়ে এসো!
২য় পুলিশ : আমার হাতে ব্যথা!
অফিসার : কী?
২য় পুলিশ : হাতটা খুব টনটন করছে! এতক্ষণ ধ'রে আমিই ওয়ালিংগুলো মুছেছি যে!
অফিসার : দেখেছো কাণ্ড! একটা পোস্টার ছিঁড়তে সব ভয়ে মরলো!
১ম পুলিশ : আপনিই ছিঁড়ুন না! আপনার তো কোনো ভয়ডর নেই।
অফিসার : বেশ। আমিই ছিঁড়ছি। ভয় কীসের? সামান্য একটা পোস্টার ছিঁড়বো, তার জন্যে আবার ভয়! (এগোবার জন্যে পা বাড়িয়ে থমকে যায়। ১ম পুলিশকে) এই তুমি, রাইফেলটা উঁচু ক'রে বাগিয়ে ধরো আর বাঁ দিকে চোখ রাখো (২য় পুলিশকে) ঠিক মতো বন্ধুকটা ধর শালা— ডান দিকটা দ্যাখ! এবার আমি এগুচ্ছি কিন্তু। কেমন? এগুই? (একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে)
২য় পুলিশ : ভাববেন না স্যার, আমরা দেখছি। আপনি এগোন।
অফিসার : হ্যাঁ, এই এগোই? তোমরা কিন্তু রেডি থাকবে, কোনো সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। একটুও ভয় পেয়ো না, বুঝলে? এবার আমি এগুবো, রেডি তো?
১ম পুলিশ : হ্যাঁ স্যার— একটুও ভয় করবেন না— আমরা তৈরি।
অফিসার : (ক্ষীণস্বরে) না, না, ভয় কীসের? একটুও ভয় করতে নেই! ভয় করবো কেন?
২য় পুলিশ : আপনি এগুচ্ছেন না কেন স্যার? যান! এগোন!
অফিসার : এই যাচ্ছি! তোমরা তৈরি থেকো, কেমন? (খুব সন্তর্পণে এগোয়)
২য় পুলিশ : (হঠাৎ বিকট স্বরে) স্যা—র!

অফিসার ঃ (ভীষণভাবে চমকে) কে? কে? এক্ষুণি মারা যেতাম! ডাকলে কেন?

২য় পুলিশ ঃ (দর্শকদের দিকে দেখিয়ে) এই দিকটা কে দেখবে স্যার?— আমরা তো মোটে তিনজন।

অফিসার ঃ অ্যাঁ! —ঠিক বলেছো তো! —চলো, থানা থেকে ফোর্স নিয়ে আসি।

১ম পুলিশ ঃ সে কী স্যার! একটা পোস্টার ছেঁড়ার জন্যে থানা থেকে ফোর্স আনবেন? লোকে হাসবে যে!

অফিসার ঃ তা'ও তো বটে! তবে কী করা যায় বলো দেখি?— এই দিকটা কে দেখবে?

১ম পুলিশ ঃ এক কাজ করুন স্যার!— আপনিই বরং পেছন ফিরে এই দিকটা দেখতে দেখতে উল্টোমুখে হেঁটে যান। পেছনে তো দেওয়াল, ওদিক দিয়ে আর কে আসবে?

অফিসার ঃ গুড আইডিয়া, ভেরি গুড। সেইভাবেই যাই— কেমন? ভয় কীসের? তোমরা কিন্তু একদম ভয় পেয়ো না। কাউকে দেখলেই গুলি করবে। (উল্টোমুখে ভয়ে ভয়ে হাঁটতে গিয়ে পেছনের দেওয়াল অর্থাৎ পর্দায় ধাক্কা খায়) কে? কে ধাক্কা দিলো?

১ম পুলিশ ঃ কিছু না স্যার! দেওয়াল! এবার ছিঁড়ে ফেলুন পোস্টারটা!

অফিসার ঃ ও, তাই বলো! (পোস্টার ছিঁড়ে) দেখলে তো, আমি একটুও ভয় পাইনি। চলো, যাওয়া যাক।

২য় পুলিশ ঃ আবার পোস্টার ছিঁড়তে যাবো?

অফিসার ঃ নিশ্চয়ই। ওপরের অর্ডার। উগ্রপন্থীদের সব পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে হবে। চলো সব। (এগিয়ে যায়)

১ম পুলিশ ঃ স্যার—

অফিসার ঃ আঃ, আবার পেছু ডাকলে কেন? শুভ কাজে যত অলক্ষুণে কারবার!

১ম পুলিশ ঃ বলছিলাম কী, ওরা যদি কাছেপিঠেই থাকে, তবে এই আশপাশের বাড়িগুলোতেই আছে নিশ্চয়ই ঘাপ্‌টি মেরে। চলুন না সেখান থেকেই ওদের পাকড়াও ক'রে আনি।

অফিসার ঃ ঠিক বলেছো! এটাই করতে হবে। নয়তো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা একবার ক'রে পোস্টার ছিঁড়বো, আর ওরা লাগাবে;— এমন কাণ্ড আর কতক্ষণ সহ্য করবো? চলো, বাড়ি বাড়ি তল্লাশী করি গে!

২য় পুলিশ : (১ম পুলিশকে) সে কী, এই তুমি পোস্টার ছিঁড়তে ভয়ে মরছিলে, এখন যে বাড়ি বাড়ি যেতে চাইছো?

১ম পুলিশ : দুর, দুর! এইভাবে শুধু শুধু পোস্টার ছিঁড়তে ভালো লাগে? এক পয়সা আমদানী নেই, বেগার খেটে মরা! তার চেয়ে বাড়ি বাড়ি ঢুকলে, আর কিছু না হোক, কিছু মালপত্তর তো হাতানো যাবে।

২য় পুলিশ : এটা অবশ্য মন্দ বলোনি। গতবার তল্লাশীর সময় আমিও গোটা-তিনেক ঘড়ি ঝাঁপতে পেরেছিলাম!

১ম পুলিশ : আমি অবশ্য ঘড়ি নিইনি, আমি ঝেড়েছিলাম একটা জাপানী ট্র্যানজিস্টার। বৌয়ের খুব সখ ছিল।

অফিসার : চলো হে, দেখি শয়তানগুলোকে ধরা যায় কি-না! অবশ্য ধরতে না পারলেও ক্ষতি নেই— যার বাড়িতে যা পাবো, তুলে নিয়ে আসবো, কিছু ফালতু ইনকামও হবে!

১ম পুলিশ : ল্যাও ঠ্যালা! এ শালা— যা জুটবে, সবই নিজে নেবে। আমাদের খেটে মরাই সার!

২য় পুলিশ : বলেছিলাম না, শকুন— পুরোদস্তুর শকুন একটা!

[তিনজনে বেরিয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়। অন্ধকারের মধ্যেই কারা যেন পর্দায় আবারও পোস্টার লাগিয়ে দিয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত বাদে আলোকিত মঞ্চে জনা তিনেক নানা বয়েসী লোককে হাত ধ'রে টানতে টানতে তিন মূর্তিমানের প্রবেশ। পেছনের পর্দায় স্পর্ধিত ঘোষণা—"গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি গড়ো। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরো।"]

১ম পুলিশ : স্যার— আবার মেরে গেছে!

অফিসার : এ্যাঁ! এইবার— এইবার আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাবো।

২য় পুলিশ : কখন মারলো? এই তো একটু আগেই এখানে ছিলাম, এরই মধ্যে মেরে গেল!

অফিসার : যুদ্ধ! একটা অঘোষিত যুদ্ধ! গেরিলা যুদ্ধ চলছে যেন! যতবারই পোস্টার ছিঁড়ি, ততবারই যেন শালারা কোন্ যাদুমন্ত্রে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পোস্টার মেরে যায়।

১ম পুলিশ : যেই স্যার ঘোষণা করা হয়েছে পোস্টার মারা বেআইনী, অমনি যেন সারা শহর জুড়ে পোস্টার পড়তে শুরু করেছে অগুন্তি— ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাত ব্যথা হয়ে গেল, তবু শালা পোস্টার মারার বিরাম নেই!

২য় পুলিশ : আমার হাতটা দ্যাখ— আল্‌কাতরা লেগে লেগে আঙুলগুলো কেমন হয়ে গেছে— হাতে ফোস্কা প'ড়ে গেছে—

অফিসার : যাও, এই পোস্টারটাও ছিঁড়ে ফ্যালো!

১ম পুলিশ : আবার আমি স্যার?

অফিসার : হ্যাঁ রে শালা তুই! আগেরটা তবু আমি ছিঁড়েছি। এটা তোকেই ছিঁড়তে হবে—

২য় পুলিশ : আমাদের কেন বিপদে ফেলছেন স্যার? যাদের ধ'রে এনেছি, তাদের দিয়েই ছেঁড়ান না স্যার—

অফিসার : এটা অবশ্য মন্দ বলিসনি। মরলে এরাই মরবে, আমাদের গায়ে আঁচড়টি পড়বে না—

১ম পুলিশ : হ্যাঁ স্যার— ঝাড় খেলে জনতা খাবে, আমাদের কী!

অফিসার : এবং তার ফলে জনতা এবং উগ্রপন্থীদের মধ্যে বিরোধ বাঁধবে! গুড আইডিয়া! এই যে বাছাধনেরা— এদিকে এসো দেখি সবাই!

১ম নাগরিক : আমাদের নিয়ে কী করতে চান আপনারা?

২য় নাগরিক : বিনা কারণে রাত্তিরবেলা বাড়ি থেকে ধ'রে নিয়ে এলেন কেন?

১ম নাগরিক : আমরা তো কোনো বেআইনী কাজ করিনি, তবে আমাদের এভাবে হ্যারাস করার মানে কী?

অফিসার : আস্তে আস্তে। অত উঁচু গলায় কথা বললে নিজেদের আখেরেই ক্ষতি হবে যে!

৩য় নাগরিক : কী আর ক্ষতি হবে? বাড়ির দরজা ভেঙে বিছানা থেকে তুলে এনেছো যখন, তখন যে জামাই আদর করার জন্যে আনোনি, সে বেশ বুঝতে পারছি।

২য় পুলিশ : তুই থাম্ বুড়ো। বেশি ত্যাণ্ডাইম্যাণ্ডাই করলে বুঝবি মজা!

১ম নাগরিক : আমার বাড়ি থেকে বাক্সপ্যাঁট্‌রা খুলে তিনটে সোনার গয়না নিয়ে এসেছেন কেন?

অফিসার : ওগুলো বাজেয়াপ্ত হলো!

১ম নাগরিক : সোনার গয়না কি বোমা, না পাইপগান, যে বাজেয়াপ্ত হবে?

অফিসার : চোপ, আবার মুখে মুখে কথা!

২য় নাগরিক : আমার বাড়ি থেকেও পাঁচটা কাঁসার বাসন এনেছেন—

অফিসার : বেশ করেছি। সব তদন্তের কাজে লাগবে। বেশি কথা বললে ভেতরে ঢুকিয়ে দেবো!

৩য় নাগরিক : এটা একটা জঙ্গলের রাজত্ব! কাউকে কিচ্ছু বলার নেই।

২য় পুলিশ : বড্ড বেশি কথা বলিস বুড়ো— দেখি তোর পকেটটা— (জোর ক'রে হাত গলায়) এ কী, মোটে বারো আনা!

৩য় নাগরিক ঃ পুলিশ দেখছি পকেটমারেরও কান কাটে।

২য় পুলিশ ঃ আবার কথা?— যা এটাও বাজেয়াপ্ত হলো।

অফিসার ঃ (২য় পুলিশকে) এ্যাই, এ্যাই— বেআইনী কাজ হচ্ছে। সমস্ত বাজেয়াপ্ত মাল আমার কাছে থাকবে। দে! (কেড়ে নিয়ে নিজের পকেটে পোরে)।

২য় পুলিশ ঃ (১ম পুলিশকে) কী হারামী দেখেছো! আস্ত শকুন! সোনার গয়না, বাসনকোসন সব নিজে নিলো। মোটে বারো আনা পয়সা আমি নিচ্ছিলাম, তা'ও সইলো না!

১ম পুলিশ ঃ নকশালরা এই শালাকে মারতে পারে না!

২য় নাগরিক ঃ আমাদের ধ'রে এনেছেন কেন? আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?

অফিসার ঃ থাম্ শালারা! অভিযোগ কী পরে শুনবি, আগে ঐ পোস্টারটা ছেঁড়!

সবাই ঃ (বিস্ময়ে) কী ছিঁড়বো? পোস্টার? (ধৃতদের মধ্যে গুঞ্জন)

২য় নাগরিক ঃ আবার ওরা পোস্টার মেরেছে?

৩য় নাগরিক ঃ ওরা তালে একেবারে শেষ হয়নি? আবার আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে?

১ম নাগরিক ঃ তার মানে আবার খুনজখম হবে? রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে পারবো না?

৩য় নাগরিক ঃ খুন-জখম এখন হচ্ছে না? মাস্তানরা হামলা করে না? পুলিশ কি জনদরদী হয়ে গেছে? খুব শান্তিতে আছো?

১ম নাগরিক ঃ চুপ! আস্তে! শুনতে পাবে।

অফিসার ঃ কী হলো? দাঁড়িয়ে রইলি কেন? পোস্টারটা ছেঁড়।

২য় নাগরিক ঃ কেন? আমরা কেন পোস্টার ছিঁড়বো? আমরা কোনো পার্টি করি না। ছিঁড়তে হ'লে আপনারা ছিঁড়ুন।

অফিসার ঃ আমার হুকুম! পোস্টার ছিঁড়তে হবে!

৩য় নাগরিক ঃ এ কী জুলুম, গা-জোয়ারী?

অফিসার ঃ হ্যাঁ রে বুড়ো ভাম, গা-জোয়ারী। আমাদের হাতে এখন ক্ষমতা। যা বলবো, তা-ই করবি।

১ম নাগরিক ঃ অতই যখন ক্ষমতা— নিজেরাই তো ছিঁড়তে পারেন।

অফিসার ঃ না, তোমরাই ছিঁড়বে। কারণ আমরা দেখাতে চাই— জনতাই উগ্রপন্থীদের পোস্টার স্বেচ্ছায় ছিঁড়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ জনতা ওদের চায় না।

৩য় নাগরিক ঃ বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পোস্টার ছিঁড়িয়ে বলবে— জনতা স্বেচ্ছায় ছিঁড়েছে?

অফিসার ঃ হ্যাঁ তাই! ইস্, একজন ফোটোগ্রাফার থাকলে ফোটো তুলে কাগজে ছেপে দিতাম— উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে জনতার প্রতিরোধ হেডিং দিয়ে—

৩য় নাগরিক ঃ সাদা পোষাক পরা আই.বি.-দের দিয়েও ছেঁড়াতে পারো। ওদেরও জনতা জনতা লাগবে!

অফিসার ঃ তখন থেকে খালি বড় বড় কথা। ছিঁড়বি কি-না বল্?

৩য় নাগরিক ঃ যদি না ছিঁড়ি—

অফিসার ঃ সব ক'টাকে বেধড়ক ঝাড় দিয়ে ভ্যানে তুলবো!

৩য় নাগরিক ঃ বাহ্বা, চমৎকার! এর নাম পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র!

১ম নাগরিক ঃ (৩য় নাগরিককে) চুপ করুন দাদা, কেন নিজের বিপদ বাড়াবেন?

৩য় নাগরিক ঃ বিপদ! আর কী বিপদ হ'তে পারে? একাত্তরে যখন আমার জোয়ানমদ্দ ছেলেটাকে থানার লক্-আপে পিটিয়ে মারলো, তখনও যদি কোনো বিপদ না হয়ে থাকে, এখন আর নতুন ক'রে কী হবে?

অফিসার ঃ ও শালা, তোমার ছেলে নকশাল ছিল, নকশালের বাপ তুমি!

৩য় নাগরিক ঃ হ্যাঁ, সেই ছেলেকে জন্ম দিয়েছি ব'লে আজও গর্বে আমার বুক ভ'রে ওঠে। নয়তো তোমার মতো ছেলের বাপ হ'লে লজ্জায় ঘেন্নায় কবে গলায় দড়ি দিতাম!

অফিসার ঃ কী এত বড় কথা! শালাকে মেরেই ফেলবো। (অফিসার মারতে যায়. অন্যেরা আটকায়)

১ম নাগরিক ঃ (অফিসারকে) ছেড়ে দিন দাদা। ছেলে মারা যেতে ভদ্রলোকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

২য় পুলিশ ঃ (অফিসারকে) চেপে যান স্যার। চেপে যান। কে কোথায় রিপোর্ট ক'রে দেবে, কে জানে—

অফিসার ঃ রিপোর্ট করবে মানে! কীসের রিপোর্ট?

২য় পুলিশ ঃ মানে, এই সোনার গয়নাটয়না হাতিয়েছেন— দিনকাল তো ভালো নয়! কে কার ইয়েতে কখন কাঠি দেবে কে জানে— কেঁচো খুড়তে সাপ বেরুবে!

অফিসার ঃ কিন্তু এই বুড়ো আমায় অপমান করেছে!

১ম পুলিশ ঃ পুলিশের চাকরিতে ওসব গায়ে মাখতে নেই স্যার—

২য় পুলিশ ঃ এদিকে আসুন স্যার, মাথা ঠাণ্ডা করুন— (অফিসারকে ওরা দু'জন অন্যদিকে নিয়ে যায়)

৩য় নাগরিক : আর কত সহ্য করবো? সহ্য ক'রে ক'রে তো গায়ে গণ্ডারের চামড়া গজিয়েছে—

১ম নাগরিক : কেন এসব বলছেন দাদা? আমরা বিপদে পড়বো।

৩য় নাগরিক : খুব সুখে আছো তোমরা, না? সব অভাব-অনটন ঘুচে গেছে তোমাদের, তাই না? এই যে এতগুলো ছেলে মরলো, কাদের জন্যে মরলো? কাদের ভালো করতে গিয়ে? কাদের ভাত-কাপড়ের অভাব ঘোচানোর জন্যে তারা ঘর ছেড়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে এসেছিল? একবারও তা ভেবে দেখবে না?

২য় নাগরিক : আস্তে। ওরা শুনতে পেলে ঝামেলা করবে কিন্তু!

৩য় নাগরিক : রাস্তাঘাটে যখন ওদের রক্তাক্ত শরীরগুলো ছড়িয়ে প'ড়ে ছিল, তখন কেউ একজনও প্রতিবাদ করেছিলে? কেউ একজনও এগিয়ে এসেছিলে ওদের বাঁচাতে?

১ম নাগরিক : কথা বাড়ালেই গণ্ডগোল বাঁধবে। থামুন দাদা।

অফিসার : এই যে, ঐ বুড়ো পাগলটা না হয় থাক্, কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ গিয়ে পোস্টারটা ছিঁড়ুন, শিগ্‌গির।

১ম নাগরিক : আবার আমরা কেন স্যার? আপনারাই ছিঁড়ুন না।

অফিসার : বেশি কথা বলবি না শালা! যা বলছি তা-ই কর্!

৩য় নাগরিক : এর নাম গণতন্ত্র! সবার না-কি এখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে! অথচ বিশেষ একটা দলকে পোস্টার মারতে দেওয়া হবে না, তাদের কথা বলতে দেওয়া হবে না! চমৎকার ব্যবস্থা!

অফিসার : এই পাজি বুড়োটা তখন থেকে দেখছি পেছনে লেগেছে!

১ম নাগরিক : স্যার, আপনাদের হাতে বন্দুক, আপনারাই যদি ছিঁড়তে ভয় পান, তবে আমরা কোন্ সাহসে ছিঁড়বো?

অফিসার : বলছি তো, সবার নিরাপত্তার আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি—

৩য় নাগরিক : তোমাদের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি কে দেয়— তার ঠিক নেই—

২য় নাগরিক : আমাদের কাঁধে বন্দুক রেখে আর কতদিন ফায়ার করবেন?

[নেতার প্রবেশ]

নেতা : কী ব্যাপার! শুনলাম— আমার পাড়া থেকে বিনা কারণে কিছু নিরীহ লোককে ধ'রে এনেছেন?

অফিসার : না ধ'রে উপায় কী স্যার? ঐ দেখুন না—

নেতা : এ কী! উগ্রপন্থীদের পোস্টার! আমারই এলাকায়? কী ক'রে সম্ভব হলো?

অফিসার : সেই কথাটা জানার জন্যেই তো এদের ধ'রে এনেছি।

২য় নাগরিক : আমরা কী ক'রে বলবো— কারা পোস্টার মেরেছে? আপনারা তো পুলিশ, আপনাদেরই তো জানার কথা!

নেতা : ঠিকই তো! মিছিমিছি এদের ধ'রে এনেছেন! আপনাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? এরা নিরীহ, গোবেচারা—

অফিসার : এরা মোটেই নিরীহ নয় স্যার, সব ক'টা একেবারে পাজির পা ঝাড়া! পোস্টারটা কোনো শালা ছিঁড়তে চাইছে না।

নেতা : সে কী কথা? আপনারা কি মনে মনে উগ্রপন্থীদের সমর্থন করেন না-কি?

১ম নাগরিক না না, সেজন্য নয়। এটা ছিঁড়লে আমাদের যদি কোনো বিপদ হয়, তখন আমাদের কে বাঁচাবে?

নেতা আমি বাঁচাবো! আমি রয়েছি কী জন্যে?

২য় নাগরিক তাহলে আপনিই তো ছিঁড়তে পারেন দাদা— আমাদের জড়ান কেন?

নেতা ঃ পারি বৈকি! আমার কীসের ভয়? এই দেখুন— ছিঁড়ে দিচ্ছি— (নিজে গিয়ে ছেঁড়ে)

৩য় নাগরিক ঃ (২য় নাগরিককে) এই লোকটি কে?

২য় নাগরিক ঃ কী আশ্চর্য! এঁকে চেনেন না? ইনি জনতার নেতা? সবাই তো এঁর হুকুমে চলে!

অফিসার ঃ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে স্যার!

নেতা ঃ কী কাণ্ড?

অফিসার ঃ যতবার পোস্টার ছিঁড়ছি, ততবারই কে যেন নতুন পোস্টার মেরে যাচ্ছে! এ যেন রাবণের মুণ্ডু, একটা কাটি তো আরেকটা গজায়।

নেতা ঃ হুঁ! তার মানে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে ওরা আবার জোট বাঁধছে!

অফিসার ঃ হ্যাঁ স্যার, আবার ঝামেলা শুরু হবে মনে হচ্ছে!

নেতা ঃ একবার চেষ্টা ক'রে দেখুক না— সব-ক'টাকে আবার জেলে পুরবো, আবার খতম করবো! এবার আর একদম বাড়তে দেওয়া হবে না! অবশ্য ওদের বেশির ভাগকে ইতিমধ্যেই শেষ ক'রে দিয়েছি!

৩য় নাগরিক ঃ তবু কি নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছেন?

নেতা ঃ কী?

৩য় নাগরিক ঃ বলছি— তবু কি রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন? কী এক অজানা আতঙ্কে বারবার কি ঘুম ভেঙে যায় না আপনার? যত

হত্যা করেছেন, তার প্রতিশোধ কি কেউ কোনোদিন নিতে পারবে না?

২য় নাগরিক ঃ দাদা, করছেন কী! চুপ করুন! যেচে বিপদ আনবেন না—

অফিসার ঃ স্যার, এই হতচ্ছাড়া বুড়োটা আসলে নকশালদের চর!

নেতা ঃ জানি। ওর ছেলে রণ্টি ছিল এই এলাকার উগ্রপন্থীদের পাণ্ডা!

২য় পুলিশ ঃ তাহলে অ্যারেস্ট্ করি স্যার?

নেতা ঃ খবরদার নয়, আমাদের বদনাম হবে। কেননা পাড়ার লোকেরা এই ভদ্রলোককে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। কেন যে জনগণ রণ্টির মতো ওরকম একটা দেশদ্রোহী গুণ্ডাকে অত ভালোবাসতো—কে জানে!

অফিসার ঃ তা ব'লে একটা ডাকসাইটে নকশালের বাপ জেলের বাইরে থাকবে?

নেতা ঃ উপায় নেই, উপায় নেই! একে গ্রেপ্তার করলে এক্ষুণি আগুন জ্ব'লে যাবে। তবে ভয়েরও কিছু নেই। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি— খোদ নকশালদের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগই নেই!

অফিসার ঃ তবে আর কী করা! ছেড়েই দিই। ও মশাইরা— এখন এখান থেকে সবাই কেটে পড়ুন তো—

নেতা ঃ বন্ধুগণ, চীনের চরেরা আবার মাথা তুলেছে। তাই আপনারা এখন ঐক্যবদ্ধ হোন, দেশদ্রোহীদের চক্রান্তকে.... আচ্ছা, ঠিক আছে, এত রাতে আর বক্তৃতা দেবো না, লোকের ঘুম ভেঙে যাবে। —চ'লে যান সবাই!

১ম নাগরিক ঃ আমার সোনার গয়না—

২য় নাগরিক ঃ আমার পাঁচটা কাঁসার বাসন ফেরৎ দিন।

নেতা ঃ সে কী? কী ব্যাপার?

অফিসার ঃ কিছু না। এই কনস্টেবলরা নিয়ে এসেছে। ওসব থানায় গিয়ে ফেরৎ নেবেন'খন।

১ম পুলিশ ঃ (২য় পুলিশকে) কি হারামী দেখেছো! নিজে চুরি ক'রে বেমালুম আমাদের নামে দোষ চাপিয়ে দিলো?

নেতা ঃ আচ্ছা, এবার আমি বাড়ি যাবো। মিছিমিছি ঘুমটা নষ্ট হলো। আমায় বাড়ি পৌঁছে দিন।

অফিসার ঃ সে কী স্যার! আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে!

নেতা ঃ নয়তো কি একা যাবো? আমি ওদের পোস্টার ছিঁড়েছি না! রাস্তায় যদি কিছু করে?

অফিসার ঃ একটু আগেই এত সাহস দেখালেন, আর এখন পুলিশ ছাড়া বাড়ি ফিরতে পারেন না! —চলো হে, সবাই মিলে স্যারকে বাড়ি পৌঁছে দিই!

২য় পুলিশ ঃ চলুন। (১ম পুলিশকে) এই চ'লে যাচ্ছি, দেখবে— আবার কারা যেন পোস্টার মেরে যাবে!

১ম পুলিশ ঃ এই এক খেলা চলছে! একদল ছিঁড়ছে, আরেকদল মারছে। কোনো পক্ষেরই বিরাম নেই। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না— বারবার একই জায়গায় পোস্টার মারছে কী ক'রে, আর কেনই-বা মারছে?

[সবাই কথা বলতে বলতে চ'লে যায়। মঞ্চ অন্ধকার। আবার কে যেন ঢুকে পেছনের পর্দায় কী সব আটকাতে থাকে। ৩য় নাগরিক সন্তর্পণে ঢোকে, ব'লে ওঠে চাপাস্বরে— "কে ওখানে?" —আলো জ্বলে। যে পোস্টার মারছিলো, সেই ছেলেটি বিদ্যুৎবেগে রিভলবার বের ক'রে ঘুরে দাঁড়ায়। পেছনের পর্দায় পোস্টার— "শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের গেরিলাযুদ্ধ চলছে, চলবে।"]

ছেলেটি ঃ কে আপনি? এখানে কেন?

৩য় নাগরিক ঃ তুমিই তাহলে পোস্টার মারছিলে? একা?

ছেলেটি ঃ (কিছুক্ষণ ৩য় নাগরিককে দেখে) আপনি.... রণ্টিদার বাবা, না?

৩য় নাগরিক ঃ আমার ছেলেকে তুমি চিনতে?

ছেলেটি ঃ আমার নাম গৌর— রণ্টিদাই আমাকে রাজনীতি দিয়েছিলেন! আমি আপনাদের বাড়িতেও গিয়েছি!

৩য় নাগরিক ঃ কী জানি, মনে পড়ছে না। অনেকদিন তো হলো! রণ্টিই তো মারা গেছে— ধরো বছর ছয়েক!

ছেলেটি ঃ আপনি হঠাৎ এখানে?

৩য় নাগরিক ঃ তোমাদের পোস্টার ছেঁড়ানোর জন্যে আমাদের ধ'রে এনেছিল। তবে আমরা কেউ ছিঁড়িনি?

ছেলেটি ঃ আমি দেখেছি— কে ছিঁড়েছে। সময় আসুক। তার কপালেও দুর্ভোগ আছে।

৩য় নাগরিক ঃ শুনলাম— যতবার পোস্টার ছিঁড়ছে, ততবারই না-কি নতুন পোস্টার পড়ছে। —তাই বড় কৌতূহল হলো।—

ছেলেটি ঃ কাজটা ভালো করেননি। যান, চ'লে যান। ওরা আবার ফিরে আসতে পারে।

৩য় নাগরিক : তোমরা তাহলে আবার মাঠে নামছো? আবার তৈরি হচ্ছো?

ছেলেটি : মাঠ ছেড়ে তো পালাইনি কোনোদিন। তাই নতুন ক'রে আর নামবো কী,— নেমেই তো আছি। যতদিন না মেহনতী জনতার রাজ কায়েম হয়, ততদিন আমাদের লড়াই চলবেই, কোনো বিরতি নেই।

৩য় নাগরিক : জয়ী হও বাবা! প্রার্থনা করি— তোমরা জয়ী হও! আমাদের জন্যে তোমরা সব ছেড়েছো! তোমাদের রুখবে কে?

ছেলেটি : (প্রণাম করে) আশীর্বাদ করুন— রণ্টিদার হত্যার বদলা যেন আমরা নিতে পারি। ....তবে আর দেরি নয়, ওরা আবার ঘুরে আসতে পারে। —চ'লে যান।

৩য় নাগরিক : যাচ্ছি বাবা! কিন্তু একটা কথা। বারবার একই জায়গায় পোস্টার মারছো কেন?

ছেলেটি : পরে বলবো। এখন সময় নেই। চ'লে যান।

নেপথ্যে : ঐ দ্যাখ— কারা যেন পাঁচিলটার কাছে ঘুরছে।

ছেলেটি : এই দেখুন— ওরা এসে গেছে। আমার সঙ্গে আসুন, নয়তো ধরা পড়বেন।

[ছেলেটি ও ৩য় নাগরিক ছুটে বেরিয়ে যায়। অন্যদিক দিয়ে দুই কন্স্টেবল ঢোকে]

১ম পুলিশ : এই দ্যাখ্— আবার মেরে গেছে। ঠিক দেখেছি— এখানে কারা যেন ঘোরাফেরা করছিল।

২য় পুলিশ : কিন্তু গেলটা কোথায়? এত তাড়াতাড়ি হাওয়া হয়ে গেল? রাস্তাটাও ফাঁকা, কেউ নেই!

১ম পুলিশ : আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল— তাই যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেই ছুটে এলাম।

২য় পুলিশ : আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে। ভাবতেই অবশ্য গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। ভূতটুত নয় তো!

১ম পুলিশ : যাঃ, কী যা-তা বলছিস! পাগল হলি না-কি?

২য় পুলিশ : না রে! হ'তেও পারে। এই ক'বছর যাদের মেরেছি— কে জানে তারাই ভূত হয়ে.... [নেতা ও অফিসার ঢোকে]

অফিসার : এই হারামজাদারা! হঠাৎ যে দু'জনে ছুটে পালিয়ে এলি?

১ম পুলিশ : এই দেখুন স্যার! আবার?

অফিসার : অ্যাঁ!— (মাটিতেই ব'সে পড়ে)

২য় পুলিশ : ভুতুড়ে কাণ্ড স্যার। নির্ঘাৎ ভূত!

নেতা ঃ অবাক কাণ্ড! কী ক'রে হচ্ছে এসব? আটঘাঁট বেঁধে কাজে নেমেছে, দেখছি!

অফিসার ঃ আমি চাকরিই ছেড়ে দেবো! এমন গোলমেলে ব্যাপার বাপের জন্মে দেখিনি!

১ম পুলিশ ঃ কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না স্যার।

অফিসার ঃ কী?

১ম পুলিশ ঃ বার বার একই জায়গায় ওরা পোস্টার মারছে কেন? আরও কত জায়গা তো আছে—

অফিসার ঃ কেন আবার? বদমাইসি! বারবার আমাদের খাটিয়ে মারার জন্যে।

নেতা ঃ না, না, ব্যাপারটা অত সহজ নয় মনে হচ্ছে। কোনো একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে!

২য় পুলিশ ঃ কী মতলব?

নেতা ঃ সেটা বুঝতে পারলে তো হয়েই যেতো। —যান, এই পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলুন।

অফিসার ঃ আর কত ছিঁড়বো? এ তো শুধু দেওয়ালের লিখন নয়, এ যেন আমাদের ললাট লিখন! যতই চেষ্টা করো না কেন, কিছুতেই মুছতে পারবে না।

২য় পুলিশ ঃ এক কাজ করুন স্যার। পোস্টার ছেঁড়ারই-বা দরকার কী? মারুক না শালারা, কত মারবে? আমরা যদি আর না ছিঁড়ি, তবে তো নতুন ক'রে মারতে পারবে না—

নেতা ঃ বলিহারী বুদ্ধি! পোস্টার ছিঁড়বে না মানে? জানেন এই পোস্টারগুলো একেকটা আগুনের ফুলকি! সারা দেশ জ্বালিয়ে দেবে। ঐজন্যেই তো ওদের পোস্টার-মারা দেওয়াল-লেখা— সব নিষিদ্ধ হয়েছে।

অফিসার ঃ তাতে আর লাভটা কী হলো? নিষিদ্ধ করার ঘোষণার সাথে সাথেই কোনো অলৌকিক মায়ামন্ত্রবলে সব-ক'টা দেওয়ালে পোস্টার গজিয়ে উঠেছে। ছিঁড়লেও নতুন ক'রে গজায়।

নেতা ঃ তাহলেও আমাদের ছিঁড়তে হবে, না ছিঁড়লেই বিপদ। যদি বাঁচতে চান, তবে ওদের পোস্টার ছিঁড়ুন, ওয়ালিং মুছুন। কিছুতেই জনতার মধ্যে ওদের ঘাঁটি গাড়তে দেবেন না।

[হন্তদন্ত হয়ে পুলিশের বড় কর্তার প্রবেশ]

কর্তা ঃ এই যে— এই যে— এখানে দাঁড়িয়ে সব আড্ডা মারছো!

অফিসার ঃ (স্যালুট করে) স্যার— আপনি?

কর্তা : কী পেয়েছো? কী পেয়েছোটা কী— তোমরা শুনি? সব ক'টাকেই বরখাস্ত করবো!

অফিসার : কেন স্যার? কী দোষ করলাম?

কর্তা : ছিঃ ছি লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। যত সব অকম্মার ঢেঁকি!

নেতা : হলোটা কী! এত রাগছেন কেন?

কর্তা : ও, আপনিও আছেন দেখছি! এবার আপনারাই তো আবার সোরগোল তুলবেন— পুলিশ কোনো কাজের নয়, খালি ঘুষ খায় আর ঘুমোয়—

নেতা : কেন, এসব কথা উঠছে কেন?

কর্তা : ও! আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। এই আজকেই এই এলাকায় সব-ক'টা ইম্পর্টেন্ট স্পটে পুলিশের জীপ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে— উগ্রপন্থীদের পোস্টার মারা ও ওয়ালিং করা নিষিদ্ধ, কাউকে পোস্টার মারতে দেখলেই গুলি ক'রে মারা হবে!

নেতা : সে তো জানি!

কর্তা : এই এদেরকে নিয়ে এই এলাকার পুলিশের পোস্টার মোছা আর ওয়ালিং ছেঁড়ার স্কোয়াড তৈরি হয়েছে!

অফিসার : পোস্টার মোছা নয় স্যার, পোস্টার ছেঁড়া আর ওয়ালিং মোছা!

কর্তা : আমায় জ্ঞান দিবি না শালা, মাথায় আমার আগুন জ্বলছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, স্কোয়াডটা তো বেরিয়ে পড়েছে, আমিও শুতে গেছি— এমন সময় খালি ফোনের পর ফোন!

নেতা : ফোন কারা করলো?

কর্তা : কারা আবার? আপনাদেরই নেতারা, কর্মীরা! ঐ পোস্টার আর ওয়ালিং নিষিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই সারা শহর জুড়ে যেন পোস্টার আর ওয়ালিংয়ের নেত্য চলছে! সব ক'টা দেওয়ালে লাল রঙের হরফগুলো যেন ঝলসে উঠছে। আমি ভাবলাম— এ কী কাণ্ড! আমাদের স্কোয়াড বেরুলো— পোস্টার মোছা ওয়ালিং ছেঁড়ার স্কোয়াড—

অফিসার : পোস্টার মোছা নয় স্যার, ছেঁড়া!

কর্তা : একবার না চুপ করতে বলেছি? —আমি ভাবলাম, পুরো স্কোয়াডটাই ফিনিশ হয়ে গেল না-কি! রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে দেখি— আমাদের স্কোয়াডের টিকিটিও কোথাও নেই, চারিদিকে শুধু পোস্টার আর পোস্টার, ওয়ালিং আর ওয়ালিং।

সারা শহরের চেহারাই যেন বদলে গেছে— নানা রঙের পোস্টারের সে কী জৌলুস!

অফিসার : বিশ্বাস করুন স্যার, আমরা ঠিক মতোই কাজ করছি— অনেকগুলো পোস্টার ছিঁড়েছি, ওয়ালিং মুছেছি।

কর্তা : আমাকে টুপি পরিয়ো না বাপু। সে খবরও নেওয়া হয়ে গেছে। মাত্র একবার— মাত্র একবার তোমরা শহরের কয়েকটা রাস্তায় গিয়ে লোক দেখানো পোস্টার ছিঁড়ে এসেছো! ব্যাস্, তাইতেই কাজ শেষ? বলা হয়েছিল না, এটা একটা মোবাইল স্কোয়াড— সারা শহর ঘুরে ঘুরে পোস্টার মুছবে ওয়ালিং ছিঁড়বে—

নেতা : পোস্টার ছেঁড়া, ওয়ালিং মোছা—

কর্তা : বারবার জ্ঞান দিবি না বাঞ্চোৎ। —ও আপনি! কিছু মনে করবেন না মাইরি, মাথায় আগুন জ্বলছে।

অফিসার : সত্যি বলছি স্যার— আমরা অনেকগুলো পোস্টার ছিঁড়েছি—

কর্তা : মিথ্যে কথা বললে চার্জশীট খাবে! —কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখুন! শালারা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে!

অফিসার : বিশ্বাস করুন স্যার, অন্য একটা ব্যাপার—

কর্তা : রাখো, রাখো, অন্য ব্যাপার! ছি ছি ছি দেশের লোকের কাছে আমরা একেবারে হেকেল্ড় হয়ে গেলাম— পুলিশের নাকের ডগায় ওরা তুড়ি মেরে পোস্টারে আর ওয়ালিঙে সারা শহর ছেয়ে দিলো, আমরা কিছু করতে পারলাম না— শুধু এই লোকটার অপদার্থতার জন্যে—

অফিসার : আগে আমাদের কথাটা শুনুন স্যার— পরে যত খুশি গালমন্দ করবেন—

কর্তা : কী আর শুনবো? পুলিশের মানসম্মান সব নষ্ট হলো—

নেতা : না, না, সত্যি এখানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমিও দেখেছি।

কর্তা : কী কাণ্ড?

অফিসার : একেবারে পিলে-চম্‌কানো গোলমেলে ব্যাপার! ঐ যে দেওয়ালটায়—

কর্তা : এ কী! কী আশ্চর্য! চোখের সামনে একটা পোস্টার! তবু তোমরা ছেঁড়োনি? অপদার্থ, উজবুক!

অফিসার : কত আর ছিঁড়বো স্যার? যতবারই ছিঁড়ি, ততবারই নতুন পোস্টার মেরে যায়!

কর্তা : সে কী কথা! কারা মারছে?

অফিসার : কিছুই বুঝতে পারছি না। ঐ দেখুন না— ছেঁড়া পোস্টারগুলো—

কর্তা : কী ক'রে হচ্ছে এসব? কেন করছে এরকম?

নেতা : হ্যাঁ! আমারও অবাক লাগছে!

কর্তা : পোস্টার মারে লোকে— রাজনৈতিক প্রচারের জন্যে! ছেঁড়া ছেঁড়া খেলা করবার জন্যে তো নয়!

নেতা : ঠিকই তো!

কর্তা : তবে ওরা বারবার এখানেই পোস্টার মারছে কেন?

অফিসার : কী জানি স্যার— কিছুই মাথায় ঢুকছে না!

কর্তা : ওরা তো জানে— এখানে পোস্টার মারলেই— (হঠাৎ পোস্টারটা ছিঁড়ে দেয়) এইরকম ক'রে পুলিশ ছিঁড়ে দেবে। তবু কেন এখানেই পোস্টার মারছে? পুলিশকে ছিঁড়তে দেবার জন্যে?

অফিসার : তাই তো! এদিকটা তো সত্যিই ভাবিনি!

কর্তা : তা ভাববি কেন, শালা মাথামোটা!— এই বুদ্ধি নিয়ে সব পুলিশে চাকরি করতে ঢুকেছো? ব্যস্ত, ব্যস্ত রাখছে তোদের, এই দেওয়ালটার সামনেই আটকে রাখছে তোদের, যাতে অন্য কোথাও যেতে না পারিস! আর সেই সুযোগে ওরা সারা শহর পোস্টারে আর ওয়ালিঙে ছেয়ে দিয়েছে!

নেতা : ঠিক! ঠিক ধরেছেন তো!

কর্তা : আর এরা বোকার মতো ওদেরই ফাঁদে পা দিয়েছে। গোবরগণেশ সব!

অফিসার : এমনভাবে আমাদের বোকা বানালো মাইরি!

কর্তা : নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে, খুব কাছাকাছি! চারদিকটা সার্চ করা হয়েছে?

অফিসার : হ্যাঁ স্যার— ঐদিকটার প্রত্যেকটা বাড়িতে ঢুকে দেখেছি—

কর্তা : এক চড় মারবো শালা। ঐ অত দূরের বাড়িগুলো থেকে এখানে এসে এত তাড়াতাড়ি কেউ পোস্টার মারতে পারে?

অফিসার : (থতমত খেয়ে) হ্যাঁ স্যার— মানে— না স্যার!

কর্তা : তবে ওখানে গিয়েছিলিস কেন? লুটপাটের মতলবে? মারবো পেটে এক লাথি, চুরির সখ বেরিয়ে যাবে।

নেতা : কী করতে হবে তাই বলুন না!

কর্তা : এই পাঁচিলটার ওপাশটা দেখা হয়েছে?

অফিসার : না স্যার!

কর্তা ঃ তা দেখবি কেন শালা? ওদিকে তো লুটের মাল নেই। (এগিয়ে গিয়ে উঁকি মারে) ঐ দ্যাখ্ শালা পালাচ্ছে— ধর্— ধর্— ফায়ার— ফায়ার!

[সবাই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে যায়। মঞ্চে আবার অন্ধকার নেমে আসে। আবার কে যেন পেছনের পর্দায় পোস্টার সেঁটে দিয়ে যায়। পরে আলোকিত মঞ্চে আগে-দেখা- ছেলেটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় হিঁচড়ে টানতে টানতে ওরা ঢোকে। পেছনের পর্দায় এবারকার পোস্টার—"সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন শোষকের পিঠের চামড়ায় গরিবের জুতো তৈরি হবে।"]

অফিসার ঃ মেরে ফেলবো, একেবারে জানে খতম ক'রে দেবো শুয়োরের বাচ্চা— আমাদের কম নাজেহাল করিসনি তুই— তোর জন্যে আমাকে কম গালাগাল খেতে হয়েছে, শালা! (সজোরে লাথি মারে)

কর্তা ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে! এখন আর অত বীরত্ব না দেখালেও চলবে— এই ছোঁড়া— শিগ্‌গির বল্— এই অঞ্চলে তোদের দলের নেতা কে? কোথায় থাকে? কে কে আছে তোদের দলে? স্পিক আউট ননসেন্স!

ছেলেটি ঃ বলবো না, কিছুতেই বলবো না!

কর্তা ঃ এই খবরগুলো ঠিকমতো দিলেই তোকে ছেড়ে দেবো! শিগ্‌গির বল্— কে কে আছে তোদের দলে, ঠিকানা কী— (তুলে ধ'রে সজোরে ঘুষি মারে) এক্ষুণি ব'লে দে শালা, না হ'লে কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারবো!

ছেলেটি ঃ তবু কি লড়াই থামবে? তবু কি বিপ্লবের স্রোত স্তব্ধ হয়ে যাবে? একটা সিসের বুলেট আমাকে মুছে দিতে পারে দুনিয়া থেকে, তবু লড়াই মরবে না, লড়াই ছড়িয়ে পড়বে পাহাড়ে-জঙ্গলে গ্রাম-গ্রামান্তরে— শহরে-বন্দরে!

কর্তা ঃ চুপ কর্ শালা! জ্ঞান দিবি না বাঞ্চোৎ। শিগ্‌গির বল্— তোদের নেতা কে?

ছেলেটি ঃ যতদিন অত্যাচার থাকবে, শোষণ থাকবে, থাকবে বীভৎস নির্যাতন, মানুষে-মানুষে বৈষম্য— ততদিন হে মহাপ্রভুরা বারবার বিদ্রোহ হবেই, বোমার বিস্ফোরণ কেড়ে নেবে তোমাদের রাতের ঘুম, যতদিন না আসে তোমাদের আঁধার-শাসন নিশ্চিহ্ন করা জবাকুসুমসঙ্কাশ মুক্তি— ততদিন জেনে রেখো আমাদের পোস্টারে

স্লোগানে এই কোলকাতা মুখরিত হবে, শিহরিত হবে।

অফিসার ঃ দেওয়ালের সব লেখা আমরা মুছে দেবো—

ছেলেটি ঃ দেওয়ালের লিখন কেউ মুছতে পারে না। তাকিয়ে দ্যাখো— কোলকাতার দেওয়াল তোমাদের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করছে— তোমাদের অনিবার্য ধ্বংসের সঙ্কেত—

কর্তা ঃ সব পোস্টার আমরা কালকের মধ্যেই ছিঁড়ে দেবো—

ছেলেটি ঃ তবু আবার পোস্টার পড়বে, আবার কোলকাতার দেওয়াল কথা বলবে। দেওয়ালের লিখন পড়তে শেখোনি আজও? ক্রোধে ঘৃণায় বিদ্বেষে আবার থরথর ক'রে কাঁপছে কোলকাতার দেওয়াল। কত মুছবে তোমরা? যত মুছবে, ততই রক্তাক্ত শ্রেণীহিংসায় আর দারুণ আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে গ'র্জে উঠবে দুঃস্বপ্নের নগরীর দেওয়াল!

কর্তা ঃ শেষবারের মতো বলছি— এখনও ব'লে দে— কে কে তোদের দলে আছে?

ছেলেটি ঃ কখনোই না। আমার গায়েতে মীরজাফরের রক্ত নেই। আমার বাবা ইংরেজ আমলে সাহেব খুন ক'রে জেলে গিয়েছিলেন। আমি তো তাঁরই সন্তান, তাঁদের বিদ্রোহের রক্তরাঙা পথ ধ'রেই তো আমি এসেছি। আমি জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শিখিনি, কোনো বেইমানীর স্কুলে আমি পাঠ নিইনি!

কর্তা ঃ অফিসার— গুলি করুন— ইমিডিয়েট্‌লি! (সবাই বন্দুক উঁচিয়ে ধরে)

ছেলেটি ঃ মৃত্যুর বুকের উপর দাঁড়িয়ে অত্যাচারী হিংস্র বন্দুকের সামনে মেরুদণ্ড সোজা রেখে শেষবারের মতো ঘোষণা ক'রে যাই— শোনো হে দুনিয়াদার—' আমরা মরি না, আমরা বার বার ফিরে আসি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়, সূর্য সেনের চট্টগ্রামে, তেলেঙ্গানার রক্তাক্ত প্রান্তরে, শ্রীকাকুলামের অরণ্য-পর্বতে! যতদিন অনাহারক্লিষ্ট শ্রমিকের চোখে জ্বলবে বঞ্চনার আগুন, নিরন্ন কৃষক বুভুক্ষায় ঢ'লে পড়বে যতদিন মরণের কোলে, শীর্ণকায় মধ্যবিত্তের ঘরে থাকবে নিত্য অনটনের কদর্য গ্লানি, ততদিন আমাদের হাতের বন্দুক বিশ্রাম নেবে না, ততদিন নিজেদের রক্ত দিয়ে ইতিহাসের দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে যাবো আমরা আগ্নেয় বিদ্রোহের রক্তিম লিপিরেখা!

কর্তা ঃ (বীভৎসভাবে) ফায়ার! (গুলির আওয়াজ! সবাই চিত্রার্পিত স্থির। ক্ষণপরে ফ্রিজ ভাঙে)।

অফিসার ঃ শালাদের তেজ বটে! মরবে, তবু নামগুলো বলবে না!

কর্তা ঃ (নেতাকে) যুদ্ধের প্রথম রাউণ্ডে জিতেছি! কী বলেন? আর এই এলাকায় ওদের পোস্টার পড়বে না।

নেতা ঃ সে তো নিশ্চয়ই! সবই আপনার কৃতিত্ব! যাক, আর ভাবনা রইলো না!

১ম পুলিশ ঃ (হঠাৎ) স্যার— ঐ দেখুন, আবার পোস্টার! (সবাই দ্যাখে। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা)।

কর্তা ঃ তাজ্জব ব্যাপার!

নেতা ঃ এটা আবার কে মারলো? কখনই-বা মারলো—

কর্তা ঃ নিজে হাতে আমি আগের পোস্টারটা ছিঁড়েছি— আবার একই জায়গায় একই রকম পোস্টার!

অফিসার ঃ আগেই বলেছিলাম স্যার— বড় গোলমেলে ব্যাপার!

কর্তা ঃ কিন্তু কে মারলো এটা? আমরা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে মাত্র বাইরে গেছি, তারই মধ্যে মেরে গেছে?

১ম পুলিশ ঃ ঐ ছোঁড়াটাই মারেনি তো?

কর্তা ঃ তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? সে কী ক'রে মারবে? সে তো ঐদিকে ছুটে গেল, আমরা পেছনে পেছনে গেলাম।

নেতা ঃ তবে? ব্যাপারটা ভীষণ ঘোরালো মনে হচ্ছে! একেবারে বোকা ব'নে গেলাম! কে মারলো?

২য় পুলিশ ঃ ভূত, ভূত স্যার! আগেই বলেছিলাম— ভৌতিক কাণ্ড!

কর্তা ঃ যা-ই হোক! অবস্থাটা সুবিধের নয়। চলো, তাড়াতাড়ি স'রে পড়ি!

অফিসার ঃ পোস্টারটা কি থাকবে?

কর্তা ঃ না, না, ছিঁড়ে ফ্যালো!

অফিসার ঃ কে ছিঁড়বে স্যার! আমি পারবো না! আবার আগের মতো শুরু হবে বোধহয়, জান বাঁচানোই দায় হবে।

কর্তা ঃ বেশি বোকো না! মনে হচ্ছে— ওরা আশেপাশেই লুকিয়ে রয়েছে!

অফিসার ঃ অ্যাঁ! সে কি কথা স্যার? ভয়ে আমার বুক কাঁপছে!

কর্তা ঃ কাছাকাছি না থাকলে এত প্রম্পট্ এ্যাকশন নিলো কী ক'রে? আমরাই না ঘেরাও হয়ে পড়ি!

নেতা ঃ আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবেন কিন্তু! আমারই এলাকায় এসব ঘটছে, ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছি!

কর্তা ঃ চলো, চলো, দেরি কোরো না! দাঁড়াও, পোস্টারটা ছিঁড়ে দিয়ে আসি! (চারিদিকে তাকিয়ে দৌড়ে গিয়ে ছিঁড়ে দিয়েই পালিয়ে আসে) বাব্‌বাঃ! হাঁপিয়ে গেছি! চলো এবার! বড় রাস্তায় জীপ আছে। এখন এই নিষিদ্ধ এলাকাটা পেরুতে পারলে হয়! সবাই বন্দুক উঁচিয়ে ধরো— আমি মাঝখানে থাকছি—

অফিসার ঃ শুধু আপনিই মাঝখানে থাকবেন কেন? আমিও থাকবো। আমার বুঝি প্রাণের ভয় নেই।

কর্তা ঃ চোপ। আমি যা হুকুম দেবো, তা-ই করতে হবে! আমিই মাঝখানে থাকবো!

অফিসার ঃ ইস্‌, মামার বাড়ির আব্দার! ওপরওয়ালা ব'লে মাথা কিনেছে। আমি মাঝখানে!

কর্তা ঃ কক্ষণো না, আমি থাকবো! (দু'জনে ধস্তাধস্তি শুরু হয়)

নেতা ঃ কী করছেন কী পাগলের মতো! ছাড়ুন! যত তাড়াতাড়ি পালানো যায়, ততই ভালো। তাড়াতাড়ি চলুন! নাঃ, রাজনীতিই ছেড়ে দেবো আমি, বাংলার বাইরে চ'লে যাবো!

[সবাই ভয়ে ভয়ে যেতে থাকে]

১ম পুলিশ ঃ (যেতে যেতে ২য় পুলিশকে) কিন্তু এই পোস্টারটা মারলো কে বল্‌ তো?

২য় পুলিশ ঃ আমি আগেই বলেছিলাম, ভূত! ভূত ছাড়া আর কেউ নয়!

[হঠাৎ বাইরে জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ। ওরা ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে যে যেদিকে পারে দৌড় মারে। মঞ্চ ফাঁকা, শুধু ছেলেটির মৃতদেহ প'ড়ে। ক্ষণপরে সেই ৩য় নাগরিক ঢোকে, হাতে একটা পোস্টার, পেছনের পর্দায় আটকে দেয়। পোস্টারে লেখা- "বিপ্লবীদের হত্যা ক'রে বিপ্লবকে রোখা যায় না, যাবে না।" তারপর সে ছেলেটির কাছে আসে। আরও অনেক মানুষ মঞ্চে ঢোকে। সবাই মৃতদেহটিকে তুলে নিয়ে অন্তহীন মিছিলে চলতে থাকে। নেপথ্যে সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর গান— "হাত দিয়ে বলো সূর্যের আলো রুধিতে পারে কি কেউ? আমাদের মেরে ঠেকানো কি যায় জনজোয়ারের ঢেউ?"—]

।। পর্দা নামে।।

শরৎচন্দ্র অনুপ্রাণিত

একাঙ্ক

আকালের দেশে

চরিত্রলিপি ঃ গফুর, আমিনা, কাঙালী, মাঝি, পাগলা মাস্টার

[সময়— পড়ন্ত বিকেল। গরুড় নদীর ঘাট। পর্দা খোলার সময়— 'বদর বদর' ডাক, যেন এইমাত্র একটি নৌকো ছেড়ে গেল, তারই সম্মিলিত কলরব। ক্ষণপরে ক্লান্ত ও বিধস্ত গফুর আর তার মেয়ে আমিনা প্রবেশ করে]

আমিনা ঃ বাপজান, বাপজান, পা চালিয়ে এসো, ঐ দ্যাখো নৌকো ছেড়ে দিচ্ছে— ঐ যে নোঙর তুলছে—

গফুর ঃ সব্বোনাশ! ছেড়ে দিচ্ছে (দৌড়ে যায়) হে-ই, হে-ই মাঝি—

নেপথ্যে ঃ হবে না। পরের নৌকায় এসো।

গফুর ঃ তোর দু'টি পায়ে পড়ি ভাই, আমার ভীষণ তাড়া, সাঁঝের আগেই ওপারে পৌঁছুতে হবে আমায়, আমাদের ফেলে যাসনে ভাই—

নেপথ্যে ঃ বলছি তো হবে না! স্রোতের টান এখন ভীষণ। নৌকা একবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে— আর সে এপারে আসবে না।

গফুর ঃ আসবে আসবে, ঠিক আসবে! তুই চেষ্টা করলেই ফিরে আসবে। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নে ভাই! না হয় তোকে দু'পয়সা বেশিই দেবো, তবু আমাদের দু'জনকে তুলে নে!

নেপথ্যে ঃ তোমার পয়সা তোমার ট্যাকেই গুজে রাখো মিয়া, নৌকা আর ফিরবে না। এ নৌকায় বড় ভিড়। পরের খেয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে এসো!

গফুর ঃ এর পরেও ওপারে যাবার নৌকা আছে?

নেপথ্যে ঃ আছে— আছে— আর একখানা মাত্র আছে। সেই শেষ খেয়া। একটু বাদেই ওপার থেকে ছাড়বে। তা'তেই চড়ো'খন মিয়া সাহেব, ততক্ষণ বরং ঘাটে ব'সে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া খাও, বুঝলে? হাঃ হাঃ— (কথাগুলি ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যায়)

আমিনা ঃ বাপজান, ওরা আমাদের ফেলে রেখে চ'লে গেল?

গফুর ঃ হ্যাঁ, মা, ওরা চ'লে গেল, আমাদের নিলো না। সবাই বড় স্বার্থপর হয়ে গেছে রে, কেউ কারুর কথা শোনে না!

আমিনা ঃ আমরা আরেকটু জোরে হাঁটলেই এই খেয়াটা ধরতে পারতাম।

গফুর : কী ক'রে জোরে হাঁটবো মা? তুই-আমি কেউ সারাদিন দাঁতে কুটোটি কাটিনি। সেই কখন রাত থাকতেই জন্মের মতো কাশীপুর ছেড়ে পথে নেমেছি— তারপর সারাটা দিন ধ'রে শুধু হাঁটা আর হাঁটা, পথের আর শেষ নেই। আর তা'ছাড়া কী ভীষণ রোদ্দুরের তাপ, সমস্ত মাঠ ফুটিফাটা, এক ফোঁটা জল নেই, ফ্যাকাশে আকাশে মেঘ নেই, পায়ের তলার জমিতে যেন আগুনের ঢেউ, পা রাখলেই পুড়ে যায়, রোদ্দুরের তেজে মাথার তালু ফাটে। গরম বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে বুক জ্বলে। তুই একটা কচি মেয়ে আর আমি একটা রোগে-ভোগা হাড়-জিরজিরে আধ বুড়ো লোক! এই দুপুর রোদে এতটা পথ যে কোনোরকমে হেঁটে এসেছি— এ-ই ঢের; এর চেয়ে জোরে হাঁটতে গেলে মাথা ঘুরে প'ড়ে যেতাম রাস্তায়।

আমিনা : ফুলবেড়ে আর কতদূর বাপজান?

গফুর : সে অনেক দূর! এই তো সবে গরুড় নদীর তীরে এলাম, নদীর ওপারে বাস রাস্তা। শেষ খেয়ায় নদী পেরিয়ে যদি অন্তত রাতের বাসটা ধরতে পারি, তবে ভোরবেলা নাগাদ ফুলবেড়েতে গিয়ে পৌঁছোবো!

আমিনা : বাব্বাঃ, সে যে অনেক রাস্তা।

গফুর : হ্যাঁ মা, সে অনেক রাস্তা। গাঁয়ের মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে যে পথ ধ'রে শহরে যায়; সেই পথ কিছুতেই ফুরোতে চায় না।

আমিনা : তবে তুমি বসো বাপজান, একটু বসো, এই রোগা শরীরে অনেক হেঁটেছো তুমি, একটু জিরিয়ে নাও। নদীর ওপারে সুয্যি ডুবে যেতে আর বেশি দেরি নাই, এখুনি আঁধার নামবে। বসো।

গফুর : (বসে) আঃ, বেশ হাওয়া ছেড়েছে এখানে, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল! সারাটা দিন ধ'রে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দিয়ে পথ হেঁটেছিলাম আর এখন কেমন ঠাণ্ডা ভাব, শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর তোর মুখের হাসির মতোই মিঠে লাগে রে আমিনা!

আমিনা : আমি একটু নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে আসবো বাপজান? এই ঠা-ঠা পড়া রোদ্দুরে পথ হেঁটে শরীরটা যেন পুড়ে ঝল্‌সে গেছে কাঠকয়লার মতো; আর বুক ফেটে যাচ্ছে তেষ্টায়। আমাদের গাঁয়ের কোথাও এত জল ছিল না। আর কী আশ্চর্য এই গরুড় নদীর বুকে টলটল করছে পরিষ্কার জল—

গফুর : যা মা, আগে বুকভরা তেষ্টা মিটিয়ে নে। সামান্য তেষ্টার জলও

এই পোড়া দেশে জোটে না মানুষের। খরায় জ্বলছে মাঠ, বেশির ভাগ পুকুর শুকিয়ে কাঠ! বাবুদের বাড়ির পুকুরে তো আমাদের মতো ছোটজাত জল আনতে যেতে পারে না। আমার মহেশ মরার সময় এক ফোঁটা জলও পেলো না আমিনা—

আমিনা ঃ চুপ করো বাপজান, চুপ করো। কেন এসব কথা ভেবে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছো? তোমার চোখের জলে কি মহেশের তেষ্টা মিটবে, না-কি কাঁদলেই সে আবার ফিরে আসবে?

গফুর ঃ তবু চোখের জলে, অনুতাপে-অনুশোচনায় মানুষের পাপক্ষয় হয়। আমি মহাপাপ করেছি আমিনা, জাহান্নমেও আমার ঠাঁই হবে না, অবলা জীব তোর আনা কলসির জলে মুখ দিয়েছিল ব'লে আমি নিজে হাতে আমার আদরের মহেশকে—

আমিনা ঃ না, না, আর বোলো না সেকথা, আমি সইতে পারবো না! সেই ভয়ঙ্কর ছবি আর দেখতে চাই না বাপজান। কেঁদে কেঁদে আমার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে— চোখের পাতায় যেন জলশূন্য আকালের নিষ্ঠুর জ্বালা—[ছুটে চ'লে যায়]

গফুর ঃ নসিব, সবই নসিব! সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আজ স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছি আমি। শুনেছি ফুলবেড়ের চটকলে লোক নিচ্ছে। গত মাসে আমাদের পাশের গ্রামের কাঙালীচরণ ফুলবেড়ে থেকে ফিরে এসে বলেছিল— কেন মিছিমিছি কাশীপুরে থেকে না খেয়ে মরবে, তার চেয়ে ভিটেমাটি বেচে দিয়ে শহরে চলো, যা হোক একটা কাজ জুটে যাবে'খন। হায় রে— তখন যদি কাঙালীর কথা শুনতাম, তাহলে হয়তো আমার মহেশও মরতো না, আর আমাকেও একবস্ত্রে গাঁ ছেড়ে এভাবে চ'লে আসতে হতো না!

নেপথ্যে আমিনা ঃ আঃ, মিষ্টি জল! কী ঠাণ্ডা! বাপজান, তুমিও চ'লে এসো, তোমারও তেষ্টা মিটবে!

গফুর ঃ সাত সমুদ্দুরের জলেও আমার তেষ্টা মিটবে না আমিনা, আমার মহেশ যে বুকভরা তেষ্টা নিয়ে মরেছে মা! কিন্তু তুই বেশি জল ঘাঁটিস না মা। উঠে আয়। সারাটা দিন রোদে পুড়েছিস হঠাৎ সর্দি-গরমি না হয়ে যায়! একদিনেই এত বাড়াবাড়ি ঠিক নয়।

নেপথ্যে আমিনা ঃ আমার কিছু হবে না বাপজান, কিছু না।

[এক বাউণ্ডুলে চেহারার লোক ঢোকে]

লোকটা ঃ কী গো মিয়া? দেখে তো মনে হয় ভিন্ গাঁয়ের লোক। বলি, যাবে কোন্ চুলোয়?

গফুর ঃ কথার কী ছিরি! আমি যেখানেই যাই, তোমার কী দরকার বাপু?

লোকটা ঃ পালিয়ে যাচ্ছো বুঝি?

গফুর ঃ কী?

লোকটা ঃ চিরদিনের মতো বাপ-পিতামো'র ভিটে ছেড়ে শহরে পালাচ্ছো?

গফুর ঃ এ তো মহা বেআক্কেলে লোক! গায়ে প'ড়ে ঠেস্ দিয়ে কথা বলতে আসে! পায়ের ওপর পা দিয়ে ঝগড়া করার মতলব!

লোকটা ঃ আহা ঝগড়া করলাম কোথায়? তুমি দেখছি একেবারে ফণা উঁচিয়েই রয়েছো, কথা বললেই চ'টে উঠছো! অবিশ্যি চটবার কথাই বটে, নিজের জমি-জমা ছেড়ে চিরকালের জন্যে চ'লে যাওয়া— কোন্ মানুষই-বা ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিতে পারে?

গফুর ঃ যাও, যাও, নিজের কাজে যাও, আমায় জ্ঞান দিতে এসো না।

লোকটা ঃ এই গরুড় নদীর ধারে ক'দিন ধ'রে ভিড় লেগেই রয়েছে; আকালের দেশে কেউ আর থাকতে চায় না। দূরের শহর হাতছানি দিয়ে ডাকে খরাক্লিষ্ট গাঁয়ের মানুষকে—

গফুর ঃ আর বক্‌বক্ কোরো না তো বাপু, একটুও শুনতে ভালো লাগছে না!

লোকটা ঃ তা ঠিক! সত্যি কথা কারুরই শুনতে ভালো লাগে না। কিন্তু শহরে গিয়েও কি নিস্তার পাবে ভেবেছো? গরম কড়াই থেকে একেবারে জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়বে! গরিব মানুষের কোথাও যাবার জায়গা নেই রে ভাই, না শহরে— না গ্রামে, সবখানেই একই অবস্থা।

গফুর ঃ যাও, ভাগো বলছি! এখান থেকে যাও—

লোকটা ঃ এখন শুনতে ভালো লাগবে না, কিন্তু পরে হাড়ে হাড়ে টের পাবে ভাই, শহর তো নয়— যেন একটা বিরাট জঙ্গল, দিনের বেলাতেই সেখানে মানুষখেকো বাঘের দল ঘুরে বেড়ায়, আর রাতের আঁধারে ছোবল মারে বিষাক্ত কালসাপ—

গফুর ঃ ওঃ, আর পারা যায় না, কান ঝালাপালা ক'রে দিলো!

[আমিনার পুনঃ প্রবেশ]

আমিনা ঃ বাপজান, আমার হয়ে গেছে— এবার তুমি যাও।

লোকটা ঃ ইটি কে! তোমার বিটি বুঝি!

গফুর ঃ বেরোও, বেরোও বলছি! ভালো কথায় না গেলে—

লোকটা ঃ ফুলের মতো সুন্দর তোমার বেটি, কী মিষ্টি চেহারা! তবে খুব সাবধান মিয়াসাহেব, শহরের হাওয়া লাগলেই এই ফুটন্ত ফুলখানা

ঝ'রে যাবে কিন্তু, বুনো জানোয়ারের পায়ের তলায় থেঁৎলে পিষে যাবে— সাবধান ভাই!

গফুর ঃ (আধলা ইট তুলে) শালা, তুই যদি না যাবি তো এই ইট মেরে তোর মাথা গুঁড়িয়ে দেবো—

লোকটা ঃ বাব্বাঃ, মিয়াসাহেবের দেখছি ভীষণ রাগ! তা আসল জায়গায় রাগ দেখাতে পারলি না বাবা? লাথি খেয়ে কুত্তার মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এলি?

গফুর ঃ (তেড়ে যায়) তোকে আজ খুনই করবো শালা, তখন থেকে ছিনে জোঁকের মতো আমার পেছনে লেগে রয়েছিস—

আমিনা ঃ (আটকায়) কী করছো? মহেশের কথা ভুলে গেলে?

লোকটা ঃ মহেশ! কোন্ মহেশ?

আমিনা ঃ মহেশ আমাদের বলদের নাম।

লোকটা ঃ তার মানে শরৎবাবুর মহেশ! কী আশ্চর্য! এত বছর বাদে!

আমিনা ঃ কী বলছো আবোলতাবোল? পাগল হ'লে না-কি?

লোকটা ঃ শরৎ চাটুজ্জের নাম শুনেছো? ও, না, শুনবে কী ক'রে? তোমরা তো আর লেখাপড়া শেখোনি! কী আশ্চর্য, এত বছর বাদেও মহেশ! সেই এক গল্প, এক খরা, এক আকাল!

গফুর ঃ পাগলের বক্‌বকানি শুনিসনি আমিনা, চ'লে আয়!

লোকটা ঃ দাঁড়াও, যেও না! তোমারই নাম তাহলে গফুর? আর এই তোমার মেয়ে আমিনা—

আমিনা ঃ তুমি আমাদের চেনো?

লোকটা ঃ সময় কত বদলে গেছে— তবু আজও পৃথিবীর বুকে মানুষের এই সব গল্পই বেঁচে থাকে চিরদিন।

গফুর ঃ তুমি যাবে কি-না? আমার মাথা আগুন হয়ে রয়েছে! আবার সেই চণ্ডালের রাগ আর ঘেন্না আমার ভেতরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে! যে হাতে আমি আমার মহেশের মাথায় ঘা মেরেছিলাম, সেই হাতে তোমার টুঁটি ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে!

লোকটা ঃ বাহ্‌বা, চমৎকার! কী ভীষণ রাগ আর ঘেন্নার সমুদ্দুর তোমার বুকে ফুসছে, অথচ তুমি জানো না— কোথায় কখন আঘাত হানতে হয়, তাই তোমার অন্ধ নিরুপায় ক্রোধের শিকার হয় একটা অসহায় জীব, অথবা আমার মতো চালচুলোহীন হতভাগ্য মানুষ!

গফুর ঃ তুমি যদি এখান থেকে না যাবে তো আমরা চললুম। চ'লে আয় আমিনা!

লোকটা ঃ আচ্ছা আমিই যাচ্ছি! তোমরা থাকো, গরুড় নদীর ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে বসো কিছুক্ষণ! তবে ভাই, তোমায় দেখে আমার কষ্ট হয়। নিজের বুকের আগুনে নিজে নিজেই জ্ব'লে-পুড়ে মরছো, অথচ ঐ আগুনে দুনিয়াকে পোড়াতে পারছো না, তোমার আগুন ছড়িয়ে দিতে পারছো না অন্যদের ভেতরে, তাই আজ তোমাকে কিল খেয়ে কিল হজম ক'রে একবস্ত্রে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হয়—

গফুর ঃ চ'লে যাও বলছি, আমার ধৈর্য থাকছে না—

লোকটা ঃ (হঠাৎ দরাজ গলায় গান ধরে)

কেন রে মন বাঘের ভয়ে পালাতে চাস বনে?
বাঘ যে আছে সকল স্থানে সকল ঘরের কোণে!
বাঘের ভয়ে লুকাবি কোথায় সংগোপনে
বাঘ যে আছে বনের ভেতর, বাঘ যে আছে মনে।
তার চেয়ে তুই কোমর বেঁধে লড় না বাঘের সনে!
কেন রে মন.... [গাইতে গাইতে প্রস্থান]

আমিনা ঃ লোকটা কে বাপজান? ভারী অদ্ভুত তো!

গফুর ঃ কে জানে, কোন্ মতলবে ঘুরছে! তখন থেকে গায়ে প'ড়ে এমন সব গা জ্বালানো কথা বলছিল—

আমিনা ঃ গানের গলাটা কিন্তু দারুণ, তাই না বাবা?

গফুর ঃ আমার অত গান শোনার মতো ধৈর্য নেই মা! মন মেজাজ ভালো লাগে না!

আমিনা ঃ বলছি তো বাপজান, অত ভেবো না। ভেবে কোনো লাভ নেই!

গফুর ঃ না মা, ভাবছি না আর, ভাবার কিছু নেই; সব ভাবনা চুকিয়ে দিয়েই পথে নেমেছি; এ পথ যে কোথায় আমাদের পৌঁছে দেবে, তা'ও জানি না, ভাবতেও চাই না আর—

আমিনা ঃ ফুলবেড়েতে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে, তাই না বাপজান? ওখানে নিশ্চয়ই কাউকে তেষ্টার জল না পেয়ে মরতে হয় না?

গফুর ঃ কাঙালী তো সেইরকমই বলেছিল! ফুলবেড়েতে না-কি পথে ঘাটে দেদার পয়সা ছড়ানো, স্রেফ কুড়িয়ে নিয়ে কোমরে গোঁজো। চটকলে সারা বছর কাজ, অনেক মজুরী, গতর খাটিয়ে খাও আর মনের আনন্দে থাকো। কেউ কারুর সাতে-পাঁচে থাকে না, কেউ কারুর পেছনে আদা-জল খেয়ে লাগে না। অনেক লোভই তো দেখিয়েছে কাঙালী— কী হবে গফুর চাচা, গাঁয়ে সবার লাথি-

ঝাঁটা খেয়ে থেকে? চ'লে এসো শহরে, দেখবে কত সুখ, কত মজা!—কাঙালীকে তোর মনে আছে আমিনা?

আমিনা ঃ মনে নেই আবার? এই তো সেদিন এসেছিল। তোমার বন্ধু রসিক দুলের ব্যাটা—

গফুর ঃ হ্যাঁ, ওর বাপ রসিক দুলে ছিল আমার বন্ধু! কাঙালীর বাপ অবশ্য কাঙালীর মাকে নিয়ে কোনোদিনই থাকেনি! আহা, বড় ভালোমানুষ ছিল রে কাঙালীর মা'টা। অনেক কষ্ট সয়েছে, তবু কোনোদিন মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলেনি। জোয়ান বয়েসেই শক্ত অসুখে ভুগে বেচারী মারা গেল! এই গরুড় নদীর চরাতেই তাকে পুঁতে দেওয়া হলো। আমি খবর পেয়ে সেদিন এসেছিলাম শেষ দেখা দেখতে।

আমিনা ঃ যাও বাবা, আর দেরি কোরো না! বেলা প'ড়ে গেছে! নৌকা হয়তো এখুনি এসে পড়বে।

গফুর ঃ হাঁ মা, আমি যাই, তুই বোস্ এখানে! এখানেই থাকবি কিন্তু, অন্য কোথাও ভুলেও যাসনি। তোর অচেনা জায়গা, লোকজন কে কেমন কে জানে। এই ঘাট ছেড়ে কোথাও নড়িসনে!

আমিনা ঃ না বাবা, আমি কোথাও যাবো না, তুমি যাও।

গফুর ঃ যাই মা, আমারও ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। বুক ভরা তেষ্টা। গরুড় নদীর জলে তেষ্টা মিটিয়ে আসি। কিন্তু আমার মহেশ যে তেষ্টা নিয়েই মরেছে মা, সেকথা আমি কেমন ক'রে ভুলবো?

[ছুটে প্রস্থান]

আমিনা ঃ বাপজান খুবই ভেঙে পড়েছে। মহেশকে ভীষণ ভালোবাসতো কি-না! ঘর ছেড়ে আসার সময় খড়কুটোও সঙ্গে নিলো না। বললো—প'ড়ে থাক্, সব প'ড়ে থাক্, আবার নতুন ক'রে শুরু হবে, মুছে যাবে ফেলে-আসা-জীবনের কথা! সত্যিই কি ফুলবেড়ের চটকলে নতুন জীবন শুরু হবে আমাদের?

[লোকটা আবার ফিরে আসে]

লোকটা ঃ না, এ প্রশ্নের উত্তর শরৎবাবু দিয়ে যাননি, তিনি গফুর আমিনাকে ফুলবেড়ের পথে রওয়ানা করিয়ে দিয়েই থেমে গিয়েছিলেন।

আমিনা ঃ তুমি যাওনি? তুমি আবার ফিরে এসেছো?

লোকটা ঃ তোমাকে ছেড়ে কি যেতে পারে কেউ? পাহাড়ী ঝর্ণার মতো দুরন্ত তোমার টানে যে সকলকেই বারবার ফিরে আসতে হয়।

আমিনা ঃ তুমি খুব সুন্দর গান করো, আমাকে আরেকটা গান শোনাবে!

লোকটা ঃ তুমি তো বেশ মেয়ে! সারা দেশ খরায় জ্বলছে, আকাশ জুড়ে আগুনের জোয়ার, আর তারই মাঝে ব'সে তুমি গান শুনতে চাও! তুমি নিশ্চয়ই সম্রাট নীরোর নাম শোনোনি, জ্বলন্ত রোমে ব'সে যে বাজিয়েছিল বিকৃত বাসনার বীণা!

আমিনা ঃ কে নীরো? সে কোন্ গাঁয়ে থাকে?

লোকটা ঃ তোমাকে এসব বলা বৃথা! তুমি নিশ্চয়ই এখনও ইস্কুলের দরজা মাড়াওনি, কোন্ গরিব ঘরের মেয়েই-বা সেখানে যেতে পারে? সাক্ষরতার ঢপকীর্তনের পরেও নয়।

আমিনা ঃ তুমি আমাকে গান শোনাবে না?

লোকটা ঃ কী আশ্চর্য! এই আগুনঝরা দিনের শেষে তুমি গান শুনতে চাও?

আমিনা ঃ কেন শুনবো না? তোমার গান যে গরুড় নদীর ঠাণ্ডা জলের মতো, আমাদের বুকভরা তেষ্টা মেটায়!

লোকটা ঃ বাঃ মেয়ে, তুমি দেখছি খুব ভালো ভালো কথা কইতে জানো। বলি— থাকতে কোথায়? কাশীপুরে নিশ্চয়ই?

আমিনা ঃ তুমি কী ক'রে জানলে— আমাদের গ্রামের নাম কাশীপুর?

লোকটা ঃ "গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁহার প্রজারা টু শব্দটি করিতে পারে না— এমনই প্রতাপ!"

আমিনা ঃ কী বলছো এসব?

লোকটা ঃ শরৎ চাটুজ্জের গল্প এইভাবেই শুরু হয়েছিল, সেই এক খরা, সেই এক আকালের জীবন্ত বর্ণনা—"বৈশাখ শেষ হইয়া আসে কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।"

আমিনা ঃ আমি তোমার কথা একটুও বুঝতে পারছি না! এসব বলছো কেন?

লোকটা ঃ "সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মতো তাহাদের সর্পিল উর্দ্ধগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে— যেন নেশা লাগে।"

আমিনা ঃ আমাকে এমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছো কেন? আমি কী করেছি?

লোকটা ঃ আরও শুনবে? ভয়াবহ আকালের ছবি আর দেখবে? "রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে

কত ভীষণ কত কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। ....মনে হয় সমস্ত প্রজ্জ্বলিত নভস্তল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই, সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।"

আমিনা ঃ চুপ করো, চুপ করো, আমার ভীষণ ভয় করছে!

[গফুরের প্রবেশ]

গফুর ঃ কী হলো মা? অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলি কেন? কী হয়েছে?—এ কী, তুমি আবার এসেছো এখানে?

লোকটা ঃ কী করবো? কৌতূহল বড় মারাত্মক ব্যাধি, একবার ধরলে আর ছাড়ান নেই! আজকের দিনে গফুর-আমিনা কেন গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য হয়, তা' জানতে বড় সাধ আমার!

গফুর ঃ কেন শহরে যেতে বাধ্য হয় গাঁয়ের গরিব, বোঝো না? পেটের দায়ে, বাঁচবার তাগিদে ভিটেমাটি ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলের দরজায় গিয়ে ভিড় করে কাশীপুরের গফুর জোলা! পরপর খরায় অজন্মায় সারা গ্রাম শ্মশান হয়ে গেছে। যেদিকে তাকাও শুধু ফসলহীন শূন্য ক্ষেত! তবু যাদের ঘরে কিছু আছে, তাদের এর মধ্যেই চ'লে যায় বেশ, কিন্তু যাদের হাত-দুটো ছাড়া বাকি নেই কিছু, সব গেছে মহাজনের দেনা মেটাতে, তাদের তেষ্টায় জলও মেলে না।

লোকটা ঃ শিবচরণবাবু তোমাদের গ্রামের জমিদার, তাই না?

গফুর ঃ না তো! তিনি তো আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান! জমিদারটমিদার আমাদের গ্রামে আর নেই! তবে বাবুমশাইয়ের কাছে গাঁয়ের সকলেরই টিকি বাধা। দু'-তিনশো বিঘে তাঁর বেনামী জমি, গঞ্জে দুটো হাস্কিং মিল আর একটা গুদাম, দারোগা পুলিশ জজ ম্যাজিস্টর সব তাঁর কথায় ওঠে বসে; ভীষণ প্রতাপ তাঁর—

লোকটা ঃ তার মানে শরৎবাবুর গল্পে যে ছিল গাঁয়ের জমিদার, আজ সে গাঁয়ের নেতা, সব আমলেই সে গ্রামের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, মাঝেমাঝেই দরকার মতো সে তার ঝাণ্ডার রঙ বদলে নেয়—

আমিনা ঃ আমাদের বাবুমশাইয়ের বাড়িতেই পঞ্চায়েতের কুয়ো, পঞ্চায়েতের পুকুর! কিন্তু সে পুকুরে আমরা যেতে পারিনে। এই আকালের দিনেও আমাদের জল আনতে যেতে হয় তিন ক্রোশ দূরের

জংলা ডোবায়! আমার আনা সেই জলে বেচারা মহেশ মুখ দিয়েছিল ব'লে বাপজান রাগের মাথায়—

গফুর ঃ হ্যাঁ, আমি ঐ অবলা জীবটাকে খুন করেছি। কী করবে তোমরা আমার? পুলিশে দেবে? ফাঁসিতে চড়াবে? যা ইচ্ছে করতে পারো, কোনো খেদ নেই আমার, কিন্তু যারা আমার মহেশের তেষ্টার জল কেড়ে নেয়, তাদের কী শাস্তি দেবে তোমরা?

লোকটা ঃ ঠিক একই কথা শরৎবাবুর গফুরও তো বলেছিল— "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমিও কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমরা দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনও মাপ কোরো না।"

গফুর ঃ বাবু কি যাত্রা করো না-কি? আমাদের বুকের জ্বালা নিয়ে পালা বেঁধেছো বুঝি? কিন্তু না, না বাবু, এই গফুর জোলা আজ আর আল্লার কাছে প্রতিকার চেয়ে চোখের জল ফ্যালে না, এই দ্যাখো, আমার চোখে একফোঁটাও জল নেই, শুধু আগুন, আকাশের ঐ আগুন আছে এই দুই চোখের ভেতরে, বুকের ভেতরেও কোনো কান্না নেই, সেখানেও যেন জ্যৈষ্ঠের ফুটিফাটা শুকনো মাঠ—

লোকটা ঃ হ্যাঁ, আমি জানি সময় বদলেছে! আজকের গফুরেরা কান্নাকাটি করে না বোকার মতো, আজ তারা নিজেরাই এক‌েকটা লেলিহান অগ্নিশিখা। কিন্তু ভাই, তবুও তো তোমাকে পালিয়ে আসতে হয় গ্রাম ছেড়ে, তোমাকেও তো সেই শহরেই পাড়ি দিতে হয়, যে শহর খেয়ে নিচ্ছে গ্রামকে।

গফুর ঃ কী করবো? বেঁচে থাকার দরজাগুলো ক্রমশই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের ভেতরে, তাই তো আমাদের ফুলবেড়ের চটকলের দরজায় ধর্না দিতে হয়— কাঙালীচরণ বলেছে ফুলবেড়ে গেলে সে আমাকে যে-কোনো একটা কাজ জুটিয়ে দেবেই—

আমিনা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শহরে আকাল নেই, খরা নেই, সেখানে তেষ্টার জল পাওয়া যায়, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে সেখানে— চলো বাপজান, আমরা সেখানেই চ'লে যাই, আর কোনোদিন আমরা এই পোড়া দেশে ফিরবো না, কোনোদিন না—

লোকটা ঃ এইসব স্বপ্ন নিয়েই গাঁয়ের গরিব মানুষ গরুড় নদী পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে শহরের দিকে— প্রতিদিন ভিড় বাড়ে নৌকোর ঘাটে। তোমরা শেষ খেয়ায় যাবে ব'লেই ভিড় দেখছো না কোথাও,

কিন্তু আগের নৌকোও একেবারে বোঝাই হয়েই ছেড়েছে।

আমিনা ঃ আমরা দেখেছি— লোক বেশি ছিল ব'লেই ওরা আমাদের নিলো না।

গফুর ঃ কিন্তু এতক্ষণে তো নৌকা এপারে আসা উচিত ছিল—

আমিনা ঃ ঐ যে আসছে, বাবা, ঐ দ্যাখো ঘাটে এসে পড়েছে—

লোকটা ঃ হ্যাঁ, ওপার থেকে মাত্র একজন এপারে আসছে! আসলে এপার থেকেই সব যায়, ওপার থেকে ফেরার সময় এখনও হয়নি।

গফুর ঃ এই নৌকায় গেলে ওপার থেকে ফুলবেড়ে যাবার বাস পাবো তো?

লোকটা ঃ বরাত খারাপ হ'লে পেতেও পারো!

গফুর ঃ কী অদ্ভুত তোমার কথা! বাস পেলে বরাত খারাপ হবে কেন?

নেপথ্যে মাঝি ঃ এঃ বাবু, তাড়াহুড়ো ক'রে নামতে গিয়ে কাদায় আছাড় খেলে? জামাকাপড়ে কাদা লাগলো তো—

আমিনা ঃ দ্যাখো বাপজান দ্যাখো, নৌকা থেকে নামতে গিয়ে লোকটা কেমন পা পিছলে নদীর কাদায় প'ড়ে গেছে— হি-হি—

নেপথ্যে যাত্রী ঃ তোমার জন্যে, স্রেফ তোমার জন্যেই আমি কাদায় আছাড় খেলাম। নামার সময় নৌকোটা এমন নাড়িয়ে দিলে যে টাল সামলাতে পারলাম না! ইস্, সারা গায়ে কাদা মাখামাখি! নদীর জলে ভালো ক'রে হাতমুখ না ধুয়ে কিছুতেই বাড়িতে যেতে পারবো না!

নেপথ্যে মাঝি ঃ নাও বাবু, হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি নৌকাটা বেঁধে ওপরে চললাম!

আমিনা ঃ চলো বাপজান, আমরা গিয়ে নৌকায় উঠি।

গফুর ঃ হ্যাঁ মা, তাই চল্। আমার আর তর সইছে না। রাতের বাসটা যেভাবেই হোক ধরতেই হবে। তাহলেই ভোরবেলায় ফুলবেড়ে; আমাদের জীবনের আঁধারও কেটে যাবে, আলোয় রাঙা সকাল আসবে— [মাঝির প্রবেশ]

লোকটা ঃ কী গো মাঝি, উঠে এলে যে বড়! নৌকা ছাড়বে না?

মাঝি ঃ কে? ও, পাগলা মাস্টার যে! তো নৌকা ছাড়ি না ছাড়ি— তা'তে তোমার কী? তুমি তো কখনও নদী পেরিয়ে শহরে যাবে না!

মাস্টার ঃ না, আমি অবশ্য কোথাও যাবো না। মাটি কামড়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানেই প'ড়ে থাকবো। শেষ দেখে তবে ছাড়বো।

মাঝি : কী যে তোমার এত টান কে জানে বাপু! পিছুটান ব'লে কিছু তো রাখোনি। তবু যে কেন এখানেই প'ড়ে রয়েছো—

মাস্টার : আমার কথা বাদ দাও! —কিন্তু এরা যে শেষ খেয়ায় নদী পেরুবে ব'লে ব'সে রয়েছে! তাড়াতাড়ি নৌকো না ছাড়লে এরা ফুলবেড়ের বাস পাবে না।

মাঝি : না মাস্টার, আজকে আর নৌকা ছাড়বো না।

গফুর : সে কী কথা! নৌকা ছাড়বে না মানে? আমরা তাহলে কোথায় যাবো?

মাঝি : কোথায় আবার যাবে? এপারেই থাকবে। নৌকা আজ আর যাবে না।

গফুর : কেন? কেন যাবে না শুনি?

মাঝি : লক্ষণ আমার ভালো মনে হচ্ছে না। নদীর বুকে হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। অদ্ভুত একটা গুমোট ভাব চারপাশে— বুঝতে পারছো না? হাঁফ ধ'রে যায় যেন—

আমিনা : তা'তে কী হলো? খেয়া ছাড়বে না কেন?

মাঝি : তুফান! তুফান আসছে বেটি! আমি তার ইশারা পাচ্ছি! হঠাৎ ঝড় উঠবে, নদী হবে উথালপাথাল, নৌকা যাবে উলটিয়ে—

গফুর : কিচ্ছু হবে না। মিথ্যে ভয় তোমার! ছাড়ো, ছাড়ো, নৌকা ছাড়ো!

মাঝি : না বাপু, আজ আর কিছুতেই নৌকা যাবে না!

গফুর : আমাকে রাতের বাস ধরতেই হবে। বেশি পয়সা দেবো। চলো!

মাঝি : আমাকে মেরে ফেললেও আমি আর এখন খেয়া বাইবো না।

গফুর : তোমাকে নৌকা ছাড়তেই হবে। চলো বলছি।

মাঝি : কাকে চোখ রাঙাও মিয়াসাহেব? কাকে? তোমার কথায় নৌকা ছেড়ে আমি কি জান খোয়াতে যাবো?

গফুর : তাহলে তুমি যাবে না? তোমার জন্যে আজ আমাকে সারা রাত নদীর পাড়ে ব'সে থাকতে হবে?

মাঝি : নদীর পাড়ে থাকতে যাবে কেন? ঐ পাগলা মাস্টারের সঙ্গে তার ডেরায় চ'লে যাও। মাস্টারের তো তিনকূলে কেউ নেই, তোমরা বাপ-বেটিতে তার ঘরে গিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দাও। তারপর ভোরবেলায় আবার এসো। প্রথম নৌকায় পার ক'রে দেবো।

মাস্টার : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো, মিছি মিছি ঝগড়া ক'রে কী হবে? আমার ঘরেই চলো!

গফুর ঃ তবু তুমি আজ যাবে না? এত তোমার জেদ? তোমার জন্যে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভোরে পৌঁছুতে না পারলে ফুলবেড়ের চটকলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

[নদীর পাড় থেকে সিক্ত গায়ে একজন উঠে আসে]

একজন ঃ ফুলবেড়ের চটকলের দরজা এমনিই বন্ধ হয়ে গেছে গফুর চাচা। বাইশটা চটকল আজ বন্ধ!

মাস্টার ঃ সেদিনের ফুলবেড়ে, আজকের ফুলেশ্বর। কানোরিয়া জুটমিলে লক্‌আউট।

গফুর ঃ কে? কাঙালী! তুই কোত্থেকে এলি?

কাঙালী ঃ কোত্থেকে আবার? যেখানে তুমি যাচ্ছো, সেখান থেকেই।

গফুর ঃ আমি কোথায় যাচ্ছি, তুই জানিস?

কাঙালী ঃ জানবো না কেন? এ তল্লাটের বেশির ভাগ লোকই তো এখন সেদিকেই ছুটছে।

গফুর ঃ আমি যে তোর কথাতেই ভিটেমাটি ছেড়ে ফুলবেড়েতে ছুটছিলাম কাঙালী! তুই-ই তো বলেছিলিস, ফুলবেড়েতে গেলে চটকলে কাজ পাবো, খেয়ে-প'রে বাঁচতে পারবো, এই ভয়ঙ্কর আকালের হাত থেকে নিস্তার পাবো!

কাঙালী ঃ হ্যাঁ বলেছিলাম। অস্বীকার করি না।

গফুর ঃ তাহলে এখন কেন উল্টো সুর গাইছিস?

কাঙালী ঃ উল্টো সিধে কিছুই বলিনি। যা সত্যি তাই বললাম।

মাস্টার ঃ এই তাহলে 'অভাগীর স্বর্গের' কাঙালী, সেই মাতৃহীন বালক, বর্তমানে পুরোদস্তুর জোয়ান, ফুলবেড়ের চটকলের কর্মচ্যুত শ্রমিক! শরৎবাবুর চরিত্রেরা তাহলে এইভাবেই বেঁচে আছে এখনও! শুধু ফুলবেড়ের বদলে হয়তো ফুলেশ্বর, কানোরিয়া।

কাঙালী ঃ হ্যাঁ, এইভাবে আমরা বেঁচে আছি, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে না পেয়ে, রোগে ভুগে বাবুদের হাজার জুলুম সহ্য ক'রে চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়ে ভিক্ষে ক'রে কোনোরকমে বেঁচেবর্তে আছি আমরা। আমার চিরদুঃখী মা আমার হাতের আগুন নিয়ে মরতে চেয়েছিল, ঠাকুরদাস মুখুজ্জের গিন্নীর আড়ম্বর আর সমারোহে ভরা শেষযাত্রা দেখে সেও চেয়েছিল বাবুদের মতো চন্দন কাঠের চিতায় শুয়ে স্বর্গে যেতে। জীবনে যার দুঃখ-কষ্ট-অভাব ঘোচেনি কোনোদিন, মরণেও তার স্বর্গের দরজা খোলে না, স্বর্গও দখল ক'রে রেখেছে ঐ জোতদার-মহাজন-মিলমালিকের দল। আমার

হতভাগী মা'টা সেই সত্য বোঝেনি ব'লেই আজ তার আধপোড়া শরীর এই গরুড় নদীর চরায় পোঁতা রয়েছে, মাকে দাহ করার মতো কাঠও জোটেনি আমার।

মাঝি : যাও, যাও, সবাই যে যার ঘরে চ'লে যাও। এখুনি ঝড় উঠবে—

মাস্টার : ঝড় উঠবে হয়তো, কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি নামবে না, যে ভীষণ দাবানল জ্বলছে চারিদিকে, তার আগুন কিছুতেই নিভবে না।

আমিনা : তাহলে আমরা বাঁচবো কী ক'রে? খরার আগুনে জ্ব'লে-পুড়ে মরা ছাড়া আমাদের কি কোনো ভবিতব্য নেই?

গফুর : সত্যি ক'রে বল্ কাঙালী, তুই যে আমাকে এত আশা দিয়েছিলিস স্বপ্ন দেখিয়েছিলিস— তার সবই কি তাহলে মিথ্যে?

কাঙালী : আমাদের স্বপ্নগুলো কখনও মিথ্যে হয় না গফুর চাচা, কিন্তু স্বপ্নকে সত্যি ক'রে তুলতে হয়।

গফুর : কী বলতে চাস কিছুই বুঝতে পারছি না। সোজাসুজি জবাব দে— আমি ফুলবেড়েতে যাবো কি-না—

কাঙালী : গিয়ে কোনো লাভ আছে কি? চটকল তো বন্ধ—

গফুর : কী বলছিস তুই কাঙালী, ফুলবেড়ের চটকল বন্ধ?

কাঙালী : হ্যাঁ, কোম্পানি তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে— লক্‌আউট।

গফুর : তাহলে ফুলবেড়েতে গেলে আমি কাজ পাবো না?

কাঙালী : তুমি আর পাবে কোত্থেকে? আমরাই বেকার হয়ে গেছি। আমাদেরই কাজ নেই। ভিক্ষে ক'রে সংসার চালাচ্ছি।

গফুর : কী সর্বনাশ! আমার তাহলে একূলও গেল, ওকূলও গেল?

মাস্টার : বলেছিলাম না গফুর মিয়া-- মিছিমিছি শহরে যাচ্ছো, শহর একটা অলীক মরীচিকা— শরৎবাবুর আমলে ওসব হতো, খরাক্লিষ্ট গ্রামের চাষি শহরে গিয়ে শ্রমিক হতো, এখন আর ওসব হয় না, গ্রামের চাষি এখন শহরে গিয়ে কলকারখানার মজুর হয় না, হয় পথের ভিখিরী! ফুটপাথের বাসিন্দা, সস্তা শ্রমশক্তি।

গফুর : তার মানে আমাদের কোথাও ঠাঁই নেই? গ্রামে আকালের কালো ছায়া, আর শহরে ভিখিরীর ভবিষ্যৎ!

মাস্টার : আসলে পালিয়ে গিয়ে রেহাই মেলে না গফুর মিয়া, কোথায় পালাবে? সারা দেশ জুড়ে আগুন জ্বলছে, খরার আগুন—

কাঙালী : শহরেও খরা। একদিকে কারখানা বন্ধ, অন্যদিকে জিনিসপত্রের

দাম হু হু ক'রে নাগালের বাইরে চ'লে যাচ্ছে, গ্রামে যেমন মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, শহরেও তাই।

মাস্টার : তাহলে পালাবে কেন? নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের পাওনা, নিজের হক্— কড়ায়-গণ্ডায় আদায় ক'রে নাও।

আমিনা : বাপজান— আমরা তাহলে ফুলবেড়ে যাবো না?

গফুর : কোথায় যাবো, কী করবো— কিছুই বুঝতে পারছি না মা, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার—

মাস্টার : খরা আর বন্যা বিরূপ প্রকৃতির নিষ্করুণ অভিশাপ। বিজ্ঞানের এত উন্নতির যুগেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে আজও জয় করা গেল না এই হতভাগ্য দেশে! ঋতুচক্রের মতোই ঘুরে ঘুরে আসে একবার বন্যা, একবার খরা। কিন্তু এর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচা যায় না, বরং একযোগে সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে রুখে দাঁড়াতে হয় এই দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে।

কাঙালী : কিন্তু কার সঙ্গে হাত মেলাবো? ওরা তো চিরকাল খরা আর বন্যার ক্ষয়ক্ষতির বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে নিশ্চিন্ত থেকেছে। বন্যায় চিরদিন অভাগীর বেটা কাঙালীর ঘর ভেসে যায়, অথচ ঐ ঠাকুরদাস মুখুজ্জে আর অধর রায়দের অট্টালিকায় বানের জল ঢোকে না; খরায় জ্ব'লে-পুড়ে মরে গফুর জোলা, কিন্তু শিববাবু আর তর্করত্নের তেষ্টার জলের অভাব হয় না। অথচ সরকারী সাহায্য দানখয়রাত সবই ওদের সিন্দুকে জমা হয়, ত্রাণসামগ্রী মাঝপথে লুটে নেয় ওরা, আর আমরা ভুখা পেটে নির্বাক চোখে তাকিয়ে দেখি—

মাঝি : একথা অবশ্য কাঙালী ঠিকই বলেছে পাগলা মাস্টার, তেলা মাথাতেই তেল দেয় সবাই। সরকারী সাহায্য বাবুদের ঘরেই ওঠে, আর গরিব মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে পালায়!

কাঙালী : যত খারাপ অবস্থাই হোক না কেন, ওরা সবসময়েই মুনাফা কামায়! খরাই হোক, কী বন্যাই হোক, মহাজন আর মালিকের ভাঁড়ারে টান পড়ে না কখনও। সবসময়েই ওরা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়, আর মারা পড়ে আমাদের মতো গরিব মানুষ! এই দ্যাখো না কেন, খরার অজুহাতে বেনিয়ার বাচ্চারা এখনই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। অথচ এখন তো জিনিসের দাম বাড়ার কথাই নয়। কেননা খরায়

এবছর যে ফসলের ক্ষতি হলো, তার ফল বোঝা যাবে আসছে বছর, এখন নয়। অথচ ঐ ধান্দাবাজ ব্যবসাদারেরা এখনই জিনিসের দাম বাড়িয়ে গরিবের পকেট কাটতে শুরু করেছে। আর সারা দেশেরই পকেট কাটছে বিদেশী কোম্পানিগুলো এই স্বাধীন দেশে।

মাস্টার ঃ আসলে কী জানো, আমাদের সব-ক'টা লড়াই একসূত্রে বাঁধা। খরার বিরুদ্ধে লড়াই আর ফুলবোর্ডের চটকল লক্‌আউটের বিরুদ্ধে লড়াই— সব এক! এই সমাজটাকে না বদলালে বিদেশী শোষণও বন্ধ হবে না। খরা আর বন্যাকেও আটকানো যাবে না!

কাঙালী ঃ কই— খরা হয়েছে ব'লে তো মালিকের চক্রান্ত কমেনি! এই আকালের বছরেও তো মহাজন— গফুর চাচার দেনা মুকুব করেনি, এই দুর্মূল্যের বাজারেও তো ওরা কারখানার পর কারখানা লক্‌আউট ক'রে হাজার হাজার শ্রমিককে অনাহারের পথে ঠেলে দিতে দ্বিধা করেনি! তাহলে সব দায় কি শুধু আমাদের?

মাস্টার ঃ বলেছি তো, শুধু খয়রাতি দিয়ে বন্যাকে খরাকে আটকানো যায় না, তার জন্যে অন্য পথ নিতে হবে। সত্তর দশকের পথ।

গফুর ঃ তোমরা কী যে বলছো সবাই, আমার কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না। তোমরা শুধু আমাকে বলো— এখন আমি কী করবো? বড় দুঃখে সবকিছু ছেড়ে আমি পথে নেমেছি। তবে কি সারাটা জীবন আমাকে এইভাবে সর্বস্ব হারিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে? আমি কি কখনও কোথাও পৌঁছুতে পারবো না? আমার গ্রামে ফেরার দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে, আবার ফুলবেড়ের চটকলের দরজাও বন্ধ— তবে কি আমার বেঁচে থাকার দরজাই বন্ধ হয়ে গেল?

মাস্টার ঃ না, কোনো দরজাই বন্ধ হয়নি, সব-ক'টা দরজাই আমাদের খুলতে হবে, দরকার হ'লে বন্ধ দরজাগুলোয় আঘাত হেনে একেবারে ভেঙে ফেলতে হবে সব— আরেকটা স্বাধীনতার লড়াই চাই।

গফুর ঃ কী বলছো মাস্টার—

মাস্টার ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি! ঘা মেরে ভেঙে ফেলতে হবে সব! ফিরে যেতে হবে নিজেদের গ্রামে, ঐ শিবচরণবাবুদের কাছ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিতে হবে প্রতিটি অধিকার!

মাঝি ঃ পাগলা মাস্টার, তুমি কি আবার এখানে দাঙ্গাহাঙ্গামার উস্কানি

দিতে চলেছো? এততেও তোমার শিক্ষা হয়নি, এখনও তুমি আগের মতো লোক খেপানোর কাজে নেমেছো?

মাস্টার ঃ আমার আর নতুন ক'রে এ বয়েসে কী শিক্ষা হবে ভাই? থানার লক্‌আপে ওরা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে, তা সারাটা জীবনেও কোনোদিন মুছবে না।

মাঝি ঃ নকশাল আমলে পুলিশে মেরে মেরে মাস্টারের সারাটা শরীরে কালসিটে ফেলে দিয়েছিল, হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছিল, তারপর থেকেই মাস্টারের মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়—

মাস্টার ঃ না। আমার মাথায় কোনো গণ্ডগোল হয়নি, ওরা আমাকে মিছিমিছি পাগল সাজিয়ে রেখেছে। জেল থেকে বেরুনোর পর ওরা আমাকে পাগল ব'লে রটিয়ে দিয়ে আমার চাকরিটা কেড়ে নিয়েছে। বিনা চিকিৎসায় আমার আদরের মেয়েটা মরেছে আর আমার বৌ দিয়েছে গলায় দড়ি। ছিলাম প্রাইমারি স্কুলের গরিব মাস্টার, সেটাও ওদের সইলো না। আমার মতো একটা সামান্য মানুষকেও ওরা যে এত ভয় পেয়েছে এইটুকুই আমার গৌরব!

আমিনা ঃ তোমাকে পুলিশে ধরেছিল কেন? কী করেছিলে তুমি?

মাস্টার ঃ কী করেছিলাম? তোমার মতো ছোট্ট মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম মা, এমন একটা দেশ তৈরি করতে চেয়েছিলাম, যে দেশে কোনোদিন কাশীপুর গ্রামের গরিব চাষি গফুর জোলাকে ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে গিয়ে ভিক্ষে করতে হবে না, অভাগীর হতভাগ্য সন্তান কাঙালীকে ছাঁটাই হয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না; এইটুকু চেয়েছিলাম ব'লেই ওরা এই প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারটাকে জেলে পুরে দিয়েছিল।

গফুর ঃ বাবু তোমার নাম কী? কোথায় থাকো?

মাস্টার ঃ আমার নাম বললে কি চিনতে পারবে তোমরা? আমার নাম— ধ'রে নাও— সব্যসাচী!

সবাই ঃ (বিস্ময়ে) সব্যসাচী?

মাস্টার ঃ কেন? বিশ্বাস হলো না নামটা? আরে বাবা, শরৎবাবু আজ বেঁচে থাকলে এই আমাকে নিয়েই নতুন ক'রে 'পথের দাবী' লিখতেন— নতুন একটা আজাদীর লড়াইয়ের কথা।

কাঙালী ঃ লেখাপড়া শিখিনি তো, তাই সবকিছু হয়তো ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। তবু এটুকু বুঝতে পারছি— তোমার কথাবার্তায় চালচলনে কোথায় যেন একটা ভয়ঙ্কর সত্য লুকিয়ে আছে; ওরা

তোমাকে যতই পাগল বলুক, আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি! বলো, আমাকে বলো— কোন্ পথে কোথায় যেতে হবে আমাদের—

মাঝি ঃ না, না, তোমরা মাস্টারকে আর কোনো নতুন ঝামেলায় টেনো না ভাই, এই লোকটার সবকিছু গেছে, ঘর সংসার সব, শরীরটাও ভেঙে পড়েছে একেবারে, ক'দিন বাঁচবে তার ঠিক নেই, তোমরা ওকে আর নাচিয়ো না।

মাস্টার ঃ মূর্খ! সব্যসাচী যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিনই তার লড়াই, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। ঝড়বাদলের আঁধার রাতে পথ চলতেই তার আনন্দ! সাঁতার দিয়ে তুফানের নদী পার হওয়াতেই তার উৎসাহ। চলো, চলো, আমরা সবাই বেরিয়ে পড়ি এই সর্বশক্তি নিয়ে— শূন্যতায় ভরা আকালের দেশে। লেলিহান দাবানলের মতো জ্বালিয়ে দিই এই অন্যায় আর অসাম্যে ভরা দুনিয়াটাকে—

মাঝি ঃ মাস্টার, এখনও ভেবে দ্যাখো— তোমার ওপর ওদের ভীষণ রাগ, এবার কিন্তু ওরা আর তোমাকে ছেড়ে দেবে না—

মাস্টার ঃ তা'তে আমার কিছু যায় আসে না। সব্যসাচী মল্লিক ওদের করুণায় পদাঘাত করে। ওরা ভেবেছে— এতদিনের অব্যবহারে আমার হাতের বন্দুক স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওরা জানে না— এখনও এই রুগ্ন অশক্ত সব্যসাচীর হাতের নিশানা আগের মতোই নির্ভুল এবং লক্ষ্যভেদী। চলো, চলো— এসো সবাই— স্বাধীনতার নতুন যুদ্ধ শুরু করো।

আমিনা ঃ আমি যাবো না? আমাকে নেবে না তুমি?

মাস্টার ঃ নিশ্চয়ই নেবো মা, আমাদের এই অভিযাত্রায় তুমিই তো থাকবে সকলের আগে এগিয়ে, তুমিই যে আমাদের আঁধার-বর্তমানে জবাকুসুমসঙ্কাশ ভবিষ্যৎ—

গফুর ঃ কোথায় তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও মাস্টার, কোথায়?

মাস্টার ঃ নিজের মাটিতে, নিজের ঘরে ফিরিয়ে দেবো তোমাদের। দাঁতে দাঁত চেপে লড়তে হবে নিজের ঘরে, নিজের মাটিতে শক্ত ক'রে দাঁড়িয়ে ভীষণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে, সুযোগসন্ধানী মানুষের লোভের বিরুদ্ধে, বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে। ঐ শিবচরণ অধর রায় আর ঠাকুরদাসদের বিরুদ্ধে। নতুন যুগের গফুর, আমিনা, কাঙালীকে।

কাঙালী ঃ নতুন যুগের সব্যসাচী, তুমি আমাদের পথ দেখাও— প্রতিবাদে প্রতিরোধে অধিকার অর্জনের সংগ্রামে!

মাস্টার ঃ আজকের সব্যসাচী আর— জনগণ-বিচ্ছিন্ন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চে ভরা ব্যক্তিগত বীরত্বের পথের নিঃসঙ্গ পদাতিক নয়, আজকের সব্যসাচী— জনজোয়ারের উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত উচ্ছ্বাসে ধেয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাতে হাত রেখে মহাপ্লাবনের রণহুঙ্কারে ভাসিয়ে নিতে— এই বিষাক্ত স্বদেশের গলিত আবর্জনা— বাবুরা

মাঝি ঃ গতিক সুবিধের নয়, ঝড় উঠলো ব'লে, দিক্‌বিদিক তোলপাড় করা তুফান আসছে। যে যেখানে যেতে চাও, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ো, আর থেমে থেকো না বোকার মতো এই নির্জন নদীর তীরে—

মাস্টার ঃ ঝড়কে আমাদের ভয় কীসের? ঝড়-তুফানের সঙ্গেই যে আমাদের আজন্ম মিতালী! আমরাই যে যুগ যুগ বঞ্চিত ক্রোধ আর ঘৃণার প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের উন্মাদ কালবৈশাখী।

আমিনা ঃ এসো, চ'লে এসো সবাই, আমার সঙ্গে এসো, আমার পেছনে সারি বেঁধে এসো—

(মাস্টার ছাড়া সবাই, উঁচু নদীর পাড় ধ'রে ছুটতে থাকে। মাস্টার সামনে এগিয়ে আসে)

মাস্টার ঃ দেখুন, শেষ দৃশ্যটি দু'চোখ মেলে দেখে রাখুন সবাই। এমন ঘটনা অবশ্য এখনই ঘটছে না কোথাও, এখনও গ্রামছাড়া খরাক্লিষ্ট কৃষক গফুর জোলা শহরে এসে ভিক্ষার পাত্র নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, ছাঁটাই শ্রমিক কাঙালীও হতাশার কদর্য আঁধারে নিঃশব্দে ক্ষয়ে যায়। কেননা আজও সেই অভ্রান্ত তীরন্দাজ, ইতিহাসের শাশ্বত স্বপ্নের সব্যসাচী মল্লিকের আগ্নেয় আবির্ভাব ঘটেনি এখনও কালের দিগন্তে, তাই আজও এই আকালের দেশে বিষণ্ণ বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় নেই। আসলে কী জানেন, এই গরুড় নদীর তীর আর তার মানুষগুলো, ঐ গফুর, ঐ আমিনা, ঐ কাঙালী— সবাই তো আমারই মানসসন্তান, আমারই অলস কল্পনার খেয়ালী বিলাস, এসবই তো মরীচিকার মতোই অলীক! এসব তো কিছুই বাস্তবে নেই। সমাজতান্ত্রিক শিবির নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে গ্যাটদৈত্যের তাণ্ডব, এই দেশও বহুজাতিক সংস্থাদের শিকলে বন্দী। এই প্রতিবাদ, এই প্রতিরোধ, এই লড়াই— সবই তো এখনও স্থিতাবস্থার বাঁধনে বন্দী; অথচ আমার স্বপ্নে— আমার কল্পনায়— এরা আছে, সত্য

হয়েই আছে। আপনারা বলতে পারেন— সত্তর দশকে থানার লক্‌আপে বীভৎস অত্যাচারে মস্তিষ্কবিকৃত এক উন্মাদের প্রলাপ, এসব তারই উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিকার! হ'তে পারে শরৎবাবুর বই প'ড়ে প'ড়ে আর পুলিশের হাতে অকথ্য নির্যাতন ভোগ ক'রে এই অর্দ্ধশিক্ষিত প্রাইমারি স্কুল টিচারের মাথাটাই বিগড়ে গেছে, তাই সে এই বন্ধ্যা মৃত দুঃসময়েও নতুন একটা স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন দেখে চলে! কিন্তু বলুন তো আপনারা— আমার এই স্বপ্ন যদি সত্যি হতো, যদি আমার স্বপ্নের গফুর-আমিনারা বাস্তবের ভিক্ষার পাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে দানখয়রাতের সুবিধাবাদী রাজনীতির মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যদি ঐ অমন দৃপ্তভঙ্গীতে আরেকটা গণফৌজ গ'ড়ে তুলে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায় শেষ যুদ্ধের রণাঙ্গণে, তাহলে কি আপনারাও সুখী হতেন না? এই একই স্বপ্ন, একই আকাঙ্ক্ষা কি আপনাদের বুকের গভীরেও লুকিয়ে নেই? বলুন! জবাব দিন! আমরা সবাই কিন্তু আপনাদের উত্তর শুনতে চাই।

।। পর্দা ।।

একাঙ্ক

করণ দুসাদ

চরিত্রলিপি ঃ হনুমান মিশ্র, গোলবদন সাহু, লছমন সিং, দেওকীনন্দন পাঁড়ে, করণ দুসাদ, লাটুয়া, দুলন, সোমরা

।। শেষ রাতের স্বপ্ন ।।

[অন্ধকার মঞ্চে দেখা যায় একটি ছেলে ছুটছে। নেপথ্যে ভারী গলায় ঘোষিত হয়]

"সোম্‌রা টুডু.... সোম্‌রা টুডু.... তোহ্‌রি থেকে বুরুডিহা পর্যন্ত ভোজপুরে বিস্তীর্ণ আদিবাসী বেল্টে দাঙ্গাহাঙ্গামার উস্কানি দিচ্ছে— মোস্ট নটোরিয়াস এলিমেন্ট অব দ্য এরিয়া, যে-কোনো মূল্যে তাকে ধরা চাই— জীবিত বা মৃত যা-ই হোক না কেন! ....এস.আই. করণ দুসাদ, এইবার তোমার সুযোগ এসেছে, শিকার তোমার হাতের মুঠোয়, চেজ হিম— অ্যারেস্ট্ হিম— এস.আই. করণ দুসাদ— সাহারসা ব্লকের ভারপ্রাপ্ত দারোগা করণ দুসাদ— যাও, ওর পেছনে ছুটে যাও—"

[করণ দুসাদকে দেখা যায়, রিভলবার উঁচিয়ে সেও তাড়া করেছে সোম্‌রা টুডুকে। নেপথ্যের ধারাভাষ্য চলছে]

"এস.আই. করণ দুসাদ— তুমি নিজে অচ্ছুত, তবু তোমাকে আমরা বড় চাকরি দিয়েছি, কোনো আদিবাসী হরিজন তোমার মতো উঁচু পোস্টে কোনোদিন বসেনি; তুমি আজ দারোগা বনেছো, তোমাকে আরও উঁচু পোস্টে আমরা প্রমোশন দেবো, রিওয়ার্ড দেবো, শুধু ঐ ডেঞ্জারাস এক্সট্রিমিস্ট্ সোম্‌রা টুডুকে ধরা চাই, বহুদিন ধ'রে সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছে, তমাম মহল্লায় আদিবাসী আর হরিজনদের খেপিয়ে তুলেছে। ল অ্যাণ্ড অর্ডার বিপন্ন। এস.আই. করণ দুসাদ— জীবিত বা মৃত অবস্থায় সোম্‌রা টুডুকে আমাদের চাই। সোম্‌রা টুডুকে তুমি ভালোভাবেই চেনো, সে তোমার গ্রামের ছেলে, তোমার নজর এড়িয়ে সে পালাতে পারবে না। ঐ জন্যেই তোমাকে এখানে ট্রান্সফার করা হয়েছে করণ দুসাদ, দিস ইজ ইওর লাস্ট্ চান্স। চেজ হিম, এ্যাট লিস্ট্ ফায়ার করো, শুট্ টু কিল অর্ডার দেওয়া হলো করণ দুসাদ—"

করণ ঃ থেমে যা, থেমে যা সোম্‌রা— ছুটিস না—

সোম্‌রা ঃ করণ, তুই! বেইমান!

করণ ঃ হ্যাণ্ডস্ আপ! খাড়া হো যাও! না হ'লে গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা ক'রে দেবো!

সোম্‌রা ঃ মার্— গুলি মার্— যত গুলি আছে, চালা। তবু যতক্ষণ জান আছে, ততক্ষণ ধরা আমি দেবো না—

করণ ঃ সোম্‌রা!

সোম্‌রা ঃ তুই বেইমান-বেশরম কাঁহিকা, নিজে অচ্ছুত হয়েও আজ গায়ে পুলিশের উর্দি চাপিয়ে হরিজন আর আদিবাসীদের ওপর জুলুম চালাতে এসেছিস, তোর লজ্জা করে না? বেইমান—

করণ ঃ বাজে কথা বলবি না সোম্‌রা! কে বেইমান? আমি সরকারের নোকর। সরকার যা বলবে তা-ই করবো।

সোম্‌রা ঃ কৌন হ্যায় সরকার? এ সরকার হনুমান মিশির আর লছমন সিংদের সরকার, মালিক-মহাজন-লুটেরা-দুশমনদের সরকার; এ সরকার গরিব আদিবাসী আর অচ্ছুত হরিজনের কেউ নয়। তুই আজ লছমন সিংদের পা চাটছিস করণ, হনুমান মিশিরের গোলাম বনেছিস— বেইমান কুত্তা— হট্ যাও হিঁয়াসে— থুঃ থুঃ!

করণ ঃ তুই আমার গায়ে থুতু দিলি, আমাকে কুত্তা বললি? দ্যাখ্ তবে— (রিভলবার তুলে ধরে)

সোম্‌রা ঃ (ছুটতে থাকে) তুই ফিরে যা করণ, আমাকে ধরতে আসিসনি, নিজের লোকদের সঙ্গে বেইমানী করিসনি—

করণ ঃ সোম্‌রা থাম— থেমে যা— না হ'লে—

সোম্‌রা ঃ ধরা দেবো না, গুলি চালা— চালা গুলি—

(করণ গুলি চালায়। ছেলেটি চিৎকার ক'রে স্লো মোশন ফিল্মের মতো নৃত্য-ছন্দে পড়তে থাকে—)

করণ ঃ বললাম ছুটিস না— এখন হ'লো তো— মিছিমিছি গুলি খেয়ে মরলি—

সোম্‌রা ঃ বেইমান! তুই নিজে দলিত হয়ে আদিবাসীকে খুন করলি—শাল-পিয়ালের জঙ্গলে নিজের ভাইয়ের খুন ঝরালি—

করণ ঃ সোম্‌রা তোকে আমি নিজে হাতে মেরেছি—

সোম্‌রা ঃ বেইমান— তু বেইমান ব'নে গেলি করণ— থুঃ

[সোম্‌রা হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। নেপথ্যে অসংখ্য কণ্ঠে বারবার শোনা যায় "বেইমান— তুই বেইমান ব'নে গেলি করণ— তুই আদিবাসীকে খুন করলি...."।

করণ ঃ (চিৎকার করে) না!

[ধীরে ধীরে বর্শা হাতে একদল আদিবাসী যেন মঞ্চে

ঢোকে। করণকে ঘিরে ফেলতে থাকে। করণ দৌড়োয়, ওরাও ছোটে। আর অবিরাম চিৎকার 'বেইমান, বেইমান'। করণ ছুটতে ছুটতে মঞ্চের অপর কোণে চ'লে যায়। সেদিক দিয়ে মালা হাতে মঞ্চে ঢোকে হনুমান মিশির, লছমন সিং, গোলবদন সাহু]

হনুমানের দল ঃ সাবাস! সাবাস করণ দুসাদ!

করণ ঃ কে? কে তোমরা?

হনুমানের দল ঃ চমৎকার তোমার সাহস! তুমি নিজে হাতে সোম্‌রা টুডুকে মেরেছো— তোমার জবাব নেই!

করণ ঃ চিনতে পেরেছি তোমাদের। তুমি হনুমান মিশির, তুমি লছমন সিং, তুমি গোলবদন সাউ— তোমরা এখানে কেন? কী চাও তোমরা? চ'লে যাও—

হনুমানের দল ঃ আমরা তোমাকে সোম্‌রাদের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছি— সোম্‌রা টুডুকে মেরে তুমি আজ তোমার নিজের লোকদের কাছে দুশমন বনেছো, তাই আজ থেকে তুমি আমাদের লোক!

করণ ঃ না!

সোম্‌রার দল ঃ তুই বেইমান— তুই বেইমান ব'নে গেলি করণ!

হনুমানের দল ঃ করণ দুসাদ— তোমাকে আমরা মালা পরাতে এসেছি, সরকার তোমাকে মেডেল দেবে, চিফ মিনিস্টার তোমাকে রিওয়ার্ড দেবেন।

করণ ঃ না— আমি চাই না—

সোম্‌রার দল ঃ বেইমান! বড়লোকের পা চাটা কুত্তা— থুঃ!

হনুমানের দল ঃ এসো, মালা পরো করণ দুসাদ! তুমি আজ জাতির গর্ব, দেশের রত্ন। তোমাকে আমরা অনেক উঁচু পোস্টে প্রমোশন দেবো। শুধু তুমি আরও বেশি বেশি ক'রে জুলুম চালাও, আর শত শত সোম্‌রা টুডুক গুলি ক'রে মারো— তোমার প্রমোশন হবে, টাকা পাবে— খেতাব পাবে— হাঃ হাঃ—

করণ ঃ না!

সোম্‌রার দল ঃ বেইমান— বেইমান— বেইমান—

করণ ঃ (বীভৎস চিৎকার) যাও, চ'লে যাও সবাই। হট্ যাও, নিকালো হিঁয়াসে, হট্ যাও—

[সমস্বরে উচ্চহাসির শব্দ। মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। শুধু নেপথ্যে দু'দলের কণ্ঠস্বর বার বার প্রতিধ্বনিত হয়—"করণ দুসাদ, তোমার প্রমোশন হবে" এবং "করণ তুই বেইমান ব'নে গেলি"। মাঝের পর্দা স'রে যায়]

।। স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা ।।

[আস্তে আস্তে মঞ্চ আলোকিত হয়। সাহারসা থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা করণ দুসাদের শোবার ঘর। একটা খাটিয়া, গোটা কতক চেয়ার, আলনা, গান্ধীর একটা ছবি, একটা টেবিলে একটা টেলিফোন, একটা জলের কুঁজো, তার ওপর একটা কাচের গ্লাশ— ব্যাস। এইটুকু মঞ্চসজ্জার উপকরণ। করণ দুসাদ খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিৎকার করছে "না আমি বেইমান নই সোন্‌রা, আমি বেইমান নই। চাই না— হনুমান মিশির তোমার প্রমোশন চাই না।" করণের চাকর লাটুয়া ঢোকে]

লাটুয়া : সাব সাব— চেঁচাচ্ছেন কেন সাব? কী হলো (ধাক্কা দেয়)

করণ : অ্যাঁ! কে? কী?

লাটুয়া : আমি লাটুয়া সাব। সকাল হয়ে গেছে— উঠুন।

করণ : ও! সকাল হয়ে গেছে বুঝি? ওঃ মাথার ভেতরটায় কেমন যেন—

লাটুয়া : সাব— আপনার তবিয়ত ঠিক আছে তো?

করণ : কেন? (উঠে বসে। আড়মোড়া ভাঙে)

লাটুয়া : ঘুমের মধ্যে বহুৎ চিল্লামিল্লি করছিলেন। খোয়াব দেখছিলেন বুঝি?

করণ : খোয়াব? কী জানি! আজকাল আমার ঠিকমতো ঘুম হয় না রে লাটুয়া, মাথার মধ্যে কেমন করে, কী যেন সব হয়— বুঝতে পারি না—

লাটুয়া : ক'দিন ছুটি নিয়ে নিন সাব, ঘর থেকে ঘুরে আসুন— বুরুডিহা তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়—

করণ : তাই যাবো ভাবছি। অনেক দিন যাইনি। ওদের কোনো খবরও পাইনি।

লাটুয়া : ভাবীজিকে এখানে নিয়ে আসুন সাব। কতদিন আর একা একা থাকবেন?

করণ : হুঁ! (অন্যমনস্কভাবে) কিচ্ছু ভালো লাগে না আমার, কিচ্ছু না!

লাটুয়া : সাব— গোলবদন সাউ এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে ব'লে বাইরে ব'সে আছে।

করণ : কে গোলবদন? ও, বাজারের বেনিয়া! সে শালা এত সকালে থানায় এসেছে কেন? যত্তোসব!

লাটুয়া : ভাগিয়ে দেবো সাব? ব'লে দেবো— আপনার তবিয়ত, আচ্ছা নেই, মোলাকাত হবে না—

করণ ঃ না, না, ওসব বলতে যাসনি। বড় কত্তাদের সঙ্গে গোলবদনের জান-পয়চান আছে। কী থেকে কী হয়ে যায় কে জানে। একে তো নিচু জাতের লোক হয়েও দারোগার চাকরি পেয়েছি ব'লে অনেকেরই চোখ টাটাচ্ছে। শালাকে বসতে বল্, আমি যাচ্ছি।

লাটুয়া ঃ ঠিক আছে সাব— তা-ই বলছি।

করণ ঃ চা বসিয়েছিস?

লাটুয়া ঃ হ্যাঁ সাব। জল ফুটে গেছে।

করণ ঃ একটু কড়া ক'রে চা বানাস। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। দু'চোখে এখনও ঘুমের ঘোর লেগে আছে, অথচ বিছানায় শুলে একটুও ঘুম আসবে না। এই এক জ্বালা হয়েছে। সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি, সবসময় মনে হয়— একটু ঘুমিয়ে নিই। অথচ একটা রাতেও ভালো ক'রে ঘুম হয় না, আজেবাজে স্বপ্ন দেখি—

লাটুয়া ঃ বলছি— ক'টা দিন ছুটি নিয়ে ঘরে যান। শরীর ভালো হয়ে যাবে। নয়তো ভাবীজিকে নিয়ে আসুন। এত কাছে আপনার ঘর, তবু একা থাকেন কেন?

করণ ঃ গোলবদনকেও এক কাপ চা দিস— বুঝলি? [লাটুয়া প্রস্থানোদ্যত]

লাটুয়া ঃ সে কি খাবে?

করণ ঃ তার মানে?

লাটুয়া ঃ শেঠজী আমার হাতে চা খাবে?

করণ ঃ ও হ্যাঁ হ্যাঁ! তা'ও তো বটে। করণ দুসাদ যত বড় দারোগাই হোক না কেন, আসলে তো সে অচ্ছুত হরিজন। ঠিকই বলেছিস লাটুয়া। তোর দেখছি মাথায় বেশ বুদ্ধি খেলছে আজকাল। গোলবদনকে চা দিসনি। যেচে অপমানিত হ'তে কে চায়? (উঠে জামাকাপড় পরতে শুরু করে।)

লাটুয়া ঃ সাব।

করণ ঃ কী হলো? চা আনলি না?

লাটুয়া ঃ একটা কথা জিগ্যেস করবো সাব?

করণ ঃ কী কথা?

লাটুয়া ঃ গোলবদন থানার সবাইকে বলছিল— আপনার না-কি প্রমোশন হয়ে গেছে সাব, আপনি না-কি আরও উঁচা পোস্টে চ'লে যাবেন?

করণ ঃ (হেসে) তোর কানেও কথাটা গেছে?

লাটুয়া ঃ হ্যাঁ সাব, তাহলে তো আজ বহুৎ খুশির দিন! আমি এক্ষুণি আপনার চা নিয়ে আসছি। [ছুটে প্রস্থান]

করণ : (চেঁচিয়ে) শুধু চা আনিস না লাটুয়া, সঙ্গে একটা-দুটো বিস্কুটও আনিস। পেটটা খালি খালি লাগছে। (করণ কুঁজো থেকে জল নিয়ে চোখে-মুখে ছিটোয়। লাটুয়া এক কাপ চা সহ ফিরে আসে)

লাটুয়া : শুধু চা-ই খেতে হবে। বিস্কুট ফুরিয়ে গেছে।

করণ : (গামছায় মুখ মোছে) দে তা-ই দে! করণ দারোগার ভাঁড়ার যখন খালি তখন আর কী হবে? দে শুধু চা-ই দে।

লাটুয়া : সাব— আজ বড় খানাপিনার ব্যবস্থা করুন— আমি বাজার থেকে মুরগী নিয়ে আসছি।

করণ : কেন? হঠাৎ খানাপিনা? (চা খায়)

লাটুয়া : কেন নয় বলুন সাব? আপনি এবার দারোগা থেকে বড় সাহেব ব'নে যাচ্ছেন, খানাপিনা হবে না মানে? জরুর হবে!

করণ : দুর, দুর, ওসব ফালতু কথায় কান দিস না।

লাটুয়া : না— ফালতু নয়। শেঠজী বলেছে— হুকুম বেরিয়ে গেছে— হনুমান মিশিরজী কাল রাতে শেঠজীকে ফোন ক'রে বলেছে—

করণ : আরে না আঁচালে বিশ্বাস নেই! বুঝিসই তো— জাতে আমি দুসাদ। উঁচু জাতেরা আমার ছোঁয়া জল খায় না। ওরা চায় না— নিচু জাতের প্রমোশন হোক। দেখবি হয়তো কোত্থেকে কলকাঠি নেড়ে এর মধ্যেই সব উল্টিয়ে দিয়েছে।

লাটুয়া : না সাব, তা' হবে না। গোলবদন সাউ যখন নিজে মুখে সবার কাছে বলেছে— (করণ চা খেয়ে কাপ নামিয়ে রাখে।)

করণ : তুই গোলবদনকে বরং এখানেই পাঠিয়ে দে। এই সাতসকালে আমি এখন আর অফিসে যাবো না। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

লাটুয়া : ঠিক আছে সাব, আমি তাকে এখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি— [প্রস্থান]

করণ : (হাত-আয়নায় চুল আঁচড়াতে থাকে) এখনই এত নেচো না করণ দুসাদ! বেশি উঁচুতে উঠতে চেয়ো না। অচ্ছুত হরিজন হয়েও তুমি আজ কপালের জোরে দারোগা বনেছো। এতেই তোমার অনেক শত্রু বেড়েছে। যা আছো, তা-ই থাকো। আরও ওপরে উঠতে গেলে শেষকালে পা ফস্‌কে একেবারে নিচে প'ড়ে যাবে। (ফোন বাজে। করণ দ্রুত ফোন ধরে)

করণ : হ্যালো!

নেপথ্যে : সাহারসা পি.এস.?

করণ : কাকে চাই?

নেপথ্যে : মিস্টার দুসাদ কথা বলছেন মনে হচ্ছে?

করণ : হ্যাঁ-- আমি— মানে আপনি—

নেপথ্যে ঃ আমি সুরিন্দর সিং বলছি!

করণ ঃ (চমকে উঠে স্যালুট করে) স্যার— আপনি? নমস্তে! কী সৌভাগ্য আমার!

নেপথ্যে ঃ কনগ্র্যাচুলেশন মিস্টার দুসাদ! আপনার কৃতিত্বে আমরা সকলেই চার্মড! উই আর প্রাউড অব ইউ!

করণ ঃ থ্যাঙ্কু স্যার!

নেপথ্যে ঃ একটা ভালো খবর দিই। আপনার প্রমোশনের অর্ডারে আমি গতকালই সই ক'রে দিয়েছি।

করণ ঃ স্যার—

নেপথ্যে ঃ সত্যি আপনার জবাব নেই মিস্টার দুসাদ। বিহার পুলিশের আপনি গর্ব। অচ্ছুত হরিজনের ঘরে জ'ন্মেও শুধুমাত্র নিজের কর্মদক্ষতায় আপনি আজ এত উঁচুতে উঠেছেন— ইউ আর এ্যান এক্সম্পল ফর আস—

করণ ঃ সবই আপনাদের দয়া স্যার—

নেপথ্যে ঃ আপনি আরও বড় হবেন, আরও উঁচুতে উঠবেন মিস্টার দুসাদ। ইয়ংম্যান আপনি— ব্রাইট ফিউচার আপনার সামনে, মাই বেস্ট উইশেস ফর ইউ! রাখছি।

করণ ঃ থ্যাঙ্কু স্যার! ....লাটুয়া— [লাটুয়া ঢোকে] —তোদের কথাই ঠিক। আমার প্রমোশন হয়েছে। স্বয়ং আই.জি. ফোন করেছিলেন।

লাটুয়া ঃ সে তো খুব ভালো কথা সাব। ঐ যে গোলবদন এসে গেছে। [লাটুয়ার প্রস্থান]

গোলবদন ঃ [প্রবেশ করে] নমস্তে, নমস্তে দারোগাবাবু।

করণ ঃ এই এক আপদ জুটলো! নমস্তে! তা, সকালবেলায় আপনি হঠাৎ এই গরিবের কুঁড়েতে?

গোলবদন ঃ হ্যাঁ— কাল রাতেই আমি খবরটা পেয়েছিলাম দারোগাবাবু। এম.এল.এ. সাহেব নিজে আমার গদিতে ফোন ক'রে জানালেন। শুনে মনটা ভীষণ খুশি হয়ে গেল দারোগাবাবু।

করণ ঃ কেন? আপনাদের এত খুশি হবার কারণ কী?

গোলবদন ঃ খুশি হবো না? বলেন কী দারোগাবাবু? আপনার নাম এখন এই মহল্লার সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে! একা একা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অমন একটা— কী বলবো দুর্ধর্ষ খুনে ডাকাত সোম্‌রা টুডুকে নিজে হাতে গুলি ক'রে মারলেন, সত্যি বলতে কী দারোগাবাবু— এমন সাহস আমার জীবনে দেখিনি।

করণ ঃ আসলে কী জানেন শেঠজী, আমি নিচুজাত, অচ্ছুত তো! ঐ

জন্যেই আমার ভয়ডরটা একটু কম! নিচুজাতরা সাধারণত সাহসীই হয়।

গোলবদন : কী যে বলেন— এখানে আবার জাতের বিচার আসছে কোত্থেকে?

করণ : জাতপাতের বিচার ছাড়া এদেশে কিছু হয় না কি? শ্মশানেও জাতের বিচার। আপনারা উঁচু জাতের মানুষেরা যেখানে চন্দন কাঠের চিতায় পোড়েন, সেখানে অচ্ছুত হরিজনদের লাশ শেয়াল কুকুরে খায়! যাক গে সে-সব কথা! বলুন শেঠজী— হঠাৎ এই সকালবেলায় আপনার আগমনের হেতুটা কী?

গোলবদন : আমি আপনাকে কোন্‌গ্র্যাচুলেট করতে এসেছি দারোগাবাবু! এই মিঠাইয়ের হাঁড়িটা রাখুন দয়া ক'রে।

করণ : আপনি তো জানেন শেঠজী— করণ দারোগা কোনো ঘুষ নেয় না।

গোলবদন : এ ছি ছি! ঘুষ কী বলছেন দারোগাবাবু, এ হলো সামান্য ভেট! প্রণামী!

করণ : তা হোক। তবু আমি নিতে পারবো না। আমায় মাপ করবেন।

গোলবদন : আপনি যেন কেমন দারোগাবাবু! আগে যাঁরা ছিলেন—

করণ : আমি জানি তাঁরা সবাই আপনাদের কাছ থেকে ঐ ভেটই বলুন, আর ঘুষই বলুন— দু'হাতে নিতেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন আপনাদের স্বজাতি। আর আমি অচ্ছুত দুসাদ। তাঁরা যা পারেন আমি তা পারি না।

গোলবদন : সত্যিই আপনি অদ্ভুত মানুষ— এমন আশ্চর্য লোক আমি কখনও দেখিনি।

করণ : জানি না কথাটা আমার নিন্দে না প্রশংসা! যা-ই হোক, নিচু জাতের ঘরে বসতে যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে, তবে এই চেয়ারটায় বসুন!

গোলবদন : আমি কী দোষ করেছি দারোগাবাবু যে আমাকে এমনভাবে ঠেস দিয়ে কথা বলছেন?

করণ : আসলে কী জানেন শেঠজী— দারোগাই হই আর পুলিশ কমিশনারই হই, কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না— আমি অচ্ছুত ঘরের ছেলে, আজও আমার বাপ-মা বৌ-ছেলে আপনাদের ঘরের কুয়োয় জল তুলতে যেতে পারে না— যাকে আমি নিজে হাতে মেরেছি, সেই সোম্‌রাও যেমন অচ্ছুত ছিল, তেমন আমিও— আমি জানি আপনাদের চোখে জাতের বিচারে সোম্‌রা টুডু আর করণ দুসাদের কোনো ভেদ নেই।

[সেকেণ্ড অফিসার দেওকীনন্দন পাঁড়ের প্রবেশ]

দেওকীনন্দন ঃ স্যার— এখুনি খবর এসেছে বুরুডিহায় কাল রাতে গণ্ডগোল বেঁধেছে, দু'একটা বাড়িঘর বোধহয় পুড়েছে। কী করবো? ফোর্স পাঠাবো?

করণ ঃ সে আপনি যা হয় করুন, আমার মন মেজাজ ভালো নেই।

দেওকীনন্দন ঃ আপনি নিজে গেলে বোধহয় ভালো হতো স্যার— কারণ—

করণ ঃ কারণগুলো আমি জানি পাঁড়েজী, আপনি না বললেও চলবে। আমি জানি বুরুডিহা ট্রাইবাল বেল্ট, তাই সেখানে অচ্ছুত করণ দুসাদের যাওয়া দরকার। তাছাড়া বুরুডিহা করণ দুসাদের নিজের গ্রাম, সোম্‌রা টুডুরও। সুতরাং সেখানে কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বাঁধলে করণ দুসাদকে তো যেতেই হবে।

দেওকীনন্দন ঃ না স্যার, আমি কথাটা ঠিক সে অর্থে বলিনি। আমি বলছিলাম—

করণ ঃ পাঁড়েজী, কোন্ কথার কী অর্থ হয়, তা' আমি ভালোই বুঝি। যা-ই হোক, আপনি বসুন। আমি এই বিছানা ছেড়ে উঠেছি। এখনও ভালো ক'রে মুখ হাত ধুইনি। আমি বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি। [প্রস্থান]

গোলবদন ঃ হাই বাপ! দারোগাবাবুর যে দেখছি মেজাজ গরম!

দেওকীনন্দন ঃ মেজাজ গরম হবে না? ছোট জাত যে! আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, এখন তো ধরাকে সরা দেখবেই।

গোলবদন ঃ আস্তে, আস্তে, কেউ শুনতে পেলে—

দেওকীনন্দন ঃ আরে রাখুন— ওসব দুসাদের বাচ্চাকে এই শর্মা ভয় করে না। আমি দেওকীনন্দন পাঁড়ে— খাঁটি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমি ওসব অচ্ছুত হরিজনকে তোয়াক্কা করি না— সে তারা দারোগাই হোক, কী পুলিশ-সাহেবই হোক।

গোলবদন ঃ তা' তো বটেই, তা' তো বটেই। কথায় বলে না— পায়ের তলার জুতোকে কখনও মাথায় চড়াতে নেই। ওসব হরিজন-আদিবাসীর দল থাকবে পায়ের তলায়, তবে দেশ চলবে।

দেওকীনন্দন ঃ বলুন তো শেঠজী, বলুন— কী আছে ঐ দুসাদের বাচ্চার, যে দারোগা বনেছে? আর আমি উঁচুজাত হয়েও ঐ অচ্ছুত জানোয়ারটাকে দু'বেলা স্যার স্যার করছি? ছি ছি— এই কি সরকারের বিচার? আরা জেলায় আমার নিজের গ্রামে ওই শালাকে পেলে একেবারে খতম ক'রে লাশ নদীতে ফেলে দিতাম, ব্রাহ্মণের মাথার ওপরে ব'সে নবাবী করার ফল বুঝিয়ে দিতাম।

[লাটুয়া ও হনুমান মিশ্রের প্রবেশ]

লাটুয়া ঃ আসুন এম.এল.এ. সাব, আসুন! বসুন। দারোগাজী মুখ হাত ধুতে গেছেন, এখুনি এসে পড়বেন। [প্রস্থান]

হনুমান ঃ কী ব্যাপার শেঠজী! আপনি দেখছি আমাকেও হারিয়ে দিলেন। কোথায় ভাবলাম আমিই সবার আগে করণ দারোগাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট করবো, তা আমার আগেই আপনি এসে গেছেন, হাঃ হাঃ—

গোলবদন ঃ আপনি হলেন আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মিশিরজী; ওরকম অনেক করণ দারোগাই আপনার দুয়ারে বাঁধা। কিন্তু আমি হলাম চুনো-পুঁটি, সামান্য কারবারী, দারোগা-পুলিশকে সবসময় হাতে রাখতে হয়, তোয়াজ করতে হয়, করণ দুসাদ জাতে অচ্ছুত হ'লেও দারোগা তো, তাই তার দুয়ারে ভোরবেলায় এ শর্মাকে হাজির হ'তে হয়।

দেওকীনন্দন ঃ এম.এল.এ. সাব— শুনলাম করণ দুসাদ না-কি প্রমোশন পাচ্ছে! দারোগা থেকে একলাফে সার্কেল ইনেস্‌পেক্টর হচ্ছে!

হনুমান ঃ প্রমোশন পাচ্ছে নয়, পেয়ে গেছে। কালকেই অর্ডার সই হয়ে গেছে।

দেওকীনন্দন ঃ এটা কী রকম হলো এম.এল.এ. সাব? করণ দুসাদের থেকে সিনিয়ার অনেককে বাদ দিয়ে তাকে প্রমোশন দেওয়া কি উচিত হলো মিশিরজী?

হনুমান ঃ দেওকীনন্দন পাঁড়ে— আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন— করণ দুসাদ এমনি এমনি প্রমোশন পায়নি— প্রমোশন পাবার মতো কাজ দেখিয়েছে বৈকি!

গোলবদন ঃ তা ঠিক— করণ দুসাদ আমাদের উপকারই করেছে। সোম্‌রা টুডুকে সে না মারলে আমাদের বিপদ হতো।

দেওকীনন্দন ঃ কেন বাজে কথা বলছেন শেঠজী? সেদিন করণ দুসাদ একা ছিল না। জঙ্গল ঘেরার সময় আমিও তার সঙ্গে ছিলাম, আরও অনেকেই ছিল।

হনুমান ঃ কিন্তু একথাও ঠিক পাঁড়েজী, ঐ করণ দুসাদ না হ'লে সোম্‌রা টুডুকে কিছুতেই মারা যেতো না— সত্যি বলতে কী, ঐ দুসাদের বাচ্চাই সেদিন নিজের জানের মায়া ছেড়ে যেভাবে একা একা জঙ্গলে ঢুকে সোম্‌রাকে মেরেছে— সে আপনাদের দিয়ে হতো না।

দেওকীনন্দন ঃ আরে রাখুন ওসব কথা! আমি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে হয়ে ঐ

সাঁওতালটার পেছনে বনের মধ্যে দৌড়োতে যাবো কেন? আমার কি একটা ইজ্জত নেই? ওসব দুসাদরাই পারে। ও শালা নিজেও সোম্‌রার মতোই জংলী ছিল, এখন না হয় মিশনারী ইস্‌কুলে দু' পাতা ইংরেজি প'ড়ে দারোগা বনেছে।

গোলবদন ঃ ঠিকই তো, সোম্‌রা টুডু আর করণ দুসাদের মধ্যে তফাৎ কী?

হনুমান ঃ সেইজন্যেই করণ দুসাদকে দারোগা বানানো হয়েছে। সরকারের মতলবটা বুঝলেন না? কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। করণকে দিয়ে সোম্‌রাকে মারানো— হাঃ হাঃ—

দেওকীনন্দন ঃ হাসছেন! হাসুন। কিন্তু একদিন এই হাসিই চোখের জলে পরিণত হবে ব'লে রাখছি। আজ যে অচ্ছুত দুসাদকে মাথায় তুলেছেন, কাল সেই দুসাদই আপনাদের মাথা ভাঙবে!

হনুমান ঃ না পাঁড়েজী, অত সহজ নয়, তার আগেই এই দুসাদের বাচ্চাকে দুনিয়া থেকে স'রে যেতে হবে। আমি এম.এল.এ. হনুমান মিশ্র কথা দিচ্ছি।

গোলবদন ঃ মিশিরজীকে আপনি নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করবেন না। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নিয়মিত পুজো-আর্চা করেন। আদিবাসী হরিজনদের তিনিও দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

দেওকীনন্দন ঃ কিন্তু এম.এল.এ. সাবই তো নিজে তদ্বির ক'রে করণ দুসাদকে আরও উঁচু পোস্টে প্রমোশন দিয়েছেন। দারোগা থেকে সার্কেল ইন্সপেক্টর? এটা কীরকম হলো মিশিরজী? দুসাদের বাচ্চা আরও উঁচুতে উঠবে? তাহলে যে, মহল্লায় মহল্লায় নিচুজাতেরা পেয়ে বসবে, তারা আমাদের আর মানতে চাইবে না, কথায় কথায় হাঙ্গামা বাঁধাবে, তারা ভাববে ওদের নিজেদের লোক যখন পুলিশের বড় কর্তা বনেছে, তখন আর ভয় কী? না, না, মিশিরজী আপনি কাজটা ভালো করেননি, এতে গ্রামে গ্রামে অশান্তি বাড়বে।

হনুমান ঃ ওসব ভয় করবেন না। ওসব কিছু হবে না। আমি তো বলছি— উঁচু পোস্টে ব'সে করণ দুসাদ যদি আদিবাসী আর হরিজনদের পক্ষে যায়, তবে সেইদিনই ওর লাশ প'ড়ে যাবে। আরে মশাই জমি-জায়গা-দোকানপাট-থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারী-আইন-কানুন— সব আমাদের দখলে, একা করণ করবে কী?

দেওকীনন্দন ঃ না, না, তবু বলা যায় না— দুসাদের বাচ্চাকে অত লাই দেওয়া উচিত নয়।

হনুমান ঃ আসলে কী জানেন, করণ দুসাদকে চাকরি দেওয়া হয়েছে

আদিবাসী আর হরিজনের ওপর জুলুম চালানোর জন্যে, আদিবাসীকে দিয়ে আদিবাসীকে মারাও, অচ্ছুতকে দিয়ে অচ্ছুতের ঘর পোড়াও। এই হলো সরকারের নীতি।

গোলবদন ঃ ঠিক কথা। তাতেই হাঙ্গামা কম হবে, শান্তি বজায় থাকবে।

হনুমান ঃ এই যে ইদানীং আপনারা রিজার্ভেশন নিয়ে চেঁচাচ্ছেন, অচ্ছুতদের জন্যে স্কুল কলেজ বা চাকরির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণ নিয়ে আপনারা বর্ণহিন্দুরা গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন, কিন্তু আপনারা ভুলে যাচ্ছেন— এই সংরক্ষণটংরক্ষণের আসল উদ্দেশ্যটাই হলো— অচ্ছুতদের সবাইকে উন্নত করা নয়, তাদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরি-বাকরি দিয়ে আমাদের দালাল বানানো, অর্থাৎ কি-না— অচ্ছুতদের মধ্যে জগজীবন রাম বা করণ দুসাদ তৈরি হোক, কিন্তু সোম্‌রা টুডু যেন না জন্মায়।

দেওকীনন্দন ঃ কিন্তু এর উল্টোটাও তো হ'তে পারে।

হনুমান ঃ কী মুশকিল? তা হবে কেন? দেখলেন না— করণ দুসাদের হাতে সোম্‌রা টুডু মরলো! আপনারা মারতে পারতেন?

গোলবদন ঃ যা-ই বলুন পাঁড়েজী— সোম্‌রাকে খতম ক'রে করণ দারোগা আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ঐ শয়তান সোম্‌রা আমাদের জানপ্রাণ নিয়ে টান মেরেছিল, গ্রামে গ্রামে আদিবাসী আর অচ্ছুতদের খেপিয়েছিল, হাঙ্গামা বাঁধিয়েছিল, মালিক-মহাজনদের খতম করছিল, ওর ভয়ে লছমন সিং পর্যন্ত পাটনায় পালিয়েছিল, গঞ্জে এসে আমার দোকানে ঢুকে আমাকেও শাসিয়েছিল সোম্‌রার লোকেরা।

হনুমান ঃ সেই সোম্‌রা- আজ মরেছে, বুঝলেন পাঁড়েজী, ঐ করণ দুসাদের হাতেই। সোম্‌রাকে খতম করার জন্যে করণকে দারোগা বানিয়ে সাহারসায় পাঠানো হয়েছিল, আর সেই কাজ সে সবচেয়ে ভালোভাবে করেছে। আপনি-আমি সোম্‌রাকে মারলে কথা উঠতো। আদিবাসী নির্যাতন চলছে ব'লে খবরের কাগজে চেঁচামেচি হতো। কিন্তু করণের হাতে সোম্‌রা মরেছে— অচ্ছুতের হাতে অচ্ছুত মরেছে— এর চেয়ে ভালো আর কী হ'তে পারে?

দেওকীনন্দন ঃ আপনারা দেখছি ঐ দুসাদের বাচ্চার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

হনুমান ঃ আপনার ব্যথাটা আমি বুঝি পাঁড়েজী! একে তো আপনাকে ডিঙিয়ে দুসাদের বাচ্চা আপনার মাথায় দারোগা হয়ে বসেছে,

তা'তেই আপনার বুক জ্বলছে, তার ওপর সে আরও বড় প্রমোশন পেয়ে গেল, অথচ আপনি একই পোস্টে রয়ে গেলেন।

গোলবদন ঃ হ্যাঁ মিশিরজী, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। পাঁড়েজীর ওপর এতবড় অবিচার! যতই হোক, তিনি আপনার জাতের লোক, আপনিও ব্রাহ্মণ, পাঁড়েজীও ব্রাহ্মণ— আপনি যদি নিজের লোককে একেবারেই না দেখেন—

হনুমান ঃ ভাববেন না পাঁড়েজী, আপনারও প্রমোশন হবে।

দেওকীনন্দন ঃ কী বলছেন মিশিরজী! সত্যি!

হনুমান ঃ আরে মশাই, আপনাকে কি আমি ফেলতে পারি? করণ দুসাদ সার্কেল ইন্সপেক্টর হয়ে গেলে সাহারসা থানার দারোগা হবেন সেকেণ্ড অফিসার দেওকীনন্দন পাঁড়ে। আই.জি.র সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে।

দেওকীনন্দন ঃ আমি যে আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো মিশিরজী— এ আমার স্বপ্নেরও অতীত।

গোলবদন ঃ এম.এল.এ. সাহেব যুগ যুগ জিও! [করণ দুসাদের প্রবেশ]

করণ ঃ আরেব্বাস! আমার কী সৌভাগ্য! স্বয়ং এম.এল.এ. সাব আজ গরিবের কুঁড়েতে পা দিয়েছেন!

হনুমান ঃ না মিস্টার দুসাদ, বরং আমার সৌভাগ্য! আজ আপনার মতো একজন বিখ্যাত পুলিশ অফিসারের দেখা পেলাম।

করণ ঃ এম.এল.এ. সাহেব নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন।

হনুমান ঃ ঠাট্টা নয় মিস্টার দুসাদ। আপনি জানেন না সোম্‌রা টুডুদের ঐ হাঙ্গামা দমন করার পর আপনার নাম শুধু এই সাহারসা ব্লকেই নয়, সারা ভোজপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন-কি পাটনা পর্যন্ত আপনার খ্যাতি পৌঁছেছে।

গোলবদন ঃ দারোগাবাবু, আপনার প্রমোশন হওয়ায় আমরা সবাই খুশি হয়েছি।

হনুমান ঃ মিস্টার দুসাদ, আপনার প্রমোশনের ঘটনাটি আমরা একটু ভালোভাবে সেলিব্রেট করতে চাই। মানে, এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। অন্যভাবে ব্যাপারটা নেবেন না মিস্টার দুসাদ— মানে আমি বলতে চাইছি— এতকাল নিচুজাতের লোকদের মধ্যে এই এলাকায় আপনার চেয়ে উঁচু পোস্টে কেউ প্রমোশন পায়নি, আপনার এই প্রমোশনে প্রমাণ হলো— আমাদের ভারতবর্ষে আইনের চোখে সংবিধানের চোখে সব মানুষই সমান, কেউ উঁচু নয়, কেউ নিচু নয়, অচ্ছুত হরিজন

থেকে শুরু ক'রে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সবাই সমান, সবাই আমরা ভারতমাতার সন্তান, এই ভারতবর্ষের স্বপ্নই তো জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দেখেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সেই স্বপ্নই আজ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী.... এক গ্লাশ জল।

করণ : (হেসে) এম.এল.এ. সাহেব— এটা থানার কোয়ার্টার, এখানে আর বক্তৃতা দিয়ে কী হবে বলুন— ওসব বক্তৃতা ময়দানেই মানাবে।

হনুমান : তার মানে আমি বাজে কথা বলছি?

করণ : নিশ্চয়ই না। তবে কী জানেন— আমি ভীষণ ব্যস্ত— আমাকে এখুনি একটা ইনভেস্টিগেশনে বেরুতে হবে।

হনুমান : না, না, এখন কোথায় বেরুবেন? আজ আর কোনো কাজ নয়, চলুন আমার বাড়িতে, সেখানে সবাই মিলে আপনার এই প্রমোশনের জন্যে একটু ফুর্তি করা যাবে।

করণ : অন্য একদিন হবে— আজকে সত্যিই কাজ আছে।

গোলবদন : কীসের কাজ মশাই? আর আপনি কাজ দেখিয়ে কী করবেন? প্রমোশন তো হয়েই গেছে, আবার কী চাই?

করণ : আপনি বোধহয় জানেন না মিশিরজী— বুরুডিহায় কাল রাতে প্রচণ্ড গণ্ডগোল বেঁধেছে, বেশ কয়েকটা বাড়িতে আগুন লেগেছে।

হনুমান : আমি তা জানি মিস্টার দুসাদ। বুরুডিহার খবর আপনি এখন জেনেছেন, কিন্তু আমি জেনেছি কাল রাতেই।

করণ : যদি আমি এখন বুরুডিহায় না গিয়ে আপনার বাড়িতে ফুর্তি করতে যাই, তাহলে তো আপনিই আমার বিরুদ্ধে ওপর মহলে রিপোর্ট করবেন!

হনুমান : না, আমি তা করবো না। বরং আমি উপদেশ দেবো— বুরুডিহার ঝামেলায় না গিয়ে আমার বাড়িতে খানাপিনা করতে!

করণ : কী বলছেন মিশিরজী? বুরুডিহা আমার থানার আণ্ডারে, সেখানে হাঙ্গামা হয়েছে, আর আমি নিজে দারোগা হয়ে সেখানে যাবো না?

হনুমান : না, যাবেন না! সব জায়গায় আপনার যাবার দরকার কী?

করণ : আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিশিরজী, বুরুডিহা খুব গণ্ডগোলের জায়গা, নক্সালাইট মুভমেন্টের হট বেড ছিল, তারপর ওটা সোম্‌রা টুডুর গ্রাম।

দেওকীনন্দন : শুধু সোম্‌রা টুডুর নয়, ওটা করণ দুসাদেরও গ্রাম।

করণ ঃ হ্যাঁ তাই। ওটা আমারও নিজের গ্রাম। আমি নিজে হাতে সোম্‌রাকে মারায় গ্রামের লোক শুনেছি আমার ওপর খেপে আছে। এখন আমি যদি ওখানে না যাই তাহলে নকশালরা এর সুযোগ নেবে; তারা ভাববে আমি ভয় পেয়েছি, তাই ওরা নিরীহ লোকজনদের ওপর জুলুম চালাবে, খুনজখম করবে।

হনুমান ঃ বলছি তো আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই মিস্টার দুসাদ। সোম্‌রা মরার পর ওদের ক্ষমতা নেই ওখানে আবার হাঙ্গামা বাঁধায়।

করণ ঃ কী যা-তা বলছেন? তাহলে গতরাত্রে হাঙ্গামা হলো কেন?

হনুমান ঃ ও হাঙ্গামা নকশালরা বাঁধায়নি।

করণ ঃ তবে?

হনুমান ঃ ওটা বদলা। বলতে পারেন সোম্‌রাদের জুলুমের বদলা।

করণ ঃ তার মানে?

হনুমান ঃ এতকাল নকশালরা বুরুডিহার জোতদার-মহাজনদের ওপর হামলা চালিয়েছে, এবার তার পাল্টা আঘাত হানা হয়েছে।

করণ ঃ কী বলছেন? এটাও তো অন্যায় বেআইনী কাজ।

হনুমান ঃ মোটেই নয়। এটা অত্যন্ত ন্যায্য কাজ। সোম্‌রা মরেছে, আদিবাসীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। এখনই তো সময় ঘা মারার।

করণ ঃ তার মানে আদিবাসী আর অচ্ছুত হরিজনদের ওপর আক্রমণ হয়েছে? কেননা ওরাই তো নকশাল আন্দোলনে মেতেছিল।

হনুমান ঃ হ্যাঁ তাই, আদিবাসীদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

করণ ঃ কারা এ কাজ করেছে?

হনুমান ঃ কারা আবার? লছমন সিংয়ের দল।

করণ ঃ লছমন সিং? মানে বুরুডিহার সবচেয়ে বড় জোতদার?

গোলবদন ঃ লছমন সিংকে আপনি ভালোই চেনেন দারোগাবাবু।

দেওকীনন্দন ঃ চিনবে না কেন? স্যারও তো বুরুডিহার লোক।

করণ ঃ আমি এখুনি যাবো।

হনুমান ঃ কোথায়?

করণ ঃ বুরুডিহায়। এসব অত্যন্ত অন্যায় কাজ। গরিব আদিবাসীদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া—

হনুমান ঃ নকশালরাও তো জোতদার-মহাজনের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

করণ ঃ সে যারা করেছিল, তাদের— হয় আমরা গ্রেপ্তার করেছি— নয়তো সোম্‌রা টুডুর মতো গুলি ক'রে মেরেছি। কিন্তু লছমন

সিংয়ের কী অধিকার আছে নিজের হাতে আইন নেবার?

হনুমান : মিস্টার দুসাদ, ভুলে গেছেন— লছমন সিং আমাদের বন্ধুলোক, এমন-কি আপনার প্রমোশনের জন্যে সেও তদ্বির করেছে।

করণ : তাহলেও সে বেআইনী কাজ করতে পারে না। আইন ভাঙার জন্যে যেমন সোম্‌রার দলের লোকেরা শাস্তি পেয়েছে, তারও পাওয়া উচিত।

হনুমান : কথাটা ভেবে বলবেন মিস্টার দুসাদ।

করণ : ভেবেই বলছি এম.এল.এ. সাহেব। আপনিই তো একটু আগে বললেন আইনের চোখে এদেশে সবাই সমান, তাহলে জোতদার মহাজনকে মারার জন্যে সোম্‌রা টুডুদের যদি শাস্তি হয়ে থাকে তবে কেন গরিব আদিবাসীদের ঘর জ্বালাবার জন্যে লছমন সিংদের শাস্তি হবে না?

দেওকীনন্দন : বলেছি না মিশিরজী, দারোগাবাবু শেষপর্যন্ত নিজের জাতের লোকেদেরই পক্ষে যাবেন, ওকে আপনারা যতই প্রমোশন দিন না কেন, তবু উনি আদিবাসীদের টেনে কথা বলবেন।

করণ : তা যদি আমি সত্যিই করতাম, তাহলে সোম্‌রা টুডু মরতো না। যা-ই হোক, সে সব কৈফিয়ৎ আপনাদের দেবো না। মিস্টার দেওকীনন্দন পাঁড়ে, আমি বুরুডিহা যাবো, আপনারা রেডি হোন!

হনুমান : এর পরিণাম কী হ'তে পারে তা কি ভেবে দেখেছো করণ দুসাদ?

করণ : এর পরিণাম যা-ই হোক না কেন, তবু আমি সেখানে যাবো এবং যারা গরিব মানুষের ঘরে আগুন দিয়েছে, তাদের একে একে খুঁজে বের ক'রে কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে এই থানায় নিয়ে আসবো, তবে আমার নাম করণ দুসাদ।

[দ্রুত প্রস্থান]

হনুমান : না, কক্ষণো ওকে বুরুডিহায় যেতে দেওয়া যাবে না। যে-কোনো ভাবেই হোক ওকে আটকাতে হবে।

দেওকীনন্দন : দেখছেন তো মিশিরজী, গরিবের কথা বাসি হ'লে ফলে। যতই ধোও না কেন, তবু কয়লা কখনও সফেদ হবে না। যতই তোয়াজ করো না কেন অচ্ছুত কখনও আমাদের পক্ষ নেবে না।

গোলবদন : কিন্তু আমি এটা ভেবে পাচ্ছি না— আদিবাসীদের ওপর করণ দুসাদের যদি সত্যিই এত টান থেকে থাকে, তবে কেন সে সোম্‌রাকে মারলো।

হনুমান ঃ সে রহস্যের সমাধান পরে হবে। আগে ঐ দুসাদের বাচ্চাকে আটকাই। কিছুতেই তাকে বুরুডিহায় যেতে দেওয়া চলে না। (হনুমান ফোন তোলে)

হনুমান ঃ হ্যালো— পাটনায় ট্রাঙ্ককল করবো। লাইনটা ক্লিয়ার আছে কি-না দেখুন, আমি হনুমান মিশ্র বলছি। খুব জরুরি দরকার— পাটনায় পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স দিন— ঠিক আছে, ধ'রে আছি। হ্যালো, হেড কোয়ার্টার্স আই.জি. সুরিন্দর সিংকে দিন। আমি হনুমান মিশ্র ভোজপুর থেকে কথা বলছি।

নেপথ্যে ঃ হ্যালো।

হনুমান ঃ কে! সুরিন্দরজী? নমস্তে। আমি হনুমান মিশ্র বলছি।

নেপথ্যে ঃ কী ব্যাপার? হঠাৎ?

হনুমান ঃ বুরুডিহার ঘটনা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।

নেপথ্যে ঃ হ্যাঁ। আজ সকালে লছমন আমাকে ফোন ক'রে জানিয়েছে। সে তো ভালোই হয়েছে। কোনো ঝামেলা নেই। খুব ভালোভাবেই কাজটা হয়ে গেছে।

হনুমান ঃ না, ঝামেলা বেঁধেছে! ঐ দুসাদের বাচ্চা বুরুডিহায় যাচ্ছে।

নেপথ্যে ঃ না, না, ওর যাওয়া চলবে না। যদিও করণ দুসাদের ব্যাপারটা খুবই স্যাড; আমি লছমনকে বললাম— তোমরা সাবধান হ'লে না কেন? লছমন বললো— ভুল হয়ে গেছে।

হনুমান ঃ সে যা-ই হোক, ওকে আপনি একবার ফোন ক'রে বারণ ক'রে দিন— না হ'লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

নেপথ্যে ঃ ঠিক আছে। তা-ই হবে। ওভার।

দেওকীনন্দন ঃ বুরুডিহায় যাওয়া নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? সে যদি ওখানে যায়, তাহলে আমাদের ক্ষতিটা কী? লছমন সিংয়ের দলের কাউকে যদি সে গোঁয়ার্তুমি ক'রে ধরতেও যায়, তবে তার নিজের চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়বে; আমাদের কী?

হনুমান ঃ উল্লুকী পাঠ্‌ঠে! বুরুডিহায় করণ দুসাদের নিজের বাড়ি— তা জানো না?

দেওকীনন্দন ঃ তা'তে কী হলো?

হনুমান ঃ কী হলো পরে বুঝবে! এখন চলো যেভাবেই হোক ওর যাওয়া বন্ধ করি।

[হনুমান, দেওকীনন্দন ও গোলবদনের প্রস্থান। লাটুয়ার প্রবেশ]

লাটুয়া ঃ সাব— সাব— নাস্তা ক'রে নিন। এ কী কোথায় গেল সব! আজকে সকাল থেকেই সব রইস আদমীরা থানায় এসে ভিড়

জমিয়েছে। কী যে হচ্ছে চারিদিকে বুঝতেও পারি না। ঐ সোম্‌রা টুডুকে মারার পর থেকেই আমাদের সাহেবের খুব খাতির বেড়ে গেছে। আগে যখন সাহেব দারোগা হয়ে এই থানায় এলেন, তখন সবাই আড়ালে আবডালে নিচুজাত ব'লে কত ঘেন্না করেছে, এমন-কি এই থানার সেপাইরা পর্যন্ত— সাহেব যে কুঁজো থেকে জল খান, সেই কুঁজো ছোঁয় না। অবশ্য আমিও নিজে নিচুজাতের লোক। যত দারোগাবাবু আসেন, তাদের সবার ফাইফরমাস খাটি। সাহেব আমাকে খুব ভালোবাসেন। সাহেবের সব ফাইফরমাস আমাকেই খাটতে হয় কি-না!

['লাটুয়া' 'লাটুয়া' ব'লে ডাকতে ডাকতে করণের প্রবেশ]

করণ ঃ শোন্ রে লাটুয়া, আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। তুই আমার ঘরটা তালা দিয়ে রাখবি বুঝলি!

লাটুয়া ঃ দুপুরে এসে খাবেন তো সাব?

করণ ঃ জানি না। ওখানে গিয়ে কী অবস্থায় পড়বো কে জানে? দুপুরে হয়তো না-ও ফিরতে পারি।

লাটুয়া ঃ কেন সাব? কোথায় যাচ্ছেন?

করণ ঃ বুরুডিহায়।

লাটুয়া ঃ বুরুডিহায়! আপনার বাড়িতে? যান সাব, ঘুরে আসুন।

করণ ঃ না রে, বাড়ি যাবার সময় পাবো না। অন্য কাজে যাচ্ছি।

লাটুয়া ঃ সে কী সাব! বুরুডিহায় গিয়েও বাড়ি যাবেন না?

করণ ঃ বাড়ি আমার নেই রে লাটুয়া, বাড়ি আমার নেই।

লাটুয়া ঃ কী বলছেন সাব?

করণ ঃ মাস গেলে মাইনের টাকাটা শুধু ওদের কাছে পাঠিয়ে দিই। ব্যাস্, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আমার ওইটুকুই।

লাটুয়া ঃ না না, সাব— এ তো মোটেই ভালো কথা নয়।

করণ ঃ লাটুয়া রে আমি হলাম না-ঘরকা, না-ঘাটকা! ঘরের লোকও আমায় চায় না, তারা আমায় বেইমান ব'লে ঘেন্না করে; আর এখানেও সবাই আমাকে অচ্ছুত ব'লে মনে মনে অবজ্ঞা করে, আমার ছোঁয়া জল কেউ খায় না!

লাটুয়া ঃ কেন সাব, বাড়ির লোক আপনাকে ঘেন্না করে কেন?

করণ ঃ ওরা কেউ চায়নি লেখাপড়া শিখে আমি পুলিশের চাকরি নিই। আজও আমার গ্রামের লোকের কাছে আদিবাসী আর হরিজনদের কাছে পুলিশ মানেই অত্যাচার বিভীষিকা জুলুম!

পুলিশ মানে ওদের কাছে জোতদার লছমন সিংয়ের ভাড়াটে বাহিনী; পুলিশকে ওরা দেখেছে শুধু হনুমান মিশির আর লছমন সিংয়ের হয়ে গরিব মানুষের ওপর গুলি চালাতে, কয়েদ করতে।

লাটুয়া ঃ কী বলছেন সাব?

করণ ঃ ঐ জন্যেই আমার বাবা আমার মা আমার বৌ লছমী— কেউ চায়নি আমি দারোগার চাকরি নিই।

লাটুয়া ঃ তবে নিলেন কেন সাব!

করণ ঃ কেন নিলাম? বলতে পারিস জেদে। অচ্ছুত ঘরের ছেলে আমি। ছোটবেলা থেকেই ঐ লছমন সিং হনুমান মিশিরদের ঘেন্না কুড়িয়ে বড় হয়েছি। ঐ লছমন সিংরা চায়নি আমি লেখাপড়া শিখি। হরিজনের ছেলে স্কুলে যাবে এটা ওরা সহ্য করতে পারতো না। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ওরা আমাকে পড়তে দেয়নি। আমি পড়তে যেতাম তিন মাইল দূরের মিশনারি স্কুলে। এজন্যে আমার বাপ দুলন দুসাদকে কম হেনস্থা করেনি ওরা। কিন্তু আমার ভয়ঙ্কর জেদের কাছে সবাই হেরে গিয়েছিল। বড় পরীক্ষায় আমি পাশ করলাম ভালোভাবে। এই প্রথম হরিজনদের ঘরের ছেলে স্কুল ছেড়ে পাটনায় গেল কলেজে পড়তে। কলেজে পড়তে পড়তেই পুলিশের চাকরিতে ঢুকলাম।

লাটুয়া ঃ কেন সাব? কেন?

করণ ঃ কারণ আমি জানতাম পুলিশকে সবাই হাতে রাখতে চায়, বিশেষ ক'রে মহাজনরা তো বটেই। পেছনে আমাকে যতই অচ্ছুত ব'লে ওরা ঘেন্না করুক, সামনে এসে ওদের সবাইকেই দারোগাবাবু ব'লে হাতজোড় করতে হবে! ভাবতে পারিস— আজকে লছমন সিংয়ের মতো দুর্ধর্ষ জোতদারকেও এই অচ্ছুত করণ দুসাদের সামনে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়াতে হয়। এখানেই আমার জয় রে লাটুয়া, এখানেই আমার জয়। আজ এক হরিজনের ঘরের ছেলের দাপটে অনেক উঁচু জাতের জোতদার মহাজনদের বুক ভয়ে কাঁপে! কিন্তু না, একথা আমার ঘরের লোকেরা কোনোদিন বুঝলো না। ওরা ভাবলো— আমি বেইমান ব'নে গেছি, নিজের জাতের সঙ্গে দুশমনী করেছি। আমার বাপ-মা আর বৌয়ের চোখে করণ দুসাদের চেয়ে ঐ সোমরা টুডু অনেক বেশি আপনজন।

লাটুয়া ঃ সাব, একটা কথা জিগ্যেস করবো?

করণ ঃ বল্?

লাটুয়া ঃ সবাই বলে ঐ সোম্‌রা টুডু না-কি আপনার বন্ধু ছিল!

করণ ঃ হ্যাঁ! সোম্‌রা, সোম্‌রার ভাই এতোয়া, আর আমার বোন বুধ্‌নী— সবাই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি। সোম্‌রাও মিশনারি স্কুলে প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিল। তারপর ও মাঠের কাজে লেগে যায়। আর আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকি। আস্তে আস্তে ছোটবেলার সেই বন্ধুত্বের রঙ ফিকে হয়ে আসতে থাকে। আমি পাটনা চ'লে যাই। ন'মাসে ছ'মাসে গ্রামে আসতাম, মাঝেমধ্যে দেখা হতো। তখনও আমি বুঝতে পারিনি লাটুয়া, সোম্‌রা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে— তলে তলে ও ক্রান্তিকারী পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। বুঝলাম সেদিন, যেদিন আমি প্রথম পুলিশের ট্রেনিং কোর্স শেষ ক'রে গ্রামে ফিরলাম। সেদিনই বিকেলবেলায় সোম্‌রার সঙ্গে আমার দেখা হলো।

[সোম্‌রার প্রবেশ]

সোম্‌রা ঃ কী রে করণ, শেষপর্যন্ত তুই পুলিশে ঢুকলি!

করণ ঃ হ্যাঁ ঢুকলাম। একটা চাকরিবাকরি তো দরকার। ছোটবেলায় বাবা বিয়ে দিয়েছে, ছেলেপুলেও হয়েছে। চাকরি না করলে খাবো কী?

সোম্‌রা ঃ তা ব'লে পুলিশের চাকরি?

করণ ঃ কেন? পুলিশের চাকরি খারাপ কীসে? পুলিশরা কি মানুষ নয়?

সোম্‌রা ঃ না, নয়। তারা জানোয়ার!

করণ ঃ সোম্‌রা।

সোম্‌রা ঃ পুলিশ মানে জুলুম, পুলিশ মানে গরিব আদিবাসীর ঘর পোড়ানো, হরিজন মেয়ের ইজ্জত লুট; পুলিশ মানে জোতদার-মহাজনের দালালী, লছমন সিংয়ের গোলামী।

করণ ঃ তুই নিশ্চয়ই পার্টি করছিস, তাই না?

সোম্‌রা ঃ কী?

করণ ঃ তুই এসব কথা জানলি কোত্থেকে? নিশ্চয় লাল পার্টির বাবুদের খপ্পরে পড়েছিস?

সোম্‌রা ঃ যারই খপ্পরে পড়ি, আমি গরিব মানুষের হক্ নিয়ে লড়ছি, তোর মতো বেইমানীর রাস্তায় পা দিইনি।

করণ ঃ খুব বড় বড় কথা শিখেছিস সোম্‌রা!

সোম্‌রা ঃ তুই ভুলে যাচ্ছিস করণ, আমাদের দেশে পুলিশ-মিলিটারি মানে

লছমন সিং-হনুমান মিশিরদের দারোয়ান। ওদেরই হাতে সব, আইন-কানুন-কোর্ট-কাছারী— সব ওদের জন্যে। পুলিশে চাকরি করা মানে ওদের দালালী করা। মনে রাখিস ওরা আমাদের মেয়েদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায়, আমাদের মাঠের ফসল জোর ক'রে কেটে ওদের গোলায় তোলে, ছোট জাত ব'লে আমাদের ঘেন্না করে; আমাদের ওরা মানুষ ব'লেই মনে করে না। করণ, তুই ওদের সঙ্গে হাত মেলালি?

করণ ঃ তুই ভুল করছিস সোম্‌রা— আমি ওদের গোলাম নই।

সোম্‌রা ঃ করণ, আজ একটা নতুন হাওয়া আসছে, খেটে খাওয়া গরিব মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আর নিচুজাত ব'লে তাদের দাবিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এলাকায় এলাকায় লড়াই শুরু হ'তে চলেছে। করণ, তুই বল্, তুই কার পাশে দাঁড়াবি, তুই কি আমাদের পাশে দাঁড়াবি, না লছমন সিংদের?

করণ ঃ আমি আইনের পাশে দাঁড়াবো, যা আইন আমি তার পক্ষে।

সোম্‌রা ঃ মস্ত বড় ভুল করছিস— আইন মানে কার আইন? এ দেশে আইন মানে বড়লোকের আইন, মহাজনের আইন, মালিকের আইন। লছমন সিং কোনো গরিব আদিবাসীর ঘর পোড়ালেও তার সাজা হয় না, অথচ আমি বাড়তি মজুরি চাইলে আমাকে জেলে যেতে হয়, তবে এ আইন কার? তুই কোন্ আইনের পাশে দাঁড়াবি?

করণ ঃ পার্টির বাবুরা তোর মাথা খেয়েছে সোম্‌রা!

সোম্‌রা ঃ আর হনুমান মিশির লছমন সিংরা তোকে কিনে নিয়েছে।

[প্রস্থান]

করণ ঃ সোম্‌রার সঙ্গে এরপর আমার দেখা হয়নি বহুকাল। অন্য থানায় যখন আমি পোস্টেড ছিলাম, তখন মাঝেমাঝে খবর পেতাম— সে না-কি মস্তবড় লীডার বনেছে, তার ভয়ে এই এলাকার সব মালিক-মহাজন গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশও সোম্‌রাকে কিছু করতে পারছে না। তখন একদিন আমাকে দারোগা ক'রে এখানে পাঠানো হলো। নাঃ, অনেক দেরি হয়ে গেল। তোর সঙ্গে কথায় কথায় অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার আমি চলি।

লাটুয়া ঃ সাব, আপনি সোম্‌রা টুডুকে মারলেন কেন?

করণ ঃ কী?

লাটুয়া ঃ সোম্‌রা আপনার ছেলেবেলার বন্ধু, তবু তাকে মারলেন?

করণ ঃ কী করবো বল্? সে যে কিছুতেই ধরা দিলো না।

লাটুয়া ঃ তা ব'লে তাকে মারবেন? আপনি তো জানতেন সোম্‌রা কোনো অন্যায় করেনি, সে গরিব মানুষের হয়ে লড়ছিল।

করণ ঃ কী বলছিস?

লাটুয়া ঃ তাকে তো আপনি ছেড়ে দিলেও পারতেন?

করণ ঃ কী ক'রে ছাড়বো? ছেড়ে দিলেই তো লছমন সিংরা বলতো অচ্ছুত করণ দুসাদ আদিবাসী সোম্‌রা টুডুকে ইচ্ছে ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, তার ছেলেবেলাকার বন্ধুকে ইচ্ছে ক'রে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

লাটুয়া ঃ তাহলে আপনি লছমনদের ভয়ে সোম্‌রাকে মারলেন?

করণ ঃ কী?

লাটুয়া ঃ তাহলে তো সোম্‌রা টুডুর কথাই ঠিক, আপনি ওদের গোলাম!

করণ ঃ লাটুয়া!

[হনুমান, গোলবদন, আর মালা হাতে লছমন সিংয়ের প্রবেশ]

হনুমান ঃ এই যে লছমন সিংও এসে গেছে মিস্টার দুসাদ। আপনাকে আর কষ্ট ক'রে বুরুডিহায় যেতে হবে না। যা জানার লছমনের কাছ থেকেই জেনে নিন।

করণ ঃ না এম.এল.এ. সাহেব— আমাকে যেতেই হবে।

লছমন ঃ কোথায় আর যাবেন দারোগাবাবু? মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবেন কেন? আমি যা বলছি, তাই শুনে নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি ক'রে ফেলুন, ব্যাস্— আপনার কোনো ঝামেলা থাকবে না।

গোলবদন ঃ লছমন ভাইয়া তো আর মিথ্যে কথা বলবে না। তাহলে আর বুরুডিহায় গিয়ে ফালতু সময় নষ্ট করবেন কেন?

করণ ঃ কিন্তু এম.এল.এ. সাহেব যে বলেছেন, লছমন সিংয়ের লোকেরাই আগুন দিয়েছে, নকশালী হাঙ্গামার বদলা নিয়েছে।

লছমন ঃ (রেগে হনুমানকে) আপনি একথা বলেছেন বুঝি?

হনুমান ঃ আরে না, না, লছমন ভাইয়া— ঠিক তা বলিনি, মিস্টার দুসাদ ভুল শুনেছেন।

করণ ঃ না, আমি মোটেই ভুল শুনিনি, শেঠজীও ছিলেন তখন, কী শেঠজী, এম.এল.এ. সাহেব বলেননি যে লছমন সিং আগুন দিয়েছে?

গোলবদন ঃ না, মানে, আমি ঠিক শুনতে পাইনি।

করণ ঃ কেন মিথ্যে কথা বলছেন? দেওকীনন্দন পাঁড়েও ছিল, ডাকুন তাকে।

লছমন ঃ (হনুমানকে) আপনি একটা আস্তো বুড়বক। এসব কথা ওকে বললেন কী ক'রে? না-কি আপনিও আমার সঙ্গে দুশমনী করছেন?

হনুমান ঃ আরে না ভাইয়া, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি— এই দুসাদের বাচ্চা আমার কথাটাকে অমন ক'রে বেঁকিয়ে ধরবে—

করণ ঃ জবান সামলে মিশিরজী, ভদ্রভাবে কথা বলুন।

হনুমান ঃ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার কথা আমি ঘুরিয়ে নিচ্ছি। শুনুন মিস্টার দুসাদ, আমি তখন ভুল খবর পেয়ে আপনাকে ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিলাম। আসলে ওসব কিছু নয়, মানে পলিটিক্যাল কিছু নয়, সামান্যই ব্যাপার।

লছমন ঃ আমি বলছি, শুনুন দারোগাবাবু, একটা বাড়িতে কেরোসিনের বাতি জ্বালাতে গিয়ে চালে আগুন লেগে যায়। সেই আগুন পরপর পঞ্চাশ-ষাটটা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে, বেশির ভাগ লোকই বেঁচে গেছে, মাত্র দশ-বারোজন পুড়ে মরেছে— ব্যাস্ এইটুকু ঘটনা। আপনি যেভাবে খুশি লিখে নেবেন।

গোলবদন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, লছমন ভাইয়া যা বলছে লিখে নিন দারোগাবাবু।

করণ ঃ না, আপনাদের কথায় আমার সন্দেহ বাড়ছে। আমি বুরুডিহা যাবোই।

হনুমান ঃ কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন মিস্টার দুসাদ? যেচে কেন নিজের বিপদ ডাকছেন! মনে রাখবেন এই লছমন সিং আপনার প্রমোশনের মূলে। হোম মিনিস্টার লছমন সিংয়ের চাচাতো ভাইয়ের আপন মামা হয়।

লছমন ঃ থাক্, থাক্, ওসব কথা। আসুন দারোগাবাবু আপনাকে আমি মালা পরিয়ে দিই।

করণ ঃ কীসের মালা?

লছমন ঃ আপনি উঁচু পোস্টে প্রমোশন পেয়েছেন, তাই আমাদের সকলের বুক গর্বে ভ'রে উঠেছে। দারোগাবাবু— নিন মালাটা পরুন।

গোলবদন ঃ মিঠাইয়ের হাঁড়িটা তখন নেননি, এখন কিন্তু নিতে হবে।

করণ ঃ না, না— এসব কী? আমার ভালো লাগে না। আমি মালা পরবো না!

হনুমান ঃ নিন, নিন, মালা প'রে নিন। লছমন পরিয়ে দাও। তারপর চলুন আমার বাড়িতে, সবাই মিলে হৈ-হল্লা করা যাবে। পাটনা থেকে আসলী বিলাতী মাল এনেছি। এক ঢোঁক খেলেই মেজাজ খুলে যাবে— নিন মালা পরুন— (জোর ক'রে মালা পরায়)

গোলবদন ঃ করণ দুসাদ-কী—

হনুমান ও
লছমন ঃ জয়! [দেওকীনন্দন ঢোকে]

দেওকীনন্দন ঃ বুরুডিহা থেকে একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নাম বলছে দুলন দুসাদ।

করণ ঃ আমার বাবা! এখানে এসেছে? লাটুয়া!

লাটুয়া ঃ আমি এখুনি নিয়ে আসছি সাব। [দ্রুত প্রস্থান]

হনুমান ঃ মিস্টার দুসাদের পিতাজী হঠাৎ এখানে?

লছমন ঃ যা ভয় করেছিলাম, সব ফাঁস হয়ে গেল!

গোলবদন ঃ কেন? কী হয়েছে?

হনুমান ঃ (দেওকীকে) তুমি লোকটাকে আটকাতে পারলে না?

দেওকীনন্দন ঃ কী ক'রে বুঝবো— সে-ই বাবা? [লাটুয়া ও দুলন ঢোকে]

দুলন ঃ (আর্তনাদ) করণ রে—

করণ ঃ (দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে) —বাবা!

দুলন ঃ সর্বনাশ হয়ে গেল করণ রে— সর্বনাশ হয়ে গেল—

করণ ঃ কী হয়েছে? এমন করছো কেন?

দুলন ঃ আমাদের ঘর আগুনে পুড়ে গেছে— আর সেই আগুনে তোর মা আর তোর বৌ—।

করণ ঃ লছমী! কী হয়েছে?

দুলন ঃ দু'জনেই আগুনে পুড়ে মরেছে!

করণ ঃ (চিৎকার) কী? (নিস্ফল আক্রোশে টেবিলে একটা ঘুষি মারে)

দুলন ঃ শুধু তোর ছেলে আর আমি কোনো মতে প্রাণে বেঁচেছি করণ!

লছমন ঃ বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, আমি জানতাম না, একদম জানতাম না আপনার বাড়িতেও আগুন লেগেছে। বিশ্বাস করুন।

করণ ঃ (গর্জন) চুপ! খামোশ!

গোলবদন ঃ খুবই দুঃখের ব্যাপার, দারোগাবাবুর মাইজী আর বহু পুড়ে মরলো খুবই দুঃখের—

করণ ঃ এমন ভাব করছেন, যেন কেউ আপনারা আগে জানতেন না!

গোলবদন ঃ বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানতাম না, এরা জানলেও জানতে পারে—

হনুমান ঃ কেন বাজে বকছো গোলবদন? আমরা জানতাম— কে বলেছে তোমায়?

করণ ঃ কারুর কিছু বলার দরকার নেই এম.এল.এ. সাহেব— যা

বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি, সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে....

দুলন ঃ করণ রে, তোর মা তোর বৌ—

করণ ঃ চুপ করো বাবা চুপ করো! কেঁদো না!

লাটুয়া ঃ কেঁদো না চাচাজী, কেঁদো না!

করণ ঃ এম.এল.এ. সাহেব— কাল রাতে যখন আপনারা তদ্বির ক'রে আমার প্রমোশনের অর্ডার বের করছিলেন, ঠিক তখনই আপনাদের লোকেরা আমার ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারছিল এক বুড়ি মা আর এক জোয়ানী বৌকে! চমৎকার! কী মজার ব্যাপার! হাঃ হাঃ।

হনুমান ঃ আপনি ভুল বুঝলেন মিস্টার দুসাদ!

করণ ঃ আর আজ সকালে আমার মা-বৌকে আগুনে পুড়িয়ে আপনারা সদলবলে এসেছেন আমার গলায় মালা পরাতে, বাঃ বাঃ কত দয়া আপনাদের!

লছমন ঃ দারোগাবাবু!

করণ ঃ এই ফুলের মালা তাই আজ আমার ফাঁসির দড়ি— বুঝলেন ফাঁসির দড়ি। (মালা ছেঁড়ে। কেঁদে ফ্যালে)

লাটুয়া ঃ সাব সাব— তুমি কাঁদছো? তোমার চোখে জল? নিজের মা-বৌকে হারিয়ে তুমি কাঁদছো? কই সোম্‌রা টুডুকে মারার সময় তো তোমার চোখে জল আসেনি সাব? সোম্‌রারও তো মা-বৌ ছিল?

করণ ঃ লাটুয়া!

দুলন ঃ করণ রে— তুই সোম্‌রাকে কেন মারলি? কেন মারলি? আজ সোম্‌রা থাকলে কি ওদের সাহস হতো আমাদের ঘরে আগুন দিতে?

করণ ঃ কী বলছো বাবা?

দুলন ঃ সোম্‌রা যতদিন ছিল, ততদিন ঐ লছমনরা পারেনি গরিব অচ্ছুতের ওপর জুলুম চালাতে, আজ সোম্‌রা নেই ব'লেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর।

দেওকীনন্দন ঃ এসব কথা এখানে বলবে না। উস্কানি দিচ্ছো কেন?

করণ ঃ পাঁড়েজী, এই বৃদ্ধ আমার বাবা, তার সম্মান রেখে কথা বলবেন ব'লে দিচ্ছি!

দুলন ঃ করণ রে— সোম্‌রাকে মারার পর থেকে সারা গ্রামের লোক তোর নামে থুতু দিচ্ছে, সবাই তোকে ঘেন্না করে, তোর জন্যে

লজ্জায় আমাদের মাথা নিচু ক'রে পথ চলতে হয়।

করণ ঃ বাবা!

দুলন ঃ আজ তুই গ্রামের লোকেদের পাশে এসে দাঁড়া করণ, তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্। তুই আজ অনেক উঁচুতে উঠেছিস বাপ, অনেক তোর ক্ষমতা! তুই আজ ঐ খুনীদের শাস্তি দে. ঐ লছমনের দলকে কয়েদ কর্!

করণ ঃ অতখানি ক্ষমতা আমার নেই বাবা, তবে তোমার সঙ্গে আমি এখুনি বুরুডিহায় যাবো, গ্রামের লোকেদের বিপদের দিনে পাশে গিয়ে দাঁড়াবো।

হনুমান ঃ না, আপনি তা পারেন না মিস্টার দুসাদ, বুরুডিহায় আপনার যাওয়া হবে না।

করণ ঃ কী বলছেন এম.এল.এ. সাহেব? আপনার কথায় আমাকে চলতে হবে?

হনুমান ঃ হ্যাঁ তা-ই হবে। কেননা আমি এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তার ওপর আমার দল আজ সরকার চালাচ্ছে। আমি যা বলবো তা-ই করতে হবে।

করণ ঃ যদি না করি?

হনুমান ঃ আপনি সাসপেণ্ড হবে, চাকরি যাবে, হয়তো-বা সোম্‌রাদের দলের সমর্থক ব'লে জেলে যেতে হ'তে পারে!

(ফোন বাজে। করণ দুসাদ ধরে)

করণ ঃ হ্যালো—

নেপথ্যে ঃ সুরিন্দর সিং বলছি—

করণ ঃ স্যার! ভালোই হয়েছে ফোন করেছেন। এদিকে বুরুডিহায়—

নেপথ্যে ঃ বুরুডিহার ব্যাপারে আপনি মাথা গলাবেন না। মিস্টার দুসাদ, ওখানে আপনাকে যেতে হবে না।

করণ ঃ কী বলছেন স্যার!

নেপথ্যে ঃ লছমন সিং যা বলছে— সেই মতো রিপোর্ট লিখে ফেলুন। আর আপনার কোনো দায়িত্ব নেই!

করণ ঃ কিন্তু স্যার— ঐ লছমন সিং তো কালপ্রিট।

নেপথ্যে ঃ খামোশ। যা বলছি তা-ই করুন। দিস ইজ মাই অর্ডার।

করণ ঃ রিট্‌ন দিন।

নেপথ্যে ঃ হাও ডেয়ার ইউ! আই.জি.র কাছে রিট্‌ন অর্ডার চাইছেন? ভারবাল অর্ডারই এনাফ!

করণ ঃ আমি তা মানতে বাধ্য নই।

নেপথ্যে ঃ মিস্টার দুসাদ, ডোণ্ট ফরগেট, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট চালু হয়েছে। ইফ ইউ ডিসওবে মাই অর্ডার, ইউ উইল বি অ্যারেস্টেড ইন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট।

করণ ঃ আজকেই আমাকে প্রমোশন দিলেন, আর আজকেই গ্রেপ্তার!

নেপথ্যে ঃ ডোণ্ট বি সিলি! যা বলছি তা-ই করুন। বরুডিহায় যাবেন না! ওভার! (করণ ফোন রেখে হতাশায় চিৎকার করে)

করণ ঃ তাহলে আমার কোনো ক্ষমতাই নেই? আমি ঠুঁটো জগন্নাথ? আমাকে শুধু শুধু দারোগা বানিয়েছেন? সার্কেল ইন্সপেক্টরের পোস্টে মিছিমিছি প্রমোশন দিয়েছেন?

দেওকীনন্দন ঃ দুসাদের বাচ্চার আবার ক্ষমতা কীসের? সব ক্ষমতা আমাদের।

করণ ঃ ঠিক বলেছেন পাঁড়েজী, ঠিক। দুসাদের বাচ্চা দারোগা হ'লেও আসল ক্ষমতা থেকে যায় ঐ লছমন সিংদের হাতে। যাও, চ'লে যাও বাবা।

দুলন ঃ তুই যাবি না করণ?

করণ ঃ না। আমার নিজের তৈরি ফাঁদে আমি আজ জড়িয়ে পড়েছি বাবা, আমার মুক্তি নেই। যতদিন বাঁচবো, ততদিন ওদেরই গোলামী ক'রে যেতে হবে!

লাটুয়া ঃ তাহলে আমাকেও ছেড়ে দিন সাব। আমিও চ'লে যাই।

করণ ঃ লাটুয়া! তুই! তুইও আমাকে ছেড়ে যাবি?

লাটুয়া ঃ গোলামের গোলাম হয়ে থাকতে কে চায়? চলো চাচাজী, আমরা চ'লে যাই।

দুলন ঃ করণ, তোর ছেলে কিন্তু আমার কাছে থাকবে, বড় হবে, তাকে আমি শেখাবো— নিজের লোকেদের সঙ্গে কখনও বেইমানী করতে নেই, তোর ছেলেকে আমি আরেকটা সোম্‌রা টুডু বানাবো করণ, কিছুতেই তাকে আরেকটা করণ দুসাদ হ'তে দেবো না!

করণ ঃ আমি বড় একা, বড় একা! নিজের পাপের মরুভূমিতে আমি চূড়ান্ত একা!

লাটুয়া ঃ তুমি বড়ই অভাগা করণ দুসাদ, হায়— বড়ই অভাগা!

।। ফ্রিজ। পর্দা ।।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার— **মহাশ্বেতা দেবী**]

একাঙ্ক

মান্য মাইতির আইন অমান্য

চরিত্র ঃ তারিণী, এস.আই.সামন্ত, দারোগা চ্যাটার্জি, সি.আই.দত্ত. ননী ঘোষাল, বঙ্কুবিহারী, বসাই টুডু, মান্য মাইতি

[একটি পোস্টারে মুখ ঢেকে একজন মঞ্চের একপাশ দিয়ে ঢুকে, অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পোস্টারে লেখা—"গ্রামের পথ। পাশে ধানক্ষেত।" ননী ঘোষাল ঢোকে, পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা, ডান কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বয়স— চল্লিশোর্দ্ধ, পেশায়— শিক্ষক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা]

ননী। পার্টি অফিসে ব'সে থেকে থেকে কোমরে বাত ধ'রে গেল, তবু কোনো শালার পাত্তা নেই! আজ দুপুর একটায় হাটতলায় অত বড় আন্দোলন— তবু এখনও কেউ মুখটিও দেখাতে এলো না। কোনো ধরনের প্রস্তুতি পর্যন্ত নেওয়া গেল না এখনও। অথচ হাতে একটুও সময় নেই। যা করার আমাকে একাই করতে হবে দেখেছি! কেননা— প্রোগ্রামটা ফ্লপ করলেই চিত্তির, সব দোষ আমার কাঁধে এসে চাপবে, জেলা কমিটি থেকে কৈফিয়ৎ তলব করবে, এমনিতেই আমার বিরোধী গ্রুপ সবসময়েই আমার ইয়েতে কাঠি দেবার জন্যে মুখিয়ে রয়েছে— এই জমানায় আমার একটু অবস্থা ফিরেছে ব'লে সব শালা হিংসেয় জ্ব'লে পুড়ে মরছে, আমাকে পার্টি থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্রও করছে, এখন— আজ যদি মুভমেণ্টটা সাক্‌সেশফুল না হয়, শালারা একেবারে পেয়ে বসবে— চারদিকে ব'লে বেড়াবে— ননী ঘোষাল শুধু নিজের আখেরটাই গুছিয়েছে, এলাকায় কোনো অর্গানাইজেশনই করেনি। সুতরাং ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য যেভাবেই হোক, আজকের কর্মসূচি সফল করতেই হবে। কিন্তু কাদের নিয়ে করবো? একা একা তো আর মিছিল হয় না, আন্দোলনও হয় না! লোক কই? গ্রামের লোকগুলোও হয়েছে তেমনি, একেকটা হাড়-হারামজাদা, তিলে খচ্চর। সিডিউল্ড কাস্টের গ্রাম আর কত ভালো হবে! এত কিছু তোদের জন্যে করলুম, ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ দিলুম, বর্গা রেকর্ড করিয়ে দিলুম, পঞ্চায়েত থেকে লোনের বন্দোবস্ত ক'রে দিলুম, মিনিকিট দিলুম— তবু শালারা কেউ আপনা থেকে প্রাণের টানে পার্টি অফিসেও আসে না, আমারও কাছে ঘেঁষে না, সবাইকে গিয়ে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আসতে হয়, তবে আসে, মুখ বেজার ক'রে আসে। পাঁচন গেলার মতো মুখ ক'রে আমার ভাষণ শোনে, আর চুপচাপ চ'লে যায়, এমন-কি আজকাল হাততালিটাও দেয় না— এত বড়

বেইমান সব। শালা নিচু জাত হ'লে যা হয়, ভদ্রতা তো আর শেখেনি! এত কিছু পাইয়ে দিচ্ছি— বঙ্কুবিহারীদের আমলে যা তোরা পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবিসনি, সেসবও পাইয়ে দিচ্ছি, তবু একটু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই? আড়ালে-আবডালে ব'লে বেড়ায়— ননী ঘোষাল পঞ্চায়েতের টাকা মেরে ফাঁক ক'রে দিচ্ছে। ভাবুন কাণ্ডখানা একবার, আমিই তোদের জন্যে ক'রে মরছি— আর সেই আমারই নামে মিছিমিছি বদনাম দেওয়া! নিচু জাত হয়েও বামুনের নামে অপবাদ দেয়, এত বড় আস্পর্দ্ধা!— ঐ যে, ঐ যে— আলের ওপর দিয়ে মান্য যাচ্ছে দেখছি— এ্যাই মান্য, এ্যাই মান্য, এ্যাই— আরে আমি ননী— ননী ঘোষাল, এদিকে আয়— শুনে যা একবার!— মান্যটা অবশ্য খারাপ লোক নয়, নীচ জাত হ'লেও সাদাসিদে ভালোমানুষ— যা বলি, শোনে। ওর অন্তত কৃতজ্ঞতাবোধটা আছে। বেচারা গরিব ক্ষেতমজুর, খাওয়া জুটতো না, এখন যে আমার দয়ায় সারা বছর কাজ পাচ্ছে, দু'বেলা খেতে পাচ্ছে— এই কথাটা ও অন্তত ভোলে না। বলা যায়— এই এলাকায় মান্য মাইতিই আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ক্যাডার।

[পরণে হাঁটু পর্যন্ত তোলা ময়লা ধুতি, খালি গা, কাঁধে গামছা নিয়ে প্রায় প্রৌঢ় মান্য মাইতি ঢোকে]

মান্য : আজ্ঞে ম্যাস্টরবাবু, আমায় ডাকতিছেন আপনি?

ননী : হ্যাঁ রে মান্য, বলি তোর আক্কেলটা কী, অ্যাঁ? বলি, আজ কত তারিখ খেয়াল আছে?

মান্য : আজ্ঞে তারিখ?

ননী : হ্যাঁ তারিখ! বলি, আজ সকালে পার্টি অফিসে তোর আসার কথা ছিল; কী? ছিল না?

মান্য : ইস্ বাবু, বড় ভুল হয়ি গেছে গো! সত্যিই তো— আপনে বলিছিলেন বটে!

ননী : ব্যাস্, ভুল হয়ে গেছে বললেই সাত খুন মাপ! বলি— এ কী মামার বাড়ি পেয়েছিস?

মান্য : আজ্ঞে না বাবু।

ননী : কতদিন তোদের বলেছি— পার্টির কাজ সবার আগে, তারপর অন্য কিছু, বলেছি কি না?

মান্য : আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু বলিছেন!

ননী : আঃ! খালি বাবু আর বাবু! কতদিন তোকে আমি বলেছি মান্য— আমাকে বাবু ব'লে ডাকবি না। আমি তো আর বঙ্কুবিহারীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির নেতা নই, আমাদের পার্টি গরিব মানুষের পার্টি, সংগ্রামী পার্টি। এখানে কেউ বাবু নয়, সবাই সমান! আমাকে কমরেড ব'লে ডাকবি, বড়জোর

সম্মান দিয়ে বলতে পারিস— কমরেড ননীদা।

মান্য ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!

ননী ঃ আবার বাবু! কেন কমরেড ব'লে ডাকতে কি তোর মন চাইছে না?

মান্য ঃ আজ্ঞে নজ্জা করে বাবু!

ননী ঃ লজ্জা! কীসের লজ্জা?

মান্য ঃ আজ্ঞে আমি মান্য মাইতি— সামান্য হেলে চাষা, গোমুখ্যু, নিচু জাত, নুন আনতি পান্তো ফুরায় মোর, আর আপনে শিক্ষিৎ, ম্যাস্টারবাবু, তার ওপর জেতে বামুন— সদ্বংশ! আপনেরে কি বাবু ছাড়া অন্য কিছু বলতি পারি?

ননী ঃ দ্যাখ্ মান্য, এইজন্যেই তোদের দ্বারা কিস্যু হবে না। চিরটাকাল পায়ের তলার জুতো হয়েই থাকবি। তোকে কত বুঝিয়েছি— ওসব ভেদাভেদ আমাদের পার্টিতে নেই; আমরা বন্ধুদের মতো নই। বন্ধুদের বাবু বলতে পারিস, কিন্তু আমাদের বলবি— কমরেড—

মান্য ঃ আজ্ঞে এবার থেকে তাই বলবো বাবু! কমরেড ননীবাবু!

ননী ঃ ঠিক আছে। ওতেই হবে। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে! যা-ই হোক, সকালে পার্টি অফিসে তো এলি না, কিন্তু দুপুরবেলায় একটার সময় হাটতলায়—

মান্য ঃ হ্যাঁ বাবু, মনে আছে— ঠিক যাবো— সত্যি বলছি— আর ভুল হবে না বাবু (জিভ কেটে) মানে কমরেড—

ননী ঃ একা তুই এলেই হবে না কিন্তু, গ্রামের অন্য লোকদেরও নিয়ে আসতে হবে তোকে—

মান্য ঃ অন্যদের কথা কী ক'রে বলি বাবু? এখন চাষের সময় মাঠের কাজ ছেড়ে কেউ কি আসবে?

ননী ঃ উঃ, কী স্বার্থপর ব্যাটারা! এই সরকার তোদের জন্যে এত করেছে, একটু কৃতজ্ঞতা নেই? চাষের কাজ তোদের কাছে বড় হলো? পার্টির কাজটা তোদের কাছে কিছু না? নিচু জাত আর কত ভালো হবে!

মান্য ঃ আজ্ঞে এখন একেবারে ভরা মরশুম কি-না, একটা দিন নষ্ট হ'লে অনেক ক্ষেতি! অন্য সময় তো সবাই আসে বাবু, আপনি ডাক দিলেই সব্বাই চ'লে আসে, কলকেতায় মিটিন্ শুনতে যায়, চিড়িয়াখানা দ্যাখে, কিন্তু এখুন সত্যিই কাজের চাপে কারুর নিঃশ্বেস ফেলারও ফুরসুৎটি নেই যে!

ননী ঃ হুঁ তুই যে দেখছি— ক্রমাগত তোর জাতের লোকদের হয়েই ওকালতি ক'রে চলেছিস! তোর মতলবটা কী বল্‌ তো দেখি মান্য— কাজের ছুতো দেখিয়ে তুইও ডুব মেরে বসবি না-কি?

মান্য ঃ (জিভ কেটে নাক কান মূলে) ছি ছি ছি! কী যে বলেন বাবু? আপনার কোন্‌ কাজে মান্য মাইতি না এয়েছে শুনি? আপনে আমাদের ন্যাতা, আপনের কথাটি কি আমি অমান্য করতি পারি? আর তা'ছাড়া আপনের দয়াতেই আজ দু'মুঠো খেতে পাই বাবু— বামুনের নিন্দে করলে যে পাপ হবে!

ননী ঃ একমাত্র তোরই দেখছি— এই কৃতজ্ঞতাটুকু আছে, অন্য সবাই তো আমারই খেয়ে আমারই ইয়েতে বাঁশ ঠেলে দেয়! আমারই জন্যে পঞ্চায়েত থেকে ডোল পায়, আবার আমার নামেই কুচ্ছো গেয়ে বেড়ায়— ননী ঘোষাল চোর, নইলে তিন বছরে তার দোতলা পাকা বাড়ি, মোটর সাইকেল, দুটো হাস্কিং মিল, তিনটে বাস হয় কী ক'রে?

মান্য ঃ ছি ছি বাবু, একথা যারা বলে, তাদের জিভ খ'সে যাবে, সারা অঙ্গে কুরিকুষ্ঠ হবে!

ননী ঃ যাক সেকথা, সেজন্যে আমি কিছু মনেও করি না, জনগণের সেবা করতে গেলে ওরকম একটু-আধটু গালমন্দ খেতেই হয়! কিন্তু মান্য— খেয়াল থাকে যেন— ঠিক দুপুর একটায় যতজনকে পারিস সঙ্গে নিয়ে হাটতলায় চ'লে আসবি। আজ একটা বিরাট আন্দোলন হবে— কেন্দ্রের নতুন অর্থনৈতিক নীতি, আই.এম.এফ.-এর কাছে দেশকে বেচে দেবার বিরুদ্ধে—

মান্য ঃ কেন্দ্র কাকে বলে বাবু?

ননী ঃ কেন্দ্র হলো গিয়ে ওই বঙ্কুবিহারীরা— ওদেরই অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে—

মান্য ঃ আজ্ঞে বঙ্কুবাবুদের তো আমরা বারবার সব-ক'টা ভোটেই হারিয়ে দিয়েছি— এখন তো সরকার আপনেদের—

ননী ঃ আহা, সে তো এখানে— কিন্তু কেন্দ্রে আবার বঙ্কুদেরই রাজত্ব শুরু হয়েছে।

মান্য ঃ কেন্দ্র মানে তাহলি এখানে নয়! তাহলি কেন্দ্রটা কোথায় বাবু? কোন্‌ দেশে?

ননী ঃ আহা, অন্য কোনো দেশে নয়, আমাদের দেশেই; তবে এখানে নয়। দিল্লিতে।

মান্য ঃ দিল্লি? ও বাবা, সে তো অনেক দূর, বিলেতের কাছে, লয় গো?

ননী ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, দিল্লি কোথায়— এসব তোকে পরে শিখিয়ে দেবো। ভূগোলটা একটু জানা দরকার। যা-ই হোক— ঐ কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই আমাদের জোরদার আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে হবে— এখানে যেমন আমরা ভোটে জিতে সরকার করেছি, ঠিক তেমনি ক'রে কেন্দ্রে— দিল্লিতেও—

মান্য ঃ বাবু— পুলিশ— তারিণী সেপাই আসছে!

ননী ঃ ও, তারিণী! হ্যাঁ ওকে আমিই আসতে বলেছিলাম।

মান্য ঃ আমি যাই বাবু— পুলিশ দেখলেই আমার ভয় করে— ধ'রে নিয়ে ফাটকে না পুরে দেয়—

ননী ঃ দুর, দুর, এ কি বন্ধুদের পুলিশ যে ভয় পাবি? এ হলো আমাদের পুলিশ, জনগণের বন্ধু, বুঝলি?

[তারিণী সাইকেল নিয়ে আসে। মান্য মাইতি— ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে টুকটাক মন্তব্য করবে আপন মনে]

তারিণী ঃ তা ননীবাবু, আপনি হঠাৎ এমন ক'রে জরুরি তলব পাঠালেন কেন, বলুন তো?

মান্য ঃ তাই তো বাবু, হঠাৎ পুলিশ কেন?

ননী ঃ কেন, ডেকে পাঠিয়ে কোনো অন্যায় করেছি না-কি?

তারিণী ঃ কী যে বলেন ননীবাবু? আপনারা কখনও অন্যায় করতে পারেন না-কি? আপনারা হলেন গিয়ে খোদ সরকারের লোক। আর সরকার মানেই পুলিশের মা-বাপ। পুলিশ— সেই সরকারের বাচ্চা। আদরের দুলাল। ছেলে কখনও বাপের অন্যায়ের কথা নিজের মুখে বলে না-কি? তার জিভ খ'সে যাবে না!

ননী ঃ হুঁ! ইদানীং দেখছি তোমাদের মুখেও খই ফুটছে!

তারিণী ঃ হেঁ হেঁ ননীবাবু! সবই আপনাদেব কল্যাণে যে! আপনারাই তো আমাদের কথা বলতে শেখালেন! এর আগে বন্ধুবাবুদের আমলে পুলিশ শুধু মুখ বুঁজে হুকুম তামিল করতো, একে ধরতো, তাকে মারতো, বাঁ হাত বাড়িয়ে কাঁচা টাকা নিতো, কিন্তু সবই মুখ বুঁজে। ঠোঁটে তালা-চাবি এঁটে।

মান্য ঃ তা যা বলিছো, একেবারে ন্যায্য কথা!

তারিণী ঃ আর আপনারাই আমাদের কথা বলতে শেখালেন, আগের মতোই একে ধরছি তাকে মারছি ঠিকই; বাঁ হাতের কারবারও চলছে; কিন্তু কথা বলতে পারছি— প্রাণ ভ'রে গলা খুলে চেঁচাতে পারছি— পুলিশও এখন স্লোগান দিয়ে মিছিল করছে— ভাবতে পারেন!

ননী ঃ এই কথাটি মনে রেখো তারিণী, পুলিশের হয়ে ঐ গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু আমরাই দিয়েছি, মানে— এই সরকারই তা দিয়েছে— মাইনেও বাড়িয়ে দিয়েছে অঢেল—

মান্য ঃ শুধু আমাদেরই এক অবস্থা।

তারিণী ঃ তা জানি ননীবাবু, এজন্যেই তো স্যার— আপনারা যা বলেন সঙ্গে সঙ্গে তা ক'রে দিই। যাকে বাঁশ ঠেলতে বলেন, তার ইয়েতেই ঠেলে দিই। অবশ্য এটা আমাদের কর্তব্য। যখন যে সরকার থাকবে, তারই মন জুগিয়ে চলো। বঙ্কুবাবুরা সরকারে থাকলে তাদেরও সেবা করতাম।

ননী ঃ কী বেইমান! এখনও বঙ্কুদের ওপর দরদ! এত ক'রেও তোমাদের মন পাওয়া যায় না! পুলিশের হৃদয় পরিবর্তন হয় না।

তারিণী ঃ পুলিশের হৃদয় পরিবর্তন? হাসালেন ননীবাবু। এত বোঝেন আর এটা বোঝেন না মাস্টারমশাই— পুলিশের ঐ হৃদয়টিদয় নেই। পুলিশ হলো একটা যন্তর, পেটানোর কল, তার কখনও ঐ হৃদয় বা মনটন থাকে না-কি? পুলিশ কি পদ্য লেখে, না ছবি আঁকে যে তার মন থাকবে?

ননী ঃ হুঁ! কথাটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি! শালা, মীরজাফরের জাতভাই— বিভীষণের বংশধর! এখন দেখছি— এখানে যদি আবার বঙ্কুরা পাওয়ারে আসে, তুমিও শালা এই ননী ঘোষালের পেছন ছেড়ে বঙ্কুবিহারীর বৈঠকখানায় গিয়ে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে।

তারিণী ঃ তা তো থাকবোই ননীবাবু, চাকরি বাঁচাতে হবে না? আর আগেই তো বললাম— সরকার হলো পুলিশের বাপ। সরকার বদল হ'লে পুলিশেরও বাপ বদল হয়, ঘন ঘন সরকার বদল মানেই ঘন ঘন পুলিশের বাপ বদল। আর প্রত্যেক বাপেরই সুপুত্তর হ'তে হবে পুলিশকে, নইলে তার চাকরি নট্। বঙ্কুবাবুরা সরকারে এলে তখন তো তাদের কথাতেই চলতে হবে ননীবাবু।

মান্য ঃ উরি বাবা— এ বলে কী! তাইলে তো আজই বঙ্কুবাবুর কাছেও একবার যেতি হবে—

ননী ঃ অথচ এই তোমার জন্যেই আমি কী-না করেছি তারিণী! ছিলে একেবারে ভিন্-জেলায় ধ্যাদ্ধেরে গোবিন্দপুরে পোস্টিং, কত লেখালেখি, কত ধরাধরি, কত তদ্বির-তদারকি ক'রে তোমাকে নিজের গ্রামের থানায় নিয়ে এলাম, বাড়ির ভাত খেয়ে বৌয়ের

রান্না খেয়ে আজ চাকরি করছো কার দৌলতে শুনি?

তারিণী : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারই জন্যে, আপনারই দৌলতে— সেকথা কি কখনও অস্বীকার করেছি ননীবাবু? তবু যদি সেকথা তোলেন, তবে আমিও বলবো— আমিও কিন্তু কাজেকর্মে তার শোধ দিয়েছি অনেক।

ননী : শোধ? কীসের শোধ?

তারিণী : বাঃ! যা বলেছেন. তা-ই করেছি; যাকে মিথ্যে কেসে জড়াতে বলেছেন, তাকে তা-ই জড়িয়েছি; অন্য দলের খবরাখবর আপনাদের পৌঁছে দিয়েছি; আমার সাহায্য ছাড়া পঞ্চায়েতে সব-ক'টা সিটে যে কিছুতেই জিততে পারতেন না— একথা তো স্বীকার করবেন?

ননী : তা বটে! সেসময় সত্যি তুমি খুব সাহায্য করেছো, ঠিকই।

তারিণী : তবে? শোধবোধ হয়ে গেল তো! আপনারা যখন পাওয়ারে, তখন আমি আপনাদের চাকর, ঠিক কি-না?

মান্য : যখন যার, তখন তার— এ তা'লে কার নোক?

ননী : আর চাকা ঘুরলে?

তারিণী : সেকথা এখন তুলে কী হবে ননীবাবু? যখন হবে, তখন দেখা যাবে। তবে মাস্টারমশাই, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। এখন আপনারা যেতে আসেননি, থাকতেই এসেছেন! বঙ্কুবাবুদের নিয়ে অত মাথা ঘামানোর কী আছে? ওদের তো সবাই নেতা, প্রত্যেকেই নিজের নামে যুগ যুগ জিও বলে, তার ওপর আগে ওরা দিল্লি সামলাক, তারপর তো এখানে, ওখানেই ওদের সরকার নড়বড় করছে—

ননী : বলছো তাহলে? ওদের আসার সম্ভাবনা নেই?

মান্য : যাক বাবা, বাঁচা গেল.

তারিণী : তাই তো মনে হয়। সুতরা: চালিয়ে যান এখন বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে। তবে সবদিন তো সমান যায় না। বঙ্কুবাবুরা না হ'লেও অন্য কেউ আসতে পারে অবশ্য। তবে সেই অন্য কেউরা বোধহয় আমাদের ততটা পছন্দ করবে না— তাই আমরাও চাই না— তারা আসুক। তেনারা এলে আপনাদেরও রব্‌রবা ঘুচবে. আমাদেরও।

ননী : (বিস্ময়ে) তার মানে! তুমি কাদের কথা বলছো?

মান্য : অ্যাঁ, এ আবার কাদের কথা বলে?

তারিণী ঃ বাদ দিন, বাদ দিন ওসব কথা। আজকে থানাতে যা শুনে এলাম, তাতে মনে হচ্ছে—

ননী ঃ কী শুনে এলে? কী মনে হচ্ছে?

তারিণী ঃ মনে হচ্ছে— এখানেও বোধহয় আবার ঝামেলা শুরু হবে—

ননী ঃ ঝামেলা শুরু হবে? কারা করবে? বন্ধুরা?

তারিণী ঃ না, না, তারা করবে কেন? তারা এখন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত, দিল্লিতে ওদের নড়বড়ে সরকার, তার ওপর নেতায়-নেতায় চুলোচুলি, ওদের অন্যদিকে মাথা ঘামাবার সময় কই?

মান্য ঃ তা'লে কারা গো বাবু?

ননী ঃ তবে কারা? আমার এলাকায় মাথা গলাবে কোন্ শালা? অন্য সব পার্টিকে শেকড়সুদ্ধু উপড়ে ফেলেছি এখানে, পঞ্চায়েতে সব-ক'টা সিটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছি, ক্যাণ্ডিডেট হ'তেও কোনো শালা সাহস করেনি। এখন আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালাতে আসছে কে?

মান্য ঃ আগুন জ্বালায় কে বটে?

তারিণী ঃ ওটা স্যার টপ সিক্রেট! বলা যাবে না!

ননী ঃ আমাকেও বলা যাবে না?

তারিণী ঃ আজ্ঞে না, ননীবাবু। কাউকেই বলা যাবে না। মুখ ফস্‌কে মনের আবেগে যেটুকু ব'লে ফেলেছি, সেটুকু বলাও উচিত হয়নি আমার। বড়বাবু জানতে পারলে চাকরি খেয়ে নেবেন। মাইরি বলছি ননীবাবু, আর কিছু জিগ্যেস ক'রে আমাকে ফাঁসাবেন না। আমার মুখে এখন লক্‌আউট, তালাবন্ধ!

ননী ঃ কী! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমাদের সরকার! আর আমার কাছ থেকেই গোপন করা হচ্ছে! তোমাকে বলতেই হবে— কী হয়েছে? নতুন কী ঘটেছে এই এলাকায়?

তারিণী ঃ বলছি তো বলতে পারবো না। হুকুম নেই!

ননী ঃ কার হুকুম? আমাকে অবজ্ঞা করার হুকুমটা কে দিয়েছে শুনি?

তারিণী ঃ দোহাই ননীবাবু— আর একটা কথাও আমি বলতে পারবো না—

ননী ঃ তারিণী! তোমার নামে আমি ওপর মহলে কমপ্লেন করবো। আবার তোমাকে অন্য জেলায় ট্রান্সফার করবো।

তারিণী ঃ পারবেন না ননীবাবু, অন্তত এই কেসে পারবেন না। কেননা ঐ ওপর মহলের হুকুমেই আমার মুখে তালা আঁটা।

মান্য ঃ ওপর মহল!

নলী ঃ ওপর মহলের হুকুম! তার মানে?

তারিণী ঃ মানে আবার কী? ওপর মহল মানে ওপর মহল।

ননী ঃ কত ওপর? বলি কত ওপরের হুকুম?

তারিণী ঃ সবচেয়ে ওপর!

ননী ঃ মুখ্যমন্ত্রী?

তারিণী ঃ আপনি বুদ্ধিমান মাস্টারমশাই, সবচেয়ে ওপর বলতে কাকে বোঝায়— বুঝে নিন।

ননী ঃ কী বলেছেন তিনি?

তারিণী ঃ তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে কাকপক্ষীতেও যাতে না জানে, সেইরকমই যেন শুনে এলাম থানা থেকে। যা হবে সব গোপনে— কেউ যেন না জানে ঘুনাক্ষরেও— তা-ই তো বললেন বড়বাবু!

মান্য ঃ ওরে বাবা— তা'লে তো ভীষণ ব্যাপার গো!

ননী ঃ কিন্তু আমরা পার্টির লোক। আমরাও জানবো না?

তারিণী ঃ বললাম তো— কাকপক্ষীও জানবে না। আপনারা কি কাকপক্ষীরও অধম না-কি? তা যদি হন, মানে পার্টির লোকেরা যদি কাকপক্ষীও না হয়, তবে আপনাকে বলতে পারি বটে!

ননী ঃ হুঁ। খুব বাঁকা বাঁকা কথা শিখেছো দেখছি! সুযোগ পেলেই খোঁচা মারছো!

তারিণী ঃ ছাড়ান দিন ননীবাবু— ওসব ছেঁদো কথায় কান দেবেন না। —ও হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো জানা হলো না— সাত সকালে হঠাৎ আমাকে একেবারে থানা থেকে ডেকে পাঠালেন কেন স্যার?

ননী ঃ মেজাজটাই খিঁচড়ে দিলে তারিণী, আমার এলাকার ব্যাপার— আর আমিই জানবো না?

মান্য ঃ সত্যিই তো— বাবু জানবে না?

তারিণী ঃ বলছি তো এসব কথা ভুলে যান মাস্টারমশাই! খুঁচিয়ে ঘা করতে যাবেন না, তা'তে আমারও চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে, আর আপনারও পজিশান ঢিলে হয়ে যেতে পারে, বিক্ষুব্ধ ব'লে হয়তো পার্টি থেকেই বের ক'রে দেবে, তখন এই বাজারে খাবেন কী? যে রাজা'র হালে এখন থাকেন, তা'তে শুধু মাস্টারীর মাইনেয় কুলোবে না, অন্য সব ইন্‌কামের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে— কেন যেচে বাঁশ নিচ্ছেন, চেপে যান ননীবাবু, চেপে যান।

ননী ঃ শালা পুলিশও দেখছি আমার চেয়ে বেশি পার্টি বোঝে, আমাকেও জ্ঞান দেয়!

তারিণী ঃ আপনি মশাই কেতাব প'ড়ে বোঝেন, আর আমরা বুঝি— অভিজ্ঞতায়! তাই তো বলছি— বেশি ঘাঁটাবেন না, ওপর মহল যা চেপে থাকতে চায়, আপনিও তা চেপে যান।

ননী ঃ (গম্ভীর) হুম্! কোথায় যে কী হচ্ছে— কে যে কোথায় কাঠি নাড়ছে—

তারিণী ঃ আমার অনেক দেরি হয়ে গেল ননীবাবু, থানায় আজকে কাজের হেভি চাপ, এক মুহূর্তও কারুর ফুরসৎ নেই, স্রেফ আপনি ডেকেছেন ব'লেই এলাম। বলুন স্যার এবারে, কী কারণে এই অধমকে তলব করেছেন?

ননী ঃ কী কারণে? (হঠাৎ ক্ষেপে যায়) কী কারণে জানো না? যতসব হতচ্ছাড়া ঘুষখোর পুলিশ জুটেছে আমাদের কপালে, নিষ্কর্মার ঢেঁকি একেক্‌টা, কাজের কাজ নেই শুধু ঘুষ খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছে, পাজির পা-ঝাড়ার দল, আগাপাস্তলা ফাঁকিবাজ— এদের দিয়ে কখনও দেশের ভালো হয়! বিপ্লব হয়!

তারিণী ঃ (হেসে) পুলিশকে দিয়ে বিপ্লব করাতে চাইছেন না-কি ননীবাবু? বেশ, বেশ, নতুন একটা কথা শোনা গেল। তা হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন মাস্টারমশাই? আমাদেরকে ঘুষখোর ফাঁকিবাজ ব'লে দিলেন! ওসব তো বন্ধুবাবুদের আমলে ছিলাম, এখন তো আমাদের চরিত্র পাল্টেছে। আপনারাই তো বলেন পুলিশ এখন জনগণের বন্ধু। শান্তিপুরে মগরায় বাগুইহাটিতে কোলকাতার এসপ্ল্যানেডে গুলি চালালেও সেই বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না— এত গভীর বন্ধুত্ব!

মান্য ঃ এ যে দেখি শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি গো!

ননী ঃ ক্রমাগত আমাকে পিঞ্চ ক'রে যাচ্ছো তারিণী, আচ্ছা— আমিও দেখে নেবোখন?

তারিণী ঃ পারবেন না ননীবাবু— পারবেন না, আমাদের ইউনিয়ন আছে, আপনাদের পার্টিরই ইউনিয়ন, আমিও সেই ইউনিয়ন করি। যাক সেকথা, কেন ডেকেছেন— তাই তো এখনও বললেন না! বললাম না— থানায় আজকে হেভি প্রেশার— পেচ্ছাপ করতে যাবারও সময় নেই; বাইরে থেকে পর্যন্ত ফোর্স এসেছে। এই যাঃ আবার গোপন তথ্য ফাঁস করছি— (ননী তাকায়) না, না, কিছু না, কিছু না, কিছুই হয়নি, বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে বড়বাবু

বারণ ক'রে দিয়েছেন— কেন ডেকেছেন বলুন, শুনে চ'লে যাই!

নন্দী ঃ (খেঁকিয়ে) বলি আজকে কত তারিখ খেয়াল আছে?

তারিণী ঃ (হতভম্ব) তারিখ! মানে আজকে! ইয়ে— তারিখ দিয়ে কী হবে? মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন?

নন্দী ঃ কী স্পর্ধা! মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ইয়ার্কি!

তারিণী ঃ না, না, মানে আজকে মিটিং আছে না-কি পার্টির? আজকের তারিখটা হলো গিয়ে—

মান্য ঃ এ শালাও আমারই মতো, তারিখটারিখ জানে না।

নন্দী ঃ (চেঁচিয়ে) আজকে পার্টির ডাকে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতি আর শিল্পনীতি এবং বিদায়নীতির বিরুদ্ধে আইন অমান্য! বলি সে খেয়ালটা আছে?

তারিণী ঃ আইন অমান্য! আজকে?

নন্দী ঃ কেন, জানো না? একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছো?

মান্য ঃ আমিও ভুলে গেছিলাম!

তারিণী ঃ (তাড়াতাড়ি) না, না, ভুলবো কেন? ঠিক মনে আছে। মানে, পোস্টারে দেখেছি বটে!

নন্দী ঃ ছাই দেখেছো! দেখলে আর কেন ডেকেছি জিগ্যেস করতে না!

তারিণী ঃ ইস্! ঠিক বেছে বেছে আজকেই আইন অমান্যের দিনটা ঠিক করলেন?

মান্য ঃ সত্যি! আজকেই দিনটা হলো!

নন্দী ঃ কেন? তাতে তোমার আপত্তি আছে না-কি?

মান্য ঃ আমারও আছে!

তারিণী ঃ না— মানে— আপত্তি কেন থাকবে? মানে আজকের দিনটায়— ইয়ে বললাম না কাজের চাপ!

নন্দী ঃ তোমার কাজের চাপের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? তোমাকে তো আর আইন অমান্য করতে বলছি না। তুমি শুধু চ্যাটার্জি সাহেবকে কথাটা মনে করিয়ে দেবে---

তারিণী ঃ তা নয় দিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন— আজকে সত্যিই আমাদের খুব অসুবিধে আছে— অন্যদিন করলে হতো না?

নন্দী ঃ অবাক কাণ্ড! আমাদের আন্দোলন, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের লড়াই— আমাদের আইন অমান্য কবে করবো না করবো, তার জন্যেও পুলিশের সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে?

তারিণী ঃ না, তা দেখবেন কেন? আপনার পাঁঠা যেদিকে ইচ্ছে কাটবেন।

আপনাদেরই সরকার— আপনাদেরই আইন— যেদিন ইচ্ছে ভাঙবেন, যেদিন ইচ্ছে জুড়বেন— কে কী বলবে?

ননী : তবে? তবে তখন থেকে এত বাগড়া দিচ্ছো কেন?

তারিণী : না, মানে— বিশ্বাস করুন— আজকে আমরা অন্য একটা ঝামেলা নিয়ে খুব ব্যস্ত।

ননী : তাতে আমাদের কী? আমাদের আইন অমান্য আমরা করবোই—

তারিণী : তা নয় করলেন, কিন্তু আপনাদের এ্যারেস্টটা কে করবে? এই পুলিশই তো! আমাদেরই এসে আপনাদের ধরতে হবে, আবার ঘণ্টা দুই বাদে ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু করবোটা কখন? সত্যি বলছি ননীবাবু, আজকে আমাদের একদম সময় নেই। মাইরি বলছি— আজকের দিনটা বন্ধ রেখে অন্যদিন করুন।

মান্য : হ্যাঁ বাবু অন্যদিন হ'লেই সুবিধে, এখন চাযের মরশুম।

ননী : কী ক'রে অন্যদিন হবে? এ তো শুধু আমাদের এলাকার ব্যাপার নয়, এই আইন অমান্য হচ্ছে সারা দেশব্যাপী— কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, তোমাদের একটা থানায় কী ঝামেলা আছে না আছে সেজন্যে তো সারা দেশের আন্দোলনের দিন পেছুনো যায় না!

তারিণী : তা পেছুনো যায় না বটে!
(এতক্ষণ মান্য দূরে দাঁড়িয়ে আলটপ্‌কা আপন মনে মন্তব্য করছিল, এইবার ওদের কাছে আসে)

মান্য : বাবু গো— এর কথায় আজ না করলেই পারতেন গো, আজ বোধহয় মাঠের কাজ ছেড়ে কেউ একটা আসবে না, লোকজন বেশি হবে না—

ননী : না-হোক, শুধু যদি আমাকে একাই আইন অমান্য করতে হয়, এমন-কি যদি তুইও না আসিস—

মান্য : না, না, আমি আসবো, আমি আসবো গো বাবু—

ননী : তাহলেও আইন অমান্য হবেই। পার্টি প্রোগ্রাম কখনই বন্ধ হবে না। আর বন্ধ করার অধিকারও আমার নেই। এখানে যদি আজ কিছুই না হয়, তাহলে পার্টিতেই আমার পজিশন ঢিলে হয়ে যাবে। আমার বিরুদ্ধপক্ষ সুযোগ পেয়ে যাবে। আমি তা কখনই হ'তে দেবো না। সুতরাং আইন অমান্য হচ্ছে! হবে!

তারিণী : করতে চান করুন। বারণ করলেও যখন শুনবেন না—

ননী : না, শুনবো না, কারণ শোনার উপায় নেই। শোনো তারিণী, তুমি এক্ষুণি থানায় গিয়ে দারোগা চ্যাটার্জি সাহেবকে বলবে—

আমি ননী ঘোষাল বলেছি— দুপুর একটায় হাটতলায় আমরা আইন অমান্য করবো, উনি যেন একটার মধ্যেই একটা প্রিজন ভ্যান পাঠিয়ে দেন। হ্যাঁ, ভ্যান যেন সময়মতো আসে, আমরা কিন্তু ভ্যানের জন্যে হাপিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকতে পারবো না।

তারিণী ঃ বলতে বলছেন যখন বলবো, তবে আজ দারোগাবাবু ভ্যানট্যান পাঠাতে পারবেন ব'লে মনে হয় না!

ননী ঃ ভ্যান না হোক, জীপগাড়ি তো পাঠাতে পারবেন—

তারিণী ঃ তা'ও পারবেন কি-না বলতে পারছি না।

ননী ঃ ইয়ার্কি না-কি? অ্যারেস্ট্ হবার পর আমি কি পায়ে হেঁটে থানায় যাবো না-কি? আমার কি প্রেস্টিজ নেই?

তারিণী ঃ ঐজন্যেই তো বললাম— আজকে ওসব করবেন না, অন্যদিন করুন, ভ্যান বলুন, জীপ বলুন— এমন-কি হেলিকপ্টার— বলুন— যা চান, সব দেবো, শুধু আজকের দিনটা বাদ দিন।

ননী ঃ ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না। আজকে আইন অমান্য না হ'লে আমার প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে যাবে পার্টিতে। সুতরাং তোমাদের আসতেই হবে—

তারিণী ঃ আমি বড়বাবুকে গিয়ে রিপোর্ট করছি— তারপর উনি যা করেন— (প্রস্থানোদ্যত)

ননী ঃ সময়টা খেয়াল রেখো তারিণী— দুপুর একটা, হাটতলায়।

তারিণী ঃ আচ্ছা! [প্রস্থান]

ননী ঃ মান্য— তুই আসবি তো?

মান্য ঃ না এসি তো উপায় নাই বাবু— আসবো— আপনে বামুনের ছেলে— আপনের কথা কি অগ্রাহ্যি করতি পারি!

ননী ঃ যতজনকে পারিস সঙ্গে নিয়ে আসবি—

মান্য ঃ ব'লে তো দেখি— যদি আসতি চায়— আসবে। ছোট জাতের মেজাজ-মর্জি কখন যে কী হয়!

ননী ঃ তুই কিন্তু মাস্ট্। হাটতলায়— দুপুর একটায়!

[দু'জনে দু'দিকে চ'লে যায়। মাথা ঢেকে একজন একটি পোস্টার নিয়ে মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হেঁটে যায়। পোস্টারে লেখা— 'হাটতলায় দুপুর একটায়'। ননী ঘোষাল ও মান্য মাইতির প্রবেশ]

ননী ঃ সে কী রে মান্য! আর কেউ আসেনি! শুধু তুই আর আমি!

মান্য ঃ আপনেকে তো আগেই বললাম বাবু— আজকে বাদ দ্যান মাঠের কাজ ছেড়ি আজ কেউ আসবেনি—

ননী ঃ না, না, মাঠের কাজ নয়, আসলে— আসলে এটা একটা স্যাবোটাজ। আমার বিরুদ্ধ পক্ষই পার্টির কাছে তলে তলে আমাকে হেকেল্ড্ করার জন্যেই এটা করেছে। নইলে ভাবতে পারিস— যেখানে গোটা পঞ্চায়েতটাই আমাদের, সেখানে আইন অমান্য আন্দোলনে— শুধু তুই আর আমি! ঠিক আছে, আমিও বামুনের ব্যাটা, আমারও নাম ননী ঘোষাল! আমারও হাত অনেকদূর যায়। যারা এই আন্দোলনকে ভেতর থেকে ছুরি মারছে, তাদেরও আমি দেখে নেবো। বরং এতে একদিক থেকে ভালোই হলো— পার্টিও বুঝবে— এই এলাকায় কে সত্যিসত্যি পার্টির কর্মসূচি পালন করে।

মান্য ঃ তা বাবু— আমরা কি এই দু'জনে মিলেই আইন অমান্য করবো?

ননী ঃ নিশ্চয়ই। দু'জনেই করবো। ঐজন্যেই তো লেনিন বলেছিলেন— "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না-ও আসে, তবে একলা চলোরে" আর এখানে তো তবু দু'জন রয়েছি। একজন বামুন আর একজন সিডিউল্ড কাস্ট, ওতেই হবে। ভয় কী? কিন্তু তারিণী ব্যাটাচ্ছেলে এখনও ভ্যান নিয়ে এলো না কেন? একটা তো বেজে গেছে। ওদের তো এতক্ষণে চ'লে আসা উচিত ছিল—

মান্য ঃ তারিণী সিপাই আর এসেছে! তখন শুনছিলেন না— খালি না আসার ফন্দি—

ননী ঃ ওর ঘাড় আসবে! আমরা আইন অমান্য করবো— আর ওরা আমাদের ধরতে আসবে না— এ যদি হয়, তবে থানা সুদ্ধু সকলেরই চাকরি খেয়ে নেবো আমি! ইয়ার্কি না-কি? ওরা যদি আমাদের গ্রেপ্তার না করে, তবে বুঝতে হবে— ওরাও আসলে কেন্দ্রের চর, বঙ্কুবিহারীদের দালাল, আমাদের কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যেই আমাদের গ্রেপ্তার করতে আসছে না। আমি তাহলে সোজা মুখ্যমন্ত্রীকে কমপ্লেন করবো—

মান্য ঃ চলুন বাবু, তারিণী সেপাই যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ ঐ ছায়ায় গিয়ে বসি—

ননী ঃ খেপেছিস! কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম নেওয়া! কভি নেহি! আয়, তারিণী না আসা পর্যন্ত আমরা শ্লোগান দিই—

মান্য ঃ লোক কই? আমরা তো মোটে দু'জন!

ননী ঃ ওতেই হবে! দু'জনেই শ্লোগান দেবো! তোকে বললাম না—

লেনিন বলেছেন— একলা চলোরে! আয় স্লোগান দিয়ে একটু গা গরম ক'রে নিই— (ওরা দু'জনে স্লোগান দিতে থাকে— "প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকার নিপাত যাক", "কেন্দ্রের শিল্পনীতি মানছি না, মানবো না", "কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে", "কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আইন-অমান্য করছি, করবো", "আইন অমান্য আন্দোলন চলছে চলবে—" ইত্যাদি, ইত্যাদি! স্লোগান দিতে দিতে ওরা বারবার সারা মঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে থাকে। হঠাৎ স্লোগান থামিয়ে মান্য চেঁচিয়ে ওঠে)

মান্য ঃ বাবু— বাবু— পুলুশ আসছে— তারিণী সেপাই—

ননী ঃ অ্যাঁ! কই, কই? যাক— এতক্ষণে ভাবনা ঘুচলো। তারিণী কথা রেখেছে, একটু দেরিতে হ'লেও এসেছে তো! কিন্তু, ওর সঙ্গে তো কোনো ভ্যান বা জীপ দেখছি না! প্রিজন ভ্যান কই?

মান্য ঃ না বাবু, ভ্যানফ্যান কিছু নাই। তারিণী সেপাই একাই আসতিছে সাইকেল চেপে!

ননী ঃ অ্যাঁ! শালা একটা ভ্যানও জোগাড় করতে পারলো না! কী হবে তাহ'লে এখন!

[সাইকেল সহ তারিণীর প্রবেশ]

তারিণী ঃ আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম ননীবাবু, আজকের দিনটায় কিছু করবেন না। দেখলেন তো গরিবের কথা বাসি হ'লেও ফলে। মিছিমিছি আপনারও ভোগান্তি আমারও ভোগান্তি—

ননী ঃ চ্যাটার্জিব্যাটা একটা ভ্যানও দিলো না— এত বড় আস্পর্দ্ধা!

তারিণী ঃ আহা— দারোগাবাবুর কী দোষ? তাঁর কি দেবার উপায় আছে না-কি? থানার সব গাড়ি অন্য জায়গায়, স্যরি— এসব গোপন তথ্য বলা যাবে না।— কিন্তু মিছিমিছি আজকে আমাকে ঝামেলায় ফেললেন। মাঝের থেকে দু-দু'বার এতটা পথ ভেঙে আসতে হলো আমাকে!

ননী ঃ ওসব কোনো কথা শুনতে চাই না! আমরা আইন অমান্য আন্দোলন করছি, পুলিশকে আমাদের অ্যারেস্ট্ করতেই হবে, ভ্যানে ক'রে থানায় নিয়ে যেতেই হবে, ব্যাস্!

তারিণী ঃ শুনুন, শুনুন ননীবাবু, মাথাগরম করবেন না— দারোগাবাবু নিজে আপনাকে বলতে বলেছেন, আজকের দিনটা দয়া ক'রে এসব করবেন না, অন্য যে কোনোদিন করুন— কাল পরশু যে দিন ইচ্ছে— উনি কথা দিয়েছেন— উনি নিজে এসে আপনাকে

অ্যারেস্ট্ ক'রে জীপে ক'রে নিজের পাশে বসিয়ে জামাই-আদরে থানায় নিয়ে যাবেন, কিন্তু আজকে নয়, মাইরি না।

ননী ঃ ইয়ারকি না-কি? আজকেই সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আমাদের আইন অমান্য আন্দোলন! আর আমার এলাকায় তা হবে না? সামান্য পুলিশের বদমায়েসীতে এই আন্দোলন বন্ধ থাকবে? কভি নেহি! আইন অমান্য হবেই, পুলিশকেও আমাদের অ্যারেস্ট্ করতেই হবে, ব্যাস্!

তারিণী ঃ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। দারোগাবাবু বলেছেন— আপনি যদি খুবই জোরাজুরি করেন, তাহলে আমি যেন এখানেই আরেস্ট্ ক'রে এখানেই ছেড়ে দিই।

ননী ঃ এখানেই অ্যারেস্ট্ ক'রে এখানেই ছেড়ে দেবে! তার মানে?

তারিণী ঃ মানে আবার কী! থানায় নিয়ে যাবার ঝামেলা আর করবো না। এখানেই ধরবো, এখানেই ছাড়বো।

মান্য ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবু, সেই ভালো।

ননী ঃ তুই চুপ কর্, যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলিস কেন? নিচু জাতের বুদ্ধি আর কত ভালো হবে? শোনো তারিণী, তোমার ওসব মামদোবাজি চলবে না। আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? এখানেই ছাড়লে আইন অমান্য আর হলোটা কোথায়? তোমাকে আমাদের থানায় নিয়ে যেতে হবে, সেখানে কাগজে-কলমে রেকর্ড রাখতে হবে— আমাদের ধরেছো—

তারিণী ঃ আমি কথা দিচ্ছি ননীবাবু— আপনাদের এখানে ধ'রে এখানে ছেড়ে দিলেও কাগজে-কলমে লেখা থাকবে— আইন ভেঙে আপনারা গ্রেপ্তারবরণ করেছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি নিজে এসে আপনাকে ফাইলটা দেখিয়ে নিয়ে যাবোখন।

ননী ঃ ওসব চালাকিতে আমি ভুলছি না। থানায় নিয়ে যেতেই হবে— ব্যাস্!

তারিণী ঃ কেন ঝুটঝামেলা পাকাচ্ছেন মাইরি? আপনাদের এখানে ধ'রে এখানে ছেড়ে দেওয়াও যা, থানায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়াও তো তাই; ধ'রে তো রাখা হচ্ছে না, ছেড়েই যখন দেওয়া হচ্ছে, তখন কোথায় ছাড়লাম— এখানে না থানায় তাতে কী আসে যায়, বলুন? ফালতু থানা পর্যন্ত যাবেন কেন?

মান্য ঃ তারিণী সেপাই তো ঠিকই বলেছে বাবু, মিছিমিছি এই ভরদুপুরে থানা পর্যন্ত গিয়ে কী হবে? সেই সকালে দুটো মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তারপরে পেটে আর কিছু পড়েনি, আপনের

কথায় বাড়ি আর না গিয়ে লোক জোগাড় করতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি, তা নিজের জাতের শালারাই তো কেউ এলো না, বরং আমার দুপুরের খাওয়াটাও হলো না— তারিণী এখানেই ধ'রে এখানেই ছেড়ে দিলে বাড়ি গিয়ে কিছু খেতুম বাবু!

ননী ঃ বাজে বকিস না। এটা একটা লড়াইয়ের ব্যাপার! কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব'লে কথা, একদিন-দু'দিন না খেলেও কিছু আসবে যাবে না!

মান্য ঃ হ্যাঁ, নিজে পেটপুরে খেয়ে এয়েছো কি-না!

ননী ঃ আমরা থানাতেই যাবো। ওখানে গিয়েই যা হবার হবে। চলো থানায়।

তারিণী ঃ কিছুতেই যখন বুঝবেন না— তখন আমার আর কী? চলুন—

ননী ঃ কিন্তু যাবোটা কীসে? ভ্যান তো আনোনি—

তারিণী ঃ হেঁটেই যেতে হবে—

ননী ঃ এঃ, এতটা পথ আমি হেটে যাবো? কক্ষণো না।

তারিণী ঃ তাছাড়া আর উপায় কী বলুন? আপনি একা থাকলে না হয় আমি সাইকেলে চাপিয়েই নিয়ে যেতাম— কিন্তু সঙ্গে যে আরেকটা লেজুড় রয়েছে, এই মান্যটা—

মান্য ঃ তাইলে বাবু আমি ফিরেই যাই। আপনি তারিণী সেপাইয়ের সাইকেলে চেপেই থানায় যান।

ননী ঃ না, কক্ষণো না। একা একা আইন অমান্য হয় না-কি? মান্যও থাকবে।

মান্য ঃ খেয়েছে! ভেবেছিলাম— এ যাত্রা ছাড়ান পেলাম। তা আর হলোনি!

ননী ঃ তারিণী রিক্সো করো। আমরা দু'জন রিক্সোয় যাবো, তুমি সাইকেলে চেপে আসবে।

তারিণী ঃ তার মানে রিক্সো ভাড়াটা আমার গ্যাঁট থেকেই যাবে।

ননী ঃ বাঁ হাতের কারবারে প্রচুর কামাচ্ছো তারিণী, একদিন রিক্সোভাড়া দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

তারিণী ঃ আচ্ছা, তা-ই সই। আপনি তো আমার জন্যে কম করেননি, একদিন না হয় আপনাকে রিক্সোই চাপাই— তাহলে চলুন এবার থানায়।

[ওরা তিনজন চ'লে যায়। আবার মঞ্চের একপাশ থেকে অন্য পাশে পোস্টার নিয়ে একজন অভিনেতা হেঁটে যায়। পোস্টারে লেখা—'চলুন এবার থানায়'। এই নাটকে পুলিশের পোষাক

পরা অভিনেতারা কয়েকটি চেয়ার টেবিল বেঞ্চ এনে মঞ্চে রাখে। ব্যাস্ থানার সেট হয়ে গেল। এবার একটা ফাইল হাতে নিয়ে এস.আই. সামন্ত ঢোকে]

সামন্ত ঃ ওঃ যত রাজ্যের ঝামেলা সব এই শর্মার ঘাড়ে। বড়বাবু নিজে কোনো দায়দায়িত্ব নেবেন না, কায়দা ক'রে সব আমার কাঁধে চাপিয়ে দেবেন— আর খেটে খেটে মরবো আমি। আর উনি শুধু আসল কাজটার সময় মুখ দেখিয়ে সব ক্রেডিট নিজে একাই নেবেন। যেমন এখন, যখন আসল ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে চারপাশে জাল পাতা কমপ্লিট, তখন উনি নিজে গেলেন আসামী ধরতে। সার্কেল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ফিরে এসে জাঁক ক'রে বলবেন— বুঝলে সামন্ত, আমি না গেলে শালাকে ধরাই যেতো না! অথচ এই সামন্তই যে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও পাখি ধরার ফাঁদ পেতেছিল, না হ'লে যে কিছুতেই জালে অত বড় শিকার পড়তো না— সেকথা একটিবারের জন্যেও বলবেন না। এখন সব বন্দোবস্ত পাকা, ছুঁচ গলবার জায়গাটুকুও নেই, তাই এখন আর সামন্তর দরকার নেই, শিকার ধরতে উনি নিজেই যাবেন, আর আমাকে রেখে যাবেন থানার গু-মুত পরিষ্কার করতে। শ্মশানে মড়া আগলানোর মতো আমাকেও একা থানা আগলে ব'সে থাকতে হবে সবেধন নীলমণি দু'টি মাত্র সেপাই নিয়ে। এদিকে আবার তারিণী গেছে ননী ঘোষালদের সার্কাস দেখতে। আমার হয়েছে যত জ্বালা! বড়বাবু আবার যাবার সময় ব'লে গেছেন— সব সাফ্সুতরো ক'রে রাখতে। (চেঁচিয়ে) হ্যা রে কে আছিস? লক্আপটা পরিষ্কার করা হয়েছে?

নেপথ্যে ঃ হাঁ সাহাব, জমাদার সব ধুয়ে মুছে দিয়েছে—

সামন্ত ঃ আর যে তিনটে ছিঁচকে চোর লক্আপে ছিল তারা কোথায়?

নেপথ্যে ঃ ও শালাদের পিসাবখানায় আটকে রাখা হয়েছে সাহাব।

সামন্ত ঃ আর থানার চারপাশে বড় বড় সার্চলাইট লাগানো হয়ে গেছে?

নেপথ্যে ঃ ইলেকটিরি মিস্তিরি এসে গেছে সাহাব, কাম কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে।

সামন্ত ঃ যাক, তাহলে সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ! এখন মহাপ্রভু এলেই হয়! —হ্যাঁ শোন্, তুই কিন্তু গেটেই ব'সে থাকবি, গেট ছেড়ে একদম নড়বি না:

নেপথ্যে ঃ জী হাঁ সাহাব, আমি গেটেই থাকছি।

সামন্ত ঃ এতবড় ক্রিমিন্যাল অবশ্য এ তল্লাটে কোনোদিন আসেনি। তাই

এমন রাজকীয় বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে। শালা ঐজন্যেই দারোগাবাবু লাস্ট মোমেন্টে আমাকে যেতে না দিয়ে নিজে গেল বাহাদুরী দেখাতে। অবশ্য এসব কাজে রিস্ক্ও আছে। ব্যাটাচ্ছেলে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের আর্মস্ ধরতে শেখাচ্ছিল। শালাদের কাছে আর্মস্ এ্যামুনেশন কত আছে, কে জানে! ধরা পড়ার সময় দনাদ্দন গুলি চালিয়ে দিলেই চিত্তির, পৈত্রিক প্রাণটি নিয়েই টানাটানি পড়বে। সেদিক থেকে আমি না গিয়ে ভালোই করেছি, মোটে চারমাস বিয়ে করেছি। এত তাড়াতাড়ি বৌটাকে বিধবা করার রিস্ক্ নেওয়ার কোনো মানেই হয় না! তার থেকে থানায় ব'সে থাকাই ভালো। আর, কাউকে না কাউকে তো থানায় থাকতেই হবে। ঘন ঘন রাইটার্স থেকে— খোদ হোম মিনিস্ট্রি থেকে ফোন আসছে, একেবারে লাস্ট মিনিট পজিশান জানতে চাইছে। আমি না থাকলে ফোন ধরবে কে? ঐ তারিণী? সে শালাও তো ননী ঘোষালদের ফালতু ঝামেলায় ফেঁসে গেছে। কিন্তু— এতক্ষণে তো তার চ'লে আসারই কথা! এত দেরি তো হবার কথা নয়! এদিকে আবার বাইরে থেকে রিজার্ভ আর্মড ফোর্স এসে গেছে। আজকে সারারাত বন্দুক উঁচিয়ে থানা ঘিরে ব'সে থাকবে শালারা, তাদেরও দেখভাল করার দায়িত্ব— এই ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো এস.আই. সামন্তর। কতদিকে যাবো? কোন্‌টা সামলাবো? তারিণী ব্যাটাচ্ছেলে থাকলেও কিছুটা হেল্প হতো, যতই হোক— লোক্যাল লোক। চারপাশের হালচাল সব আমার চেয়ে ভালোই বোঝে। রাজার পার্টির সঙ্গেও কানেকশন আছে। কিন্তু সেও এখনও এসে পৌঁছালো না কেন?
[তারিণীর প্রবেশ]

সামন্ত ঃ এত দেরি করলে কেন? তোমার তো আরও আগেই আসার কথা।

তারিণী ঃ দেরি না হয়ে উপায় কী? কম ঝামেলা!

সামন্ত ঃ তা, ঝামেলা শেষ ক'রেই এসেছো তো?

তারিণী ঃ আজ্ঞে না, ঝামেলা সঙ্গে নিয়েই এসেছি! ঐ দেখুন—

[ননী ও মান্য ঢোকে]

সামন্ত ঃ এ কী! এদের আবার থানায় আনতে গেলে কেন? তোমাকে না বড়বাবু পইপই করে ব'লে গিয়েছিলেন— সব ঝঞ্ঝাট স্পটেই মিটিয়ে দেবে, কিছুতেই ওদের থানায় আনবে না!

তারিণী ঃ বড়বাবু তো ব'লেই খালাস! কিন্তু সেকথা এরা শুনলে তো!

জোর ক'রে থানায় চ'লে এলো— মাঝের থেকে আমার নিজের গ্যাঁট থেকে পাঁচটাকা রিক্সোভাড়া খস্‌লো!

[ননী ঘোষাল ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে সামন্তের সামনে ব'সে পড়েছে। মান্য অবশ্য দাঁড়িয়েই আছে]

সামন্ত : ননীবাবু— আজ আপনারা বাড়ি যান।

ননী : বাড়ি যাবো ব'লে তো এতটা পথ ঠেঙিয়ে এখানে আসিনি সামন্তবাবু। কিছুক্ষণ অবশ্যই থাকবো। আগে আপনারা কাগজ-কলমে আমাদের অ্যারেস্ট্‌ করেছেন ব'লে লিখুন, তারপর না হয় বিনা শর্তে মুক্তি দেবেন— তারপর তো বাড়ি যাবার কথা ওঠে!

সামন্ত : দেখুন, সত্যি বলছি— আজ আমরা ভীষণ ব্যস্ত, দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। থানায় লোকজন খুব কম। তাই বলছি— আপনারা আমাদের নিজেদের লোক। আপনাদেরই সরকার, আর আমরাও সরকারি চাকরি করি, কেন ফালতু নিজেদের মধ্যে ঝামেলা পাকাচ্ছেন ননীবাবু? আজকের মতো রেহাই দিন, বাড়ি যান।

ননী : বলেছি তো— একেবারে পাকাপাকি থাকার জন্যে এখানে আসিনি। কিছুক্ষণ বাদেই চ'লে যাবো। কিন্তু আইন অমান্য অন্দোলন করে যখন অ্যারেস্ট্‌ হয়ে এসেছি; তখন নিয়মরক্ষে করার জন্যে মিনিট দশেকের জন্যে হ'লেও একবার লক্‌আপে ঢুকিয়ে দিন, তারপর না হয় আপনার অনুরোধ রাখতে বাড়ি ফিরে যাবো—

সামন্ত : সত্যি বলছি— আজকে লক্‌আপে একদম জায়গা হবে না—

ননী : ওসব ছেঁদো কথা শুনতে আমি রাজি নই। তারিণী সেপাই হাটতলায় আমাদের অ্যারেস্ট্‌ করেছে। আইনত আমাদের লক্‌-আপে ঢোকাতে আপনি বাধ্য!

তারিণী : আমাকে মিছিমিছি এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন ননীবাবু? আমার কী দোষ? আমি তো আপনাদের অ্যারেস্ট্‌ করতেই চাইনি। আপনারাই বরং জোর ক'রে আমার সঙ্গে এলেন।

ননী : সে যা-ই হোক, এসেছি যখন— একবার লক্‌আপে না ঢুকে যাচ্ছি না।

সামন্ত : তাহলে আপনাকে একটু ওয়েট্‌ করতে হবে, বড়বাবু না ফিরলে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারবো না ননীবাবু, ফাইনাল ডিসিশান উনিই নেবেন।

ননী ঃ ঠিক আছে— তাহলে আমি বড়বাবুর জন্যেই ওয়েট্ করছি।

তারিণী ঃ মান্য— তুই বরং বাড়ি চ'লে যা। তুই অন্তত মেজবাবুর কথাটা রাখ্!

মান্য ঃ (ননীকে) আমি তা'লে বাড়ি চ'লে যাই বাবু? তারিণী সেপাই এত ক'রে বলছে যখন—

ননী ঃ মান্য, খবরদার নয়। আমি বলছি— তুই এখানে থাকবি। আমরা দু'জন যখন একসঙ্গে এসেছি, তখন ফিরবোও একসঙ্গে—

মান্য ঃ কিন্তু বাবু— পেটে যে ছুঁচোর কেত্তন শুরু হয়ে গেছে— সেই সকালে এক গাল মুড়ি খেয়েছি—

ননী ঃ সংগ্রামের স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে আমাদের অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয় মান্য— এসব কথা তোকে আমি কত বুঝিয়েছি; হারামজাদা, তবু তোর মাথায় ঢুকলো কিছু? পেটের খিদে তো ছাড়, সংগ্রামের জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়, বুঝলি?

মান্য ঃ (আপন মনে গজ গজ করে) নিজের পেট ভরা থাকলে এসব বড় বড় কথা বলা যায় বাবু।

তারিণী ঃ (সামন্তকে) বড়বাবু তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি?

সামন্ত ঃ না। সি.আই. দত্ত সাহেবও সঙ্গে গেছেন।

তারিণী ঃ কিন্তু এতক্ষণ তো ফিরে আসা উচিত ছিল বড়বাবুর! এত দেরি হবে কেন? একেবারে পাকা খবর। সকাল থেকেই ঘিরে ফেলা হয়েছে— ব্যাটাচ্ছেলের পালাবার কোনো রাস্তা নেই।

সামন্ত ঃ কিছুই বলা যায় না হে! শালারা যা ডেঞ্জারাস লোক। অত সহজে ধরা দেবে ব'লে মনে হয় না। বড় ধরনের এন্‌কাউন্টার না হয়। বড়বাবু ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

ননী ঃ মনে হচ্ছে— কী একটা ব্যাপার আমাদের না জানিয়েই তলে তলে ঘ'টে চলেছে এখানে—

তারিণী ঃ দোহাই ননীবাবু, আমরা মরছি নিজেদের জ্বালায়— আর আমাদের নতুন ক'রে জ্বালাবেন না মাইরি।

ননী ঃ আশ্চর্য ব্যাপার— সরকার আমাদের, পঞ্চায়েত আমাদের— আর আমাদেরই একেবারে অন্ধকারে রেখে—

[নেপথ্যে মোটরগাড়ি আসার ও থামার শব্দ]

নেপথ্যে ঃ আ-গয়া, আ-গয়া, হজৌর বামাল পাকাড়কে—

(সামন্ত ও তারিণী যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একেবারে লাফিয়ে ওঠে)

সামন্ত ঃ মার দিয়া কেল্লা! বুড়ো শিবতলায় আজই পঁচিশ টাকার পুজো দেবো—

তারিণী ঃ এদিকে সব বন্দোবস্ত ঠিক আছে তো মেজবাবু?

সামন্ত ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক। লক্‌আপ থেকে চোরগুলোকে বের ক'রে পেচ্ছাপখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি— জমাদারকে দিয়ে লক্‌আপ পরিষ্কার করিয়ে রাখা আছে; লক্‌আপ বিলকুল ফাঁকা এখন—

ননী ঃ এই যে বললেন— লক্ আপে আমাদের জায়গা হবে না, লক্ আপ ভর্তি— আর এখন তো দেখছি সব মিথ্যে কথা, ধোঁকাবাজি— নিজেরাই বলছেন— লক্‌আপ ফাঁকা— অথচ সেখানে আমাদের—

সামন্ত ঃ না, আপনাদের সেখানে জায়গা হবে না, লক্‌আপ ফাঁকা থাকলেও সেখানে আপনাদেব ঠাঁই নেই।

ননী ঃ (চেঁচিয়ে) কারণটা শুনতে পারি কি মেজবাবু?

সামন্ত ঃ দেখুন ননীবাবু, মেজাজটা খারাপ করাবেন না— একেই সারাদিন টেনশনে আছি; সরকারি পার্টির লোক হোন আর যা-ই হোন— এবার কিন্তু সত্যিই উল্টোসিধে ব'লে দেবো—

ননী ঃ কী সাহস! এখনই চোখ রাঙাচ্ছে! মনে রাখবেন এখনও সরকার আমাদের। চতুর্থবার ভোটে জিতে এসেছি; আরও পাঁচবছর থাকবো। আমাদের চটালে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে ব'লে দিলুম।

তারিণী ঃ কেন খামোকা মাথা গরম করছেন ননীবাবু— চুপ করুন!

ননী ঃ আমি জানতে চাই— লকআপ খালি থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঢোকানো হচ্ছে না কেন? আমরা আইন অমান্য ক'রে অ্যারেস্ট্ হওয়া সত্ত্বেও—

সামন্ত ঃ রাখুন মশাই— আপনাদের ঐ আইন অমান্য খেলা—

ননী ঃ কী? আমাদের আইন অমান্য খেলা? আমাদের আন্দোলনকে অপমান?

সামন্ত ঃ তা'ছাড়া আর কী? যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঠেক্‌নো দিয়ে টিকিয়ে রাখছেন, তার বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন কী! আর তা'ছাড়া সরকারে থেকে অমন আন্দোলন আন্দোলন খেলা সবাই খেলতে পারে— ওসব পুতুল খেলা যারা খ্যালে, লক্‌আপে তাদের ঢোকাতে আমাদের বয়ে গেছে— আজকে লক্‌আপে ঢোকাতে হবে এমন একজনকে, যে সত্যি সত্যিই আইন অমান্য করেছে—

মান্য ঃ (বিস্ময়ে) সত্যি সত্যিই আইন অমান্য! সেটা কী বাবু?

সামন্ত ঃ সত্যি সত্যিই যে আইন ভেঙেছে! আপনাদের মতো খেলা করেনি, দেশের আইনশৃঙ্খলার পক্ষে যে ভয়ানক বিপদস্বরূপ— আজ লক্‌আপে সে-ই ঢুকবে— আপনারা নন—

[ননী গুম মেরে যায়। দারোগা চ্যাটার্জি ও বঙ্কুবিহারীর প্রবেশ]

চ্যাটার্জি ঃ সি.আই. প্রিজনারকে নিয়ে আসছেন। তারপর,— এদিকে সব ঠিক আছে তো? লক্‌আপ—

সামন্ত ঃ সব ঠিক আছে স্যার, কোনো চিন্তা নেই। — কীভাবে ধরলেন স্যার? কোনো গোলমাল করেনি তো?

চ্যাটার্জি ঃ করেনি আবার? শালারা কি সহজে ধরা দেবার পাত্তর? এমনভাবে তীর আর গুলি চালিয়েছে যে— কাছে যায় কার সাধ্যি? শেষকালে আমার মাথায় একটা মতলব খেললো—

সামন্ত ঃ কী মতলব স্যার?

চ্যাটার্জি ঃ শালা ডাকসাইটে ট্রাইবাল লীডার, সুতরাং পুলিশের ওপর গুলি চালালেও আদিবাসীদের ওপর তীর চালাবে না! তাই একদল সাঁওতালকে জোর ক'রে আমাদের সামনে রেখে তাদের পেছনে নিজেদের আড়াল ক'রে আমরা এগুলুম— ব্যাস্, যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই! নিজের জাতভাইদের সামনে দেখে ওরা গুলি আর তীর ছোঁড়া বন্ধ করলো, আর আমরাও ওদের ধ'রে ফেললাম—

সামন্ত ঃ ভালো বুদ্ধি বার করেছিলেন স্যার!

চ্যাটার্জি ঃ যা-ই বলো, সাঁওতাল ছোকরার কিন্তু সাহস আছে! বাচ্চা ছেলে! কিন্তু যেভাবে আমাদের এ্যাটাক্ করলো, আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়েই গিয়েছিল, এ তো আর ননী ঘোষালদের আইন অমান্য নয়, একেবারে মুখোমুখি যুদ্ধ--

ননী ঃ (চেয়ার ছেড়ে উঠে) কী! আমাদেরই রাজত্বে ব'সে আমাদেরই অপমান!

চ্যাটার্জি ঃ আরে ননীবাবু যে! আপনি এখানে কী করতে এলেন? তারিণী আপনাকে থানায় আসতে বারণ করেনি?

ননী ঃ ও! থানায় আমার আসা বারণ, আর ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের দালাল বঙ্কুবিহারীকে আদর ক'রে থানায় ডেকে আনা হয়েছে? আমি আজই চিফ মিনিস্টারকে রিট্‌ন কমপ্লেন করবো— ও.সি. চ্যাটার্জি তলায় তলায় ঐ বঙ্কুবিহারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, আর আমাদের অপমান ক'রে ঐ হঠকারী উগ্রপন্থী ডাকাতদের সাহসের প্রশংসা করে—

চ্যাটার্জি ঃ হ্যাঁ, তা করি, কিন্তু আবার ঐ ডাকাতদের ধ'রেও আনি আপনাদের রাজত্বকে বাঁচাবার জন্যেই—

ননী ঃ কিন্তু ঐ বঙ্কুবিহারী থানায় কী করতে এসেছে শুনি?

বঙ্কু ঃ ভাই ননী, মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছো! আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করতে থানায় আসিনি, আমি বড়বাবুর সঙ্গে ঐ সমাজবিরোধী আদিবাসী ডাকাতটাকে ধরতে গিয়েছিলাম

ননী ঃ অ্যাঁ! তোমাকে নিয়ে বড়বাবু ডাকাত ধরতে যাচ্ছে? আর আমাদের কোনো খবরই দেয়নি!

বঙ্কু ঃ আমায় না নিয়ে চ্যাটার্জি সাহেব যাবে কী ক'রে? বিহার থেকে ঐ ডেঞ্জারাস সাঁওতাল ছোঁড়াটা পুলিশের তাড়া খেয়ে এই এলাকায় ঢুকে পড়েছে— সে খবরটা তো পুলিশকে আমিই দিয়েছিলাম, আমি না দেখালে পুলিশ ওর আস্তানার খোঁজ পেতো কী ক'রে?

চ্যাটার্জি ঃ ঠিকই তো! বঙ্কুবাবু খবর না দিলে আমরা ওর খোঁজই পেতাম না—

ননী ঃ ও, তার মানে বঙ্কুই এখন পুলিশের উদ্ধারকর্তা বনেছে— বটে!

বঙ্কু ঃ দ্যাখো ননী, তুমি দেখছি— মিছিমিছি মাথা গরম করছো! শোনো, শোনো, বিহারের ডাকসাইটে নকশাল নেতা বসাই টুডু যে বর্ডার পেরিয়ে এই জেলায় আমাদেরই মহল্লায় ঢুকে পড়েছে— সে খবর তো আমি পুলিশকে না-ও দিতে পারতাম, কেননা— এ রাজ্যে সরকার তো আমাদের নয়, তোমাদের। বসাই টুডু এখানেও বিহারের মতো আদিবাসী আর নিচু জাতদের খেপালে তোমাদের সরকারকেই হ্যাপা সামলাতে হতো, তাতে আমাদের দলের তো কোনো ক্ষতি হতো না— বরং এখানে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে ব'লে আমরা দিল্লিতে সোরগোল তুলতাম, তোমাদের সরকারকে ভেঙে দেবার দাবি জানাতাম। এটাই ছিল আমাদের দলের সদস্য হিসাবে আমার কর্তব্য। তাতে দলেরই সুবিধে হতো। কিন্তু ভাই ননী, আমি তা করিনি। আমি দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে দেশ ও জাতির প্রতি আমার কর্তব্য করেছি। বিহারে বসাই টুডুর দল যেভাবে জোতদার-মহাজন-বড়লোকদের পাল্টা মারছে, তা যদি এখানেও শুরু হতো, তবে শুধু আমিই মরতাম না, তুমিও মরতে; দু'জনে দুই পার্টি করলেও জাত আমাদের এক, আর তাছাড়া পঞ্চায়েতের দৌলতে এককালের গরিব ননী মাস্টার স্বনামে-বেনামে কম সম্পত্তি

করেনি! না, না, রেগে যেও না— এটা সবাই জানে— সম্পত্তির হিসেবে তুমি-আমি এখন দু'জনেই শুধু এক জাতেরই নই, এক গোত্রেরও, যদিও দু'জনের হাতের ঝাণ্ডার রঙ ক'রে আলাদা। আমি কিন্তু ঐ ঝান্ডার রঙের ফারাকটাকে বড় দেখেনি। আর দেখিনি ব'লেই এই এলাকায় বসাই টুডুর ঢোকার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশকে জানিয়েছি, প্রশাসনকে জানিয়েছি, হ্যাঁ ননী— তোমাদের বিরোধী দলের লোক হয়েও তোমাদের সরকারকেই সাহায্য করেছি। ভালো করিনি?

চ্যাটার্জি ঃ অবশ্যই ভালো কাজ করেছেন। এইভাবে দলীয় সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে ওঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। ওপর মহল থেকে এজন্যে বঙ্কুবাবুকে টেলিফোনে ধন্যবাদও জানিয়েছে।

বঙ্কু ঃ তোমাদের নেতারাই যদি আমাকে ধন্যবাদ জানায় তবে আর তুমি মুখগোম্‌ড়া ক'রে থেকে কী করবে ননী? এসো— হাত মেলাও। ঐ হতচ্ছাড়া আদিবাসী দলিত নকশাল ছোটলোকদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই একজোট—

সামন্ত ঃ হাত মেলান ননীবাবু— এমন দুর্লভ সুযোগ আর কোনোদিন আসবে না— এ তো শুধু ননী-বঙ্কুর হাত মেলানো নয়, এ হলো কেন্দ্র ও রাজ্যের মিলন— হাঃ হাঃ—

ননী ঃ না, আমি ঐ প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রের দালালের সঙ্গে কিছুতেই হাত মেলাবো না! তাছাড়া একটু আগেই আমরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আইন অমান্য ক'রে অ্যারেস্ট হয়ে থানায় এসেছি, আর এখন ঐ বঙ্কুর সঙ্গে হাত মেলাবো? কভি নেহি!

বঙ্কু ঃ অ্যাঁ! তুমি আইন অমান্য ক'রে থানায় এসেছো? ও হরি, আমি ভেবেছিলাম— তুমিও বসাই টুডুর খবর পেয়েই খোঁজখবর নিতে এসেছো!

তারিণী ঃ না, না, উনি এসবের কিছুই জানেন না। এইমাত্র জানলেন। উনি আর মান্য মাইতি আমার বারণ সত্ত্বেও হাটতলায় দু'জনে মিলে আইন অমান্য ক'রে জোর ক'রে আমার সঙ্গে থানায় এসেছেন?

বঙ্কু ঃ ভাই ননী— তোমাকে কি তোমার পার্টি আর পাত্তা দিচ্ছে না? বিক্ষুব্ধ ব'লে বের ক'রে দিয়েছে না-কি?

ননী ঃ মুখ সামলে বঙ্কু! খবরদার আজেবাজে কথা বলবে না!

বঙ্কু ঃ কিছু মনে কোরো না ননী, সত্যিই পার্টিতে তোমার আগের পজিশন বোধহয় আর নেই। নইলে— তুমি জানতে যে, এই এলাকায় তোমার পার্টি আইন অমান্য স্থগিত রেখেছে!

ননী : কী, আমার পার্টি এই এলাকায় আইন অমান্য স্থগিত রেখেছিল?

বঙ্কু : নিশ্চয়ই, কাল রাতেই তোমার পার্টির আরেক নেতা বিশুবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে— বসাই টুডুর এই অঞ্চলে ঢুকে পড়ার জন্যে আইন অমান্য আপাতত বন্ধ থাকছে।

ননী : ঐ বিশু হারামজাদা তোমাকে খবর দিয়েছে, আর আমাকে কিছুই বলেনি? ঐ শালাই আমার বিরুদ্ধে পার্টিতে ঘোঁট পাকাচ্ছে!

বঙ্কু : মনে হচ্ছে— তোমার দিন ফুরোলো ননী, এখন বোধ হয় তোমাদের পার্টিতে বিশুবাবুরই ক্ষমতা বাড়বে—

ননী : দেখাচ্ছি কার কত ক্ষমতা! কোলকাতায় আমারও খুঁটি আছে, শুধু ওর একারই নেই।

চ্যাটার্জি : ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনাদের পার্টির ভেতরের ঝগড়া না-ই-বা ফাঁস করলেন।

বঙ্কু : আমাদের দলেই এতদিন নেতায় নেতায় চুলোচুলি কামড়া-কামড়ি ছিল, এখন দেখছি— তোমাদের গায়েও সে হাওয়া লেগেছে। আর হবে না-ই-বা কেন? ভাগ-বাঁটোয়ারায় কম পড়লেই ঝগড়া বাড়ে, আমাদের দলেও যেমন, তোমাদের দলেও তেমনি। ক্রমশ আমাদের ব্যবধান ক'মে আসছে— হাঃ হাঃ।

ননী : হেসো না, হেসো না, ঐ বিশুকে যদি না আমি টিট করেছি— উঃ! শালা কম শয়তান! সবাইকেই খবর দিয়েছে, শুধু আমাকেই বাদ? ঐজন্যেই সকালে পার্টি অফিসেও কেউ আসেনি, হাটতলাতেও নয়, আর আমি আর মান্য শুধু দুপুর রোদে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়ে মরলাম—

মান্য : আপনারে তো আগেই বলিছিলাম বাবু— চলেন, বাড়ি যাই, আইন অমান্য করতি হবেনি—

বঙ্কু : কিছু ভেবো না ননী— তোমার দলে যদি তোমার আর প্রতিপত্তি না থাকে— তবে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমার দলের দরজা তোমার জন্যে সবসময়েই খোলা—

ননী : কী! আমি তোমাদের দলে যাবো?

বঙ্কু : কেন নয়? আমাদের দল থেকে যদি তোমাদের দলে লোক যেতে পারে, তবে তোমাদের দল থেকেই-বা আমাদের দলে লোক আসবে না কেন? আর এখন তো আসছেই। আগে আমরা ভাবতেই পারতাম না— তোমার দলের লোক আমার দলে যোগ দেবে— কিন্তু এখন তো এসব জলভাত হয়ে গেছে গ্রামাঞ্চলে! কেননা, আগেই বলেছি— আমাদের মধ্যে তফাৎ

এখন খুব কম। এক মায়েরই দুই ছেলে আমরা, ভোটমাতার দুই সন্তান।

নবী ঃ দ্যাখো বঙ্কু— বাজে কথা বোলো না বলছি—

বঙ্কু ঃ একটুও বাজে কথা নয় ননী। তুমিও ভালো ক'রেই জানো এসব। এই যে এই এলাকায় তোমার দলের এত আধিপত্য, পঞ্চায়েতে আমরা একটা ক্যাণ্ডিডেট দিতে পারিনি পর্যন্ত, কেন বলো তো? আমাদের লোকগুলো কি সব উবে গেল কর্পূরের মতো? মোটেই তা নয় ননী, তারা শুধু ঝাণ্ডা বদল করেছে, আমাদের লোকেরাই তোমাদের দলে গিয়ে ভিড় করেছে, আমাদের লোকেরাই তোমাদের সিম্বল নিয়ে দাঁড়িয়েছে তো আমরা ক্যাণ্ডিডেট পাবো কোথায়? শ্রেফ্ আমার মতো মার্কামারা কিছু লোক তোমাদের সঙ্গে চক্ষুলজ্জায় যেতে পারিনি, কিন্তু আমার ছেলেকে তোমার দলে ঢুকিয়ে দিয়েছি, সে এখন ঐ বিশুবাবুর চেলা, তোমাদের উঠতি যুবনেতা! আমার ছেলে যদি তোমাদের দলে যেতে পারে, তবে তুমিই-বা কেন আমার দলে আসতে পারবে না?

ননী ঃ না, পারবো না, কেননা— আমার একটা আদর্শ আছে— মতবাদ আছে।

বঙ্কু ঃ আদর্শ! মতবাদ! হাসালে ননী ঘোষাল! ওসব আগে ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে ঐ গদিতে বসেছো, সেদিন থেকে ওসব আদর্শ-ফাদর্শ চুলোয় গেছে। আমার প্রধানমন্ত্রীও যেমন শিল্পপতিদের তোয়াজ করে, তেমনি তোমার মুখ্যমন্ত্রীও! একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমার নেতাও নির্বিকার, তোমার নেতাও। আদর্শ! ছোঃ!

(নেপথ্যে আবার গাড়ির আওয়াজ)

চ্যাটার্জি ঃ ব্যাস্, ব্যাস্, নিজেদের মধ্যে কাজিয়া একদম বন্ধ। আহত বন্দী বসাই টুডুকে নিয়ে সি.আই. দত্ত সাহেব এসে গেছেন। সবাই খুব সাবধান— সামন্ত—

সামন্ত ঃ আমার রিভলবার ফুল লোডেড।

চ্যাটার্জি ঃ তারিণী— রাইফেলটা বাগিয়ে ধরো। হারামজাদা কিন্তু ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস, ননীবাবু— বঙ্কুবাবু— একটু ওপাশে স'রে দাঁড়ান— বলা তো যায় না— কখন কী ঘটবে—

নেপথ্যে ঃ সি.আই. সাহাব আ-গয়া— সি.আই.সাহাব—

[খালি গায়ে, রক্তাক্ত দেহ বসাই টুডু মাথা উঁচু ক'রে বীরদর্পে

ঢোকে। পেছনে রিভলবার উঁচিয়ে— সার্কেল ইন্সপেক্টর দত্ত। বসাইকে দেখে সামন্ত ও চ্যাটার্জিও রিভলবার বের করে। কিন্তু রাইফেল হাতে তারিণী ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে। বঙ্কু ও ননী পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে পেছোতে থাকে, এ ওর পেছনে লুকোতে চায়, ও তার পেছনে। কেবল মান্যাই হাঁ ক'রে অবাক হয়ে দেখতে থাকে—]

বসাই ঃ বাবাঃ, একেবারে রাজকীয় অভ্যর্থনা! এতগুলো রিভলবার রাইফেল একেবারে আমার বুক উঁচিয়ে রয়েছে, বাইরেও দেখছি আর্মড ফোর্সের ক্যাম্প! একটা সাদাসিধে সাঁওতালের জন্যে এ যে একেবারে এলাহী বন্দোবস্ত, হাঃ হাঃ!

দত্ত ঃ বসাই টুডু অন্তত সাদাসিধে সাঁওতাল নয়। সে রাঁচি ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট।

সামন্ত ঃ (চ্যাটার্জিকে) বড়বাবু— এর নামটাম কি এণ্ট্রি করবো এখন?

চ্যাটার্জি ঃ পরে, পরে ওসব হবেখন! আগে লক্‌আপে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হই! এ্যাই তারিণী ওভাবে কাঁপছিস কেন? এক্ষুণি গুলি বেরিয়ে গেলে শুধু ও নয়, আমরাও মারা পড়তে পারি!

দত্ত ঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে, সবাই রিভলবার আর বন্দুকগুলো নামিয়ে নিন।

বসাই ঃ এতক্ষণে আপনার বুদ্ধি খুলেছে সি.আই. সাহেব! খালি হাতে এই জায়গা থেকে পালাতে গিয়ে বেঘোরে মরার মতন বোকা আমি নই! কেননা— আমাকে বাঁচতে হবে, আপনাদের সব্বাইকে পাল্টা মার দেবার জন্যে আর মেহনতী জনতার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কিছুদিন অন্তত বাঁচতেই হবে— কী বলেন?

দত্ত ঃ আমাদের কিছু করার আগে নিজেই শেষ হয়ে যাবেন মিস্টার টুডু! জেল থেকে বেঁচে বেরুতে হবে না। ফাঁসি না হোক, লাইফার তো হবেই!

বসাই ঃ পৃথিবীর কোনো জেলের দেওয়াল আমাদের আটকে রাখতে পারে না পুলিশ সাহেব, কেননা সিধো কানহু আর বীরসা মুণ্ডা আমাদের রক্তে কথা বলে। তাই আমি বেরোবোই। আবার আগুন জ্বালাবোই। আদিবাসী, দলিত, ও গরিব মানুষের হাজার বছরের বঞ্চনার বদলা নেবোই নেবো।

চ্যাটার্জি ঃ ওঃ! এইভাবে উণ্ডেড অবস্থায় ধরা প'ড়েও ব্যাটাচ্ছেলের তেজ যায়নি এখনও!

দত্ত ঃ তেজ! সাঁওতাল পরগণা আর ছোটনাগপুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

এই রাজ্যে ঢুকেছিল। ভাগ্যে বঙ্কুবিহারীবাবু খবরটা দিলেন, তাই ধরা পড়লো—

বসাই ঃ ও হ্যাঁ, কে যেন আপনাদের খবর দিয়েছে। তাই না? সেই মহাপ্রভুটি কে? ঐ যে, দু'জন খাঁকি উর্দি না পরা ভদ্দরলোক রয়েছে, ওদেরই মধ্যে কেউ, তাই না? কোন্ জন?

ননী ঃ (ভয়ে) আমি না, আমি না— এ— এ— এ হলো বঙ্কু—

বঙ্কু ঃ বেইমান! তোমাদের সরকারকে সাহায্য করলাম— আর এই তার পুরস্কার দিলে ননী— ঐ খুনে আদিবাসী ডাকাতটাকে চিনিয়ে দিলে আমায় ছি ছি ছি!

বসাই ঃ (বঙ্কুর দিকে এগিয়ে) থুঃ! পুলিশের খোঁচড়!

বঙ্কু ঃ থুতু দিলো, গায়ে থুতু দিলো—

বসাই ঃ মুখখানা মনে থাকবে— আজ না হোক কাল, বেরিয়ে তো আসবোই— তখন—

বঙ্কু ঃ (প্রায় কেঁদে ফেলে) স্যার— স্যার— এ আমাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে স্যার—

দত্ত ঃ ডোন্ট ওরি মিস্টার বঙ্কুবিহারী, মোটেই ঘাবড়াবেন না। বসাই টুডু আজ রাতটুকুই শুধু এই থানায় থাকছে— তারপর কাল সকালে বিশেষ পুলিশ পাহারায় সোজা— দিল্লি— তিহার জেলে— অতদূর থেকে ও আপনার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। (বসাইয়ের পিঠে হাত রেখে) চলুন মিস্টার টুডু— এই লকআপ খোলো—

বসাই ঃ পিঠ থেকে হাতটা সরান পুলিশ সাহেব। (চেঁচিয়ে) সরান বলছি। (এক ঝট্‌কা মেরে) খবরদার, ঐ নোংরা হাতটা যেন এই শরীরটাকে স্পর্শ করার স্পর্দ্ধা না দেখায়। (বুক চাপড়ে) হ্যাঁ ইচ্ছে করলে গুলি ক'রে এই বুকটাকে ঝাঁঝরা ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু গায়ে হাত ঠেকাবেন না!

মান্য ঃ (অবাক হয়ে) বাবা গো! কী সাহস!

দত্ত ঃ চলুন, চলুন— আমার ভুল হয়ে গেছে, স্যরি!

[বসাই বুক ফুলিয়ে প্রস্থান করে। পেছনে পেছনে যায় দত্ত, চ্যাটার্জি ও সামন্ত। তারিণী এগিয়ে আসে]

তারিণী ঃ ননীবাবু— এবার আপনারা যান মাইরি— বুঝতেই তো পারছেন— এ শালা যেন একটা আগুনের ঝড় হয়ে এখানে ঢুকেছে— যতক্ষণ শালাকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে না দেওয়া যাচ্ছে— ততক্ষণে আমাদের নিশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই—

সারা রাত আজ সবাইকেই জেগে কাটাতে হবে— এখন আপনারা যান দাদা— লক্ষ্মী দাদারা— এবার আসুন—

বঙ্কু ঃ চলো ভাই ননী, হাঁটু দুটো আমার এখনও ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে— শালা যেভাবে আমার দিকে চোখ লাল ক'রে তাকিয়ে ছিল, ভাবলে এখনও বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছে! এ শালা তো জেলে গেল, কে জানে এর ক'জন চ্যালা বাইরে আছে, তারা যদি আমায় ঝেড়ে দেয়— আর, এই এলাকা তো আদিবাসী আর নিচু জাতে ভর্তি। উরি বাবা— ননীভাই, একসঙ্গে ফিরি ভাই—

ননী ঃ কিছু ভেবো না ভাই বঙ্কু, আমাদের সরকার তোমাকে প্রোটেকশন দেবে— চলো, আমি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি— আয় মান্য—

মান্য ঃ (দৃঢ়স্বরে) না বাবু!

ননী ঃ কী!

মান্য ঃ আমি যাবো না বাবু।

ননী ঃ তোর আবার কী হলো? যাবি না মানে? এখানে থাকবি না-কি?

মান্য ঃ না, এখানে থাকবো না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গেও যাবো না বাবু! আমি একাই যাবো!

ননী ঃ ও, তুই ভয় পেয়েছিস বুঝি? ঐ সাঁওতাল ডাকাতটার ফাঁকা আওয়াজ শুনে শেষে তোর ভয় হলো? আমাদের সঙ্গে ফিরলে ওর চেলারা চিনে রাখবে ব'লে ভাবছিস? তারপর তোকেও মেরে দেবে ব'লে ভয় পাচ্ছিস? দুর, দুর, ওসব মোটেই ভাবিস না। কোনো ভয় নেই। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দারের দল। ওরা কী করবে? দেখছিস না— ওদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই এককাট্টা—?

মান্য ঃ হ্যাঁ বাবু, তা-ই দেখছি! কেন্দ্র-রাজ্য সব একজোট, ননীবাবু-বঙ্কুবাবু সব এক—

ননী ঃ বাঃ চমৎকার, চমৎকার বলেছিস মান্য। এতদিনে পলিটিক্সটা তোর মাথায় একটু একটু ঢুকছে, মনে হচ্ছে। তাহলে বুঝতেই পারছিস— ওদেরকে ভয় করার কিছুই নেই।

মান্য ঃ (চিৎকার ক'রে) না, ভয় নয়, ভয় নয় বাবু! ওরে তোমরা ভয় পেয়েছো, কিন্তু আমি ভয় পাই নাই। ভয় পাবো কেনে? ও যে মোর বুকের ভেতরে আশা জাগিয়েছে বাবু।

ননী ও বঙ্কু ঃ মান্য!

মান্য ঃ আমি আর তোমার সাথে নাই বাবু! তোমার ঐ আইন অমান্যের ঢপবাজিতে ভুলে আর আমি হেথায় আসছি না ননীবাবু—

ননী ঃ কী?

মান্য ঃ যদি কোনোদিন এখানে আসতে হয় তবে ঐ তাগড়া জোয়ান সাঁওতাল ছেলেটার মতোই আসবো, রাজার মতো বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু ক'রে তোমাদের উঁচু তলার সমস্ত দুনিয়াকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে তবে আসবো— নিচুতলার ঝড় হয়ে আসবো—

বঙ্কু ঃ বলে কী ননীভাই, তোমার ক্যাডার যে বেহাত হয়ে গেল গো—

ননী ঃ মান্য— খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু—

মান্য ঃ আর চোখ রাঙিও না ননীবাবু— তোমাদের চোখ রাঙানোকে মান্য মাইতি আর পরোয়া করে না। তোমরাও যাদের ভয়ে কাঁপো, আজ হ'তে তাদের দলেই নাম লেখাতে চললুম আমি ননীবাবু— (দৌড়োবার ভঙ্গি করে)

ননী ঃ তারিণী, তারিণী— ধর্ ধর্ শালাকে, আরেকটা নকশাল উগ্রপন্থী বাড়লো এলাকায়।

বঙ্কু ঃ বড়বাবু-মেজবাবুকে খবর দে তারিণী— শালাকে ধর্ ধর্—

(ওরাও মান্যর পেছনে দৌড়াতে থাকে। পর্দা পড়ে)

অনুপ্রেরণা ঃ এই নাটকে মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন বসাই টুডু' এবং শৈবাল মিত্রের 'মান্য মাইতির আইন অমান্য' গল্প দু'টির সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে নাট্যরচনায় আমি প্রচুর স্বাধীনতা নিয়েছি, তাই এটিকে গল্প দু'টির নাট্যরূপ বলছি না। —অ. রা.

পথনাটিকা

বলির পাঁঠা

[ল্যু সুনের 'On Self-Sacrifice' অবলম্বনে]

চরিত্র ঃ মোটাসোটা ধোপদুরস্ত নেতা ও জীর্ণশীর্ণ লোকটি

[জননেতা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। পথে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে ধাক্কা লাগলো দীনদরিদ্র লোকটির। লোকটি ছিট্‌কে প'ড়ে যায়]

জননেতা ঃ আহ্‌হা! অন্ধ না-কি? বেমক্কা ধাক্কা মেরে বসলে যে! জানো— আমি কে? জানো— তোমাকে আমি এক্ষুণি পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি—

লোকটি ঃ (আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়) মাপ করবেন হুজুর, খেতে পাই না, শরীরটা বড় দুর্বল, চোখেও কম দেখি—

নেতা ঃ আরে আরে— তোমাকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! কোথায় থাকো? —আমাদের এলাকাতেই? তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি—

লোকটি ঃ বহুবার দেখেছেন হুজুর, গত বারের ইলেকশানে আপনাকে জেতানোর জন্যে আমরা জান লড়িয়ে খেটেছিলাম হুজুর, তখন আপনি সবাইকে প্রচণ্ড পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন হুজুর, উৎসাহ দিয়েছিলেন—

নেতা ঃ আরে আরে— তুমিই তাহলে সেই! কী আশ্চর্য দ্যাখো, এক্কেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি, আসলে ভীষণ কাজের চাপ, সরকারি দায়িত্ব ব'লে কথা! আজ এখানে যেতে হয় তো কাল সেখানে, খালি মিটিং আর মিটিং— ঐজন্যেই পুরোনো কথাগুলো আর মনে থাকে না— যা-ই হোক, কিছু মনে কোরো না ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে, যতই হোক, তুমি আমার কমরেড—

লোকটি ঃ হ্যাঁ হুজুর, আগে আমাদের কমরেড ব'লেই ডাকতেন আপনি!

নেতা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা দু'জনে কমরেড, কী বলো! আরে ভাই, প্রথমে তো তোমাকে আমি রাস্তার একটা হাড়হাভাতে ভিখিরি ব'লেই মনে করেছিলাম— আর রাগও হচ্ছিল খুব— এমন একটা গাঁট্টাগোঁট্টা ছেলে— বুড়োও নয়, কানা-খোঁড়াও নয়— তবু সে

খেটে খায় না কেন, কিংবা লেখাপড়া করে না কেন? কেন সে এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে?

লোকটি ঃ আমি পয়সার অভাবে স্কুলে যেতে পারিনি হুজুর, অল্পবয়েসেই একটা কারখানায় ঢুকেছিলাম, সে কারখানা তিনমাস হলো বন্ধ, তাই পথে পথে ঘুরি। আমায় একটা কাজ দেবেন হুজুর? যে কোনো একটা কাজ?

নেতা ঃ যাক গে, যাক গে সেসব কথা! কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি তোমার মতো একটা ভালো ছেলেকেও খারাপ ভেবে বসেছিলাম, আসলে আমি হচ্ছি খুব দিলখোলা মেজাজের লোক, যা মনে হয়, তা-ই ব'লে ফেলি! হে হে! যা-ই হোক কমরেড, তোমায় কিন্তু বেশ একটু মানে-ইয়ে-আর-কি বেশ একটু ইয়ে দেখাচ্ছে— মানে চেহারাটা বেশ ভেঙে পড়েছে, জামাকাপড়ও ছেঁড়াখোঁড়া তালি মারা— মানে মোটেই ভদ্রোচিত নয় আর কী?

লোকটি ঃ তিন মাস যে লোকটা বেকার— ভালো জামাকাপড় সে পাবে কোথায় হুজুর? আমার আর কিছুই নেই হুজুর, সব গিয়েছে। ঘরে একটা কাঁসার বাসন পর্যন্ত নেই। তিনটে মাস দাঁতে দাঁত চেপে মালিকের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি হুজুর, আর তা'তেই আমার এই ছন্নছাড়া সর্বহারা অবস্থা—

নেতা ঃ অভিনন্দন! বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাই তোমাকে কমরেড! সংগ্রামের স্বার্থে তুমি তাহলে সর্বস্বত্যাগ করেছো? সত্যি বলতে কী— যারা দেশ এবং জাতির স্বার্থে এমনভাবে আত্মত্যাগ করতে পারে, তাদের আমি সবসময় ভীষণ পছন্দ করি। আসলে আমিই তো দেশ ও জাতির জন্যে এমনভাবেই সর্বস্বত্যাগ করতে চেয়েছি চিরদিন, অবশ্য ঠিক পেরে উঠিনি— হে হে—

লোকটি ঃ আমরা জানি হুজুর, আমাদের জন্যে আপনার ত্যাগের সীমা নেই—

নেতা ঃ বলছো তাহলে? অবশ্য অনেকে আমার এইসব দামি দামি চটক্‌দার বাহারী জামাকাপড় দেখে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, মনে মনে আমিও তোমারই মতো সর্বহারা— হে হে হে! আসলে কী জানো, আমাকে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয় কি-না, ঐজন্যেই এইসব ভালো ভালো জামা-কাপড় পরা আর কী! জনগণ এখন ভীষণ খুঁতখুঁতে স্বভাবের রয়ে গেছে বুঝলে! আমি যদি তোমার মতো ঐরকম ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড় প'রে কোনো মিটিংয়ে যাই, তাহলে

কেউ আমাকে পাত্তা দেবে না। তাই আমার এসব দামি দামি জামা-কাপড় দেখে নিন্দুকরা যতই আমার নামে আজেবাজে কথা রটাক না কেন, আমি তা'তে মোটেই কান দিই না। কেননা— আমি জানি— যস্মিন দেশে যদাচার! বেশ্যাপট্টিতে গেলে তোমায় সেজেগুজে মাল টেনে কানে আতর দিয়ে হাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে যেতেই হবে। এছাড়া উপায় নেই। এটুকু মেনে নিতেই হবে, কী বলো?

লোকটি ঃ হ্যাঁ হুজুর, সে তো বটেই।

নেতা ঃ আসলে কী জানো— দেশের কাজ বড় কঠিন! দেশ ও দশের স্বার্থে ঠাট বজায় রাখতে আমার পকেট ফাঁকা হবার জোগাড়। কত টাকা যে খরচ করতে হয়, কী বলবো! অবশ্য আমদানীও কম হয় না। যা-ই হোক কমরেড, তোমায় কিন্তু আজ ভীষণ দুর্বল দেখাচ্ছে, কী ব্যাপার?

লোকটি ঃ ন'দিন আমি কিছু খাইনি হুজুর—

নেতা ঃ অ্যাঁ! ন'দিন তোমার পেটে কিছুই পড়েনি? ওঃ কী মহান, কী বৈপ্লবিক আত্মত্যাগ! অতুলনীয়, সত্যিই অতুলনীয়! আমি যে একেবারে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি— এরকম ত্যাগ সত্যিই দেখা যায় না। আবার তোমাকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই কমরেড—

লোকটি ঃ কিন্তু হুজুর— আমি বোধহয় বেশিদিন বাঁচবো না—

নেতা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেকথা ভালোই বুঝতে পারছি। না খেয়ে মানুষ বাঁচে না। তার মানে— খুব শিগগিরই তুমিও টেঁসে যাবে। কিন্তু কমরেড, তুমি ম'রে গেলেও তোমার নাম আত্মত্যাগের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আবার তোমাকে অভিনন্দন জানাই। ওঃ, ভবিষ্যতের একজন মহান শহীদকে এইভাবে নিজের চোখে দেখা যে কী অপূর্ব গৌরবের আর আনন্দের, তা কী বলবো!

লোকটি ঃ হ্যাঁ হুজুর তা ঠিক।

নেতা ঃ আসলে কী জানো— সবারই শুধু চাই চাই রব। কিছুতেই আর কারও অভাব মেটে না, লোকের চাহিদার আর শেষ নেই, যত দাও, ততই চাইবে— খাদ্য দাও, বস্ত্র দাও, চাকরি দাও, মাইনে বাড়াও, ডি.এ. বাড়াও, ঝকমারীর একশেষ! এমন-কি কলেজ-ইউনিভার্সিটির মাস্টারগুলোও মাইনে বাড়াবার দাবি করছে! আমরা তবে যাই কোথায়? খালি নেই নেই শুনতে শুনতে পাগল হবার জোগাড়! সবাই যদি তোমার মতো হতো রে ভাই, তাহলে কত সহজই না ছিল রাজ্য চালানো। সত্যি,

তোমার কোনো তুলনা নেই! তুমি দিনের পর দিন দেশ ও জাতির স্বার্থে অনাহারে থেকে যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করছো, তা যদি দেশের সবাই অনুসরণ করতো, তাহলে আর এখানে খাদ্য সমস্যা ব'লে কিছু থাকতো না। এখানে একটা উঁচু মতন জায়গা পেলে আমি এখুনি একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে দিতাম। আমরা— আমরা— তোমায় সরকারি উদ্যোগে সম্বর্ধনা দেবো— ফুলের মালা পরাবো— সত্যি, আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমার এই আত্মত্যাগের কথা সর্বত্র প্রচার করার জন্যে ময়দানে একটা সভা ডাকবো, সেই সভায় কিন্তু তোমাকে বক্তৃতা দিতেই হবে কমরেড— কী, পারবে তো?

লোকটি ঃ বোধহয় পারবো না হুজুর, শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে—

নেতা ঃ ওহ্ হো। শরীর ভালো নেই— কী মুশকিল, বড়ই দুঃখের ব্যাপার! তাহলেই বুঝতে পারছো সমাজসেবা যাদের করতে হয়, আগে তাদের নিজের শরীরের যত্ন করতে হয়। যেমন আমি— সবসময় নিজের শরীর ঠিক রাখার চেষ্টা করি, সপ্তাহে একবার ডাক্তারকে দিয়ে চেক্ আপ করাই, রোজ ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স টনিক খাই, তবে তো দেশের কাজ করতে পারি! অবশ্য তোমার কথাই আলাদা, তুমি তো, কী যেন বলে— আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, দেশের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে বসেছো— তোমার স্বাস্থ্যরক্ষার অবশ্য কোনো প্রয়োজনই নেই—

লোকটি ঃ খাওয়াই জোটে না হুজুর, তো স্বাস্থ্য—

নেতা ঃ আরে, আরে, কী ব্যাপার, তোমার তো দেখছি এখনও একটা বেশ মজবুত প্যান্ট রয়েছে, যদিও ওটা নোংরা, ময়লা, ছেঁড়া, আর তালিমারা, তবুও ওটাই তো ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা জ্বলজ্যান্ত নিদর্শন। তার মানে— তুমি এখনও পুরোপুরি সর্বহারা হয়ে উঠতে পারোনি, এখনও সর্বস্বত্যাগ ক'রে উঠতে পারোনি— কিছু মনে কোরো না কমরেড— এই সামান্য একটা প্যান্টের জন্যে আত্মত্যাগের ইতিহাসে তোমার নাম কিন্তু চিরকলঙ্কিত হয়ে থাকবে।

লোকটি ঃ না, মানে, হুজুর, আমি— আমি— মানে— ঠিক—

নেতা ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় আর কষ্ট ক'রে বলতে হবে না কমরেড, তুমি বলার আগেই আমি সব বুঝতে পেরেছি— তার মানে— তুমি এই প্যান্টটাকেও আর অঙ্গে ধ'রে রাখতে চাও না, এটাকেও পরিত্যাগ ক'রে পুরোপুরি সর্বহারা হ'তে চাও। কিন্তু এখনও

তুমি এটা কাউকে দান ক'রে উঠতে পারোনি, মানে দান করার সুযোগ পাওনি, আর কী! কিন্তু কমরেড, স্রেফ এইজন্যে তোমার নামে কলঙ্ক রটবে, এ তো আমি কিছুতেই সইবো না।

লোকটি ঃ জানি হুজুর, আপনার অশেষ দয়া—

নেতা ঃ আসলে তো আমিও তোমার মতোই সর্বস্বত্যাগে বিশ্বাসী। যদিও এখনও মলমূত্র ছাড়া অন্য কিছু ত্যাগ করতে ঠিক পেরে উঠিনি, কেন পারিনি— সে তো তুমি বোঝোই। কিন্তু কমরেড, আমি সবসময়েই অপরকে সাহায্য করতে চাই— আর তাছাড়া তুমি তো আমার আপনজন, আমার বন্ধু সংগ্রামের সাথী, তোমাকে সাহায্য করবো না তো কাকে করবো? নিশ্চয়ই করবো, একশোবার সাহায্য করবো—

লোকটি ঃ সত্যিই সাহায্য করবেন হুজুর? সত্যিই তাহলে আমি বেঁচে যাই হুজুর—

নেতা ঃ না, না, এখানে কোনো বাঁচার কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে মরার কথা, মৃত্যুই হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— তুমি তো ক'দিন বাদেই মরবে, তাই মরার পরেও তোমার নামে কলঙ্ক রটবে— লোকে বলবে— এই লোকটা সর্বস্বত্যাগ করতে পারেনি, সামান্য একটা প্যাণ্টের লোভ ছাড়তে পারেনি— এর চেয়ে খারাপ কথা আর কী হ'তে পারে বলো।

লোকটি ঃ হ্যাঁ হুজুর— ঠিক বলেছেন—

নেতা ঃ ঐজন্যেই আমি তোমাকে কলঙ্কমুক্ত করতে চাই, আর ঠিক সময়েই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ক'দিন ধ'রেই আমার বাড়ির ডাগরডোগর ঝি মাগীটা বায়না ধরেছে— তার একটা হালফ্যাসানের বেলবট্‌ম্ প্যাণ্ট চাই, মানে আজকাল ভদ্রঘরের মেয়েছেলেগুলো কেমন প্যাণ্ট-শার্ট প'রে ঘুরে বেড়ায় দেখেছো তো? আমাদের ঐ টগর ছুঁড়িরও সখ হয়েছে— সেও অমন প্যাণ্ট পরবে! টগর কিছু চাইলে আমার পক্ষে না বলা মুশকিল, কেননা— বোঝোই তো সব, রাত্তিরে মেয়েটা আমার গা হাত পা টিপে দেয়, সেবাযত্ন করে, আরও অনেক কিছু করে, সেসব তোমার না জানলেও চলবে! আরে বাবা, অমনভাবে চোখ বড় বড় ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে দেখার দরকার নেই। তুমি ভাবছো— আমার মতো একটা জনদরদী লোক অমন জোয়ান বয়সের মেয়েছেলেকে ঝি রেখেছে কেন? আরে বাবা, সেবার দুর্ভিক্ষ হলো না? তখন থেকেই ছুঁড়ি আমার কাছেই

আছে। দয়া ক'রে আমি না রাখলে ওর মা-বাবা ওকে নিশ্চয়ই বেশ্যাপট্টিতেই বেচে দিতো! হ্যাঁ হ্যাঁ, বেচে দিতো! আমি অবশ্য মানুষ কেনা-বেচায় বিশ্বাসী নই! না, না, আমি টগরকে ঠিক ঐভাবে কিনিনি! মানে ব্যাপারটা হলো— দুর্ভিক্ষের সময় খেতে না পেয়ে ওর মা-বাবা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, তারপর ওরা টগরকে আমার বাড়িতে কাজকর্ম করার জন্যে দিয়ে যায়। আমি অবশ্য টগরের মা-বাবাকে এজন্যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিলাম। এটাকে তো ঠিক কেনা বলে না। তারপর থেকেই টগর আমার কাছেই আছে। আমার সব ফাইফরমাস খাটে, মানে আমি যা চাই ও তাই করে, ভারী ভালো মেয়ে সে! কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই, শুধু দু'টি খেতে পেলেই খুশি। অবশ্য আমিও টগরকে মোটেই ঝি হিসেবে দেখি না, ওকে আমি আমার মেয়ের মতো, না মানে ইয়ে ঐ বোনের মতো দেখি আর কী, মানে ঠিক বোনও নয়, বোনের চেয়েও বেশি, মানে বোনও যা না করে, টগর তাই ক'রে দেয়। ঐ জন্যেই ও যা চায়, আমি তা দিতে বাধ্য। তুমি অবশ্য বলতে পারো— তাহলে ওর জন্যে একটা নতুন প্যাণ্ট কিনে আনছি না কেন? কী বলবো ভাই, আমার তো সেরকম ইচ্ছেই ছিল, দিতে হয়— নতুন দেবো, কতই-বা খরচ পড়বে, আমার আদরের টগররাণী তো খুশি হবে! —কিন্তু দুঃখের কথা কী বলবো ভাই, আমার বৌটি হচ্ছে ভীষণ সন্দেহপ্রবণ আর খিট্‌খিটে। টগরকে আমি নতুন প্যাণ্ট কিনে দিলে সে একেবারে অন্য অর্থ ক'রে বসবে, মানে ঝেঁটিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দেবে, আর কী! লাইফটা হেল্‌ হয়ে গেল রে ভাই, লাইফটা হেল্‌ হয়ে গেল! ভাগ্যে তোমার এইরকম খাণ্ডারনী জাঁদরেল বৌ নেই! থাকলে বুঝতে কী জ্বালা! যা-ই হোক, তোমার ঐ প্যাণ্টটাই টগর ছুঁড়ির জন্যে নিয়ে যাই, অবশ্য ওটা খুব ময়লা, আর ছেঁড়া, —সে যাক গে, কেচে নিলেই হবে'খন— আর না হয় দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেবো— প্যাণ্টটা তাহলে দিয়েই দাও—

লোকটি ঃ হুজুর— আমার তো একটাই আছে—

নেতা ঃ আহা, আপত্তি করছো কেন? মেয়েটার বর্থ্যদনের সখ— প্যাণ্ট পরবে— তুমি তাকে এইভাবে দুঃখ দেবে? আর তাছাড়া সেও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ, তুমিও তাই! তুমি নিজে গরিব হয়েও আরেকটা গরিব মেয়েকে সাহায্য করবে না, তুমি কি এতই

অমানুষ? আমি কথা দিচ্ছি— তোমার মৃত্যুর পর আমি ময়দানে তোমার একটা বিরাট বড় ব্রোঞ্জের মূর্তি তৈরি করিয়ে দেবো, মহান আত্মত্যাগের গৌরবময় দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরদিন গরিব মানুষেরা তোমার মূর্তিকে পুজো করবে। তবু তুমি প্যান্টটা দেবে না?

লোকটি ঃ এত ক'রে যখন বলছেন, তখন নিয়ে নিন। সবই তো গেছে, এটাই-বা বাকি থাকে কেন?

নেতা ঃ আমি জানতাম কমরেড তুমি রাজি হবেই, তোমার মতো মানুষ কখনও এই মহান কাজে না বলতে পারে না।

লোকটি ঃ আমি এখুনি খুলে দিচ্ছি হুজুর—

নেতা ঃ না না, সর্বনাশ, তুমি এখুনি এটা খুলতে যেও না, কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে! ঐ যে সবাই কেমন তাকিয়ে রয়েছে, দেখছো না? চারদিকে একটা হৈচৈ প'ড়ে যাবে, এক্ষুণি পুলিশ ছুটে আসবে আর প্রকাশ্যস্থানে অশ্লীল আচরণ করার অপরাধে তোমায় গ্রেপ্তার ক'রে বসবে। না, না, সে ভারী বিশ্রী হবে, আমিও জড়িয়ে পড়বো—

লোকটি ঃ হ্যাঁ হুজুর, তা যা বলেছেন—

নেতা ঃ আর তাছাড়া ধোপদুরস্ত দামি দামি জামাকাপড় প'রে আমিও তো তোমার ঐ নোংরা দুর্গন্ধ তাপ্পিমারা প্যান্টটা হাতে ক'রে বয়ে নিয়ে যেতে পারি না, লোকে পাগল বলবে—

লোকটি ঃ তাহলে? তাহলে কী হবে হুজুর—

নেতা ঃ একটু হেঁটে যেতে পারবে? আমার বাড়ি এখান থেকে খুব একটা দূর নয়। পুবদিকে কিছুটা এগিয়ে উত্তরদিকে মোড় নেবে, তারপর সোজা দক্ষিণে। ঐ রাস্তার শেষে তুমি একটা লাল রঙের দরজা দেখবে, আর তার সামনেই দুটো গাছ। ওটাই আমার বাড়ি! একটু কষ্ট ক'রে ওখানেই হেঁটে যাও কমরেড—

লোকটি ঃ বোধহয় পারবো না হুজুর, ন'দিন পেটে কিছু পড়েনি, মাথা ঘুরছে—

নেতা ঃ পারবে না? তাহলে তো ভারী মুশকিল হলো! আমি অবশ্য তোমাকে রিক্সা ক'রে পাঠাতে পারি, কিন্তু সেটাও খুব খারাপ দেখাবে, তোমার মতো মানুষ রিক্সা চড়লে কোনো রিক্সাওলাই টানতে রাজি হবে না। এক কাজ করো— বুকে হেঁটে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে পারবে? মানে হামাগুড়ি? পারবে না?

লোকটি ঃ অ্যাঁ!

নেতা ঃ বেশ, বেশ, তাহলে হামাগুড়িই দাও, দিতে শুরু করো, এইটুকু তো পথ, দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবে! ও হ্যাঁ, খেয়াল রেখো হামাগুড়ি দিতে দিতে যেন হাঁটুর ওপর কোনো মতেই ভর দিও না, সবসময় পায়ের পাতায় ভর রেখে চলবে। কেননা— হাঁটু দিয়ে চললে রাস্তার খোয়ায় ঘষা খেয়ে প্যাণ্টটা ছিঁড়ে যাবে, তাতে আমার টগররাণীর ক্ষতি! তোমারও এত পরিশ্রম বৃথা যাবে। আর হ্যাঁ, আমার বাড়িতে গিয়ে দারোয়ানকে বলবে— বাবু মাইজীকে এই প্যাণ্টটা পৌঁছে দিতে বলেছে, মাইজী যেন প্যাণ্টটা নতুন ঝিকে দিয়ে দেয়। — -কী বলতে হবে বুঝলে তো? হ্যাঁ, দারোয়ানকে দেখা মাত্রই কথাটা বোলো কিন্তু, নইলে সে আবার তোমাকে ভিখিরি ভেবে বেধড়ক ধোলাই দিতে পারে। আমার বাড়ির আশেপাশে কোনো হাড়হাভাতে ভিখিরিকে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। আহা— কী দেশ যে হয়েছে, ভিখিরির সংখ্যা বেড়েই চলেছে ক্রমাগত, শালারা কাজ করবে না, শুধু রাস্তায় ঘাটে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবে— যত্তোসব—

লোকটি ঃ কিন্তু হুজুর—

নেতা ঃ একটা কথা, দারোয়ানকে কথাটা ব'লে আর প্যাণ্টটা খুলে দিয়েই কিন্তু তুমি সেখান থেকে স'রে পড়বে, আর এক মুহূর্তও দাঁড়াবে না— বলা যায় না, ন'দিন তুমি খাওনি, ওখানেই যদি টেঁসে যাও, তাহলে ভীষণ ঝামেলায় পড়বো, তোমার লাশ যদি আমার দরজায় প'ড়ে থাকে, তাহলে চারিদিকে টি টি প'ড়ে যাবে, আমার শত্রুরা এই নিয়ে আমায় বেকায়দায় ফেলে দেবে— তুমি নিশ্চয়ই তোমার কমরেডকে বিপদে ফেলতে চাও না— অতএব কাজটা শেষ ক'রেই ওখান থেকে কেটে পড়বে। তাহলে, কমরেড— আর দেরি নয়, শুরু হোক—

লোকটি ঃ হুজুর—

নেতা ঃ হামাগুড়ি দাও কমরেড, হামাগুড়ি দাও, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি—

[লোকটি নিরুপায়ভাবে হামাগুড়ি দিতে থাকে এবং নেতা গরু-ভেড়া তাড়িয়ে নেবার ভঙ্গিতে—]

নেতা ঃ হ্যাট্ হ্যাট্— তাড়াতাড়ি চল্, তাড়াতাড়ি— হ্যাট্ হ্যাট্— যাঃ যাঃ—

।। সমাপ্ত ।।

শ্রুতিনাটক

স্মৃতির বীজ

চরিত্র ঃ বিনয় ও অনুরাধা

বিনয় ঃ (গলা ছেড়ে গায়) পুরানো সেই দিনের কথা....

অনুরাধা ঃ আস্তে, আস্তে! তোমার গানের গুঁতোয় কান ঝালাপালা হয়ে গেল! এক্ষুণি পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে আসবে। ওদের ছোট মেয়েটা এবার মাধ্যমিক দেবে। তোমার ঐ হেঁড়ে গলার হুঙ্কারে বেচারির পড়াশুনো লাটে উঠবে।

বিনয় ঃ ওঃ! যখনই আমি একটু গুনগুন ক'রে উঠি, তখনই তোমার একটা না একটা অজুহাত তৈরি হয়ে যায়। না হয় আমি তোমার মতো ন্যাকান্যাকা ভাব ক'রে "সখী, ভাবনা কাহারে বলে" গাইতে পারি না, তা ব'লে ভেবো না— গানের আমি কিছুই বুঝি না। আমার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের পৌরুষ ফুটে ওঠে!

অনুরাধা ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের পৌরুষ? কেন বাপু, তুমি কি দেবব্রত না পীযূষকান্তি? গানের নামে গাঁকগাঁক ক'রে না চেঁচিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করলেও তো পারো! সারা বাড়িটা লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে, আর তুমি চোখ বুজে গানের নামে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছো! বলিহারি যাই!

বিনয় ঃ আচ্ছা, আমি একটু মনের আনন্দে গান গাইলেই তুমি এত খেপে ওঠো কেন বলো তো? আমার গানের ওপর তোমার এত বিদ্বেষ কী জন্যে শুনি? এত হিংসে কেন?

অনুরাধা ঃ হিংসে! তোমার গলায় সুরই খ্যালে না, আস্ত অসুর একটা— তাকে করবো আমি হিংসে? ছ্যাঃ!

বিনয় ঃ কী আমি অসুর? এত বড় কথা! কিছু বলি না ব'লে আস্পর্ধা বেড়ে গেছে!

অনুরাধা ঃ আস্তে, আস্তে! এত সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া ক'রে আর লোক হাসিও না। পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন ক'রে রি-মডেল করা হচ্ছে— সারা বাড়িতে জিনিসপত্র ছত্রাকার হয়ে রয়েছে। মিস্তিরিরা খাটছে। আর তুমি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো, যত ঝামেলা সব আমার কাঁধে। তুমি শুধু গান গেয়েই খালাস। বাঃ!

বিনয় ঃ শোনো, শোনো, গানটা এমনি আসে না! ভেতরের আবেগ থেকেই আসে। আজ যে পুরোনো বাড়ি ভেঙে নতুন ক'রে তৈরি করছি, সেই বাড়িটা আমার বাপ-ঠাকুর্দার বাড়ি। কত বছরের কত স্মৃতি এর প্রত্যেকটা নোনা-ধরা ইটের মধ্যে লুকিয়ে, কতজনের কত হাসি কত কান্না এই চুণবালি-খসা দেওয়ালগুলোর ফাটলে ফাটলে জমা হয়ে রয়েছে— সেসব তুমি কী ক'রে বুঝবে? আমার শৈশবের, কৈশোরের, যৌবনের কত স্মৃতি।

অনুরাধা ঃ এই দ্যাখো— কথাটা বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। স্মৃতির কথা তুলতেই মনে পড়লো। আজ মিস্তিরিরা সামনের উঠোনটা খুঁড়তে গিয়ে একটা ছোট্ট টিনের বাক্স পেয়েছে। মাটির তলায় পোঁতা ছিল।

বিনয় ঃ টিনের বাক্স! কই, দেখি— কোথায়?

অনুরাধা ঃ দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।

বিনয় ঃ মাটির তলায় পোঁতা ছিল! গুপ্তধন? যাঃ, তা আবার হয় না-কি?

অনুরাধা ঃ এই নাও! মরচে ধ'রে গেছে। সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো। হাত কাটলেই টিটেনাস।

বিনয় ঃ একটা ছোট্ট তালাও লাগানো আছে। সেটাও মরচে পড়া।

অনুরাধা ঃ কার বাক্স গো? মাটিতে পোঁতা ছিল কেন?

বিনয় ঃ বুঝতে পারছি না। এই যাঃ, চাপ দিতেই তালাটা খুলে গেল—

অনুরাধা ঃ দেখি দেখি, ভেতরে কী আছে— দেখি?

বিনয় ঃ আঃ তাড়াহুড়ো কোরো না। বাক্সটা খুলতে দাও—

অনুরাধা ঃ ওমা! এসব আবার কী?

বিনয় ঃ হ্যাঁ, মণিমুক্তো নয়— গয়নাগাটি নয়। কতকগুলো কাগজ— বেশিরভাগই উই ধ'রে গেছে মাটি হয়ে গেছে— তবু একটা-দুটো কথা পড়া যাচ্ছে।

অনুরাধা ঃ "সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন"...."সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবই...."

বিনয় ঃ তপু! তপুর জিনিস! নিষিদ্ধ লিফলেট, পার্টির ইস্তাহার—

অনুরাধা ঃ কাগজগুলোর তলায় লাল মতো ওটা কী গো?

বিনয় ঃ লাল বই। রেড বুক। — নাঃ, এটাও নষ্ট হয়ে গেছে, হাত লাগলেই পাতাগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—

অনুরাধা ঃ এইসব তোমার ছোট ভাইয়ের জিনিস ?

বিনয় ঃ হ্যাঁ অনুরাধা, হ্যাঁ। মনে হচ্ছে— তপুই বাড়ি ছেড়ে পালাবার

সময় পুলিশের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে এগুলো উঠোনে পুঁতে রেখে গিয়েছিল। ভেবেছিল হয়তো পরে এক সময় এসে মাটি খুঁড়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আর আসা হয়নি।

অনুরাধা ঃ কাগজ পত্তরের তলায় ও দুটো কী? আলো প'ড়ে চক্‌চক্ করছে!

বিনয় ঃ কী সর্বনাশ! এ যে থ্রি নট থ্রি রাইফেলের বুলেট!

অনুরাধা ঃ তোমার ভাই রাইফেলেও চালাতো?

বিনয় ঃ মনে হয়, না। তখন তো এত এ.কে. ফরটি সেভেনের ছড়াছড়ি ছিল না— ওরা বোধহয় ঘরে তৈরি পাইপগানেই এসব ব্যবহার করতো, রিস্কি, খুবই রিস্কি ছিল, এভাবে গুলি ছোড়া—

অনুরাধা ঃ আমি বিয়ে হয়ে এসে অবধি তোমাদের বাড়িতে ঠাকুরপোর একখানা ছবিও দেখিনি। শুধু তোমার মাকেই দেখেছি মাঝেমধ্যে চোখের জল ফেলতে।

বিনয় ঃ মা'র কষ্ট হবে ব'লেই বাবা কোথাও তপুর ছবি রাখেননি, সব সরিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুরাধা ঃ ঠাকুরপোকে কেমন দেখতে ছিল গো?

বিনয় ঃ একটু চাপা রঙ, গালে সদ্য গজানো দাড়ি, একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল, চোখ দুটো স্বপ্নময়— ষোলো-সতেরো বছরের সব ছেলেকেই বোধহয় তখন এইরকমই দেখতে লাগতো—

অনুরাধা ঃ সেই সময়টাই বোধহয় তখন অন্যরকম ছিল। আমাদের পাড়াতেও ঠাকুরপোর দলের ছেলেরা ছিল— তাদেরও দেখেছি— যেমনটা বললে— সেইরকমই সব চেহারা। ভয়ডর নেই, মরার ভয়ও নয়—

বিনয় ঃ "দূর হ'তে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,

ওরে উদাসীন,

ওই ক্রন্দনের কলরোল,

লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,

বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,

ভূতল গগন

মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,

ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে

নূতন সমুদ্রতীরে

তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ....
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হলো শেষ...."

অনুরাধা ঃ সে এক আশ্চর্য সময় ছিল, তাই না! অদ্ভুত সব ছেলের দল—

বিনয় ঃ হ্যাঁ অনুরাধা, আমি সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক বিনয় সেন, শহিদ তর্পণ সেনের দাদা, তার চেয়ে মাত্র বছর ছয়েকের বড়, তবু আমিও যেন ওদের বুঝতে পারি না—

অনুরাধা ঃ কেন যে ওদের বুকে জমা হয়েছিল আগুনের এত জ্বালা, কেন যে এত রাগ ফুঁসছিল ঠাকুরপোদের মনে— আমিও ভেবে ভেবে তল পাই না।

বিনয় ঃ বাইরে থেকে দেখলে বিষয়টা হয়তো এইরকম— স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও সেদিন সাধারণ মানুষের কোনো আশা-আকাঙ্খাই পূর্ণ হয়নি, তা'বড় তা'বড় নেতাদের অজস্র প্রতিশ্রুতির ফানুসগুলো তখন একেবারে ফেঁসে গেছে; গরিব মানুষ— যে তিমিরে সেই তিমিরেই, শুধু ধান্দাবাজ কিছু লোক তাদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রে যাচ্ছে— এইরকম একটা প্রবল আশাভঙ্গের সময়, প্রতিষ্ঠিত দল বা নেতাদের প্রতিও ওরা আস্থা রাখতে পারেনি, মনে হয়েছে— চারিপাশে শুধু রঙবেরঙের মুখোশের মেলা, যে মুখোশের রঙ বদলায়, পোশাকের ঢঙ বদলায়, তবু দিন বদলায় না—

অনুরাধা ঃ দিন বদলাবার আশায় ওরা রাতের আঁধারে নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়লো পথে, নিজের ভালোমন্দ বিচার করলো না, দলে দলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো নিরুদ্দেশ যাত্রায়—

বিনয় ঃ "বাহিরিয়া এলো কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাতল;
যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের কাল হলো শেষ।"

অনুরাধা ঃ এত রক্ত! এত মৃত্যু কখনও দেখেনি কেউ!

বিনয় ঃ এত বিদ্রোহও কখনও দেখেনি কেউ! যৌবনের সেই আগ্নেয়

বিস্ফোরণে, দুঃসাহসী মিছিলের স্লোগানে, তার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের দৃপ্ত প্রত্যয়ে সারা দেশ যেন হঠাৎ হাজার বছরের মোহনিদ্রা ভেঙে স্তম্ভিত-নির্বাক। সুপ্রভাতের গান গেয়ে উঠলো যেন মধ্যরাতে হাজার পাখি—

অনুরাধা ঃ কিন্তু তারপর? সোনালী সকাল তো এলো না।

বিনয় ঃ না, এলো না। আসমুদ্রহিমাচল এই দেশের মানচিত্র জুড়ে শুধু রক্তস্রোত বয়ে গেল। আটজন মৃতদেহ— চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে, আটজোড়া খোলা চোখ আমাকে দ্যাখে বারাসতের আমডাঙার মাঠে, ঠেলাগাড়ির পর ঠেলাগাড়ি চলেছে, শত শত ক্ষতবিক্ষত লাশ বয়ে বরানগর-কাশীপুরে—

অনুরাধা ঃ আমাদের পাড়া ঘিরে ফেললো পুলিশ— কুম্বিং অপারেশন— বাড়ি বাড়ি থেকে জোয়ান ছেলেদের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে তুলে নিলো কালো ভ্যানে— তারা যে কোথায় গেল হদিস মিললো না—

বিনয় ঃ থানার লক্আপে চাপ চাপ রক্তের দাগ, জেলখানার চাতালে রক্ত আর মাথার ঘিলু শুকিয়ে ধুলোয় মিশে গেল, লর্ড সিন্‌হা রোডের টর্চার চেম্বারে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে অমানুষিক বর্বর অত্যাচার— চোখের ওপরে হাজার ওয়াটের আলো— আঙুলের প্রতিটি নখে আলপিন গোঁজা, ইলেক্ট্রিক শক—

অনুরাধা ঃ অথবা সাজানো সংঘর্ষের নামে স্রেফ নিরস্ত্র অবস্থায় মেরে ফেলা—

বিনয় ঃ এসব তো জলভাত তখন। শুনেছি— তপুকে ওরা ধরার পর ভ্যানে তুলে নিয়ে যেতে যেতে মাঝ রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে ওদের নেমে যেতে বলে, বলে— যাও, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হলো— তারপরই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি ক'রে মেরে খবরের কাগজে বিবৃতি দেয়— ভ্যান থেকে পালাতে গিয়ে বন্দীরা মরেছে।

অনুরাধা ঃ তারপর?

বিনয় ঃ তারপর! থানায় থানায় ঘুরে শেষপর্যন্ত কাঁটাপুকুর মর্গে পাওয়া গেল তার লাশ। আমার সেই ছোট্ট ভাইটা— দাদা ছাড়া যার মুখে কোনো ডাক ছিল না, সে তখন থেকেই মলিন হয়ে যাওয়া এক ধূসর ফটোগ্রাফ, তা'ও বাড়ির দেওয়ালে কোনোদিন টাঙানো হয়নি, বাবার তোরঙ্গের তলায় রাখা আছে তার একান্ত অ্যালবাম।

অনুরাধা ঃ যেমন উঠোনের মাটির তলায় ছিল এই টিনের বাক্সটা।

বিনয় : দেখেছো— এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! কারও চোখে পড়ার আগেই এটা সরিয়ে দিতে হবে।

অনুরাধা : সরানোর কী আছে? সবই তো নষ্ট হয়ে গেছে— উইয়ে কাটা কয়েকটা কাগজ—

বিনয় : কিন্তু ওই বুলেট দুটো? কে জানে হয়তো ওগুলো এখনও আগের মতোই তরতাজা, একটু রোদ পেলেই আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে—

অনুরাধা : তোমার ভাইয়েরা তো হেরে গেল! এত আত্মত্যাগ, এত জীবনদান— তবু তো যুদ্ধজয় হলো না ওদের—

বিনয় : আসলে কী জানো অনু, শুধু আগুন জ্বাললেই হয় না, আগুনের ঠিকঠাক ব্যবহারও জানতে হয়। নানা কারণে এখানেও সাধারণ মানুষের থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ক্রমশ। আর, মানুষকে পাশে না পেলে ন্যায়যুদ্ধেও জেতা যায় না। শুধু শৃঙ্খলমুক্তির স্বপ্ন দেখলেই হবে না, ঠিক রাস্তাতেও পা দিতে হবে!

অনুরাধা : আর, এখন তো আমরা স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গেছি। রাস্তায় নামা তো দূরের কথা!

বিনয় : তবু স্বপ্ন মরে না। আবার কেউ না কেউ স্বপ্ন দেখবে, হয়তো-বা পথচলার সঠিক নিশানাও খুঁজে পাবে। — বুলেট দুটো দাও।

অনুরাধা : কেন? এগুলো নিয়ে তুমি কী করবে?

বিনয় : পাশের পুকুরে ফেলে দেবো। জলের গভীরে ঘুমিয়ে থাক্ ওরা একটা প্রজন্মের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে। কিংবা জলের তলায় নরম মাটিতে এই দুটো বুলেট বীজ হয়ে ঢুকে যাবে, অপরাজেয় এক অদম্য বিপ্লবের বীজ। তপুদের উত্তরসূরীরা আবার এই বাংলার বুকেও মাথা তুলে দাঁড়াবে যেদিন, সেদিন স্বপ্নের বীজ থেকে অঙ্কুরিত মহীরুহখানি, ওদের যুদ্ধযাত্রার পথে সাময়িক বিশ্রামস্থল হবে, ছায়া দেবে— সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুশীতল ছায়া। সেই অনিবার্য ভবিষ্যতের জন্যেও আপাতত বুলেটের এই দু'টি বীজ জলের তলায় অপেক্ষা করুক, অজ্ঞাতবাসে থাক্।

———